বঙ্গরহস্য।

[নূতন নক্সা!]

বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতির আলোচনা।

প্রথম খণ্ড।

সমালোচক
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী ইলেক্ট্রো মেসিন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গরহস্য।
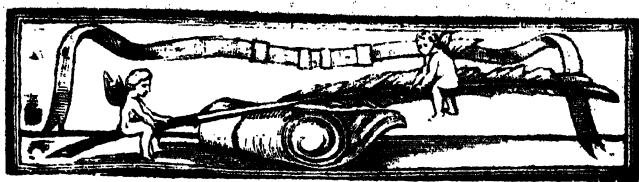
সূচনা।

বঙ্গের ইতিহাস নাই। ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। মার্শম্যান সাহেবের বঙ্গেতিহাসের আরম্ভেই লিখিত আছে, "বঙ্গদেশের প্রথম অবস্থার ইতিবৃত্তে অত্যন্ত গোলমাল।" সেই আদর্শে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশের ইতিহাস লিখিতে উৎসাহী হন, তাঁহারাও মার্শম্যান সাহেবের ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়া দেন, প্রথম ইতিহাস অত্যন্ত গোলমাল। অনুকরণ যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, যাঁহারা গবেষণা, আলোচনা আবশ্যক বিবেচনা করেন না, তাঁহাদের উহাই মাত্র সম্বল; লোকমুখে শ্রবণ করিয়া অথবা অন্য কোন বিদেশী লোকের কিছু কিছু বর্ণনা পাঠ করিয়া লেখনীমুখে তাঁহারা তাহাই বমন করিতে আরম্ভ করেন, ইহাই আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ইহা যদি আক্ষেপের বিষয় বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, "নাই মামা অপেক্ষা কানা মামা ভাল।" যাহা ছিল না, তাহা হইতেছে, ইহাও একপ্রকার মঙ্গল।

যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের পূর্ব্বাবস্থা জানিবারও কোন উপায় নাই। যাঁহারা বঙ্গের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনাও নিখুঁত করিয়া লিখিতে পারেন নাই। একটী দৃষ্টান্ত ধরুন, রাজা আদিশূর। আদিশূরকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতি লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন হইতেছে না, কিন্তু আদিশূরের প্রকৃত পরিচয় লইয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা মহাগণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। বল্লাল সেনের পরিচয়ে আরও অধিক গণ্ডগোল। একজন পণ্ডিত বল্লাল সেনকে কত পিতার পুত্র বলিয়া

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সেই পণ্ডিতের নাম মার্শম্যান। প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন, আদিশূরের পুত্র বল্লাল সেন। পুনরায় লিখিয়াছেন, বল্লালের পিতার নাম মধু সেন, পুনরায় লিখিয়াছেন, সুখসেন, পুনরায় লিখিয়াছেন কেশব সেন, পুনরায় একটা গল্প শুনিয়া হয় তো পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন, বল্লালের পিতার নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। একদা ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া বল্লাল সেনের জন্ম দিয়াছিলেন। বাস্তবিক কোন্‌টী যে সত্য, ইতিহাস-লেখক তাহা নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। শেষকালে সেই পণ্ডিত মহাশয় অবধারণ করিয়াছেন, দিনাজপুর প্রদেশে একখানি তাম্রশাসন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হয়। তাহাতে খোদিত আছে, বল্লালের পিতা ছিলেন বিজয় সেন। আদিশূরের কত দিন পরে বল্লালের অভ্যুদয়, বঙ্গের ইতিহাসে তাহা পাওয়া যায় না। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, বল্লাল সেন সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বহু গোষ্ঠী দর্শন করিয়া তাঁহাদের থাক বন্ধন করিয়া দেন। কতদিনে পঞ্চ ব্রাহ্মণের তাদৃশ বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই বিষয়টী চিন্তা করিলে অনুমানে জানা যাইতে পারে, আদিশূরের বহুদিন পরে বল্লালের জন্ম। যাঁহারা আদিশূরকে বল্লালের পিতা বলিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা ঐ বিষয়টী চিন্তা করেন নাই। যে দেশের ইতিহাসের এরূপ দুর্দ্দশা, সে দেশের প্রাচীন সমাজতত্ত্ব নিরূপণ করা দুঃসাধ্য; আরও কিছু উচ্চে উঠিয়া বলা যাইতে পারে, একেবারেই অসাধ্য।

প্রাচীন বঙ্গসমাজ কি অবস্থায় ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি না। ইংরাজী ইতিহাস দেখিয়া যত দূর জানা যায়, তাহাতে সমাজ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণ সেন উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন, সপ্তদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারী বক্‌তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ জয় করিলেন, মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হইল, এক রাজার পর আর এক রাজা আসিল, একজন মরিল, আর একজন সিংহাসনে বসিল, অমুক স্থানে যুদ্ধ হইল, অমুক স্থানে অমুক পরাজিত হইল, অমুক বিজয়ী হইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইল, আপন নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিল, এই সকল বর্ণনাতেই বঙ্গের ইতিহাস পরিপূর্ণ। যাঁহারা বঙ্গভাষায় বঙ্গের ইতিহাস অনুবাদ করিয়া লইতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তাঁহারা কেবল বমি করিতেছেন মাত্র। পর্য্যায়ক্রমে বমনোচ্ছিষ্ট, তদুচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্টের

উচ্ছিষ্ট কেবল আমাদের নয়নগোচর হয়। আমাদের বালকেরাও ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালায় অভ্যাস করিয়া ইতিহাসজ্ঞ বলিয়া সমাজমধ্যে শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে।

বঙ্গের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা চিত্র করিয়া বঙ্গবাসীকে জানাইয়া দেওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। যে অংশে হস্তার্পণ করিবার ইচ্ছা, সেই অংশেই পদে পদে হতাশ হইতে হয়। অধিক কথা কি, একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও আমরা জানি না; একশত বৎসরের প্রবীণ মনুষ্যও কেহ জীবিত নাই। যাহাকে আমরা বঙ্গ-রহস্য বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা অবশ্য অনেকাংশে আধুনিক অবস্থায় পরিণত হইবে, এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বঙ্গ-রহস্যে আমরা শত বর্ষের পূর্ব্বাবস্থাও আলোচনা করিতে পারিব না। এখন আমাদের সমাজের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবী আছেন, যাঁহারা সংসারের সমাচার রাখেন, তাঁহাদের মুখে যতটুকু অবগত হওয়া যায়, তাহা এবং আমরা যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি, তাহা একত্র করিয়া সামাজিক বিধানে যতদূর পারা যায়, তাহাই আমরা এই বঙ্গরহস্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

পরিবর্ত্তনের যুগ উপস্থিত। যুগে যুগেই পরিবর্ত্তন হয়; মানুষের আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু কেবল ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে, শাস্ত্রেরও যুগধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই বঙ্গদেশে যেরূপ পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহা প্রার্থনীয় কি না, বিচার করা আবশ্যক। অনেকের মুখেই শুনা যায়, অধুনা আমাদের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে, যাঁহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা কেবল সংস্কারের দিকেই অগ্রসর। সত্য সত্য তাঁহারা কোন বিষয়ের সংস্কার সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন কি না, তাহার কোন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না; হইবার আশাও আমরা অতি অল্প রাখি। ইহার কারণ এই যে, বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে কেবল বাক্যবীর হইয়া উঠিতেছেন। দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় যাহা প্রকাশ পায়, কার্য্যে তাহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। পরিবর্ত্তনের দুই মুখ। এক মুখ মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়, দ্বিতীয় মুখ অমঙ্গল আহ্বান করে।

প্রসঙ্গানুরোধে একটী কথা এইখানে বলিতে হইল। যাঁহাদিগকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যাইতেছে, তাঁহারা ইংরাজীতে সুশিক্ষিত না হইলে সেই সম্মানাস্পদ উপাধির অধিকারী হইতে পারেন না। যাঁহারা আর্য্য সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহাদের অনেকেই এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে প্রায়ই উপে-

ক্ষণীয়। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের তুল্য গৌরবাস্পদ উদারশাস্ত্র অতি দুর্লভ; ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা সেই দর্শনশাস্ত্রকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। সংস্কৃত অধ্যাপকের নামে অনেকেই মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করেন, ইহাকে কখনই শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে না। এখনকার পরিবর্ত্তনকে যাঁহারা উন্নতি বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে-ছেন, অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে আমরা তাঁহাদের বিপরীত সিদ্ধান্ত করি। ইংরাজেরা এ দেশের রাজা হইয়া ইংরাজী ভাষা বিস্তার করিতেছেন, তদ্দ্বারা আমাদের উপ-কার হইতেছে, অবশ্যই তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু মূল অশুদ্ধ। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তরলমতি বালকগণের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইলে সংসারের সমস্ত বিষয়ই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রাজার ধর্ম্মের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মের ঐক্য নাই, এই কথা অনেকে বলেন। এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষা-সংক্রান্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে চাহেন। বাস্তবিক ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। যাঁহারা এই নীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলেন, এখনকার বিদ্যাশিক্ষা ঈশ্বরবিবর্জ্জিত, এ শিক্ষার ইংরাজী নাম "God less education" এ বাক্য অখণ্ডনীয়। যে শিক্ষার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই, সে শিক্ষা বিষয়কার্য্যে নৈপুণ্য জন্মাইয়া দিতে পারে, রাজনীতির তর্ক শিখাইতে পারে, চাকরী জুটাইয়া দিতে পারে, বৃথা তর্কশক্তি জন্মাইয়া দিতে পারে, কিন্তু আসলে কিছুই উপকার করে না। তাদৃশী শিক্ষাকে বিফল শিক্ষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই কারণেই দেশের কোন প্রকার প্রকৃত উন্নতি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। দিন দিন বঙ্গসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। সমাজ আছে, ইহা কেবল কথায়; কার্য্যে সমাজকে যেন একটী শূন্য মাত্র বোধ হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সমাজ ছিল, সমাজের পদ্ধতি ছিল, সমাজের বন্ধন ছিল, এক একজন সমাজপতি ছিলেন, তাই সমাজ দাঁড়াইয়া ছিল। এখন সেই সমাজ ভগ্নপদ, পদে পদে সেই সমাজ এখন বিচ্ছিন্ন। যাহার নাম সামাজিকতা, তাহা এখন কেবল নাম-মাত্রেই পর্য্যবসিত। যে কোন বিষয় অবলম্বন করা যায়, তাহাতেই পদে পদে বিচ্ছিন্নভাব দৃষ্ট হয়, একে একে দৃষ্টান্তসহযোগে তাহাই আমরা দেখাইব।

প্রথম তরঙ্গ।

বঙ্গবিবাহ।

শাস্ত্রমতে বিবাহ আমাদিগের প্রধান সংস্কার। এই বিবাহ আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে প্রকার ধর্ম্মভাব-পরিপূর্ণ ছিল, এখন তাহার বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শাস্ত্রমতে বিবাহ আট প্রকার;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। বর্ত্তমান যুগে শেষোক্ত চতুর্ব্বিধ বিবাহ অপ্রচলিত; প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ বিবাহ বিধিবিহিত হইলেও তাহারও অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাহাদের সমাজ নাই, তাহাদের সামাজিক কার্য্যে ব্যতিক্রম ঘটিবে, ইহা বিচিত্র নহে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মূলমন্ত্র ধরিয়া সপ্ততি বর্ষকাল এ দেশের কতিপয় যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটী অভিনব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পৃথিবীর মূলধর্ম্মকে অভিনব ধর্ম্ম কেন বলা হইল, বিজ্ঞ সমাজের নিকট বোধ হয় তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা ঐ মূলমন্ত্রে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার ভাণ করেন, তাঁহাদের উপাসনা-মন্দিরের নাম ব্রাহ্ম-সমাজ; যাঁহারা সেই সমাজে উপস্থিত হন, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্রাহ্মদিগের বিবাহ যে প্রণালীতে সম্পাদিত হইত, কয়েক বৎসর হইল, সে প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া এক প্রকার নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সেই প্রণালীর বিবাহের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মবিবাহ যে প্রকার, আধুনিক ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের ব্রাহ্মবিবাহ সে প্রকার নহে। যে প্রকারে এখন ব্রাহ্ম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকারান্তরে ইংরাজী

বিবাহের অনুকরণ। সে বিবাহে রেজেষ্টারী আছে, সাক্ষী আছে, অঙ্গীকার আছে আর এক প্রকার উপাসনা আছে। আমাদিগের সামাজিক বিবাহে নারায়ণকে ও অগ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া মন্ত্র পাঠ করা হইয়া থাকে; ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্ম বিবাহে মানুষেরা সাক্ষী হয়। শাস্ত্র তাঁরা মান্য করেন না, সুতরাং শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করাই বিফল। ঐ প্রকার ব্রাহ্ম বিবাহে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা পিতৃধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে কি না, প্রথমে এই কথা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল, ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, বিরোধভঞ্জনের নিমিত্ত, বিবাহটী পাকাপাকি করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্ম ভ্রাতারা ইংরাজ বাহাদুরের সরকারে স্বতন্ত্র আইন প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যেখানে এ প্রকার গুরুতর ব্যাপার, সেখানে ঐ প্রকার ব্রাহ্ম বিবাহকে বাঙ্গালীর সামাজিক বিবাহমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। সাধারণ বাঙ্গালী সমাজে অধুনা যে প্রকার বিবাহ চলিতেছে, তাহা প্রাজাপত্য বিবাহের রূপান্তর অথবা নামান্তর হইলেও সেই বিবাহের উল্লেখ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যাহাদিগকে লইয়া সমাজ, তাঁহাদিগকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়াই সমাজের কথা বলিতে হয়। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতির মধ্যে কুলীন অকুলীন শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিয়াছেন। কুলীনের বিবাহ এবং অকুলীনের বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবলতা যখন ছিল না, তখন কুলীনের বংশানুগত কুলমর্য্যাদা ঠিক ছিল; ইংরাজীশিক্ষা প্রবেশ করাতে সে মর্য্যাদা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আইসে, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া অনেকেই কৌলীন্যপ্রথার নিন্দা করিতেন, আজও করেন। দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে বড় বড় বনিয়াদী বংশ ব্যতীত অনেকেই বংশপরম্পরানুগত কৌলীন্যমর্য্যাদায় অবহেলা করিতেছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কুলীনের কন্যা অকুলীনে প্রদত্ত হইত না, এখন সে প্রথা অনেক স্থলে স্বীকৃত হইতেছে না। কুলীনকে কন্যাদান করিতে হইলে মর্য্যাদানুসারে কন্যার পিতাকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে সম্ভ্রমমত বরের পণ ও কুলীন বরযাত্রগণের গণ ইত্যাদি কুলমর্য্যাদার ব্যয় বহন করিতে হইত; তাহা কাহারও পক্ষে কষ্টকর হইত না, শক্তিসামর্থ্য বিবেচনায় উভয়পক্ষের মর্য্যাদারক্ষা হইত, অথচ কাহাকেও দায়গ্রস্ত হইতে হইত না। আজকাল সেই সুপ্রথা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যাইতেছে। অন্বেষণ করিয়া দুটী একটী দৃষ্টান্ত বাহির করিতে হয় না,

ঘরে ঘরে সকলেই প্রায় সেই বিপর্য্যয় দর্শন করিতেছেন; দর্শন করিয়াই নয়নকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে হইতেছে না, প্রায় সকলেই ভুক্তভোগী হইতেছেন। দেশে একটা চলিত কথাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, বঙ্গের বিবাহবাজারে আগুন লাগিয়াছে।

হায় হায়! যে বিবাহের নাম শুভ বিবাহ, যে বিবাহপ্রথার নাম পবিত্র প্রথা, হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে বিবাহ একটা প্রধান সংস্কার, নবপঞ্জিকার সমস্ত শুভানুষ্ঠানের মধ্যে যে বিবাহ শীর্ষস্থানীয়, সেই সুপবিত্র বিবাহকে এখন বলিতে হইল বিবাহ-বাজার! বাস্তবিক আমাদের বিবাহ এখন প্রকৃত একটা বাজার হইয়াই দাঁড়াইয়াছে! এই বাজারে ছাগমেষাদি পশু-বিক্রয়ের ন্যায় ভদ্র গৃহস্থের পুত্রগণ বিক্রীত হইতেছে! বাজার অপেক্ষা বরং আরও কিছু উচ্চ কথা বলা যাইতে পারে, নীলামের বাজার। নীলামে যেমন উচ্চ ডাকে বিবিধ দ্রব্য উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, বিবাহের বরেরাও সেইরূপ নীলামে চড়িতেছে। যে কন্যার পিতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্য দিতে সমর্থ, সেই কন্যার পিতাই ঐ প্রকার নীলামে জয়ী হয়। কুলীন অকুলীন বিচার করা হয় না!

বাজারের আগুন এত প্রবল হইয়া জ্বলিতেছে যে, জিনিসের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করিবার আর অবসর নাই, আগুনের মুখে আহুতি হইলেই মেকীরা খাঁটি হয়, খাঁটিরা মেকী হইয়া যায়! পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিবাহের অগ্রে কন্যার পিতা ঘর বর দেখিতেন। ঘর ভাল হইলে, বর ভাল হইলে, সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইত। তাহার পর বর-কন্যার রাশি, গণ, বর্ণ ইত্যাদি গণনা করান হইত। শাস্ত্রানুসারে উপযুক্ত মিলন হইলে সম্বন্ধ-পত্রিকা লেখাপড়া হইত; বরের মূল্যের কথা আদৌ লেখা-পড়া হইত না। কুলশাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ বিজ্ঞ কুলাচার্য্য মহাশয়েরা মধ্যস্থতা করিতেন; তাঁহারা ঘটক নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঘটক মহাশয়েরা আপনাদের কারিকা মিলাইয়া বরকর্ত্তার ও কন্যাকর্ত্তার বংশপরিচয় ও করণ-কারণাদি আদান-প্রদান নিরূপণ করিয়া দিতেন। সেইরূপ প্রথা থাকাতে ভদ্র গৃহস্থের পুত্র-কন্যা-বিবাহে কোন প্রকার অমিলন বা ব্যতিক্রম ঘটিত না। সেই শুভদিন এখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। এখন কি হইয়াছে?

এখন হইয়াছে, বিবাহের বাজার অথবা বিবাহের নীলাম। ঘটক মহাশয়েরা পাততাড়ি গুটাইয়া প্রায়ই কাম্পিত-হস্ত হইয়া তফাৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দুই

একজন ঘটক মধ্যে মধ্যে দর্শন দেন, কিন্তু তাঁহাদের আর পূর্ব্ব-সম্মান পূর্ব্ব-গৌরব কিছুই নাই। কেহই আর তাঁহাদের মুখাপেক্ষী নহেন। ঘটকের পরিবর্ত্তে অধুনা গোটাকতক প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভদ্রলোকের গৃহে গৃহে বিবাহের ঘটকালি করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের উপাধি হইয়াছে ঘট্‌কী। তাহারা যে কে, কি জাতি, কেহই সে কথা জিজ্ঞাসা করে না; সূক্ষ্ম পরিচয় লইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে, কেহ কেহ হয় তো স্থানবিশেষের অবীরা তপস্বিনী; অথচ তাহারা বহু মানে গৃহীতা হইয়া অবাধে ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুলাচার্য্যের কার্য্য করে। কুলাচার্য্যের কার্য্যের মধ্যে তাহারা জানে, ব্রাহ্মণের কন্যা শূদ্রের বধূ হইতে পারে না, বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বধূ হইতে পারে না, বসুর কন্যা বসুর বধূ হইতে পারে না,—এই পর্য্যন্ত। আর তাহারা জানে, কত ভরি সোণা, কত ভরি রূপা।

ঐ সকল ঘট্‌কী অন্তঃপুরমধ্যে আর কি কি কার্য্য করে, তাহাও আমরা শুনিয়াছি। তাহারা কুলের কুমারীগুলিকে উলঙ্গিনী করিয়া আপাদ-মস্তক পরীক্ষা করে। "পরীক্ষাপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ" এই একটী শাস্ত্রের বচন।

সে পরীক্ষার অর্থ জ্যোতিষবাক্যপ্রমাণে লক্ষণালক্ষণ নিরূপণ। অজ্ঞাতকুলশীলা অথবা বাজারের স্ত্রীলোকেরা সেইরূপে পরীক্ষা করিতে পারে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যে বাটীর কর্ত্তারা তাহাদিগকে ঐরূপ কার্য্যে স্বাধীনতা দেন, তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। পূর্ব্বে বলা হইল, ঘট্‌কীরা কে কি জাতি, তাহা জানা যায় না; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয় জাতির পুত্র-কন্যার বিবাহে অসঙ্কোচে ঘটকালী করে। ব্রাহ্মণের পরিচয় তাহারা কি জানে, কায়স্থের পরিচয়ই বা তাহারা কি জানে, এ কথাও কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন না। বরকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন কেবল সোণা-রূপার কথা, দান-সজ্জার কথা আর পাত্রের বিদ্যা-পরীক্ষার পাশের কথা। কর্ত্তার গৃহিণীও ঐ সকল কথার অতিরিক্ত অন্য কথা জিজ্ঞাসা করেন না; জিজ্ঞাসা করেন কেবল মেয়েটীর রূপ কেমন—গুণ কেমন। আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিবার হেতু এই যে এখন আর কুলপরিচয় জানিবার প্রয়োজন হয় না।

যে সকল কথা আমরা বলিতেছি, তাহা যেন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রবন্ধ। এরূপ বর্ণনা দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে আমাদের বিবাহবাজারের নিগূঢ়

অবগত হইতে পারিবেন না। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদর্শন করা আবশ্যক। সেই দৃষ্টান্তটী নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

বরকর্ত্তা রামজীবন বসু, নিবাস কলিকাতা;—কন্যাকর্ত্তা হরিহর দত্ত, নিবাস হুগলী। ঘটকীর নাম রাইকিশোরী দাসী।

হরিহরের বাড়ীতে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হইয়া রাইকিশোরী প্রথমে বলিল, "তেমন ছেলে আর হয় না, তিন পেশে;—চার পেশে হবার আর মাস ছয়েক বাকী; বয়স এখনও কুড়ি পার হয় নাই, ইহারই মধ্যে চার পাশ। বাপের জমিদারী আছে, তবুও তিনি চাকরী করেন। মাহিনা পান পাঁচশ টাকা। ছেলের রূপ কি আর কব, ঠিক যেন কার্ত্তিক গো কার্ত্তিক। পঁচিশ টাকা জলপানি পায়, এখনও একটুও বাবুগিরী শিখে নাই। ছেলে বলে, 'যখন আমি হাকিম হব, তখন বাবুগিরী শিখ্‌বো।' সেই ছেলের সঙ্গে যদি তোমাদের মেয়ের বিয়ে হয়, তা হোলে রাজযোটক হয়ে যাবে, হরগৌরীর মিলন হবে।"

কর্ত্তাগৃহিণী উভয়েই সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। নীরবে রাইকিশোরীর কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, কর্ত্তা একবার হাই তুলিয়া, কি যেন স্মরণ করিয়া, একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শুনেছিলেম, ভবানীপুরে সেই ছেলের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সেটা হলো না কেন?"

কপালে এক চাপড় মারিয়া রাইকিশোরী বলিল, "একটুর জন্যে ভেঙে গেল গো, একটুর জন্যে ভেঙে গেল! কপালে থাক্‌লে ত হবে! মেয়েটার কপালে ততটা সুখ নাই, তা না হোলে সব একরকম ঠিকঠাক হয়েছিল। ছ-হাজার টাকা নগদ, চারশ ভরি সোণা, একশ ভরি রূপা, দানসজ্জা—খাট, চৌকী, রূপোর বাসন, সোণার গেলাস, বরের হার, ঘড়ী, চেইন, সোণার চশমা, হীরের আংটী আর খাটসজ্জা, লেপ, গদি, তাকিয়া, বালিস, নেটের মশারি, পাশবালিশ, কাণ-বালিশ, গালবালিশ, সব। তা ছাড়া, ছেলে কালেজে যাবে, তার জন্য একখানি গাড়ী। ছেলে যখন হাকিম হবে, তখন সেই গাড়ীর বদলে খুব ভাল একখানা বগী গাড়ী। আর কি জানো?—সে বড় হাসির কথা। ছেলেটী ত এদিকে বিদ্যার জাহাজ, ওদিকে কিন্তু গানবাজনার সখ আছে। সেই জন্য ছেলের মায়ের অনুরোধে মেয়ের বাপ এক প্রস্থ বাজনার যন্ত্র দিতেও রাজি হয়েছিল।"

একটু যেন বিরক্ত হইয়া কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "ও সব কথা সে দিন তো

শুনেছিলেম, আবার ও সব যোল কুড়ি পাটা শুনে আমার কি হবে? সম্বন্ধটা ভেঙে গেল কেন, সেই কথাই আমি শুন্‌তে চাই।"

মুখ ঘুরাইয়া রাইকিশোরী বলিল, "ঐ যে বল্লুম, একটুর জন্য ভেঙে গেল গো, একটুর জন্য ভেঙে গেল। মেয়েটা হারমোনি বাজাতে জানে না।"

অন্তরের ঘৃণা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া হরিহর বাবু বলিলেন, "মেয়টার কি কেবল তবে ঐ একমাত্র খুঁত?"

গলা উঁচু করিয়া রাইকিশোরী বলিল, "খুঁতের কথা যদি বল, একবিন্দুও খুঁত নাই, গড়ন পিটন খুব ভাল, রং যেন আরমানি বিবির মত, মুখ চোক নাক ঠোঁট যেন দেবতার মতন; মিস কালো এক ঢাল চুল, দেখ্‌লেই মনে হয় যেন একখানি ছবি। খুঁত কিছুই নাই। এদিকে আবার আট দশখানা ইংরাজী কেতাব সায় করেছে। ছেলেটী রূপ ভালবাসেন, বিদ্যা ভাল বাসেন, গানবাজনা ভালবাসেন, ঘোড়ায় চড়া ভালবাসেন। ঐ—ঐ—ঐ—কথাটা বল্‌তে ভুল হচ্ছিল। মেয়েটা হারমোনিয়া বাজাতে জানে না, ঘোড়ায় চড়্‌তে জানে না, নাচ্‌তে জানে না, আর—"

হরিহরের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, মুখখানিও আরক্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধে ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি আমাদের মেয়েটাও ঐ সব জানে বুঝি? লে আও ত ঝাঁটা! হারামজাদি! ভদ্রলোকের বাড়াতে ঘটকালী কোত্তে এসেছিস্? ভদ্রলোকের মেয়ে—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে—হিন্দুর ঘরের মেয়ে হারমোনি বাজায়, ঘোড়ায় চড়ে, নাচে? এই সব কথা কি বল্‌তে এসেছিস্? লে আও ঝাঁটা!"

সক্রোধে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে হরিহর শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া ঝাঁটা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। গৃহিনী তাঁহাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, "ঘটকীর দোষ কি? আজকাল ঐ রকম হয়ে উঠেছে। ঘোড়ায় চড়াটা হতে পারে না, সেই কথাটাই যা বল, তা নইলে হারমোনি বাজানো, নাচ-গাওনা করা, ইংরেজী বিদ্যে শেখা এ সকল না হোলে ভাল ভাল বরের পছন্দ হয় না। বরেরা আপনারা এসে মেয়ে দেখে যায়, বিদ্যার পরীক্ষা করে, যে যে গুণ তারা ভালবাসে, সে সকল গুণ আছে কি না, সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। বাজার এই রকম। ঘটকীর উপর রাগ ক'রে তুমি কি করবে?

রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন? তবে ঐ ঘোড়া-চড়া কথাটার উপর যাতে তারা জোর না রাখে, সেইটা বরং—"

ভূতলে পদাঘাত করিয়া হরিহর বলিলেন, মেয়েটাকে যদি চিরকাল আইবুড়ো রাখ্‌তে হয়, তাও স্বীকার, তথাপি তেমন ঘরে কখনই আমি মেয়ে দিব না। কপালে আগুন লেগেছে, বাজারে আগুন লেগেছে, লাগুক্‌, আমি কখন সে বাজারের মাটীতে গড়াগড়ি দিতে পার্‌বো না। টাকার কথা যা তারা বলেছে, গহনার কথা যা তারা বলেছে, দান-সজ্জা যে রকম চেয়েছে, সব কথাতেই আমি রাজি হয়েছি, তার উপর আবার অত বড় উপসর্গ, সেটা আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌বো না। ঘর বর যদি পাওয়া না যায়, অঘরে মেয়ে দিব, বংশের মাথা হেঁট কর্‌বো, দশের কাছে নিন্দাভাজন হব, সে সব বরং সহ্য হবে, মেয়েকে ঘোমটা-ওয়ালী করা—ঘোড়সওয়ার করা কখনই সহ্য কোর্ত্তে পার্‌বো না।"

পত্নীকে ঐ কথা বলিয়া, ঘটকীর দিকে চাহিয়া, সক্রোধে হরিহর বাবু শেষকালে কহিলেন, "যা মাগী যা, দূর হয়ে যা! তোদের সেই ফিরিঙ্গী মুরুব্বিদের বল্‌গে যা, ফিরিঙ্গীর ঘরে আমার মেয়ে যাবে না। এখনি চলে যা! আর একটু যদি দেরী করিস্‌, নিশ্চয় ঝাঁটা খাবি। এই রকম কতকগুলা মাগী জুটেছে, খানকী-গিরী ছেড়ে দিয়ে ঘটকী পেশা আরম্ভ করেছে। মজালে মজালে দেশ একেবারে মজালে! বল্‌গে যা, কল্‌কাতা সহরে যা হয়, যা হচ্ছে, যা চল্‌ছে, আমাদের এ সকল পল্লীগ্রামে মেয়ের বিয়েতে সে সকল ফিরিঙ্গীচাল চল্‌বে না! ছোট ছোট মেয়েরা হারমোনিয়াম্‌ বাজাবে, ফুলুট বাজাবে, স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে খোলা মাঠে হাওয়া খাবে, বাগানে বাগানে বেড়াবে, বিবিয়ানা চালে চল্‌বে, মজ্‌লিসে দাঁড়িয়ে বাইজী হবে, কি ভয়ঙ্কর দিনকাল পড়্‌লো! দেখে শুনে আর একদণ্ড বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হয় না।"

গৃহিণী আর এ সকল কথার উপর অন্য কথা বলিতে পারিলেন না, রাই-কিশোরীও শতমুখী-প্রহারের ভয়ে সেখানে আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।

একটী হরিহর দেখান হইল, এমন শত শত হরিহর আমাদের সমাজমধ্যে কন্যার বিবাহদায়ে মুহ্যমান হইয়া হীনবংশে কন্যাদান করিতে বাধ্য হইতেছেন। যাঁহাদের কন্যা জন্মে, তাঁহারা সকলেই ধনকুবের, উন্মার্গগামী, এমন কথা বলা

যাইতে পারে না। কন্যাদায়ে অনেকেই হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছেন, কুল নষ্ট করিতেছেন, কন্যা সুখে থাকিবে, সেই আশায় এক একজন আচারভ্রষ্ট ব্যবহারভ্রষ্ট স্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত পাত্রের হস্তে আদরিণী কন্যাকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। যাঁহাদিগের কন্যা হইয়াছে, তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া বসিতেছেন। যাঁহাদিগের পুত্র জন্মিতেছে, রাতারাতি বড়মানুষ হইবার লোভে তাঁহারা গরীব বৈবাহিকের সর্ব্বনাশসাধনের কল্পনা করিতেছেন। কলিকাতা সহর অনেকদিন অবধি আজব সহর নামে বিখ্যাত। মুখে মুখে ভাল চেষ্টা করা কতকগুলি লোকের অভ্যাস হইয়াছে, ব্যবহারে মন্দ দৃষ্টান্ত দেখাইবার দলও প্রকাশ্যরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহারা ভাল করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা নাম লই-বার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ফলে ভাল করিতে পারিবেন কি না, তাঁহাদের ভাল চেষ্টা সফল হইবে কি না, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আপাততঃ লোকে তাঁহাদিগকে সমাজ-হিতৈষী বলিয়া বাহাদুরী দিবে, এইরূপ ইচ্ছা অনে-কের। ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়া এ দেশের অনেক লোককে ফাঁকা আড়ম্বর শিখাইয়াছেন। একটা কোন কার্য্যের জন্য সভা করা সেই সকল আড়ম্বরের মধ্যে একটা শূন্য আড়ম্বর। কন্যার বিবাহে ব্যয় লাঘব করিবার উদ্দেশে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী সভা হইয়াছিল। কলিকাতার কায়স্থ মহাশয়েরাই সেই সভার সভ্য এবং কায়স্থ মহাশয়েরাই সেই সভার সভাপতি। সভা-পতিই বলুন কিম্বা দলপতিই বলুন, যাহা বলিলে ভাল শুনায়, তাহাই বলিতে পারেন। ফলতঃ সভা একটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমাদের জাতির ঐক্যের মহিমা যতদূর, তাহা সকলেই জানিতেছেন, কায়স্থের সভায় নগরবাসী কায়স্থ মাত্রেই যোগ দিয়াছিলেন, ইহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন। যাঁহাদের উপর যাঁহাদের কিছু কিছু প্রভুত্ব চলে, যাঁহারা নামের জন্য কোন কোন কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে মাথা দেন, তাঁহারাই তাঁহাদের কতিপয় অনুগত লোককে লইয়া সভা বসাইয়াছিলেন। সপ্তাহে সপ্তাহে সেই সভায় অধিবেশন হইত। পুত্রের বিবাহে যাঁহারা কন্যা কর্ত্তার নিকট হইতে দাবী করিয়া বেশী টাকা গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন, সভার একখানি খাতায় তাঁহারা স্বস্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। নাম স্বাক্ষর করিলেই এ দেশের লোক সেই দলাদের মতানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য,এমন দৃষ্টান্ত আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। কথিত খাতায়

শতাধিক নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সভাটী বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে এক-জনের কন্যার বিবাহ উপস্থিত হয়, কন্যাকর্ত্তা একজন বড়মানুষের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে যান। বরকর্ত্তা আট হাজার টাকা দাবী করেন। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা উভয়েই উক্ত সভার উদ্দেশ্যসাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ স্বাক্ষরকারী। কন্যাকর্ত্তা তাদৃশ ধনবান্ ছিলেন না, চাকরী করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হইত। একটী কন্যার বিবাহে আট হাজার ব্যয় করা তাঁহার অবস্থার অনুকূল ছিল না। আট হাজার টাকা ব্যয় করা,—আট হাজার টাকাতেই সমস্ত বৈবাহিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা নহে, বরকর্ত্তার দাবী নগদ আট হাজার, তাহার উপর আনুসঙ্গিক অপরাপর ব্যয় ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ হিসাব করিলে দশ হাজারের কমে কার্য্য সমাধা হওয়া দুষ্কর। কন্যাকর্ত্তা তখন কি করেন? অগত্যা সেই সভার সভাপতির শরণাপন্ন হইলেন, দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইলেন, কাতর হইয়া অশ্রুপাত পর্য্যন্ত করিলেন; সভাপতিও কাতর হইলেন; কাতরতার সহিত তাঁহার মনে মহা বিস্ময় জন্মিল। কাতর-ভাব বিস্ময়ভাব ঐ উভয় ভাবের উপর আর একটী ভাব মিলিত হইল। কন্যা-কর্ত্তার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি তাঁহার অবার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন। কাতরভাব, বিস্ময়ভাব, সদয়ভাব, তিনভাব একত্র।

সভাপতি মহাশয় কন্যাকর্ত্তাকে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি অদ্য বিদায় হইতে পারেন, আমি ইতিমধ্যে একদিন আপনার ভাবী বৈবাহিক মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইব, প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব, যদি সম্ভব হয়, আপনার পক্ষে সুবিধা করিবার চেষ্টা পাইব।"

কন্যাকর্ত্তা বিদায় হইলেন। তৎপরে দ্বিতীয় দিবসের অপরাহ্নে আহূত হইয়া সেই বরকর্ত্তা মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের ভবনে আগমন করিলেন। সভাপতি তাঁহাকে উপস্থিত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। ক্ষণকাল নতমস্তকে অবস্থান করিয়া মাথা তুলিয়া বরকর্ত্তা মৃদুস্বরে বলিলেন, "সমস্তই সত্য, অঙ্গীকার করিয়াছি, দস্তখৎ করিয়াছি, অঙ্গীকার পালন করিব, তাহাও মনে মনে স্থির করিয়াছি, সমস্তই সত্য; একটী কন্যার পিতা আমার বাটীতে আসিয়া-ছিলেন, তাঁহার কাছে আমি ঐরূপ দাবী করিয়াছি, তাহাও সত্য; কিন্তু মহাশয়, সেটা আমার নিজের মনোগত অভিপ্রায় নহে। অঙ্গীকারানুসারে

অল্প টাকায় আমি রাজী হইতে পারিতাম, কিন্তু গৃহিণীর মত হয় না। গৃহিণী বলেন, 'তুমি স্বাক্ষর করিয়াছ, আমি স্বাক্ষর করি নাই, তোমার অঙ্গীকারের জন্য পুত্রের বিবাহে অল্পপণে আমি রাজী হইতে পারিব না। দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া যে সন্তান আমি প্রসব করিয়াছি, সে সন্তানের উপর আমারই অধিক অধিকার।' এই সকল হেতু প্রদর্শন করিয়া, গৃহিণী আমাকে নিরুত্তর করিয়াছেন। অল্প টাকা লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে গৃহিণীর মত হয় না, আমি কি করিব?"

সভাপতি মহাশয় মৃদু হাস্য করিয়া মস্তক অবনত করিলেন, বাঙ্গালীর অঙ্গীকারের সাধারণত কোন মূল্য নাই, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া অল্পক্ষণ পরেই তথা হইতে তিনি উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণীর মত হয় না, অতএব কর্ত্তা তাহার উপর কিছুই করিতে পারেন না, এ দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা গেল। এক দিকে গৃহিণীর অমত, অন্য দিকে অর্থপিপাসা, এ অবস্থায় উপস্থিত বিভ্রাট্-নিবারণের উপায়ান্তর নাই।

সভাটী অতি অল্পদিন বাঁচিয়াছিল, তাহার পর মরিয়া গেল। দশ বার বৎসর সহরে আর কোন উচ্চবাচ্য ছিল না। এক একজন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ভদ্রসন্তান আপন গৃহে বসিয়া ললাটে করাঘাত করিতেন, দুই তিনজন একত্র হইলে পরস্পর আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তাহাতেই ঐ মহাদায়ের আন্দোলনের উপসংহার হইত। তাহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, এই কলিকাতা নগরীমধ্যে আর একটী সভা হইয়াছিল, সে সভার উদ্দেশ্যও ঐ প্রকার। কন্যার বিবাহে ব্যয়লাঘব করা সেই সভার সভাপতির দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। সভাটী কোথায় ছিল, দুঃখের বিষয় আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একজন ব্রাহ্মণের বাটীর দ্বারের অথবা এক এক কায়স্থের বৈঠকখানায় এক একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন এবং মাসান্তে দীর্ঘ দীর্ঘ কার্য্যবিবরণী পত্রিকা বিতরিত হইত, তাহা আমরা দেখিতাম। যাঁহারা পাঠ করিতেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতাম, ব্রাহ্মণ কায়স্থের কন্যার বিবাহের ব্যয়লাঘবের চেষ্টা হইতেছে। ছাপাখানার কিছু কিছু আয় হইত, কাগজ-বিক্রেতার কিছু কিছু লাভ হইত, সভ্যমহোদয়েরা দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া গলা ভাঙ্গিতেন, সেই পর্য্যন্তই সভার ফলের পরিচয়। শুনিতেছি, সে সভাটীও উঠিয়া গিয়াছে।

সভা হয়, সভা ভাঙ্গিয়া যায়, বক্তৃতা বাঁচিয়া থাকে, ইহাই আমরা দেখিতে

পাই। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে আশানুমত কার্য্যানুষ্ঠান প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। দিন দিন যেরূপ দেখা যাইতেছে, সভার বক্তৃতার ফল যেরূপ শুভ ফল দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শঙ্কা হয়, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহ মহা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। কন্যার বিবাহে অসঙ্গত ব্যয়বাহুল্য আছে বলিয়া, রাজপুতানার কোন কোন জাতি সূতিকাঘরে কন্যা হনন করে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার কুমারী-হত্যা-নিবারণের উদ্দেশে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এখনও পাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিহার-প্রদেশের সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী মুন্সী প্যারীলাল ঐ প্রকার বিবাহের ব্যয়লাঘবের অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর সভা ও বক্তৃতা অপেক্ষা প্যারীলালের উদ্যম ও চেষ্টা অনেকাংশে অধিক ছিল, তথাপি তাঁহাকেও বিফল-প্রযত্ন হইতে হইয়াছে। বরকর্ত্তা অধিক টাকা গ্রহণ করেন, কেবল ইহাই নহে, বিবাহের ব্যয় অনেক প্রকারে বাড়িয়া উঠিয়াছে। বড়মানুষের বিবাহে ইংরাজী বাদ্য, রোসনাই, আতসবাজী ইত্যাদি বাজে খরচ অনেক হয়, সেই দৃষ্টান্তে সামান্য গৃহস্থেরা ঋণগ্রস্ত হইয়াও সেই প্রকার অপব্যয় করিতে বাধ্য হইতেছেন। স্রোত কোথায় কমিবে, তদ্বিপরীতে বরং দিন দিন নানা বিষয়ে নানাপ্রকার অপব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিয়া যাঁহাদের বৈবাহিক মঙ্গলাচার সম্পাদিত হইত, অবস্থাবিশেষে যাঁহারা ঢোল, সানাই ও রোসনচৌকি বাজাইয়া কিঞ্চিৎ ঘটা করিতেন, তাঁহাদের পুত্র-কন্যার বিবাহেও এখন ইংরাজী বাদ্য না হইলে চলে না। ইংরাজী বাদ্য ব্যতীত বিবাহ যেন অসিদ্ধ হয়, ইহাই এক প্রকার সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রে কি সুর, কি তাল, কি মধুরতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝি না; উহা বরং এক প্রকার রণবাদ্য বলিলেই ভাল মানায়। যে বাদ্য শ্রবণ করিলে লোকের মনে ভয় হয়, মঙ্গলকার্য্যে সেই প্রকার বাদ্যের প্রচলন কেন হইয়াছে, তাহাও বুঝা যায় না। অধুনা এই রাজধানীমধ্যে বেশ্যাপুত্রের বিবাহেও ইংরাজী বাদ্যকর-সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হয়; মঙ্গলাচার না বলিয়া, উৎসব না বলিয়া উহাকে এক প্রকার রোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রোগই এক প্রকার গড্ডালিকা-প্রবাহের অন্তর্গত বলিলেও বলা যায়। বড় বড় লোকে যাহা করেন, সামান্য সামান্য গৃহস্থেরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন, এই কথা যখন মনে হয়, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়,

রোগটা সংক্রামক। এ রোগের কোন প্রকার চিকিৎসা আছে কি না, উপশমের কোন প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়-সমূহের কবিরাজ মহোদয়গণের নিকট তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

বঙ্গের ভদ্র ভদ্র পরিবারের বিবাহটী বরকর্ত্তাগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। কন্যাকর্ত্তারা নিঃস্ব হইতেছেন, কাহারো কাহারো ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া যাইতেছে, বরকর্ত্তারা রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া উঠিতেছেন। কুটুম্বের ধনে কেহ কখন বড়মানুষ হন নাই, হইতে পারেনও না, কখনও হইতে পারিবেনও না, ইহা নিশ্চয়, তথাপি কিন্তু কুটুম্বকে ফকীর করিয়া বড়মানুষ হইবার আশা করা কত দূর বিড়ম্বনা, যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা সেটী বুঝিতেছেন না, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়!

আমাদের শঙ্কা হইতেছে, রাজপুতানার বালিকাহত্যার ন্যায় বঙ্গদেশেও সূতিকাগারে বালিকা-হত্যা আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত। পূর্ব্বের কুলীন ব্রাহ্মণেরা যে স্থলে একটী হরীতকী, একটী যজ্ঞোপবীত ও একটী রজতমুদ্রা দক্ষিণা দিয়া স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের পুত্রকে সগৌরবে কন্যাদান করিয়াছেন, এখন সেখানে ন্যূনকল্পে দুই সহস্রের নীচে কিছুতেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা অকুলীন, যাঁহাদের বংশমর্য্যাদা নাই, কুলীনের সম্মান শ্রবণ করিলে যাঁহা-দের হিংসা হইত, সুযোগ পাইলেই তাঁহারা কুলীনের নিন্দা করিতেন; সুযোগ না পাইলেও হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাঁহারা আলস্য করিতেন না; কথা তুলি-তেন, এক একজন কুলীন একশত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন, বৃদ্ধা কন্যারাও অবিবাহিতা থাকিত, কাহারো কাহারো চিরজীবনেও বিবাহ হইত না, কুলীনের কন্যারা সতীত্ব বজায় রাখিতে পারিত না ইত্যাদি ইত্যাদি জঘন্য নিন্দাবাদ তাঁহা-দের যেন ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। কুলীনের বহু বিবাহ এবং কোন কোন স্থলে অধিকবয়স্কা কন্যার পরিণয় প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যিনি এ দেশে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কুলীনকে বহু বিবাহ করিতেই হইবে, কুত্রাপি তিনি এমন মাথার দিব্য দিয়া যান নাই। কুলীনের বিবাহে ঘর-বর দেখা হইত, ইহা সত্য, ইহা গৌরব। সেই সত্যতা এবং সেই গৌরবরক্ষার নিমিত্তই পাত্র অন্বেষণে ও পাত্রনির্ব্বাচনে কোন কোন শ্রেষ্ঠ কুলীনের কন্যার বিবাহ দিতে কিছু [illegible] হইত, অধিক-

বয়স্কা কন্যা অনূঢ়া থাকিত, ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু বহু-বিবাহপ্রথা আপনা হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। অধিকবয়স্কা কন্যার বিবাহ, তাহাও এখন সকল ঘরে হয় না, যাঁহারা বাল্য-বিবাহের বিরোধী, কুলীন না হইলেও তাঁহারা কন্যাগুলিকে বড় করিয়া থাকেন, ইহা কৌলীন্যের দোষ নহে, কুলীনের দোষ নহে; কেন না, রাজা বল্লাল সেন নবগুণবিশিষ্ট ধার্ম্মিক লোকদিগকেই কুলীনশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিক লোকেরা বিবাহ-সম্বন্ধে কোন প্রকার অবিবেচনার কার্য্য করিবেন কিম্বা করিতেন, পরিণামদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা কখনই সে কথা বলিতে পারেন না। বংশানুক্রমে কুলীন হইবে—আচারভ্রষ্ট হইলেও দুরাচার কুলীনসন্তানেরা কুলীনের সম্মান প্রাপ্ত হইবে, রাজা বল্লালের নিয়মের মধ্যে তেমন কথা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাসবেত্তা মার্শম্যান সাহেব ঐ অংশে ভুল করিয়াছেন। ইংরাজী বঙ্গেতিহাসে কৌলীন্য বংশানুগত, এই মিথ্যাকথা পাঠ করিয়াই বঙ্গবাসিগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা কুলীনের দোষ দেখাইতে তৎপর, তাঁহাদের মধ্যে একজনের দৃষ্টান্ত এইখানেই উল্লেখ করা আবশ্যক। দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ নাটক রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত একখানি নাটকের নাম "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক। সেই নাটকে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, একজন কুলীন ব্রাহ্মণের একটী পূর্ণবয়স্কা কন্যা অবিবাহিতা ছিল, সেই কন্যা কখন বিবাহের নাম শ্রবণ করে নাই। একদিন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, "অমুকের বিয়ে হইবে," সেই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যা তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বিয়ে কি মা? বিয়ে লইয়া লোকে কি করে? বিয়ে কি খায় না পরে?" এটা যে কত বড় নিন্দুকের কথা, যাঁহাদের কিছুমাত্র বিবেচনাশক্তি আছে, তাঁহারা সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেই নাটকের যখন অভিনয় হইয়াছিল, তখন অনেক লোক ঐ কথা লইয়া আমোদ করিয়াছিলেন। কন্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল পুরুষ বহুদিন অবিবাহিত থাকে কিম্বা জীবনে যাহাদের কখন বিবাহ হয় না, তাহারাও কি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে? নিন্দাকারী লোকের চরিত্রই বিচিত্র; যাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, নিজের বুদ্ধিতে তাহা রচনা করিয়াও, নিন্দাকারী লোকেরা অকারণে ভদ্রলোকের নিন্দা করে।

বিবাহ-বাজারে আগুন লাগাতে আজকাল বোধ হয়, সেই প্রকার নিন্দাকারী লোকেরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছে ; কারণ, অনেক কুলীনসন্তান এখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা অগ্রাহ্য করিয়া স্বচ্ছন্দে অম্লানবদনে অঘরে কন্যাদান করিতেছেন, কন্যা নানাপ্রকার স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিবে, চিরকাল সুখে থাকিবে, বহুমুদ্রা মূল্য দিয়া বর কিনিতে হইবে না, এই সুবিধার জন্যই কুলীনের কন্যা আজকাল অঘরে পড়িতেছে। প্রায়ই এইরূপ আমরা দর্শন করিতেছি।

পূর্ব্বে এ দেশে ভদ্র ভদ্র শ্রেণীর মধ্যেও কন্যা-বিক্রয়-প্রথা প্রচলিত ছিল, আজও স্থানে স্থানে আছে, কিন্তু পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। যাহারা কন্যা বিক্রয় করিত, ভদ্র লোকেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিত, এমন কি, মর্য্যদাবান্ সামাজিক লোকেরা তাহাদিগের সহিত আহার-ব্যবহার করিতেন না। শাস্ত্রবচনপ্রমাণে তাঁহারা সকলেই বলিতেন, "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যদ্দেশে শুক্রবিক্রয়ঃ।" যে দেশে শুক্র বিক্রীত হয়, সে দেশ পতিত, ইহাই ঐ বচনের অর্থ। শুক্র বিক্রীত হইলে কেবল বিক্রেতা মাত্র নহে, দেশ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া যাইত। হায় হায়! সে দিন এখন কোথায়? সে শাস্ত্রীয় বচনের গৌরব এখন কোথায়? এখন ঘরে ঘরে পুত্র-বিক্রয় হইতেছে। কৈ, কেহই ত এখন সে বচনটী একবার মুখেও আনেন না? বিনা শুক্রে কি পুত্রের উদ্ভব হয়? পুত্র বিক্রয় করিলে কি শুক্র বিক্রয় করা হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরদাতা অন্বেষণ করা আবশ্যক।

পুত্র-বিক্রয়ের স্রোত শীঘ্র শীঘ্র বন্ধ করিতে না পারিলে, দেশের বিবাহপ্রথা ক্রমশঃ আরও অধিক কলঙ্কিত হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম, কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্ মহাশয়েরাই পুত্রের বিবাহে কন্যা-কর্ত্তার নিকট হইতে সম্ভবাদি শুল্ক গ্রহণ করিতেন। এখন সেই সুবর্ণবণিকেরাই ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আদর্শস্থলে দাঁড়াইয়াছেন। সমাজের নাম উচ্চারণ করিতে হইলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ এই উভয় জাতি আমাদের নয়ন-পথে উপস্থিত হন; সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থই যখন গৃহ-বিগ্রহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চলিলেন, তখন আর অপরাপর জাতির কথা আমরা কি বলিব। ঐ দুটী শ্রেষ্ঠজাতির অধঃপতন হই-লেই—সমাজ অধঃপাতে যাইবে, ইহা ধরা কথা।—সমাজ অধঃপাতে যাইয়া বসিয়াছে। অনেক প্রকারেই সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, দিন দিন সমাজ বিচ্ছিন্ন

হইয়া যাইতেছে, সমাজে শাস্ত্রশাসন প্রায়ই গ্রাহ্য হইতেছে না; প্রায় সকল বিষয়েই আমাদের সমাজবন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। যদি আমরা বলি, আর আমাদের সমাজ নাই, তাহা হইলে ত কেহ আমাদিগকে দোষী করিতে পারিবেন না। সমাজ নাই, সামাজিকতা নাই, জাতি আছে, জাতীয়তা নাই, ইহা এ দেশের সামান্য দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক নহে। অনেক কথা বলিতে বাকী রহিল; সমাজের বন্ধু যদি কেহ থাকেন, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া ফলাফল চিন্তা করিবেন, প্রতিবিধানের যদি কোন উপায় থাকে, সেই উপায় অবলম্বনে আশু প্রতিবিধানের চেষ্টা পাইবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

কি প্রকার উপায়ে প্রতিবিধানের চেষ্টা আরম্ভ হইতে পারে, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আমরা দেখাইয়া দিতেছি। এক ব্রাহ্মণের একটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল, ব্রাহ্মণের যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল, তাহাতে অতি অল্পই আয় হইত, কলিকাতার একটী আপিসে মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে তিনি চাকরী করিতেন। কন্যাটী ক্রমেই বয়স্থা হইয়া উঠিল, বিবাহের যেরূপ বাজার, সে বাজারের মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ যেন ফাঁপরে পড়িলেন। চারি হাজার, পাঁচ হাজার, ছয় হাজার, এইরূপ উচ্চ উচ্চ দরে পাত্র ক্রয় করা অসাধ্য—তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে কন্যাটী অনেক বড় হইয়া উঠিল,—সপ্তদশবর্ষীয়া। সেই সময় একটী পাত্র যুটিল। দানসজ্জা, রাহাখরচ এবং অপরাপর ব্যয়-সংবলিত মোট চুক্তি হইল নগদ আড়াই হাজার টাকা। সেই আড়াই হাজার টাকাও ব্রাহ্মণের সম্বল ছিল না। পৈতৃক নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিয়া এবং কতকাংশ ঋণ করিয়া তিনি ঐ আড়াই হাজার সংগ্রহ করিলেন। বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন নববধূ লইয়া বর স্বগ্রামে স্বগৃহে গমন করিলেন। ফুলসজ্জার রজনী, কুলস্ত্রীগণের প্রথামত আমোদ-প্রমোদ শেষ হইল, বর-কন্যা এক গৃহে শয়ন করিলেন। বরের কিছু কিছু নেশা করা অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যার পরেই তিনি নেশা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কিছু অধিক মাত্রায় সিদ্ধি পান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের বর, তাঁহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না, তিনি নিজেই সংসারের কর্ত্তা। বিবাহ করিয়া বিবাহের সেই আড়াই হাজার টাকা তিনি নিজেই একটী বাক্সবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে গৃহে ফুলসজ্জা, সেই গৃহের একটী তাকের উপরে সেই বাক্সটী রক্ষিত হইয়াছিল, কন্যাটী তাহা দেখিয়াছিলেন। সিদ্ধির ঝোঁকে বর অঘোর

হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। কন্যাটী ঘুমাইলেন না। বাটীর সকলে নিদ্রাভিভূত। রাত্রি প্রভাত হইবার একপ্রহর থাকিতে উঠিয়া, বাক্সটী বক্ষে লইয়া, কন্যাটী গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। শ্বশুরালয় হইতে তাঁহার পিত্রালয় প্রায় ছয়ক্রোশ দূর। পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া, সেই কন্যা আপন স্বামীকে পত্র লিখিলেন, "আমার পিতা দরিদ্র, সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া তাহার উপর ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি আমার বিবাহ দিয়াছেন। তোমার নিজের মূল্যস্বরূপ তুমি তাঁহার নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই আড়াই হাজার টাকা আমি লইয়া আসিয়াছি; বাক্সটী শুদ্ধ সেই আড়াই হাজার টাকা আমি আমার পিতাকে দিয়াছি; না দিলে সংসারে তিনি দাঁড়াইতে পারিতেন না। যত টাকা ঋণ করিয়াছেন, চাকরীর টাকা হইতে তাহা শোধ করিতে হইলে পরিবার-প্রতিপালনে তিনি অক্ষম হইবেন; অতএব তাঁহার সেই টাকাগুলি আমি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে চোর বলিয়া যদি তুমি পুলিসের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা কর, স্বচ্ছন্দে পার।"

বাস্তবিক পুলিসে মকদ্দমা হইয়াছিল। বর সে মকদ্দমায় জয়ী হইতে পারে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। অবশ্যই সুবিচার হইয়াছিল, পুত্রবিক্রেতা ভিন্ন বোধ হয় সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন।

এটী রহস্য নহে, প্রকৃত ঘটনা। হুগলী জেলার মধ্যেই এই ঘটনা হইয়াছিল। পুত্র বিক্রয় নিবারণ-কল্পে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে এবং এই প্রকারের দুই একটী মকদ্দমা দায়ের হইলে, বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে এই পাপ প্রথা বিদূরিত হইতে পারিবে। আমরা সবিনয়ে প্রার্থনা করি, এই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া, যাঁহারা অন্তরে বেদনা অনুভব করিবেন, তাঁহারা যেন আমাদের উপর ক্রুদ্ধ না হন। দুই একজনকে ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আমরা যদি এ কথা বলিতাম, তাহা হইলে হয় তো আমাদের দোষ হইতে পারিত, কিন্তু দেশকে দেশ, সমাজকে সমাজ যে উৎপাতে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, সেই উৎপাতানলে শান্তিজল নিক্ষেপ করিয়া সাধারণ মঙ্গলের উদ্দেশে এই দৃষ্টান্তটী প্রদর্শিত হইল, ইহা স্মরণ করিয়া পুত্রবিক্রয়কারিগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে পুত্রের পিতা-মাতা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতেন, আত্মীয়-লোকেরা

কন্যা দেখিয়া মনোনীত করিয়া আসিতেন, কুলাচার্য্যেরা ঘটকালী করিতেন। আজকাল সে প্রথার পরিবর্ত্তে বরেরা ছদ্মবেশে পাত্রী দেখিতে যান, বরেরাই কন্যাগণকে পরীক্ষা করেন, বরেরাই সম্বন্ধ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, কেবল দেনা-পাওনার কথাটী কর্ত্তাদের উপর অথবা গৃহিণীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। একটী পাত্রের পাত্রী-দর্শনের একটী দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

মফস্বলের একজন জমীদারের কন্যার বিবাহ, নির্ব্বাচিত পাত্রটীও জমীদারের পুত্র। পুত্র স্বয়ং ছদ্মবেশে কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখা-শুনা শেষ হইলে কন্যার পিতা সেই ছদ্মবেশী পাত্রকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানভ্রমণে যান। সেই ছদ্ম-বেশী বাবু যে স্বয়ং বরপাত্র, কন্যার পিতা তাহা বুঝিয়াছিলেন। পাত্রটী দেখিতে রূপবান্, বয়স অল্প, সম্ভবমত বিদ্যাপরীক্ষাও করিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বাংশেই ভাল। ধনবানের পুত্র সচরাচর প্রায়ই সৌখীন হইয়া থাকেন, এই পাত্রটীও সৌখীন। তাঁহার হস্তে একগাছি সৌখীন ধরণের ছড়ি ছিল। উদ্যানভ্রমণের সময় সেই ছড়ি দ্বারা তিনি পথের উভয় পার্শ্বের সযত্ন-পালিত বৃক্ষলতার নব নব পল্লব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিতেছিলেন। জমীদার মহাশয়ের সেই দিকে দৃষ্টি ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবী জামাতার সেই কার্য্য তিনি কটাক্ষে দর্শন করিতেছিলেন। উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যথাসময়ে পাত্রটীকে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। মনোমধ্যে একটী চিন্তার উদয় হইল।

জমীদার মহাশয়টী ভাবুক লোক; প্রকৃতি দর্শনে তাঁহার অন্তরে নব নব ভাবের উদয় হইত। যাঁহারা স্বভাবকবি ন, তাঁহাদের অন্তর ঐরূপ গুণে অলঙ্কৃত। যাঁহাকে তিনি জামাতা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অনাদর দর্শন করিয়া অন্তরে বিরাগ জন্মিল। যে ব্যক্তি প্রকৃতির শোভা নষ্ট করিতে পারে, যত্ন-লালিত তরুলতার কচি কচি পাতাগুলি যে ব্যক্তি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, কোন ক্রমেই তাহাকে জামাতা করা হইবে না, ইহাই তখন তাঁহার সঙ্কল্প হইল। যাহার অন্তরে দয়া-মমতা আছে, প্রকৃতির শোভাদর্শনে যাহার অন্তরে প্রমোদের সঞ্চার হয়, সে কখন তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারে না। উদ্যানবর্ণনে, উপবনবর্ণনে, পৃথিবীর কবিগণ নবকিসলয়ের গুণকীর্ত্তন করেন, নবকিসলয় দর্শন করিয়া ভাবুকের মনে আনন্দোদয় হওয়া স্বাভাবিক। যাহারা ভাবুক নহে, তাহাদের নয়নও মনোহর দৃশ্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। এই

ব্যক্তি লেখা-পড়া শিখিয়াও প্রকৃতির মহিমা রক্ষা করিতে শিখে নাই, কৌতুক করিয়া নব নব পল্লবগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিল, এরূপ প্রকৃতি যাহার, সে কখনই কোমলাঙ্গী সুন্দরী বালিকার যত্ন জানিবে না, আদর জানিবে না, কষ্ট বুঝিবে না। কোন ক্রমেই আমি তাহাকে কন্যাদান করিব না। প্রকৃতি-ভাব-বিমুগ্ধ সৎকবি সেই জমীদার মহাশয়ের মনে তৎকালে এইরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, গৃহিণীর নিকটে তিনি সেই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তাদৃশ অরসজ্ঞ, শুষ্কহৃদয় যুবক-হস্তে কুসুমকলিকা-স্বরূপা কন্যা কদাচ তিনি অর্পণ করিবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প, গৃহিণী তাহা বুঝিলেন। ধনবানের পুত্র জামাতা হইবে, কন্যাটী সুখে থাকিবে, অপরাপর বিষয়েও সুখ হইবে, গৃহিণীর মনে সেইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল; স্বামীর ঔদাস্য দর্শনে, উদাসবাক্য শ্রবণে, সে আশা বিফল হয় দেখিয়া স্বামীকে তিনি অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু স্বামীর মন ফিরাইতে পারিলেন না। ধনবানের রূপবান্ ও বিদ্যাবান্ পুত্রকে কন্যাদান করিতে কি কারণে তাঁহার অসম্মতি, শেষকালে সেই কারণটীও তিনি আপন সহধর্ম্মিণীকে বুঝাইয়া দিলেন, গৃহিণী হাস্য করিয়া মাথা হেঁট করিলেন।

বরের পিতার যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি আছে, অট্টালিকা আছে, বর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটী তিনটী উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেই কন্যার পিতা আজকাল যথেষ্ট বিবেচনা করেন, বরের বংশ অথবা প্রকৃতিগত অন্য কোন গুণের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না। প্রস্তাবিত জমীদার মহাশয় স্বভাবের উপদেশে উক্ত পাত্রের নিষ্ঠুরতা ও অরসজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই বিবাহ রহিত হইল। ততদূর সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রায় কাহারো নাই, সেই কারণে পাশকরা বর হইলেই অবাধে পাশ হইয়া যায়। একবার একজন ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় নূতন হয়, সেই সময় দুই এক সহস্র ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে থাকে, ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, এখন সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ছাত্র বর্ষে বর্ষে উত্তীর্ণ হইতেছে। যাঁহাদের ভাগ্য ভাল, তাঁহারা বিদ্যার মর্য্যাদানুসারে পদ প্রাপ্ত হইতেছেন। সাধারণ স্থলে আমি (ভট্টাচার্য্য মহাশয়) দেখিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কেবল সেই সুপারিসেই এ দেশের কন্যাগণের পিতৃপুরুষের সর্ব্বনাশ-সাধনের হেতুভূত। মাতাপিতার পরমাহ্লাদ, পরীক্ষা-সুপারিসে বিবাহবাজারে পুত্রকন্যার মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে।

উক্ত ভটাচার্য্য মহাশয় হিংসাবশে অথবা অজ্ঞতাবশে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নাই। আজকাল আমাদের বিবাহ-বাজারে প্রায়ই আমরা ঐ বাক্যের সার্থকতা দর্শন করিতেছি। সমাজের অবস্থা আলোচনা করিয়া যে দিক্ দিয়াই যাউন, সকল দিকেই দেখিবেন, পুত্রবিক্রয়ের ধুমধামটা সর্ব্বত্রই বাড়িয়া উঠিতেছে। যাহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিত, তাহাদের সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে কন্যা-ক্রয়ের পরিবর্ত্তে আপনারাই উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। আর একটা লজ্জার কথা, নগরবাসিগণ অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, প্রকাণ্ড বেশ্যার পুত্রেরা দুই তিন হাজার টাকা মূল্যে বেশ্যার কন্যার বিবাহের সময় বেশ্যার নিকটে বিক্রীত হইয়া থাকে।

বিবাহের অঙ্গে পবিত্রতাদর্শন করাই শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের বাঞ্ছনায় ছিল, তদ্দ্বারা সংসারেরও মঙ্গল হইত। এখন সেই বিশুদ্ধ বৈবাহিক প্রথা—ধর্ম্মানুগত বৈবাহিক প্রথা নানাপ্রকারে বিকারপ্রাপ্ত হওয়াতে কেহই সুখী হইতে পারিতেছেন না। সাধারণ লোকে দেখে বটে, অমুকের পুত্রের বিবাহে অমুক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইল, হাতী-ঘোড়া নাচিল, দ্বাদশ দল ইংরাজী বাদ্য বাজিল, শত শত চলন্তী গ্যাস বড় বড় রাস্তা উজ্জ্বল করিয়া চলিল, শত শত শকট সুসজ্জিত হইয়া সহরের রাস্তায় অশ্বপদে অগ্নি ছুটাইয়া পবনবেগে ধাবিত হইল, কাঙ্গালীরা দুটী দুটী পয়সা দক্ষিণা পাইল, শুনিতে সমস্তই ভাল, কিন্তু সেইরূপ বিবাহে দম্পতি কিরূপ সুখে থাকে, দম্পতির মাতা-পিতা ভবিষ্যতে কিরূপ আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা সকলে জানিয়া উঠিতে পারে না। সংসারের একখানি সজীব চিত্র যদি কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন, সংসারবাসিগণ যদি সেই চিত্রের উপযুক্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে বৈবাহিক সংসারের সজীব ছবি আমরা দেখিতে পাইব, সাধারণেও দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিবে। প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা এক্ষণে কেবল এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখিতেছি, আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা এই বিবাহ-সংস্কারকে যেরূপে সংস্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন, সেইরূপ সংস্কারের অনুগামী হইয়া আর কিছু দূর অগ্রসর হউন। যে সংস্কারকে যথার্থ সংস্কার বলা যায়, যেরূপ সংস্কারে সাধারণ মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ সংস্কার দর্শন করাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বিধবা-বিবাহ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি অল্প আয়াস স্বীকার করেন নাই। “নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ” পরাশর-সংহিতার এই বচনটী উদ্ধার করিয়া তিনি বঙ্গীয় বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহে অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরাশরের ঐ বচনের মধ্যে বিধবার বয়সের কোন বিশেষরূপ নির্দ্দেশ নাই, অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষত-যোনির পক্ষে বিবাহ বিহিত, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা উপহাস করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়াছিলেন, যাঁহারা একটা কোন নূতন হুজুগ প্রাপ্ত হইলে উল্লাসে, কৌতুকে ও আমোদে উন্মত্তপ্রায় হয়, অভ্যাসবশে তাহারাও আনন্দে বগল বাজাইয়াছিল। সেই সময় বাজারে এক গীত উঠিয়াছিল “সাত ছেলের মা পতি পাবে, আহ্লাদেতে আটখানা।”

এখন বিবেচনা করিতে হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষত-যোনির প্রস্তাব ঐ হুজুগের মহাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। যে কয়েকটী বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, সমাজে চলুক আর নাই চলুক, সেই সকল বিবাহে বয়সের বিচার করা হয় নাই। আমাদের সামাজিক বিষয়ে ইংরাজ রাজপুরুষেরা হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ, কিন্তু সমাজের লোকেরা নিজেই উস্কাইয়া তুলিয়া তুলিয়া ইংরাজকে তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপকরণে বাধ্য করিয়াছেন। গোটাকতক ব্যাপারে তাঁহারা অযথারূপে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সে সকল কথা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে, কেবল বিধবা-বিবাহের কথাই বলিতে হইল। “ধরি মাছ, না ছুই পাণি” এই যে একটী কথা আছে, অনেক বিষয়ে ইংরাজেরা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। বঙ্গে বিধবা-বিবাহ হয় হউক, আমরা কিছু বলিব না, বিবাহ দাও কিম্বা বিবাহ দিও না, আমরা এ প্রকারের কোন আইন করিব না, তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে যেখানে বিবাহ অবধারিত হইবে, সেখানে বিপক্ষপক্ষ কেহ কোন প্রকার হাঙ্গামা করিতে উদ্যত হইলে পুলিস মোতায়েন হইয়া শান্তিরক্ষা করিবে, এইরূপ তাঁহারা আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিলে জলই স্পর্শ করিতে হয় না, ডাঙ্গা হইতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিলে জলস্পর্শ করিতে হয় না, হাতসূতা ফেলিয়া মাছ ধরিলে জল স্পর্শ করিতে হয় না, উল্লিখিত প্রবাদবাক্যের এই তিন প্রকার প্রতিপ্রসব। ইংরাজেরা প্রতিপ্রসবমন্ত্রে বিলক্ষণ অভ্যস্ত। বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রকার

অভিপ্রায় দিয়াছিলেন, তাহা উত্তম। দুই এক স্থল ব্যতীত পুলিসের ক্ষমতা-পরিচালনের কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই। এ দেশে বিধবা-বিবাহের প্রথম বর একজন ব্রাহ্মণ। সে বিবাহে পুলিস মোতায়েন আবশ্যক হয় নাই। দ্বিতীয় বর একজন কায়স্থ, সে বিবাহেও পুলিসের সহায়তায় প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সেই বিবাহের পরিণাম বড় শোচনীয় হইয়াছিল। অক্ষত-যোনির বিবাহ সিদ্ধ হইবে, এমন যদি পাকাপাকি ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, বিধবা-বিবাহে হিন্দু-সমাজে নিতান্ত বিসংবাদ ঘটিত না। বিচারপুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, বাচস্পতি মহাশয় যাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তাহার মর্য্যাদারক্ষা হয় নাই, কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষতাক্ষতে বিচার ছিল না। গঙ্গা যেমন সগরবংশের ভস্মীভূত সন্তানগণের উদ্ধারের সময় শতমুখী হইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-প্রথাও প্রকারান্তরে সেইরূপ শতমুখী হইয়াছিল। যে দৃষ্টান্তটী নিম্নভাগে প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকমহাশয়েরা তৎপাঠেই বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

বর-কন্যার নামে প্রয়োজন নাই, বর-কন্যার কার্য্য লইয়াই কথা। তথাপি মনে করুন, বরের নাম যাদবচন্দ্র, কন্যার নাম সুরঙ্গিণী। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সুরঙ্গিণী বিধবা হয়, তিন বৎসর বিধবা ছিল। তাহার পর যাদবচন্দ্রের সহিত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ। বিবাহের এক বৎসর পরে যাদবচন্দ্র রোদন করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাদবকে ভালবাসিতেন। যাদব সংস্কৃত জানিত, সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিতে পারিত, তাহার বুদ্ধিও প্রখরা ছিল, সেই গুণেই যাদবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র। যাদবকে দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি যাদব! এত কাহিল হইয়াছ কেন?" পূর্ব্ব হইতেই যাদব কাঁদিতেছিল, বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহার সেই ক্রন্দন . গুণ হইয়া বাড়িয়া উঠিল। সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! পুস্তকে আপনি লিখিয়াছিলেন, বিধবা-বিবাহ ভাল, উপদেশেও বলিয়াছিলেন বিধবা-বিবাহ ভাল, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার প্রাণ যায়!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় চমকিত হইলেন; চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ করিয়া প্রাণ যায়, এটা তোমার কি প্রকার কথা?"

প্রকৃত কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বিধবা-বিবাহের পর যাদবের সাংসারিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক হইতেছে। যাদবের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না, একজন পিতৃব্য ছিলেন, তাঁহার অধীনেই যাদবকে থাকিতে হইত। যাদব বিধবা-বিবাহ করিবে, লোকমুখে সেই কথা শুনিয়া তাহার পিতৃব্য ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন, যাদব তাহা শ্রবণ করে নাই, পিতৃব্যের অবাধ্য হইয়াই সুরঙ্গিণীকে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পর তাহার পিতৃব্য তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন, প্রতিবাসী লোকেরাও যাদবকে ঘৃণা করিতে লাগিল, যাদব নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সদাশয়, সদয়প্রকৃতি ছিলেন, যাদবকে আশ্রয় দিবার জন্য খড়দহের নিকটবর্ত্তী এক বাবুর বাগানে নিজখরচে একখানি ঘর বাঁধিয়া দিলেন, চারিদিকে দরমায় বেড়া দেওয়া হইল, তাহারই মধ্যে সদর ও অন্দর বিভাগ করা রহিল। বিধবা স্ত্রীকে লইয়া যাদবচন্দ্র সেই ঘরেই বাস করিয়াছিল, তাহার পরেই ঐ ঘটনা, বিদ্যাসাগরের নিকটে যাদবের রোদন।

তুমি এত কাহিল হইয়াছ কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে যাদব কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "যাহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে। সে সর্ব্বদাই আমার নিকট তাহার পূর্ব্ব-স্বামীর গুণের কথা বলিয়া ক্রন্দন করে, আমার প্রত্যেক কার্য্যের সহিত তাহার মৃত স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেয়, গল্প করিতে করিতে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পলায়, রাগ করিয়া আহার করে না, আমি কোন ভাল কথা বলিলে বিরক্তি প্রকাশ করে। নিত্য নিত্য আমি কতই বুঝাইতেছি, কিছুতেই সে বর্ণ মানে না। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া জীবনে আমার বিড়ম্বনা জ্ঞান হইয়াছে, আমার শরীরে একটা রোগ জন্মিয়াছে, বোধ হয়, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না।"

একমনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাদবের ঐ সকল আক্ষেপের কথা শ্রবণ করিলেন, শেষকালে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কার্য্যটা তবে ভাল হয় নাই, সুরঙ্গিণী তাহার মাতুলের আলয়ে ছিল, তাহার মাতুল আমার নিকটে আসিয়া সুরঙ্গিণীর বিবাহের কথা উত্থাপন করে, বিবাহে সুরঙ্গিণীর মত ছিল কি না, তাহার মাতুলকে আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এখন তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, তাহার মত ছিল না, প্রথমে যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাহার প্রতি তাহার

ভক্তি জন্মিয়াছিল, উভয়ের বোধ হয়, মনের মিলন হইয়াছিল, সেই স্বামীর মৃত্যুতে সুরঙ্গিণী কাতরা ছিল, তাহার মাতুল সে সকল কথা আমাকে কিছুই বলে নাই। মাতুলের ইচ্ছাতেই সেই বিবাহে আমি উদ্যোগী হইয়াছিলাম, এখন বুঝিতেছি, কার্য্যটা ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, তুমি উতলা হইও না, দিনকতক পুরাতন হইলেই সুরঙ্গিণী তাহার পূর্ব্ব-স্বামীর কথা ভুলিয়া যাইবে, তুমি তাহাকে সর্ব্বদা ভালকথা বলিও। পতি-পত্নীতে যেরূপ সদ্ভাব হওয়া উচিত, সেইরূপ উপদেশ দিও, সর্ব্বদা আদর-যত্ন করিও, কোন প্রকার কটুকথা বলিও না, শীঘ্র শীঘ্র তাহার মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা পাইও না, ক্রমে ক্রমে শুধরাইয়া যাইবে। কিছু দিন গত হইলেই সে তোমাকে ভালবাসিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিষাদের কোন কারণ থাকিবে না।"

যাদব কহিল, "আপনি আমার গুরু, লজ্জাত্যাগ করিয়া, অনেক কথাই আমি আপনাকে বলিয়াছি ; যাহা বলা উচিত ছিল না, মনের দুঃখে তাহাও গোপন রাখিতে পারি নাই। এ ভাবে এক বৎসর কাটিয়াছে, উপদেশ দিতে আমি ত্রুটি করি নাই, আদর-যত্ন করিতেও অবহেলা করি নাই। আমার অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল নহে, তথাপি তাহার ভরণপোষণের জন্য আমি কৃপণতা করি নাই ; ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিয়াছি, ভাল ভাল কাপড় কিনিয়া দিয়াছি, সর্ব্বক্ষণ মিষ্ট-কথা বলিয়াছি, কিছুতেই কিছু হইল না ; একই ভাব। এক বৎসরের মধ্যে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইবার কোন লক্ষণই আমি দেখিলাম না, শুধরাইয়া যাইবে, আপনি বলিতেছেন, অবশ্যই আমাকে শুনিতে হয়, কিন্তু তাহার মনের যে প্রকার ভাব, কখন যে তাহা শুধরাইবে, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আমি হতাশ হইয়াছি। বোধ করি, এই দুঃখেই আমার প্রাণ যাইবে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিন্তাকুল হইলেন। যাদব তাঁহার প্রিয়শিষ্য, উপস্থিত ক্ষেত্রে যে প্রকার বুঝাইতে হয়, বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, সেই প্রকারে অনেক বুঝাইলেন, যাদব কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। অবস্থার স্বচ্ছলতা যাহাতে হয়, সুরঙ্গিণী যাহাতে তুষ্ট থাকে, সুখে সংসার-নির্ব্বাহের কোন প্রকার অভাব না হয়, তজ্জন্য তিনি মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিলেন, সেইদিন নগদ কুড়িটী টাকা তাহাকে দিলেন। যাদব প্রথমে টাকা লইতে স্বীকার করে নাই, শিক্ষাগুরুর একান্ত নির্ব্বন্ধে অগত্যা সেই টাকাগুলি

গ্রহণ করিয়াছিল, যে বাগানে সুরঙ্গিণী, সেই বাগানেও গিয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সাত মাস পরে প্রকাশ পাইল, সেই বাগানের একটী আম্রবৃক্ষের শাখায় রজ্জুবন্ধন করিয়া যাদবচন্দ্র ঝুলিয়া আছে; বিধবা-বিবাহের বিষাদে হতভাগ্য যাদব তৎপূর্ব্বরজনীতে সেই বৃক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পুলিসের লোকেরা সন্ধান করিয়াছিল, উদ্বন্ধনের কোন কারণ নিরূপণ করিতে পারে নাই। সুরঙ্গিণী কোথায় গিয়াছিল, তাহারও কোন সন্ধান হয় নাই, বাগানের ঘরখানি শূন্য পড়িয়াছিল।

যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই, যে দেশে পতি-পত্নীর পবিত্র ভাব চির-প্রচলিত, সে-দেশে অধিকবয়স্কা বিধবার বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা ন্যায়ানুগত বোধ হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে চেষ্টা করেন নাই, অক্ষতযোনির বিবাহ ব্যবস্থা-সিদ্ধ বলিয়া পণ্ডিতগণের সহিত তিনি বিচার করিয়াছিলেন, কার্য্যে কিন্তু সেই সীমা উল্লঙ্ঘিত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা পতিব্রতা, বিবাহের পর যাহাদের পতি-প্রেমাস্বাদন-প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহারা পতিহারা হইলে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না, বলপ্রয়োগ করিলেও সে বিবাহে তাহারা সুখী হইবে না, ইহা নিশ্চয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যকালে সে ভাবনায় কোন ফল হইল না। "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের দোহাই দিয়া আধুনিক সংস্কারকেরা যত বয়সের বিধবাই হউক, তাহাদের বিবাহ দিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সমাজ সেইজন্য বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইল না। যে কয়েকটী বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, তাহার পরিণাম অন্বেষণ করিলে কিরূপ ফল দর্শন করা যায়, সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা তাহা জানিয়াছেন। যাহারা বিধবা-বিবাহ করিয়াছে, তাহারা সমাজচ্যুত হইয়া আছে অথবা এমন কথা বলা যাইতে পারে, বিধবা-বিবাহকারী দল আপনাদের ক্ষুদ্র একটা সমাজ বাঁধিয়া লইয়াছে, সাধারণ সমাজের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব নাই। এমনও আমরা অনেক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিদ্যাসাগরের মতের পক্ষপাতী, অথচ আপনাদের বিধবা কন্যাগণের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন নাই কিম্বা বিধবার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া সেইরূপ বধূ গৃহে আনয়ন করেন নাই, অনেক স্থলে তাঁহারাও সমাজচ্যুত; সমাজের লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গেও পান-ভোজনে বিরত। যে দেশের এমন অবস্থা, সে দেশে ষোল আনার উপর বয়স-

নির্ব্বিশেষ বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করা বিফল হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। সুরঙ্গিনীর বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দিবে। সুরঙ্গিনীর মাতুল বিদ্যাসাগরের মতের পক্ষপাতী ছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অথবা সমাজ সংস্কারক দলের মধ্যে নাম লিখাইবার অভিলাষে ভাগিনেয়ীর অভিপ্রায় না জানিয়াই দ্বিতীয়বার তাহার পরিণয়-সংস্কারে অনুরাগী হইয়াছিলেন। তাহার ফল কিরূপ হইল, শেষে তাহা জানিতে পারিয়া, অবশ্যই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। অতএব আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি. সমাজে ঐক্য স্থাপিত না হইলে এবং বিধবার বয়সের একটী সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া না দিলে, বঙ্গদেশে ভদ্রপরিবারে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে পারিবে না। যদিও কোথাও কোথাও হয়, সমাজ একাঙ্গ হইয়া মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলেও সুখের হইবে না। অনেকে আশা করেন, বিধবা-বিবাহ চলিবে। যদি তাঁহাদের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাও শীঘ্র হইবে না; তাহারও এখন অনেক বিলম্ব।

অসবর্ণ-বিবাহ।

এ দেশে ইংরাজী চর্চ্চার আধিক্য হওয়াতে ইংরাজী-শিক্ষিত অনেক যুবক ইংরাজী ধরণে বিবাহ করিতে উৎসুক। ইংরাজের মধ্যে জাতিভেদ নাই, বর-কন্যার মনোমিলন হইলেই বিবাহ হইয়া যায়। যেখানে বরের অনুরাগ অধিক, কন্যার অনুরাগ অল্প কিম্বা অনুরাগ আদলেই থাকে না, বর সেখানে কন্যার পদতলে জানু পাতিয়া চরণ ধারণ করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; মিনতি করিয়া বলে, "দয়া করিয়া একটীবার বল, তুমি আমার হইবে। তোমার বিধুমুখে সেই কথাটী একবার শুনিলেই আমি চরিতার্থ হইব।" ততদূর মিনতি ও ততদূর প্রার্থনা সত্ত্বেও ইংরাজী বিবাহ সকল স্থলে সুসিদ্ধ হয় না; কোর্টসিপ-ব্যবস্থা পদে পদে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে। অধিকন্তু ইউরোপীয় জাতি আপনাদের পিতৃব্য-কন্যা, মাতুল-কন্যা, পিতৃস্বসৃ-কন্যা, মাতৃস্বসৃ-কন্যা প্রভৃতির পাণিগ্রহণ করিতে পারে; সেইরূপ বিবাহে বরং তাহাদের শ্লাঘা হয়। মুসলমান জাতির মধ্যেও ঐ রীতি প্রচলিত আছে। হিন্দুর তাহা হইতে পারে না, হওয়া দূরে থাকুক, সেরূপ বিবাহের নাম শুনিলেও হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সে পক্ষে

শাস্ত্রবন্ধন সুদৃঢ়, পিতৃপক্ষের সপ্তমী কন্যা ও মাতৃপক্ষের পঞ্চমী কন্যা পরিবারসূত্রে গ্রহণ করিতে নাই, ইহাই শাস্ত্রের শাসন, সে শাসন এক্ষণে কতকগুলি হিন্দুসন্তান পালন করিতে চাহেন না, প্রকাশ্যরূপে শাস্ত্র অমান্য করিতেও পারেন না, কাজে কাজে তাঁহারা ইচ্ছাসত্ত্বেও ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন।

যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ চালাইবার জন্য একান্ত ব্যগ্র। কেবল ব্যগ্রতামাত্রই তাহার ফল নহে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অবিচ্ছেদে, অবিরোধে, অসবর্ণ-বিবাহ চলিতেছে।

দেশের যখন দুর্দ্দশা হইতে আরম্ভ হয়, তখন সকল বিষয়েই তাহার ছায়া পড়ে, শুভানুষ্ঠানে অথবা শুভানুষ্ঠানের নামে যাঁহারা অগ্রসর হন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলি হয়। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা উপাসক সম্প্রদায়ের সাধারণ উপাসনাস্থান ছিল। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। কিছুদিন পরে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে আর একটী তৃতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়। ব্রহ্মকে লইয়া দলাদলি করিবার তাৎপর্য্য কি ছিল, ঠিক বুঝা যায় না, কিন্তু ক্রমে শুনা গেল, সমাজ-সংস্কারের কোন কোন অঙ্গে যোড়াসাঁকো সমাজের প্রধান আচার্য্যের সহিত কোন কোন ব্রাহ্মের মতভেদ হওয়াতেই দলাদলির সূত্রপাত হয়। এক একটা কার্য্যে বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেরই বিলক্ষণ আছে। ঈশ্বরারাধনা উপলক্ষ্য করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা শুনিলে সহজেই মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি অমুক ব্রাহ্মসমাজের প্রজাপতি অথবা আচার্য্য ছিলাম, লোকে আমাকে বড়লোক বলিয়া পূজা করিবে, আমি পুরাতন সমাজের অধীন থাকিব না, আমার নূতন কীর্ত্তি দেশব্যাপ্ত হইবে, দেশ-বিদেশের মধ্যে আমি বিখ্যাত হইব, এইরূপ ইচ্ছাতে যাঁহারা প্রধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল করুন, বাস্তবিক তাঁহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি অতি অল্প।

কলিকাতামধ্যে প্রকাশ্য ব্রাহ্মসমাজ তিনটী। একাধিক হইলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিতে হয়, তদনুসারে যোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজের নাম আদি সমাজ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মমন্দিরের নাম উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপাসনা-

মন্দিরের নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এই তিনটী প্রকাশ্য সমাজ ব্যতীত সহরের এক একটী গলীর মধ্যে এক একটী গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজ আছে। বারবিশেষে সকল সমাজেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়, কিন্তু সমাজসংস্কার-সম্বন্ধে সকল সমাজের মত একরূপ নহে। বঙ্গ-কুলবালাগণের লজ্জা-পরিত্যাগ ও অধীনতা-পরিত্যাগ-সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মত-বিরোধ ঘটিয়াছিল, সেই কারণেই কৈশব সম্প্রদায়ের জন্য নূতন ব্রাহ্মসমাজের পত্তন। সাধারণ ব্রাহ্মমতের সহিত ঐ দুই সমাজের মত-বিরোধ ঘটাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। আমরা এখন অসবর্ণ-বিবাহের প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, অতএব সেই প্রসঙ্গেই দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। আদি সমাজ ঐ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন শুনা যায়, সেই সমাজের প্রধান প্রধান সভ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইতেছে। কৈশব সম্প্রদায়ের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহের যথেষ্ট আদর। বাবু কেশবচন্দ্র স্বয়ং সেই বিষয়ের পথ-প্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতেও সেইরূপ বিবাহ বঙ্গ-সমাজের শুভপ্রদ। দৃষ্টান্ত অনেক। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ স্বীকার করেন না, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আহার-ব্যবহারে প্রথমাবধি সকলেই তাহা দেখিয়াছেন। বিবাহে জাতিভেদের অবিচারটী নূতন। ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত নীচজাতীয়া কন্যার বিবাহ, নীচজাতীয় বরের সহিত শ্রেষ্ঠজাতীয়া কন্যার বিবাহ, ইহাকেই অসবর্ণ-বিবাহ বলে। সবর্ণের বর-কন্যা দুর্লভ হইয়াছে, সেই কারণেই অসবর্ণ-বিবাহের প্রয়োজন অথবা অসবর্ণ-বিবাহে গৌরব অধিক, উপকার অধিক, এই কারণেই অসবর্ণ-বিবাহের প্রবর্ত্তন, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না ; কিন্তু তদ্দ্বারা উপকার কি হইতেছে, তাহা গণনা করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মেরা স্বাধীন, ব্রাহ্মিকারাও স্বাধীনা, তাহারা পরস্পর পতি-পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করে। ইংরাজের কল্যাণে এ দেশের সর্ব্ব-জাতীয় লোকেরাই ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। রজকের পুত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটা ডিক্রী প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মিকা ব্রাহ্মকন্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে বরণ করে ; রজকের কন্যা বেথুন কলেজে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ-কুমার তাহার পাণিগ্রহণের জন্য লালায়িত হয়, এই ত ব্যবহার ; কিন্তু ইহার দ্বারা উপকার কি, তাহারাই তাহা বুঝিয়াছে। সমাজে বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি নানা পাপের

নিদান, ইহা হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের অগ্রে রণস্থলে কুরুসৈন্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুন যখন "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে রণবিমুখতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বংশক্ষয়ে বংশমধ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হইবে, ব্যভিচার সংঘটিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, কুল-পুরুষগণ নিরয়গামী হইবেন, মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর ধনঞ্জয় এই প্রকার প্রবল হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক ব্রাহ্ম যুবকেরা সেই অনর্থকর বর্ণ-সঙ্কর উৎপাদনের হেতু হইতেছেন, ইহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়।

একজন ব্রাহ্ম যুবাকে একজন ব্রাহ্মণ একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি জাতি?" ব্রাহ্ম উত্তর দিয়াছিলেন, "আমরা মানব জাতি।" যাহারা এখন জাতি মানে না, তাহারা ঐ কথা বলিবে, ইহা দোষের নহে, কিন্তু ঐ কথা বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাঁহারা পরমতত্ত্বের চরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মুখেই ঐ উচ্চকথা শোভা পায়, নতুবা একজন স্বেচ্ছাচার বালকের মুখের কথায় ঐ চরমভাব শ্রবণ করিলে কাণে যেন বিষ ঢালিয়া দেয়। চরম ভাব কিরূপ, একজন পরমতত্ত্বজ্ঞ সাধক ভক্ত শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্ব-গীতাবলীর মধ্য হইতে তৎপোষকের একটী গীত আমরা নিম্ন স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ঝিঁঝিট—মিশ্রতাল একতালা।

"বিচার যা হয় নিয়ে জাতি,
দেখি জাতির গেছে তাহে জাতি।
জাতির যদি জাত্ না যাবে কেন রে তায় হাতাহাতি?
কেন বা হয় ভিন্ন এ থাক বামুন কায়েত জোলা তাঁতি?
ছোট বড় যে কথা হোক্ জাতির আগে তুচ্ছ অতি,
জাতি ব'ল্‌তে লোক-সমাজে বুঝায় এক মানব জাতি।
সপ্তধাতু আর চেতনে সবার যবে এই আকৃতি,
জাত্ যাবে কি জড়ের তবে? না-চেতনের হবে ক্ষতি?

আত্মাতে নাই জাতির ভাব কিম্বা তার নাই কুখ্যাতি,
সে যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—চিদানন্দ পূর্ণভাতি।
জাতির নাই পূজা কোথা গুণের পূজা দিবারাতি,
চণ্ডাল যে, গুণী হ'লে ব্রাহ্মণ যে করে স্তুতি।
জাতির বড়াই কিছুই নাই আর—মাত্র মিথ্যা-মায়া-ভ্রান্তি,
একই পথে সবার আসা একই ভাবে উপরতি।
জাতি ত নাই, বর্ণ ব'লে শাস্ত্রে লেখা দু'চার পাঁতি,
সে বর্ণ সে গুণে গাঁথা ভাবেন কি সব মহামতি?
মা আমার ঘুষে কখন করেনি এ সৃষ্টি-নীতি,—
মুচি যে জন মুচিই রবে হবে না তার উচ্চ-গতি।
গুণ নয় রে বর্ণগত, ব্যক্তিগত সে গুণ-গীতি।
গুণকর্ম্মে বর্ণবিভাগ মহাজনের এই উকতি।
আনন্দ কয় সবাই যবে এক মায়ের হই সন্ততি।
কিরূপ হ'ল বুঝ সবে দিয়ে ঘৃণ্য স্বার্থাহুতি।"

আনন্দ-লহরী।

জাতিবিচারে এই গীতটী প্রকৃত উচ্চভাবের পরিচয় দিতেছে, এই ভাবের নাম চরম-ভাব। ব্রাহ্মনামধারী চঞ্চলচিত্ত স্বেচ্ছাচার বালক এই চরমভাবের কথা মুখে উচ্চারণ করে, ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, জ্ঞানের অধিকারী না হইলে মনোমধ্যে এ ভাবের উদয়ও হইতে পারে না, এ বোধ তাহাদিগের নাই। তাহারা শুনিয়াছে, জাতিভেদ করিতে নাই, সংসারে জাতিভেদ নাই, সকলই এক জাতি, সেই শ্রুতিপ্রমাণেই তাহারা ঐরূপ বৃথা অহঙ্কার প্রকাশ করে। সেই অহঙ্কারবশেই উক্ত ব্রাহ্মণের প্রশ্নে উক্ত বালক উত্তর দিয়াছিল, "আমরা মানব জাতি"। বালকের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিলে কেবল হাস্য আইসে মাত্র। ঐ সংস্কারে তাহারা বলে, মানব জাতির সহিত মানব জাতির বিবাহ হইবে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে।

নূতন কথা কিছুই নহে। ব্রাহ্মণবালক লোকমুখে শুনিয়া যখন বুঝিয়াছে, ব্রাহ্মণশূদ্রাদি কোন জাতি যখন পৃথিবীতে নাই, তখন ব্রাহ্মণের

চিহ্ন উপবীত-ধারণেরও কোন আবশ্যকতা নাই। এই কারণে ব্রাহ্ম হই সময়, ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতেছে। যোড়াসাঁকো আদি সমাজে উপবীত-পরিত্যাগের তাদৃশ ধূমধাম নাই, কিন্তু আর দুটী সমাজে উপবীত ত্যাগ না করিলে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্ম হইতে পারে না। আচার্য্য অথবা উপাচার্য্য সেরূপ উপদেশ না দিলেও বালকেরা অগ্রে সেই কার্য্য সমাপন করিয়া সমাজে আসিয়া প্রবেশ করে। কাজে কাজে অপর-জাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে তাহাদের দ্বিধা জন্মে না, তাহাদের নিজের কন্যা জন্মিলেও নিকৃষ্টজাতীয় কোন পাত্রকে সেই কন্যা দান করিতে তাহাদের সঙ্কোচ আইসে না, ফলাফলও তাহারা বিবেচনা করে না। যে গীতটী উপরে উদ্ধৃত হইল, সেই গীতের জন্মদাতা যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী, এখনকার ব্রাহ্মসমাজে তাদৃশ জ্ঞানাধিকারী কয় জন আছেন? ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীরে এই প্রশ্নটী যদি লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহার সন্তোষকর উত্তর পাওয়া যাইবে, তেমন আশা আমরা করি না।

আর একটী কথা। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্ম হইয়াছেন, উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছে। সেই সকল পুত্রকন্যার জননী ব্রাহ্মণের কন্যা, এক্ষণে ব্রাহ্ম-সমাজের আচারানুসারে সেই সবর্ণ-বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র একজন চর্ম্মকার-কন্যার পাণিগ্রহণ করিল; তাহার একটী ভগিনী একজন ডোমের পুত্রের গলদেশে বরমাল্য দান করিল। তাহাদের পিতা যিনি স্বকৃতভঙ্গ অর্থাৎ স্বয়ং যিনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তিনি কি বলিয়া লোকের নিকটে ঐ কুটুম্বিতা-গৌরবের পরিচয় দিবেন? আমি সদাশিব ভট্টাচার্য্য, রামধন চর্ম্মকার আমার বৈবাহিক, সাতকড়ে হাড়ি আমার কন্যার শ্বশুর, শ্লাঘা করিয়া এইরূপ পরিচয় দিয়া তিনি কি জনসমাজে গৌরবাস্পদ হইতে পারিবেন? ঐরূপ পরিচয় দিয়া তিনি নিজেও কি আনন্দলাভ করিতে পারিবেন? একজন রজক অথবা একজন চর্ম্মকার ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়া দশের নিকটে বুক ফুলাইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্লাঘা প্রকাশ করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের গৌরববৃদ্ধি হয়, ব্রাহ্মণের মাথা হেঁট হয়, ইহাই ত আমরা বুঝি। ব্রাহ্মনামধারী ব্রাহ্মণপুত্রেরা ঐরূপ গৌরব অগৌরব বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা কি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়?

তবে হাঁ,—ইহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। উপবীত ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্ম হন, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন, এমন কি, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেও তাঁহাদের লজ্জা হয়। পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে এক একজন ব্রাহ্ম মৌন হইয়া থাকেন, এক একজন সত্য কথা বলেন। এই বিষয়ের একটী রহস্য আমাদের স্মরণ হইল। প্রয়াগধাম হইতে একটী ভদ্রসন্তান একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। একজন বাবুর বৈঠকখানায় তিনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের স্থাপিত একটী লাইব্রেরীর জন্য কিছু সাহায্যপ্রার্থনা করেন। বাবু তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—"এস, বি, চক্রবর্ত্তী। পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আর ইংরাজী আদ্যক্ষর বলিতে পারেন নাই, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "নবজলাল চক্রবর্ত্তী।" তাঁহার হস্তে তাঁহাদের পুস্তকালয়ের একখানি খাতা ছিল। সচরাচর খাতার শিরোভাগে ঈশ্বরের নাম লেখা থাকে, সেই খাতায় তাহা ছিল না। বাবু জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি হিন্দু হইয়া ঈশ্বরের নামশূন্য খাতা রাখিয়াছেন,—আমি আপনাকে সাহায্য দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি।" এস, বি, চক্রবর্ত্তী তখন গৌরব করিয়া বলেন, "আমি হিন্দু নহি, আমি উপবীত ধারণ করি না।" বাবু তাঁহার পরিচয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন,—গম্ভীরবদনে কহিলেন, "হাঁ, আপনি হিন্দু না হইতে পারেন, কিন্তু আপনার পিতা অবশ্য হিন্দু, তাহা আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। হিন্দুর পুত্র অহিন্দু, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা! আপনি আমার জাজিমের উপর হইতে নামিয়া বসুন। এই গৃহে আমাদের পানীয় জল আছে, জাজিমের উপর হুঁকা-বৈঠক আছে, অহিন্দুস্পর্শে তাহা অপবিত্র হইয়া যায়। আপনি যখন হিন্দু ছিলেন, তখন আপনিও হিন্দুর এরূপ ব্যবহার জানিতেন। আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি খ্রীষ্ট অথবা মহম্মদধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তথাপি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। চক্রবর্ত্তীটী হিন্দুর উপাধি, ব্রাহ্মণের উপাধি, ঐ উপাধি আপনি কেন রাখিয়াছেন, তাহার উত্তর আপনি দিতে পারিবেন না, কারণ, ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা না করিয়াও, যাঁহারা ব্রাহ্ম নাম ধারণ করেন, তাঁহাদের পৈতৃক উপাধি ধারণ করা উচিত হয় না। এলাহাবাদে

ব্রাহ্মসমাজ আছে, তথাকার আচার্য্য মহাশয়কে আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রাহ্মণের পুত্র নিজমুখে আপনাকে অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে, ব্রাহ্মণের উপাধি ধারণ করিতে অধিকারী হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর যখন আপনি আনয়ন করিবেন, তখন আমি আপনাদের পুস্তকালয়ের জন্য যথা-সম্ভব সাহায্য দান করিব।"

এস, বি, চক্রবর্ত্তী লজ্জা পাইয়া বিদায় হইলেন, বাহিরে লজ্জা,—কিন্তু অন্তরে অন্তরে সেই বাবুটীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল। সমাজবিপ্লবকর এইরূপ অনেক ঘটনা লইয়া অনেক সময় আমাদিগকে মনস্তাপে দগ্ধীভূত হইতে হয়। আর্য্যসমাজ কিরূপ পবিত্র ছিল, এখন কিরূপ হইয়া যাইতেছে, সুস্থিরচিত্তে যাঁহারা এই বিষয় চিন্তা করেন, দুঃখে তাঁহাদিগকে নিশ্বাস ফেলিতে হয়।

অসবর্ণ-বিবাহে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা কি জাতি বলিয়া পরিচয় দিবে, ইহাও ভাবিবার বিষয় বটে। কিন্তু যাঁহাদিগকে লইয়া এই বিভ্রাট, তাঁহারা তদ্বিষয় চিন্তা করেন না। যে জাতির সহিত যে জাতির বিবাহই হউক, উভয় জাতিই মানবজাতির অন্তর্গত। তাঁহাদের সন্তানেরাও মানব-জাতি হইবে, ইহাই তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তাহাদের বিশ্বাস যাহাই হউক, বাস্তবিক অসবর্ণ-বিবাহে শুভ ফল ফলিবে না, ইহা যেন আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কিছুদিন হইল, একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে বিবাহ হয় বলিয়া বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, বাঙ্গালী অল্পজীবী এবং সেই কারণেই বাঙ্গালীরা ভারতীয় সেনাদলে প্রবেশাধিকার পায় না। গোরার সহিত যদি বাঙ্গালা-কন্যার বিবাহ হয়, বাঙ্গালী যদি গোরার কন্যা বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গালী অবশ্যই বলিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং বাঙ্গালী-যোদ্ধা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই যুক্তির উপর এ দেশের কেহই কোন কথা কহেন নাই, উহার খণ্ডন বা পোষকতা করিতেও কেহ অগ্রসর হন নাই, কেবল একজন গৃহত্যাগী সিদ্ধান্তবাগীশ একটী বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, উহা হইলে অশাস্ত্রীয় ব্যবহার হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রে ভবিষ্য পুরাণ স্পষ্ট বলিয়া রাখিয়াছে, কলিযুগের শেষে একাকার হইবে।

অসবর্ণ-বিবাহে জাতিভেদ থাকে না। যাঁহারা জাতিভেদ মানেন, তাঁহারা

অসবর্ণ-বিবাহে মত প্রদান করেন না। অতএব স্থির হইল, জাতিভেদ-বিলোপেই অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলন। ইংরাজেরা প্রায় সর্ব্বদাই বলেন, জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারন যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন অথবা ইংরাজের মুখে ঐ প্রকারের কথা শুনিয়াছেন, সমাজ-সংস্কারক সাজিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেও আজকাল ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। জাতিভেদ থাকিতে ভারতের মঙ্গল নাই, আধুনিক উন্নতিকামুক যুবক-সম্প্রদায়ের ইহাই যেন সিদ্ধমন্ত্র। বিবাহের কথা হইতে হইতে আর একটী কথা আমাদিগের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। বিদ্যালয়ের বালকেরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তাহারা সকল জাতির অন্ন ভক্ষণ করে, ইহা এক প্রকার সাধারণ প্রবাদের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ততদূর বলিতে ইচ্ছা করি না; বিদ্যালয়ের বালকমাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞানী, বালকমাত্রেই সর্ব্বজাতির অন্ন-ভোক্তা, এ কথা সত্য নহে; কতক কতক বালক ঐ পথের পথিক বটে, এ কথা সত্য। আজি প্রায় দশ বৎসর হইল, একটী মজ্‌লীসে একজন সুশ্রী হিন্দুযুবক আসিয়া উপস্থিত হন। মজ্‌লীসটী কলিকাতার যুবকসম্প্রদায়েই পরিপূর্ণ। যিনি নূতন আসিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বি, এ ডিক্রী লাভ করিয়াছেন; উকীল হইবার জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। বয়স অনুমান চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। মজ্‌লীসে আসনগ্রহণ করিয়াই সগৌরবে, শ্লাঘা সহকারে, সহাস্যবদনে তিনি বলিলেন, "কল্য একটা ভারী মজা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকালে মাণিকতলার বাগানের দিক্ হইতে আমি বাসায় আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে দেখিলাম, একটা খোলা জায়গায় সামিয়ানা খাটাইয়া অনেক লোক গোলমাল করিতেছে। কি ব্যাপার, দেখিবার নিমিত্ত আমি নিকটস্থ হই; দেখিলাম, মুসলমানের মজ্‌লীস, খানার ব্যাপার। নিকটস্থ হইবামাত্র মুসলমানী খানার চমৎকার সুবাস আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, আমি আর তখন লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমার গায়ে একটা চাপ্‌কান ছিল, সেটা খুলিয়া উল্টা করিয়া গায়ে দিলাম, একটু তফাতে একখানা দর্জ্জীর দোকান ছিল, সেই দোকানে গিয়া পাঁচটী পয়সা দিয়া মুসলমানী কেতার একটা সাদা তাজ কিনিয়া লইলাম, সেই তাজটী বামে হেলাইয়া বাঁকা করিয়া মাথায় দিয়া, মজ্‌লীসমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভোজের

আয়োজন হইয়াছিল, ব্রঙ্কার পরিষ্কার আসন পড়িয়াছিল, একাসনে ভোজন করাই মুসলমানজাতি: অভ্যাস, সেই আসনে আমি উপবেশন করিলাম। একটী কথা বলিতে ভুল হইল। ভোজনের অগ্রে মুসলমানী রীতিতে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিতে হয়, [illegible]কের দেখাদেখি আমিও তাহা করিয়াছিলাম। বিবিধ উপাদেয় মোগলাই পোলাও, কালিয়া ইত্যাদি পরিতোষরূপে ভোজন করিলাম। সমস্তই উত্তম কেবল, হিন্দুরা যে মাংসটাকে অখাদ্য বলে, সেই মাংসটা কিছু দড়ী দড়ী,—শক্ত শক্ত।"

হিন্দুসন্তানের মুখে এইরূপ বাহাদুরীর পরিচয় কত বড় ভয়ঙ্কর, হিন্দু পাঠক-মহাশয়েরা তাহা বিবেচনা করুন। স্বেচ্ছাচারের স্রোতে এই পবিত্র সমাজে কতদূর কদাচার প্রবেশ করিতেছে, তাহা বলিবার নহে। জাতিভেদ ঘুচিয়া না গেলে ভারতের মঙ্গল হইবে না, এই কথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বভুক্ হইয়া সর্ব্বজাতির সহিত এইরূপে পান-ভোজন করিয়া ভারত উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ব্রত। সর্ব্বজাতির সহিত একত্র পান ভোজন করিলেই যদি ভারতের মঙ্গল হয়, দেশব্যাপী উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলে সেরূপ মঙ্গল ও সেরূপ উন্নতি আমাদের প্রয়োজন আছে কি না, বিজ্ঞ বিজ্ঞ বিচারকেরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত হইলেও ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানেও বিবাহ চলিতে পারে, কিন্তু মুসলমানেরা তাহাতে সম্মত হইবে কি না, সেই প্রশ্ন বড় কঠিন। আমাদের সমাজ এক্ষণে যেরূপ ভঙ্গপ্রবণ, মুসলমানের সমাজ সে প্রকার নহে। ধর্ম্মবুদ্ধিতে কোন কোন অংশে কিছু কিছু গোঁড়ামী থাকিলেও মুসলমান-সমাজ আমাদের আধুনিক সমাজ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানের সহিত হিন্দুর বিবাহ চলিবে না, ইহা আমরা ভবিষ্যৎবাণার ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিতেছি।

অসবর্ণ-বিবাহে দোষ আছে কি গুণ আছে, তাহা বলিবার অধিকার আমরা রাখি না, তবে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, বর্ত্তমান যুগে অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। মনুসংহিতায় আছে, "ব্রাহ্মণেরা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন; ক্ষত্রিয়েরা—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন; বৈশ্যেরা—বৈশ্য, শূদ্র দুই বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন; শূদ্রেরা কেবল শূদ্রকন্যা ব্যতীত অপর কোন

বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত না। হীনবর্ণের পুরুষেরা উচ্চবর্ণের কন্যা-গ্রহণে অধিকারী ছিল না, ইহা মনুর মত। বর্ত্তমান যুগে সকল বিষয়ে মনুসংহিতার মত প্রচলিত নহে। কলিযুগে অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ; এতদূর নিষিদ্ধ যে, জন্মলগ্নানুসারে কন্যা যদি বিপ্রবর্ণ হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সে কন্যার পাণি-গ্রহণে অধিকারী হয় না; বিবাহ করিলে মিলন হয় না। ক্ষত্রিয়বর্ণা কন্যা—বৈশ্য-শূদ্রাদির পত্নী হইতে পারে না। যখন এতদূর বাঁধাবাঁধি, তখন এ যুগে যে অসবর্ণ-বিবাহ চলিতেই পারে না, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। স্বেচ্ছাচার লোকেরা শাস্ত্রবন্ধন অমান্য করিয়া—স্বেচ্ছানুসারে যাহা কিছু করিতেছে, তাহা হিন্দুসমাজের পক্ষে শুভকর নহে। প্রবোধ এই যে, সমুদ্রের জল দুই তিন কলসী তুলিয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সমুদ্রের যেমন কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, হিন্দুসমাজের কোটি কোটি লোকের মধ্যে শত ব্যক্তি অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যা সহস্র ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিহিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া চলে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের বলক্ষয় ভিন্ন তাদৃশ ক্ষতিবৃদ্ধি আর কিছুই হইবে না।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

নাম-করণ

বিবাহের পর জন্ম, জন্মের পর নাম-করণ। অন্নপ্রাশনের সময় জন্মনক্ষত্রানুসারে রাশি নিরূপিত হয়, রাশি অনুসারে শিশুর একটী নামকরণ হয়, সেই নামের নাম রাশিনাম। সচরাচর রাশিনামগুলি অপ্রকাশ থাকে; মাতা-পিতা আদর করিয়া যে একটী নাম দেন, সেই নামেই পরিচয় হয়। সেই নামকে ডাকনাম বলে। আমাদের দেশে এত দিন এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছিল, ইংরাজী শিক্ষাপ্রভাবে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহারা দেখেন, সাহেবেরা দুই একটী অক্ষর লিখিয়া উপাধিযোগে নাম স্বাক্ষর করেন। অক্ষরগুলিকে খ্রীষ্টান নাম কহে। এ দেশে সে রীতি নাই, বাঙ্গালী যুবকেরা ইংরাজী অনুকরণে সেই রীতি অবলম্বন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দুটী দুটী ইংরাজী অক্ষরের সহিত উপাধি যোগ করা হইত। যথা—পি, সি, চ্যাটার্জ্জি; এন্, সি, ব্যানার্জ্জি; ডব্‌লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি; টি, এন্, মুখার্জ্জি; পি, ডি, ভট্টাচার্জ্জি; আর, জি, দত্ত; আর, এম্, হালদার ইত্যাদি ইত্যাদি। এখনও ঐরূপ দুই অক্ষরে নাম লিখিবার ব্যবহার আছে, কিন্তু কেহ কেহ ততটা ঝঞ্ঝাটও স্বীকার করিতে চাহেন না; সংক্ষেপে একটা ইংরাজী অক্ষর লিখিয়াই উপাধি যোগ করিয়া দেন। এই নূতন রীতির প্রচলনকর্ত্তা ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত। ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া, বোতলের গায়ে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, ডি, গুপ্ত; হ্যাণ্ডবিলে এবং অপরাপর বিজ্ঞাপনেও ডি, গুপ্ত লেখা আরম্ভ হয়; ক্রমে ক্রমে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ডি, গুপ্ত, ডি, গুপ্তের ঔষধ।

এ দেশের লোক চিরদিন হুজুগ ভালবাসে, ঐ একটা নূতন হুজুগ পাইয়া যুবকেরা এমন কি, বালকেরা পর্য্যন্তও একাক্ষরে নাম লিখিতে আরম্ভ করে।

যথা—টি, পালিত; এ, চৌধুরী; বি, বানার্জ্জি; এস, ভট্টাচারিয়া, এন্ দত্ত; পি, মিত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুটী প্রথাই মহা গোলযোগের কারণ। আদ্যক্ষর নাম কিম্বা একাক্ষর নাম স্বাক্ষর করিবার সুবিধা আছে বটে, কাগজের অল্প স্থান অধিকার করে, সে অংশে মিতব্যয়িতারও পরিচয় আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাহার কি নাম, তাহা জানিবার উপায় নাই। নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রথা আমাদের দেশে সাধারণ। এ, বি, দত্ত; বি, সি, ভট্ট; জে, মুনসী; আর, ঘোষাল ইত্যাদি নামে আহ্বান করিলে কে উত্তর দিবে, ঠিক পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যাঁহারা সমাজভুক্ত আছেন, যাঁহাদের বাটীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, যাঁহাদের বাটীতে আপনারা কর্ত্তা, কোন ক্রিয়াকর্ম্মে সঙ্কল্প করিবার সময় কিম্বা বিবাহ করিবার সময় ঐরূপ উদ্ভট নামে কোন কার্য্যই হয় না। কার্য্যই যদি না হইল, তবে আধা ইংরাজী আধা বাঙ্গালা নাম লইয়া যে কি ফল, তাহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

পুরুষের নামে ত ঐ প্রকার ঘটা; ঘটাই বলুন কিম্বা বিড়ম্বনাই বলুন, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন, পুরুষেরা আপনাদের পরিচয় আপনারাই জানিয়া রাখেন, এক প্রকার এ মন্দ হয় না; কিন্তু স্ত্রীলোকের নামেও বিভ্রাট উপস্থিত। ইংরাজী বর্ণ-যোগে স্ত্রীলোকের নাম লেখা হইতেছে, যদিও তাদৃশ দৃষ্টান্ত আমরা অল্প দেখিতে পাই, তথাপি আর এক প্রকার প্রহসন ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নাম থাকে স্ত্রীলোকের, উপাধি থাকে পুরুষের। কন্যার যত দিন বিবাহ না হয়, সে তত দিন পিতার উপাধি ধারণ করে। বিবাহের পর সধবা স্ত্রীর নামের উপরে স্বামীর উপাধি যোগ হয়। যথা—শ্রীমতী বিধুমুখী বড়াল, শ্রীমতী বিনোদিনী রায়, শ্রীমতী সৌদামিনী ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী হেমলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

নামগুলি শুনিতে কেমন হয়, শ্রোতা মহাশয়েরা তাহা বুঝিতেছেন, পাঠ করিতে কেমন শুনায়, পাঠক মহাশয়েরা তাহাও জানিতেছেন, মুখে বলিবার সময় কেমন লাগে, বক্তা মহাশয়েরা তাহা অনুভব করিতেছেন। এই গেল এক কথা, দ্বিতীয় কথাটী কিছু শক্ত। শ্রীমতী কথাটী স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক; বিনোদিনী, সৌদামিনী, বিধুমুখী ইত্যাদি নামগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক; বড়াল, রায়, ভট্টাচার্য্য, মুখোপাধ্যায়

ইত্যাদি উপাধিগুলি পুংলিঙ্গ বাচক, ব্যাকরণের খিঁচুড়ী। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অন্তঃপুরে এইপ্রকারে ব্যাকরণের মাথা খাওয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উচিত হইতেছে কি না, সমাজ তাহার বিচার করিবেন। অধিকন্তু পুরুষের উপাধিযুক্ত স্ত্রীলোকের নামগুলি কেমন শ্রুতিমধুর হয়, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। কেন ঐরূপ হইয়াছে, তাহার একটী কারণ মধ্যে মধ্যে আমরা শ্রবণ করি। কায়স্থ-মহিলারা রামকিশোরী বসু, ভবতারিণী মিত্র, কাদম্বিনী ঘোষ এইরূপ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। আমাদের সমাজের ব্যবহার ব্রাহ্মণকন্যার নামের পরে দেবী এবং শূদ্রকন্যার নামের পরে দাসী লিখিতে হয়, কতিপয় কায়স্থ-সন্তান বোধ হয় ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে জানিতে পারিয়াছেন কিম্বা স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহাদের রমণীগণ দাসী হইতে পারে না। একজন স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা যে আমাদের নারীগণকে দাসী বলিয়া পাঠ লিখিয়া থাক, ইহা কোন্ রাজ্যের বিচার? কাহার দাসী?"

শূদ্রাণীর নামের পরে দাসী লিখিলে একজনের দাসী বুঝায়, সমাজমধ্যে এত দিন এ বিচার ছিল না, এখন ইংরাজীতে কিম্বা বাঙ্গালাতে স্ত্রীলোকের নাম লিখিবার সময় পুরুষের উপাধি যোগ করিয়াই লেখা হয়, তাহাতে আর দাসী লিখিতে হয় না, সুতরাং শূদ্রকন্যারা ও শূদ্রপত্নীরা কাহারও দাসী হন না, দাসী হইবার ভয়টাও থাকে না। যুক্তি ভাল, মীমাংসাও ভাল, ব্যবহারটীও ভাল; কিন্তু একটী জেলাকোর্টের উকীল একজন মান্য-গণ্য কায়স্থ মহাশয়কে সট্রে পট্রে ধরিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কায়স্থ মহাশয়ের নাম রামশঙ্কর দাস, তাঁহার স্ত্রীর নাম মহামায়া দাসী। উকীল মহাশয় সেই মহামায়া দাসীর স্ত্রী-ধনের সত্বাধিকার-সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমার আরজীতে অভ্যাসমত দাসী লিখিয়াছিলেন। মহামায়ার স্বামী তাহাতে আপত্তি করিলেন, আপত্তির হেতুটী পূর্ব্বোল্লিখিত হেতু। আরজীখানি ষ্ট্যাম্পে লেখা হইয়াছিল, বাবু রামশঙ্কর দাস সেই ষ্ট্যাম্পখানি বাতিল করিবার প্রস্তাব করেন।

উকীল মহাশয় হাস্য করিয়া বলেন, "আপনি তবে কিরূপ লিখিতে ইচ্ছা করেন? আপনি স্বয়ং হইতেছেন রামশঙ্কর দাস, আপনার স্ত্রীকে যদি মহামায়া দাস বলিয়া ষ্ট্যাম্পে লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে আপনার কথিত আপত্তির হেতুটী বজায় থাকে কৈ? শূদ্রাণীরা কাহারও দাসী নহে, এইজন্য তাহাদের

নামের পরে স্বামীর উপাধি লেখা হয়; স্বামী যেখানে দাস, তাহার স্ত্রীও দাস হইবে, এই ত আপনার অভিপ্রায়? আচ্ছা, বিবেচনা করুন, দাস শব্দের অর্থ কি? দাসী বলিলে পাছে কাহারও দাসী হয়, সেই ভয় আপনারা করেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে দাস বলিলে সে ভয়টা কি প্রকারে দূর হইয়া যায়? ব্যাকরণের অপমান করা আপনাদের সৎসাহসের পরিচয়, কেবল সেইটাই সিদ্ধ হয় মাত্র; নতুবা দাস আর দাসীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কেবল লিঙ্গভেদ মাত্র।"

বাবু রামশঙ্কর দাস ঐ কথার উপর আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল অপ্রস্তুত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, "অর্থ খাটাইবার জন্য আপনাকে ওকালতনামা দেওয়া হয় নাই, মহামায়া দাসের সমস্ত দলীলে মহামায়া দাস লেখা হইয়া আসিতেছে, আরজীতে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন?"

ব্যতিক্রম ঘটিল না, অন্যান্য দলীলের খাতিরে সত্যই ষ্ট্যাম্পখানি বাতিল হইল। মহামায়া দাসী মহামায়া দাস নামেই পরিচিতা রহিলেন।

নামবিভ্রাট ও উপাধি-বিভ্রাট আজকাল অনেক প্রকার হইতেছে। কেহ কেহ আপনাদের নাম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে চাহেন না, কেবল উপাধিতেই তাঁহাদের পরিচয় হয়। মনে করুন, রামেশ্বর দে, শিবশঙ্কর দত্ত, নবীনকিশোর গুপ্ত, এই তিনটী নাম; কিন্তু ইংরাজীর অনুকরণে প্রথম নামটী মিষ্টার ডে, দ্বিতীয়টী মিষ্টার ড্যাটা, তৃতীয়টী মিষ্টার গুপ্টা, এইরূপে লিখিত ও পরিচিত হইয়া থাকে। এমনও কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের নামের পরে পত্রের শিরোনামে এস্কোয়ার লেখা না থাকিলে সে পত্র গ্রহণ করেন না, দূর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া বৃথা অনুকরণের অনুরোধ রক্ষা করা শিক্ষিত যুবকগণের গৌরবের পরিচায়ক নহে, ঐরূপ নাম-বিভ্রাটের ফলাংশে বরং অনর্থ উপস্থিত হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। সমাজকে পরিবর্ত্তনের চক্রে ঘুরাইতে হইলে এমন করিয়া ঘুরাইতে হয় না। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ, পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি, পরিবর্ত্তনশীল সংস্কার, পরিবর্ত্তনশীল শাস্ত্র, পরিবর্ত্তনশীল সমাজ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ যে প্রকার পরিবর্ত্তনে সংসারের মঙ্গল স্থাপিত হয়, সেই প্রকার পরিবর্ত্তনই প্রার্থনীয়। কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তাহা স্থির না করিয়া স্রোতে গা ভাসান দিলে কোথায় কি অবস্থায় গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, কেহই তাহা নিশ্চয় করিতে

পারেন না; অতএব সকল দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখা আবশ্যক। নাম বিভ্রাটের কুফলাফল যাঁহারা দর্শন করিতেছেন, কোন প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এ স্থলে অনাবশ্যক বিবেচনা করা গেল।

একটী কৌতুকাবহ বিষয় উপসংহারে লিখিয়া না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা গেল না। একটী ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় একখানি পূর্ণায়ত ফটোগ্রাফ ঝুলিতেছিল। যাঁহার ফটোগ্রাফ, দুটী সমাগত নূতন বন্ধুকে তিনি সেই ফটোগ্রাফখানি দেখাইতেছিলেন। ছায়াচিত্র উত্তম হইয়াছিল। বন্ধুরা তাহার প্রশংসা করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই ছবির তলভাগে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। ছবিতে দুটী মূর্ত্তি;—একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী। পুরুষমূর্ত্তির পদতলে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা ছিল শ্রীযুক্ত রায় ইউ, সি, পাল বাহাদুর, স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে লেখা ছিল, শ্রীমতী ইউ, সি, পাল রায় বাহাদুর।

এখন আপনারা বিবেচনা করুন, সৎকার্য্যের গৌরবেই হউক অথবা বেশী দিন উচ্চ-গৌরবে রাজসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকার নিমিত্তই হউক, যাঁহারা জীবনকালের জন্য সরকার হইতে রায় বাহাদুর উপাধি পান, তাঁহারা ঐরূপে স্ত্রীকে রায় বাহাদুর সাজান, ইহা কেমন হাস্যকর ক্রীড়া! পতির উপাধির গৌরবে নারী গৌরবান্বিতা হন, ইহা কাহারও অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, কিন্তু অস্থায়ী উপাধি রায় বাহাদুর, সেই উপাধি স্ত্রীর নামের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া যুক্তিমতে ব্যাকরণের অবমাননা করা, সাধারণ বিচারেও অবশ্যই দোষাবহ। রায় বাহাদুরের স্ত্রীকে যদি রায় বাহাদুর লিখিতে হয়, তবে রাজার স্ত্রীকে রাণী না লিখিয়া রাজা বলিয়া পরিচয় দিবার বাধা কি? ইংরাজী ভাষায় ছাগ ও গর্দ্দভ প্রভৃতি কতকগুলি জীবের স্ত্রীলিঙ্গ নাই, He এবং She যোগ করিয়া স্ত্রীপুরুষ বুঝিতে হয়, সেইরূপে He রাজা, She রাজা, He রায় বাহাদুর, She রায় বাহাদুর লিখিবার প্রথা অতঃপর চলিবে কি না, সত্য সত্য আমাদিগের এই আশঙ্কা হইতেছে। প্রবন্ধান্তরে পুনরায় আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

তৃতীয় তরঙ্গ।

বিদ্যাশিক্ষা।

বালকের পঞ্চম বর্ষে হাতেখড়ি হইলে পূর্ব্বে পূর্ব্বে বালকেরা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় মাতৃভাষা শিক্ষা করিত। হস্তাক্ষর এবং শুভঙ্করী অঙ্কবিদ্যা সেই সকল পাঠশালায় শিক্ষা করিবার উত্তম সুযোগ ছিল। তাদৃশী পাঠশালা সহরে এক্ষণে অতি অল্পই আছে, মফস্বলে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে সকল পাঠশালার আর আদর নাই, এখন পণ্ডিতের নিকটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ প্রথা উত্তম। গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় বালকেরা শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিয়া লিখিতে শিখিত না, এখনকার পুলিসে, আদালতে এবং জমীদারী সেরেস্তায় যে প্রকার অশুদ্ধ শব্দাবলী ও বর্ণাবলীর ছড়াছড়ি, বালকেরা সেইরূপ শিক্ষাই প্রাপ্ত হইত। অশুদ্ধ লেখার প্রণালীকে কিতাবতী প্রণালী বলে, ইহা অনেকেই জানেন। অশুদ্ধ করিয়া না লিখিলে পুলিসের আমলারা, জমীদারীর আমলারা এবং আদালতের আমলা ও উকীল-মোক্তারাদি তাহা প্রায় বুঝিতেই পারেন না। একজন উকীল এখনকার প্রণালীতে শুদ্ধ করিয়া একখানি আরজী লিখিয়া আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন, আদালতের সেরেস্তাদার তাহা বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করিতে না পারিয়া হাস্য করিয়াছিলেন, এ কথাটী আমরা একটী জেলা-আদালতের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। আরজীখানি ফেরত হয় নাই, সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হাকিম এজলাসে ছিলেন, সেই কারণে তাহা গ্রাহ্য হইয়াছিল; কোন সাহেবের এজলাস হইলে বোধ হয়, সেখানি ফেরত দেওয়া হইত। কিতাবতী প্রণালীতে এবং এখনকার বিশুদ্ধ প্রণালীতে এতদূর অন্তর।

বাঙ্গালীসন্তানেরা অগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া, তাহার পর ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা; কিন্তু বাঙ্গালাতে কিম্বা সংস্কৃতে এখন আর ভাল ভাল চাকরী পাওয়া যায় না, চাকরী এখন বাঙ্গালীর প্রধান জীবিকা, অতএব বালকের পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি অভিভাবকেরা পঞ্চম বর্ষ বয়সেই বালকগুলিকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। বালকেরা প্রথমাবধি ইংরাজী শিক্ষা করে। মাতৃভাষায় একখানি চিঠি লিখিতে কিম্বা একটী হিসাব রাখিতে তাহাদিগের ক্ষমতা জন্মে না। এই স্থলে একটী রহস্য মনে পড়িল। কলিকাতার একটী বাবুর নাম তারাচাঁদ দত্ত, আজিও তিনি জীবিত আছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিক্রী-প্রাপ্ত, বড়মানুষের সন্তান। তাঁহার বাড়ীতে একজন সরকার ছিল, সেই সরকার সেই সংসারের জমা-খরচ লিখিত, খাতাপত্র রাখিত, খাজনা-পত্র আদায় করিত। আট দিবসের ছুটী লইয়া সেই সরকার একবার বাটীতে গিয়াছিল। বাবুর বাটীতে জমাখরচ লিখিবার লোক ছিল না, বাবু নিজে একখানি চোঁতা কাগজে মোটামুটি সংসারখরচগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সরকার ফিরিয়া আসিয়া সেই চোঁতা দেখিয়া যখন খাতা লিখিতে আরম্ভ করে, তখন কিছুই বুঝিতে পারিল না, চোঁতাখানি বাবুকে দেখাইতে গেল। চোঁতাতে লেখা ছিল, তামাক ৮, মৎস্য ১৫, তরকারি ১৭, টীকা ৪, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকারের সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত বাবু বুঝাইয়া দিলেন, যেখানে যে অঙ্ক লেখা আছে, সেখানে তত পয়সা বুঝিতে হইবে, উহা আর তুমি বুঝিতে পারিলে না? সরকার তখন মাথা হেঁট করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে চোঁতাখানি লইয়া প্রস্থান করিল। এই প্রকারের বাবু আজকাল অনেকগুলি দৃষ্টিগোচর হন। তাঁহারা মাতৃভাষায় কোন কার্য্যই প্রায় করিতে পারেন না অথচ কেহ লজ্জা দিলেও লজ্জা বোধ করেন না। স্ব স্ব পক্ষসমর্থনের নিমিত্ত তাঁহারা বলেন, "বাঙ্গালায় কিছুই নাই, বাঙ্গালা ভাষা অকর্ম্মণ্য।"

যাঁহাদের বিচারে বাঙ্গালাভাষা অকর্ম্মণ্য, ইংরাজী শিক্ষা করিয়া তাঁহারা কতদূর উন্নতি করিয়াছেন, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হয়। অধুনা সহস্র সহস্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই লক্ষ্য চাকরীর দিকে। তত লোকের জন্য তত চাকরী জুটে না,

সুতরাং তাঁহারা জীবিকার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ান। যাঁহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাঁহারা বরং নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, যাঁহারা ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতি এক একটী স্বাধীন ব্যবসা শিক্ষা করেন, তাঁহারাও বরং সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তদ্ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থ-সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া এক প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ছোট চাকরী স্বীকার করিতে তাঁহাদের অপমান বোধ হয়, বড় চাকরীও দুর্লভ। দিন দিন ছোট চাকরীও দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় উপাধিধারীরা জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহারাই তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এ দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে ভদ্রজাতীয় যুবকেরা কোন প্রকার ছোট কার্য্যে মানহানি বিবেচনা করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বনে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না; বড় বড় ব্যবসায়েও মূলধনের অভাব; কাজে কাজে চাকরী অন্বেষণের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। কলিকাতায় এক্সচেঞ্জ গেজেট নামক বিজ্ঞাপনীপত্রে প্রায় প্রতি-দিন কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপা থাকে। সকলগুলিই যে সত্য, তাহাতেও আমাদের বিশ্বাস নাই। এক একজন রসিক লোক বাঙ্গালীর কৌতুক দেখিবার জন্য এক একটী কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেন। সকল বিজ্ঞাপনে মাসিক বেতনের উল্লেখ থাকে না, এক একটী বিজ্ঞাপনে দশ কুড়ি টাকা বেতন লেখা থাকে, অথচ উক্তগেজেট-আপিসে নিত্য নিত্য উমেদার লোকের অসম্ভব ভিড় হয়। ভিড়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র উপস্থিত থাকেন। যেগুলি সত্য বিজ্ঞাপন, সেগুলি যাঁহারা দেন, তাঁহারা এক একজন কাজের লোককে পরীক্ষা করিয়া লন। উপাধিধারীরা সে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। নিয়োগকর্ত্তারা বলেন, "আমরা চাপরাস চাহি না, বে-চাপরাসী লোকেরা যদি কাজের লোক হয়, তাহারাই আমাদের আদরণীয়।" ইহা কেবল কথার কথা নহে, নিয়োগকালে যথার্থই তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে; উপাধিধারীরা হতাশ হইয়া শুষ্কবদনে ফিরিয়া আইসেন। উচ্চশিক্ষার এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া অনেককেই ম্রিয়মাণ হইতে দেখা যায়।

আর একটী শোচনীয় দশা আমরা দর্শন করিতেছি। যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেন, স্কুল-কালেজে অধ্যয়নের সময় তাঁহারা অসম্ভব পরিশ্রম

করেন। প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার সময় যতগুলি ছাত্র পরীক্ষাগারে উপস্থিত হয়, তাহাদের শারীরিক অবস্থা দেখিলে দুঃখোদয় হইয়া থাকে। সকলেই প্রায় কৃশ, সকলেরই প্রায় মুখ বিশুষ্ক, সকলেরই প্রায় চক্ষু কোটরগত, সকলেই প্রায় বিবর্ণ। জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় জানা যাইতে পারে, নিশা-জাগরণে অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাহারও কাহারও শরীরে উৎকট রোগ প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম-পরীক্ষার যখন এইরূপ দৃশ্য, তখন ক্রমশঃ পর্য্যায়ানুযায়ী উচ্চ উচ্চ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিগণের শরীর আরও অধিকতর জীর্ণশীর্ণ দৃষ্ট হয়। স্বাস্থ্যের প্রতি যাঁহাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকে, তাঁহাদের শরীর কতক পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট দেখায় বটে, কিন্তু তাঁহারাও কোন প্রকার বিশেষ শ্রমসাধ্য কার্য্যে অপটু, ইহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায়। ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি ক্রীড়ায় শরীর বলিষ্ঠ রাখিতে যাঁহারা প্রয়াস পান, সাধারণতঃ তাঁহাদের পক্ষে তাহাও একপ্রকার বিড়ম্বনা। বালকেরাই বলে, "ফুটবল না খেলিলে শরীর কেমন মাটী মাটী করে, মন কেমন উড়ু উড়ু করে, ব্যায়ামদণ্ডে না ঝুলিলে গাত্রে বেদনা উপস্থিত হয়।" এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি? ক্রীড়াসক্ত বালকেরা ক্রীড়া-কৌতুক ভালবাসে, খেলাকে তাহারা খেলা বলিয়া জানে। তাহাদের ব্যায়ামচর্চ্চাদি কেবল খেলাতেই পরিণত হয়, বিশেষ উপকার কতদূর দর্শে, বালকগণের চেহারা দর্শন করিলেই তাহা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জনকে যদি হৃষ্টপুষ্ট দর্শন করা যায়, তাহাই আমরা যথেষ্ট মনে করি। তাহাদিগকে দেখিলেই আমাদের মনে কিছু কিছু আনন্দ জন্মে; অবশিষ্ট ছাত্রগুলির জন্য অশ্রুপাত করিতে হয়। এত পরিশ্রম করিয়াও তাঁহারা জীবিকা-অর্জ্জনে অক্ষম হন, লোকের দ্বারে দ্বারে চাকরীর জন্য উমেদারী করেন, বিফলমনোরথ হইয়া অথবা স্থলবিশেষে উপহাসাস্পদ হইয়া ফিরিয়া আইসেন, বড়ই দুঃখের বিষয়। লাভের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার পরিশ্রমের ফলে অনেককে স্বাস্থ্যহীন হইয়া শয্যাগত থাকিতে হয়, ইহাও সামান্য আপশোষের কথা নহে।

চাকরী এত দুর্ল্লভ হইতেছে কেন? সাহেবেরা এ দেশে চাকরী দানে কল্পতরু, তবে কেন শিক্ষিত যুবকেরা আশামত চাকরী পাইতেছেন না? ইহার কারণ এই যে, কলিকাতা সহরেই চাকরী অধিক, মফস্বলে এক একটী সদর

ষ্টেসনে কতকগুলি লোক চাকুরী প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ। বড় বড় কার্য্যালয় সমস্তই রাজধানীতে। রাজধানীর উপরেই বেশী লোকের ঝোঁক। সাহেবেরা কল্পতরু হইলেও সকলের আশা পূর্ণ করিতে পারেন না। চাকরীর সংখ্যা অল্প হইয়াছে, চাকরীপ্রার্থীর সংখ্যা অধিক। ইহার কারণ—আজকাল বাঙ্গালীমাত্রেই প্রায় চাকরীপ্রিয়, চাকরী না করিলে যাহাদিগের চলে, তাহা-দিগের কথা স্বতন্ত্র, সেই শ্রেণী ব্যতীত সকলেই চাকরী চায়, কাজেই চাকরী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে।

আর একটী প্রবল কারণ। যাঁহারা আমাদের দেশে জাতিভেদের বিরোধী, তাঁহারা স্মরণ করিবেন, এক এক শ্রেণীর লোকের একটী একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকিলে সমাজের শৃঙ্খলা থাকে, সেই উদ্দেশে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের কার্য্য, ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, বৈশ্যের কার্য্য এবং শূদ্রের কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। শূদ্রজাতির মধ্যে আবার কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখা নিরূপিত আছে; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও নিরূপিত ছিল; অধুনা বিদেশী ব্যবসায়ী লোকেরা আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ীর ব্যবসা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এদিকে আবার শিক্ষা-সংক্রান্ত উদার-নীতি-প্রভাবে সর্ব্ব-জাতীয় লোকেরাই ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিবার অধিকার পাইয়াছে। ব্যবসায়ী লোকের সন্তানেরা,—এমন কি, কৃষক-সন্তানেরা পর্য্যন্ত কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ইংরাজী আফিসে কেরাণীগিরী করিতে ধাবিত হইতেছে, জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণা করিতে শিখিতেছে, জাতীয় ব্যবসায়ে কষ্ট অধিক, শ্রম অধিক, অথচ লাভ অল্প, কেরাণীগিরীতে ততটা কষ্ট অথবা পরিশ্রম নাই, রম্য হর্ম্ম্যতলে চেয়ারে বসিয়া, টানাপাখার বাতাস খাইয়া, ইংরাজী অক্ষর নকল করিতে পারিলে স্বচ্ছন্দে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট বেতনলাভ হয়, শরীরও অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে ভাল থাকে, এই কারণে দিন দিন জাতীয় ব্যবসায়ের অবনতি হইতেছে। বিদেশীয়েরা যাহার উপর হস্তার্পণ করেন নাই, তাদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়েও দেশীয় ব্যবসায়ীর সন্তানগণের আর প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং সংসার-ব্যবহার্য্য সামান্য সামান্য দ্রব্যও বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, অনুর্ব্বরা বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞলোকেরা মাতৃভূমিকে গালাগালি দিতেছে। দেশের লোকে চাকরী করিতেছে বটে, কিন্তু চাকরীর টাকায় সকলের সংসার-খরচের

ব্যয়সংকুলান হইতেছে না, সকল দ্রব্যই মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হয়, বাজারের দ্রব্যাদিও প্রায় অগ্নিমূল্য, তাহার উপর আবার দেশের লোকের বিলাসিতা বাড়িয়াছে। চাকরী করিলেই বিলাসী হইতে হয়, সর্ব্বদা ফিটফাট থাকিতে হয়, ভাল ভাল পোষাক পরিতে হয়, অঙ্গে এসেন্স মাখিতে হয়, অবস্থাবিশেষে কিম্বা অবিশেষে ঘড়ী-চেন ব্যবহার করিতে হয়, দিব্যচক্ষু থাকিতেও চশমা পরিতে হয়, চাকরীপ্রিয় লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। উপসর্গ অনেক প্রকার, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে। উদার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশে সভ্যতা আনয়ন করিয়াছেন, আবগারীর সকল অঙ্গকে সুসজ্জিত রাখিয়া সভ্যতার অঙ্গপুষ্টির সহায়তা করিতেছেন। আবগারীর সেবা করা একটী সভ্যতার অঙ্গ। যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করে, তাহারা সভ্য হয়, যাহারা চাকরী করে, তাহারা সভ্য হয়; সভ্য হইলেই সভ্যতার অঙ্গটী অঙ্গভূষণ করিয়া লইতে হয়। আবগারীর নামে যাহাদের নিতান্ত অরুচি কিম্বা শাস্ত্র-শাসনে যাহাদের কিছু কিছু ভয় আছে, তাহারা ভিন্ন সকলেই প্রায় মদ্যপান করে। সমাজের শাসন নাই, কেহই কাহাকে ভয় করে না, যাহারা একক্ষুরে মাথা মুড়াইয়াছে, তাহারা ত ভয় করিবেই না, সুতরাং দিন দিন সভ্যতার এই অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। একজন কবি বলিয়াছিলেন, একটী W জুটিলেই আর একটী আসিয়া যোগ দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজী অথবা মুসলমানী খানা খাইবার ইচ্ছা জন্মে; এই তিন একত্র হইলেই আশু অধঃপতন। এই স্থলে কবির কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল। যথা;—

ডবল ডব্লিউ যোগে খানায় (১) ব্যাপার।
খানায় ব্যাপারের শেষে খানায় (২) ব্যাপার॥

বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারে ও অন্য প্রকারে দেশের অধঃপতন সাধিত হইতেছে, সকলেই দেখিতেছেন; দেখিয়া দেখিয়া কিন্তু কেহ কোন প্রকার প্রতীকারের চেষ্টা পাইতেছেন না। ভারতের মঙ্গল করিবার উদ্দেশে ইংরাজেরা ভারতে আসিয়াছেন। ইংরাজ বলেন, পরমেশ্বর ভারতের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদিগকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, ইংরাজকেও ধন্যবাদ! সত্যই আমরা ইংরাজের দ্বারা গুটীকতক মঙ্গলফল লাভ করিতেছি।

(১) হোটেলের খানা। (২) নর্দ্দমা।

মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি অমঙ্গল আসিতেছে, তাহা আমাদিগের ভাগ্যের দোষে। আমরা মঙ্গলের সদ্ব্যবহার জানি না, সেই জন্যই হয় ত পদে পদে আমাদের পদস্খলন হইতেছে, ইংরাজী সভ্যতা সেই সকল অমঙ্গলের গাত্রে ঘন ঘন বাতাস দিতেছে। সে বাতাসকে আমরা সুবাতাস কি কুবাতাস বলিব, তাহা জানি না। যাঁহারা আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশের লোকগুলিকে চাকরী দিতেছে, শিক্ষার নিকটে আমরা সেই জন্য কৃতজ্ঞ। শিক্ষালাভ করিয়া চাকরী ব্যতীত আর যাহা লাভ করিতে হয়, আমাদের সমাজে আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। শিক্ষার গুণে জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞানজ্যোতিতে ধর্ম্ম-পন্থা প্রকাশিত হয়, মহৎ মহৎ লোকের উপদেশে তাহাই আমরা জানিতে পারি; কিন্তু পাদরী সাহেবেরা এ দেশে আগমন পূর্ব্বক ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিয়া অল্প-শিক্ষিত অথবা অর্দ্ধ-শিক্ষিত বালকগণের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস টলাইয়া দিতেছেন। যে শিক্ষায় ধর্ম্মবিশ্বাস টলে, সেরূপ শিক্ষাকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করি। আমাদের দেশে বিদ্যাপ্রচার হইতেছে, বিদ্যা-কল্পদ্রুম জন্মিতেছে, শাখা-পল্লব প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কল্পদ্রুমের নিকটে আমরা যেরূপ ফলপুষ্পের প্রত্যাশা রাখি, তাহা প্রাপ্ত হইতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সুরভিময় কুসুম প্রসব করিবে, সেই কুসুম হইতে সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হইবে, সকল দেশের সকল লোকেই এইরূপ আশা রাখেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সে আশা ফলবতী হইতেছে না। এখন যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভাগে শিখরদেশে আরূঢ় হইতেছেন, তাঁহারা এক এক প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া শিক্ষা-সংকোচের প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা দর্শন করিতেছি, আমাদের জাতীয় ব্যবসায়গুলি ক্রমশঃ পরহস্তগত হইতেছে, এক উপায় ছিল বিদ্যাশিক্ষা, তাহাও সংকুচিত হইতে চলিল; যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদের হস্তের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাঁহাদের সন্তানেরা নিজ নিজ বুদ্ধির দোষে তাহাও হারাইতেছেন। ইংরাজী বিদ্যা সংকুচিত হইলে ক্রমে ক্রমে যদি জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি জাতীয় লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা আমরা মঙ্গল বলিয়া মানিব। আশা বটে এরূপ; কিন্তু বিদেশী বণিকগণের সহিত প্রতিযোগিতা করা

আমাদের দেশের আলস্যপ্রিয় বিলাসপরতন্ত্র লোকের পক্ষে অসাধ্য, অশেষ-বিশেষ প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কাপ্তেন ক্লাইব যখন লর্ড ক্লাইব হন, তখনও আমাদের জাতীয় ব্যবসায় আমাদের জাতীয় লোকের হস্তে ছিল। কেবল ছিল মাত্র, এমনও নয়, সর্ব্বাংশেই পূর্ণাঙ্গ ছিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্প হইতে মোটা মোটা কার্য্য পর্য্যন্তও এ দেশের লোকের দক্ষতার পরিচয় দিত। দেশের লোকের কোন প্রকার অভাব ছিল না। পলাশী যুদ্ধের অবসানে ইংরাজী কুঠীয়াল সাহেবরা সেই ব্যবসায়ের প্রতি তীব্রতর সলোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা বুঝাইব। এ দেশের তাঁতিরা তখন উত্তম উত্তম বস্ত্র বয়ন করিয়া দেশের অভাব-বিমোচন করিত, আপনারাও যথেষ্ট লাভবান্ হইত। ইংরাজী পাট্টার জোরে কুঠীয়াল সাহেবেরা এ দেশের বস্ত্রের ব্যবসায় আপনাদের হস্তে লইতে মহা ব্যগ্র হন। তন্তুবায়গণের সহিত তাঁহাদের এরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তাহারা যেখানে যত বস্ত্র বয়ন করিবে, তৎসমস্তই ন্যায্য মূল্যে ইংরাজী কুঠীতে সরবরাহ করিতে হইবে; তন্তুবায়েরা নিজে নিজে অপরের নিকটে সে সকল বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। যখন মুসলমানের আধিপত্য ছিল, ইংরাজী কুঠীয়ালেরা তখনও অনেক কুঠী করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড ক্লাইবের অভ্যুদয়ে এই সকল কুঠীয়ালের ক্ষমতা সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কুঠীয়ালেরা তখন এ দেশের ব্যবসায়ীগণের প্রতি যতদূর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। তন্তুবায়গণের প্রতি শেষকালে এইরূপ হুকুম হইয়াছিল যে, গোপনে তাহারা যদি অপরের নিকটে বস্ত্র বিক্রয় করে, সাহেবেরা তবে তাহাদিগের বস্ত্রবয়ন বন্ধ করিয়া দিবেন আর তাহারা বস্ত্র বয়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাঁতিগণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিবেন, কেবল মুখের কথায় ঐরূপ ভয় দেখান হইয়াছিল, তাহাও নয়, সত্য সত্যই তাহাদের দৌরাত্ম্যে কয়েকজন তাঁতির অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদন করা হইয়াছিল। সেই কাপড়ের ব্যবসা এখন ম্যান্‌চেষ্টারে চলিয়া গিয়াছে, এ দেশীয় তাঁতিরা অন্নের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছে। এক বৎসর যদি ম্যান্‌চেষ্টার হস্ত বন্ধ করেন, তাহা হইলে এ দেশের লোককে উলঙ্গ থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লবণ। সমুদ্রকূলের মৃত্তিকা খনন করিলে লবণ উত্থিত হইত, তৃণাদি ভস্ম করিলে লবণ পাওয়া যাইত, সেই লবণ এখন লিভারপুল

হইতে আসিতেছে। দেশের দুরবস্থা দর্শন করিয়া এখনও দেশের লোকের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, ইহাই আমরা চমৎকার দেখিতেছি। কৃষক-সন্তানেরা কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া কেরাণী হইতেছে। ধান্যজীবী বঙ্গে অতঃপর ধান্যক্ষেত্র কর্ষিত করিবে না, দেশে আর ধান্য জন্মিবে না। অন্নজীবী বাঙ্গালীকে অন্নের জন্য বিলাতের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। যেরূপ গতিক, তাহাতে বোধ হয়, এমন দিন আসিতে পারে, যে দিনে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া অন্ন আসিয়া পৌঁছিবে; মহাপ্রসাদ বলিয়া মহা সমাদরে এ দেশের লোকেরা সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া মাথায় হাত মুছিবে। এখনও সময় আছে। দেশের লোকে যদি এখনও জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগী হন, তাহা হইলে দুর্দ্দিন ঘুচিতে পারে। আমাদের রাজার জাতি চিরদিন বাণিজ্যপ্রিয়, কৃষিপ্রিয়। প্রজাগণ কৃষি-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রকাশ করিলে তাঁহারা অবশ্য আহ্লাদিত হইবেন। এ দেশে ইংরাজী বিস্তার সংকোচবিধানে যত্নবান্ হইয়া তাঁহারা বোধ হয় সেই আহ্লাদের দিন দর্শন করিবার আশা করিতেছেন, ইহাই আমাদের মনে হয়। তাহাই হউক; জগদম্বার কৃপায় তাহাই হউক। এখনকার মত ইংরাজী বিস্তার প্রাবল্য এ দেশে কমিয়া যাউক, দেশীয় কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি হউক, শুভদিন ফিরিয়া আসুক, তাহা হইলেই ব্রিটিস রাজ্যে সুখে বাস করিয়া চিরদিন ব্রিটিস-রাজের জয়কীর্ত্তন করিব।

চতুর্থ তরঙ্গ।

গৃহ-শিক্ষক।

প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়াছি,—অবস্থা-প্রতিকূলতায় আর অধিক দূর পাঠ করিতে পারিতেছি না। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছি, শিক্ষার ব্যয় প্রদান করিতে পারি এমন অবস্থা নহে। মফস্বলে নিবাস, কলিকাতায় না থাকিলে পড়া-শুনা অথবা বিষয়কার্য্যের চেষ্টা করা হয় না; কিন্তু বাসাখরচ করিয়া থাকিতে পারি, এমন সংস্থান নাই।" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা এই সকল মন্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া কতকগুলি উমেদার ভদ্রলোকের বাটীতে প্রাইভেট টিউটররূপে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। কাহারো কাহারো ভাগ্যে ঘটে, কাহারো ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা মাসিক ৫৲ টাকা ৬৲ টাকা উর্দ্ধসংখ্যা দশ টাকা বেতনে ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। যে সকল বালক নিম্নশ্রেণীতে পাঠ করে, তাহাদিগকে শিখাইতে তদ্রূপ শিক্ষকেরা নিতান্ত অসমর্থ হন না, তথাপি এক একটা শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের আশ্রয় লইতে হয়। যে সকল গুণ আছে বলিয়া প্রাইভেট টিউটরেরা প্রথমে পরিচয় দেন, কার্য্যক্ষেত্রে সকলের সে সকল গুণ থাকা প্রকাশ পায় না। প্রবেশিকা-শ্রেণীর বালকগণকে অথবা তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় অনেকগুলি গৃহশিক্ষককে রাত্রিকালে নিজ নিজ বাসায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-পুস্তক কিম্বা অভিধান অভ্যাস করিতে হয়। অগ্রে প্রস্তুত না হইয়া তাদৃশ বালকগণকে তাঁহারা শিখাইতে পারেন না। চালাকীর উপর অনেক কাজ চলে, কিন্তু লেখা-পড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে চালাকীর জোর অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। যাঁহাদিগকে গৃহশিক্ষক বলা যাইতেছে, তাঁহাদের ইংরাজী আখ্যা

প্রাইভেট টিউটর। এমন অনেকগুলি প্রাইভেট টিউটর আছেন, তাঁহারা নিজে আবার অপরাপর প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য লইয়া চাকরী বজায় রাখিতে চেষ্টা পান। সকলেই প্রায় বালক, মুখের জোরে তাঁহাদিগকে আঁটিয়া উঠা ভার; অথচ ভিতর পরিষ্কার।

পল্লীগ্রামের প্রাইভেট টিউটরের সংখ্যা অতি কম। যাঁহাদের বার্ষিক আয় অন্যূন সহস্র মুদ্রা, তাঁহারাও প্রাইভেট টিউটর রাখেন না; কলিকাতায় যাঁহাদের মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা অপেক্ষাও কম, তাঁহারাও লোক দেখাইবার জন্য ৫৲। ৬৲ টাকা দিয়া প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া থাকেন। কতকগুলি প্রাইভেট টিউটর নিরীহ মেষশাবকের ন্যায় শান্তচরিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, আর কতকগুলি সর্ব্বপ্রকারে দুর্জ্জয়। আমরা সেই দুর্জ্জয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী লোকের দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

আমাদের দেশের লোকেরা ভাল ভাল বিষয়েও এক একটা খেয়াল দেখাইয়া থাকেন, ভাল বিষয়কেও হুজুগের মধ্যে ধরিয়া লন। লোকে এই কার্য্য করিতেছে, অন্য লোকে সেই সকল লোককে ভাল বলিতেছে, অতএব আমিও সেইরূপ কার্য্য করিব, আমিও সেই দলে গণ্য হইব, আমাকেও লোকে ভাল বলিবে, কতকগুলি লোক এইরূপ খেয়ালে অন্য লোকের দেখাদেখি এক একটা কার্য্য করেন। পুত্রগণকে গৃহে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়, কেহ কেহ কন্যাগণের শিক্ষার নিমিত্তও প্রাইভেট টিউটর রাখেন; পুত্রকন্যারা একসঙ্গে এক শিক্ষকের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। বড়মানুষের ছেলেরা প্রাইভেট টিউটরগণকে প্রায়ই গ্রাহ্য করে না; প্রাইভেট টিউটরকে তাহারা ইয়ার মনে করে। উচ্চ বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা স্কুলের পণ্ডিতকে যেরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকে, গৃহশিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই গৃহ-ছাত্রগণের নিকটে সেইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রগণের রসিকতা চলে, হাস্য-পরিহাস চলে, সোডা-লিমনেড পান করা চলে, সময়ে সময়ে বার্ডসাই খাওয়া চলে; উচ্চ অঙ্গের ন্যায় কিছু চলে কি না, তাহা আমরা বিশেষরূপ জানি না। যেখানে বালক-বালিকারা একসঙ্গে অধ্যয়ন করে, বালকগণের দেখাদেখি বালিকারাও শিক্ষকগণের সঙ্গে ঐ প্রকার ব্যবহার করিতে শিখিবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র বোধ হয় না। একবার আমরা শুনিয়া-

ছিলাম, কলিকাতার এক বন্ধুর বাটীতে একজন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, তিনি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বারমাস মোটা চাদর গায়ে দিতেন, জামা পরিতেন না, চটী জুতা ভিন্ন অন্য জুতা ব্যবহার করিতেন না, গোঁফ রাখিতেন না, মাথায় টিকী রাখিতেন। বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া গৃহস্বামী তাঁহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। বাবুর পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার একটী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা সেই পণ্ডিতের নিকটে ঋজুপাঠ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্য পাঠ করিতেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই ছাত্রী দ্বারা উত্তম উত্তম খাদ্যসামগ্রী ও সুগন্ধি তাম্বূলাদি আনাইয়া সেবন করিতেন। কন্যাটী দিব্য সুন্দরী ছিল; পাঠ দিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় তাহার মুখের দিকে আর দীর্ঘ দীর্ঘ নয়নের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন। কন্যাটী সর্ব্বদা তাহা দেখিতে পাইত না।

পণ্ডিত মহাশয় বৈঠকখানার পার্শ্বগৃহে বসিতেন, কন্যা সেইখানে আসিত; আর কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিত না; বেলা তৃতীয় ঘটিকার সময় কেবল একজন দাসী আসিয়া কন্যাটীকে দুগ্ধ পান করাইয়া যাইত। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা; নিতান্ত অজ্ঞান ছিল না, তাহার বুদ্ধিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল, সংস্কৃত কাব্যপাঠের সময় এক এক স্থলে আদিরসের কবিতা দেখিলে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে তাহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিত; দিব্য সুযোগ পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় সেই সকল স্থলে আরও অধিক নৈপুণ্য দেখাইতেন।

কন্যাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পণ্ডিত রাখা হইয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা সংস্কৃত শাস্ত্রের আদর করিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সেই পণ্ডিতকে বৈঠকখানায় বসাইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল তিনি তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপনে আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। শুনা ছিল, সেই পণ্ডিত মহাশয় বারাণসীধামে কিছু কিছু বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্তের প্রতি বাবুর কিছু বেশী অনুরাগ থাকাতে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার নিকট বেশী সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ছাত্রীর শিক্ষার জন্য তাঁহার মাসিক বেতন ছিল কুড়ি টাকা, বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বাবু তাঁহাকে আরও অতিরিক্ত দশ টাকা করিয়া দিতেন। পণ্ডিতের স্ত্রী, পুত্র; কন্যা কিছুই ছিল না, স্বতন্ত্র একটী বাসা করিয়া তিনি

একাকী থাকিতেন, মাসিক ত্রিশ টাকায় তাঁহার স্বচ্ছন্দে বাসা-খরচ চলিয়া যাইত, তাঁহাকে আর কোন কার্য্য অন্বেষণ করিতে হইত না।

বলা উচিত, বালিকাটী অবিবাহিতা। তাঁহার পিতা বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না; পঞ্চদশ বর্ষের ন্যূনে কন্যার বিবাহ দিবেন না, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। বৈদান্তিক পণ্ডিত ক্রমাগত দুই বৎসর কাল বেলা দশম ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ পঞ্চম ঘটিকা পর্য্যন্ত বালিকাটিকে শিক্ষা দিতেন। বড়মানুষের ঘরে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা সচরাচর যেরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন। যৌবনের অঙ্কুরে দিন দিন বালিকার লাবণ্য বৃদ্ধি পাইতেছিল; ক্ষণে ক্ষণে অনিমেষে পণ্ডিত মহাশয় তাহা দর্শন করিতেন। ছাত্রীকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতে হয়, পণ্ডিত মহাশয় আপন ছাত্রীটীকে তদ্রূপ স্নেহ করিতে ক্রটি করিতেন না; নিকটে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইতেন, কপালে হাত বুলাইতেন, মস্তকের কেশগুলি অবিন্যস্তভাবে কপালে ঝুলিয়া পড়িলে সুবিন্যস্ত করিয়া দিতেন, কপালে অথবা নাসাগ্রে ঘর্ম্ম হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহা মুছাইয়া দিতেন। কন্যাটী এক একবার শিহরিয়া উঠিত। লক্ষ্য করিয়াও পণ্ডিত মহাশয় যেন সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন না।

গ্রহদেবতারা মানুষের প্রতি সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন থাকেন না, দুই বৎসরকাল উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল, সম্মানে সমাদরে উপযুক্ত পারিতোষিকলাভে দুই বৎসর তিনি পরম সুখে ছিলেন, তাহার পর তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। আদর করিতে করিতে একদিন তিনি বালিকাটীকে চুম্বন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় দুগ্ধপাত্র-হস্তে দাসী সেই গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, সে তাহা দেখিতে পাইল; মুখে কিছু বলিল না, দুইবার দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়া কন্যাটীকে দুগ্ধ পান করাইয়া চলিয়া গেল। রাত্রিকালে কন্যার মাতা কন্যাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অধোমুখে কন্যা তখন নীরব হইয়া রহিল। তাহার মৌনাবলম্বনেই গৃহিণী তৎক্ষণাৎ দাসীর কথার সত্যতা বুঝিতে পারিলেন, সেই রাত্রেই সেই কথাটী কর্ত্তার কর্ণগোচর হইল। কর্ত্তা কিছুই বলিলেন না। তিনি বিজ্ঞ, সুবিবেচক, পরিণামদর্শী; তাঁহার যে প্রকার কর্ত্তব্য, পরদিন যথাসময়ে তাহাই তিনি করিলেন। পরদিন ভৃত্যকে তিনি বলিয়া রাখিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় যখন আসিবেন, তাঁহাকে বলিও, অগ্রে যেন তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

বেলা দশম ঘটিকার সময় পণ্ডিত আসিয়া কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আপনার একমাস এগার দিনের বেতন পাওনা হইয়াছে, গ্রহণ করুন। অদ্য হইতে আপনাকে আমি সসম্ভ্রমে বিদায় প্রদান করিলাম—নমস্কার।"

পণ্ডিত মহাশয়ের মুখখানি শুকাইল। সর্ব্বশরীর ঈষৎ কম্পিত হইল। হেতু চিন্তা করিবার অগ্রেই পূর্ব্বদিনের ঘটনাটী তাঁহার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। দ্বিরুক্তি না করিয়া কর্ত্তাকে অভিবাদনপূর্ব্বক টাকাগুলি লইয়া নতমস্তকে তিনি প্রস্থান করিলেন।

ঘটনাটী অনেক দিনের। অধিকবয়স্কা কুমারীগণকে পুরুষ শিক্ষকের নিকটে নির্জ্জনগৃহে শিক্ষাদানের ফলে আর কোথাও ঐরূপ ঘটনা হয় কি না, অনুমান করিয়া তাহা আমরা বলিতে পারিব না। গৃহস্থগণ সতর্ক হইবেন, এই উদ্দেশেই লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এই বিষয়টী আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকের নিকটে পূর্ণবয়স্কা বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার শিক্ষার প্রচলন এই নগরীমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও যে কোন প্রকার অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই বা কে বলিতে পারে? স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু যে প্রণালীতে যেরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক, কন্যাগণের অভিভাবকেরা বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা স্থির করিবেন। আজকাল বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রী তাদৃশ দুষ্প্রাপ্য নহে, তাঁহাদের সাহায্যে কুমারীগণকে উচিতমত শিক্ষাদান করাই আমাদের বাঞ্ছনীয়।

যে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এতৎ-পোষকে তাহাই এ স্থলে বলিব। সে ঘটনাটী কলিকাতায় হয় নাই, মফস্বলে হইয়াছিল। এক জেলার একটী ভদ্রলোক একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আপনার একটী পুত্র ও একটী কন্যাকে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন। পুত্রটী দ্বাদশবর্ষীয়, কন্যাটী দশমবর্ষীয়া। উভয়েই সেই শিক্ষকের নিকট স্কুলপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিত। শিক্ষকটী গৃহস্বামীর প্রিয়-পাত্র, সুতরাং পাঁচ বৎসর ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষাদান করিবার সময় নানাপ্রকার গল্প তুলিয়া ছাত্রছাত্রীকে তিনি শুনাইতেন। মাসেক দুই মাস গল্প শুনিতে শুনিতে ছাত্রছাত্রীদের এতদূর অনুরাগ বাড়িল যে, শিক্ষক আসিলে তাহারা প্রায় পাঠ্যপুস্তক বন্ধ করিয়া রাখিয়া গল্প শুনিতে বসিত, গল্প বলিবার জন্য

শিক্ষককে সর্ব্বক্ষণ উত্তেজনা করিত; শিক্ষকও প্রাচীন প্রাচীন উপকথা বলিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। উপকথাকে সাধারণ লোকে রূপকথা বলে। রূপকথা শুনিতে বালকবালিকাদের বড় আমোদ; রূপকথার ভিতর নানাপ্রকার রস থাকে। সুচতুর শিক্ষক রসপূর্ণ রূপকথাই বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন; বালিকাকে একাকিনী পাইলে সেই রস আরও বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেন। ক্রমে ক্রমে সেই শিক্ষকের প্রতি বালিকাটীর মন মজিয়া গেল; মন মজিলে যাহা হয়, দিনে দিনে তাহারও সূত্রপাত হইতে লাগিল। ভ্রাতা ভগিনী একত্রে থাকিলে রসাভাব চলিত না, এমনও নহে,—চলিত, কিন্তু কিছু চাপা চাপা।

ষোড়শবর্ষীয় ভ্রাতা, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ভগিনী, উভয়েরই আদিরসঘটিত বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছিল। শিক্ষক যখন ভগিনীর সহিত প্রিয়-সম্ভাষণ করিতেন, ভ্রাতা ভগিনী উভয়েরই বদন তখন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিত, উভয়েরই নয়ন-পল্লব মুদিত হইয়া আসিত। লজ্জাশীলা ভগিনী অধোমুখী হইয়া থাকিত কিম্বা আড়ে আড়ে চাহিতে চাহিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইত।

শিক্ষকের সহিত ছাত্রীর এইরূপ ব্যবহার। ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকের নব-প্রেমের সঞ্চার। পঞ্চপাত্র রাখাটা এখন আর ঠিক হয় না; স্পষ্টই বলিতে হইল, উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগের সঞ্চার। এক একদিন উভয়ে অনেক-ক্ষণ নির্জ্জন গৃহে থাকিয়া কত কি পরামর্শ করিত, ভ্রাতা তাহা জানিতে পারিত না। এ সকল কার্য্য অধিক দিন লুকাইয়া রাখা যায় না; কাণাকাণি, ঘুসা-ঘুসি, ক্রমে ক্রমে বাড়ীর লোকের জানাজানি হইল। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে সমস্তই। বাহিরে প্রকাশ না হয়, পরিবারস্থ লোকেরা সে জন্য সর্ব্বদা সাবধান। কন্যার পিতা সেই গ্রামের মধ্যে একটী পাত্র স্থির করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। বরের নাম রঘুনাথ দত্ত, কন্যার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী দাসী, কন্যার পিতার নাম রামলোচন ঘোষ। কন্যার বিবাহের সপ্তাহ পরে এক প্রকার অজ্ঞাত রোগে রামলোচনের মৃত্যু হইল। কন্যা তখন শ্বশুরালয়ে। যিনি তাহাদের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার নাম হরিবিলাস দত্ত। ত্রিপুরাসুন্দরী শ্বশুরালয়ে গমন করিলে হরিবিলাস দুই দিন তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল; দেখা হয় নাই। সদরবাটী হইতেই জলযোগাদি করিয়া হরিবিলাসকে ফিরিতে হইয়াছিল।

বিবাহের পর ছয়মাস। ত্রিপুরাসুন্দরী সেই ছয় মাসের মধ্যে কেবল দুইবার-মাত্র পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। পিতার বাটীর নিকটে হরিবিলাসের বাটী। হরিবিলাসের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী আপনার মনের ভাব তাহাকে জানাইয়া গিয়াছিল; তাহা আর কেহ জানিত না। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের সময়ে ত্রিপুরা যখন পিত্রালয়ে আইসে, তখন হরিবিলাস তাহাকে কি কি কথা শিখাইয়া দিয়াছিল, ত্রিপুরা তাহা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা যখন পিত্রালয়ে আইসে, তখন একজন দাসী সঙ্গে করিয়া হরিবিলাস তাহাকে আনিতে গিয়াছিল। রঘুনাথ দত্তের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন। পুনঃ পুনঃ হরিবিলাসের ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া তাহার চরিত্রের প্রতি রঘুনাথের পিতার কিছু কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। রঘুনাথের সন্দেহ জন্মে নাই, ইহাও মনে করা যায় না।

শেষবার পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে গিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী এক মাসের অধিক কাল সেখানে থাকিতে পারে নাই। একবার তাহার জ্বর হইয়াছিল, চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, নাড়ীতে জ্বরের বেগ যে প্রকার, উপসর্গ ও বাহ্য লক্ষণ তদপেক্ষা অনেক প্রবল। এ জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে বিকারপ্রাপ্ত হইতে পারে। অষ্টাহের মধ্যে বাস্তবিক বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। প্রলাপ বকিবার সময় রোগী বারকতক অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি একটা নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, বাড়ীর লোকেরা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়াও চক্ষে চক্ষে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন দশ দিনের জ্বর, সেই সময় ত্রিপুরার ভ্রাতার সহিত হরিবিলাস দত্ত তাহাকে দেখিতে যায়; যখন যায়, তখন বৈকাল। সেই রাত্রে ত্রিপুরাসুন্দরী যে ঘরে ছিল, সে ঘরে আর দুই তিনটী স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রোগীর কোন প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয় নাই, সে যেন দিব্য সুস্থির হইয়া ঘুমাইয়া ছিল, যাহারা চৌকী দিতেছিল, রোগীকে সুস্থ দেখিয়া শেষ রাত্রে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে প্রকাশ পায়, ত্রিপুরা অদৃশ্য।

জ্বর-বিকারগ্রস্ত বধূ রাত্রিকালে কোথায় পলাইল, বাড়ীর লোকেরা ভাবিয়া অস্থির হইলেন; নিকটে নিকটে এদিক্ ওদিক্ অনেক অন্বেষণ করিলেন, বধূকে কোথাও পাওয়া গেল না। তাহার পিত্রালয়ে সংবাদ গেল, সেখানকার লোকেরাও ভাবিত হইলেন। পাঁচ সাত দিন পরে প্রকাশ হইল, ত্রিপুরাসুন্দরী

কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার পীড়া আরাম হইয়াছে; ভাল ডাক্তার দেখাইবার জন্য হরিবিলাস তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল; ত্রিপুরার ভ্রাতাও সেই সঙ্গে ছিল। রঘুনাথের পিতা মনে করিলেন, বধূর জ্বর-বিকার মিথ্যাকথা, চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, জ্বরের বেগ ততটা অধিক নয়, তাহাতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, রোগটা কেবল ভাণ মাত্র। ইহা বুঝিবার কারণ এই যে, বিবাহের অগ্রে বধূর চরিত্রের কথা পরস্পর কাণা-ঘুসায় একটু একটু তাঁহার কর্ণে উঠিয়াছিল। হরিবিলাস দত্ত কয়েকবার তাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিল; সেই হরিবলাস দত্তই আবার ত্রিপুরাকে চিকিৎসা করাইবার ছলে কলিকাতায় আনিয়াছিল। এই সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মনে সেই সন্দেহটাই প্রবল হইয়া উঠিল। বধূকে তখন আর তিনি গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন না; যে এলাকায় তাঁহাদের নিবাস, সেই এলাকার ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিবার মনস্থ করিলেন। স্বামী বর্ত্তমানে শ্বশুর ফরিয়াদী হইতে পারেন না, অতএব উকীল-মোক্তারের পরামর্শ লইয়া রঘুনাথের দ্বারাই নালিশবন্দী করাইলেন। হরিবিলাস দত্ত তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দাসীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই প্রকার অভিযোগ।

মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। হরিবিলাস আদালতে হাজির হইলেন। প্রত্যক্ষ সাক্ষী একজনও উপস্থিত হইল না, সমস্তই অনুমানের উপর নির্ভর, অবস্থা-ঘটিত প্রমাণে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এ প্রকার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। মোকদ্দমা কিছুদিন মুলতুবী রহিল। হরিবিলাস দত্ত হলপ করিয়া জবাব দিলেন, অভিযোগ মিথ্যা। ত্রিপুরাসুন্দরী দাসী তাঁহার প্রতিবাসীর কন্যা। বিশেষতঃ প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে তাহাদের নিজ বাটীতে পাঠশিক্ষা দিয়াছেন। ত্রিপুরার প্রতি তাঁহার স্নেহ বসিয়াছিল, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার শ্বশুরবাটীতে গিয়া আত্মীয়তা করিয়া আসিতেন; ত্রিপুরার পীড়ার সময়ও সেইজন্য দেখিতে গিয়াছিলেন; ত্রিপুরা স্বয়ং রুগ্নাবস্থায় পিত্রালয়ে আসিলে তাহার ভ্রাতার সহিত তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, বাহির করিয়া আনে নাই।

ত্রিপুরাসুন্দরীকে আদালতে হাজির করিবার জন্য তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে দরখাস্ত হইল, আদালত তাহাকে তলব করিলেন। পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক যে

প্রকারে আদালতে হাজির হইতে পারে, সেই প্রকারে হাজির করিবার জন্য বিচারকের হুকুম হইল, পাল্কী করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী ফৌজদারী কাছারীর বাহিরে উপস্থিত হইল। একজন উকীলকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার জবানবন্দী লইলেন। একজন স্ত্রীলোক তাঁহাদের উভয়ের কথা উভয়কে বুঝাইয়া দিল। ত্রিপুরা বলিল, "হরিবিলাস দত্ত আমার বাল্য-শিক্ষক। অধিক দিন ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে হরিবিলাসের প্রতি আমার ভালবাসা জন্মিয়াছিল। হরিবিলাসকে বিবাহ করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমার পিতাও সেই কথা শুনিয়াছিলেন। হরিবিলাসের সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে, আমার পিতা বংশ-পরিচয় মিলাইয়া তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। হরিবিলাসকেই জামাতা করা তাঁহার অভিপ্রায় হইয়াছিল। তিনি বাগ্‌দান করিয়াছিলেন। তাহার পর জানি না, কি কারণে অন্য বরের সহিত আমার সম্বন্ধ হয়। সে সম্বন্ধে আমার মত ছিল না, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পিতা আমাকে নূতন বরে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। আমার বয়স এখন পঞ্চদশ বর্ষ। হরিবিলাসের ভালবাসা আমি ভুলিতে পারি নাই। জ্বরের সময় শ্বশুরবাটী হইতে আপন ইচ্ছায় আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। আমার ভ্রাতা আমাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল; হরিবিলাসও সেই সঙ্গে ছিল। হরিবিলাস আমাকে বাহির করিয়া আনে নাই, শ্বশুরবাটী হইতে পলায়ন করিবার পরামর্শও হরিবিলাস দেয় নাই; আমি আপন ইচ্ছাতেই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।"

উকীলের জেরাতে ত্রিপুরাসুন্দরী আরও বলে, "হরিবিলাসকে আমি ভালবাসি, পূর্ব্বেও ভালবাসিয়াছিলাম, এখনও ভালবাসি। আমাকে অসতী স্থির করি। আমার স্বামী যদি আমাকে গ্রহণ করিতে না চান, তাহা হইলে আমি আমার স্বামীর গৃহ হইতে স্বতন্ত্র থাকিব, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার পিতা পূর্ব্বে হরিবিলাসের সঙ্গে বিবাহ দিবেন বলিয়া বাগ্‌দান করিয়াছিলেন। আমি লেখাপড়া শিখিয়াছি; বাগ্‌দানে বিবাহ সিদ্ধ হয়, ইহাও শুনিয়াছি। দ্বিতীয় পাত্রে অর্পণ করিয়া আমার পিতা অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। বাগ্‌-দানেই আমার একবার বিবাহ হইয়াছিল, আপনারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া আমার কথা-প্রমাণে যদি বাগ্‌দানকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমার নূতন বিবাহ অসিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিবেন।"

মোকদ্দমা আরও অনেকদূর বাড়িয়াছিল, কিন্তু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইলেন না ; বাগ্‌দানটী সিদ্ধ কিম্বা নূতন বিবাহ সিদ্ধ, তাহারও কোন মীমাংসা করিবার আবশ্যক বুঝিলেন না। তিনি এই মর্ম্মের রায় লিখিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলেন যে,—"ফরিয়াদী শপথ করিয়া এজেহার করিয়াছিল, হরিবিলাস দত্ত তাহার বিবাহিতা পত্নীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে স্ত্রী শপথ করিয়া বলিল, হরিবিলাস তাহাকে বাহির করে নাই, অতএব অভিযোগ অনুসারে এ মোকদ্দমা দাঁড়াইতে পারে না। ত্রিপুরাসুন্দরী দাসী পঞ্চদশবর্ষীয়া, সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কা। সে এখন তাহার আপন ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতে পারে। স্ত্রী বাহির করা মোকদ্দমায় কিছু আর প্রমাণ নাই।"

মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল, রঘুনাথ পরাজিত হইলেন। তিনি আর ত্রিপুরাসুন্দরীকে প্রাপ্ত হইলেন না ; তাঁহার পিতাও সে বধূকে গৃহে লইলেন না। ত্রিপুরাসুন্দরী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া হরিবিলাসের মনোহরণ করিতে লাগিল।

এখন সকলে বিবেচনা করুন, গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া যুবতী কন্যাগণকে তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে। পুরুষ শিক্ষকের নিকটে যুবতীগণের শিক্ষার বিরোধী এ দেশের বিজ্ঞলোক মাত্রেই। যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার বন্ধু, তাঁহারাও কখন ঐরূপ বিসদৃশ পরামর্শ দেন না। গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া বালকগণকে শিক্ষা দিবার পক্ষেও বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়াছে কিম্বা কোন উচ্চ পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করিয়াছে, কেবল সেই সুপারিসেই গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত নহে। বিদ্যার পরীক্ষা অপেক্ষা চরিত্রের পরীক্ষা অগ্রে আবশ্যক। শিক্ষকের চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে, ছাত্রই বলুন কিম্বা ছাত্রীই বলুন, আমাদের সমাজে কেহই কখন চরিত্র শিক্ষা করিতে পারে না। দুটী পাঁচটী ইংরাজী কথা কহিতে শিখিলেই শিক্ষক হইবার উপযুক্ত হয়, এমন যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহদিগকে বারম্বার পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। গৃহে গৃহেই পরীক্ষা হইতেছে। সেই পরীক্ষাগুলিকে সজীব করিবার অভিপ্রায়েই আমরা ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম। দৃষ্টান্ত অনেক আছে, যাঁহাদিগের জন্য দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন তাঁহাদিগের চৈতন্যোদয় হইলেই আমরা তুষ্ট হইব; সমাজেরও মঙ্গল হইবে।

পঞ্চম তরঙ্গ।

পুলিসের ভেল্কী।

পঞ্চতন্ত্রের বিড়াল আপনাকে অহিংসাব্রতাচারী নিরামিষাশী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া, এক আশ্রমতরুবাসী বিহঙ্গগণের আশ্রয় প্রার্থনা করে; পক্ষিগণ চরাও করিতে যাইলে সেই বিড়াল তাহাদের কুলায়বাসী শাবকগুলিকে রক্ষা করিবে, পক্ষীরা রাত্রিকালে যৎসামান্য ফলমূল আনিয়া দিবে, তাহাই ভক্ষণ করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে। পক্ষিগণ সম্মত হইয়া বিশ্বাস করিয়া সেই বিড়ালকে আশ্রয় দিয়াছিল; কার্য্যফল কিরূপ হইয়াছিল, হিতোপদেশগ্রন্থ-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ইংরাজী পুলিসের নিম্ন বিভাগের রক্ষকগণ অনেক স্থলে সেই তপস্বী বিড়ালের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে। অগ্রে আমরা কলিকাতা পুলিসের দুটী একটী কথা বলিয়া তাহার পর বঙ্গ-পুলিসের একটী ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত দেখাইব। কলিকাতার পুলিস নগরের শান্তি-রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত, ইহাই সকলে শুনিয়া আছেন; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, পুলিসের প্রহরীরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অশান্তির সহায়তা করে। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা মিউনিসিপালিটী প্রজালোকের উপকার উদ্দেশ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইন এবং দস্তুর আমল জারী করেন, পুলিসের হস্তে তাহা বিপরীতভাব ধারণ করিয়া থাকে। মনে করুন, কলিকাতার গঙ্গায় যে সকল ভাড়াটিয়া নৌকা নানা স্থানে গতিবিধি করে, লাইসেন্স্ অনুসারে প্রত্যেক নৌকায় যতগুলি আরোহী অথবা যত জনের জিনিস লইবার অনুমতি, পুলিসের চক্ষের উপর দাঁড়ী-

মাঝিরা স্বচ্ছন্দে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বোঝাই লইয়া যায়। পুলিস সন্তুষ্ট থাকিলে কেহই তাহাদের কিছুই করিতে পারে না, অথচ বে-আইনী বোঝাই লওয়াতে মধ্যে মধ্যে মনুষ্যের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, ইহাও সকলে জানেন। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা পান্থ লোকের গতিবিধির ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, ভারবাহী গরুর স্কন্ধে অধিক ভার চাপাইতে না পারে, এইরূপ আইন আছে। যাহারা সেই আইনানুসারে কার্য্য করিবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দেয়, তাহারা তাহা দেখিয়াও দেখে না। কেন দেখে না, তাহার কারণ এই যে, গাড়োয়ানেরা পুলিস-প্রহরীদের পূজা দিতে জানে। আইন যাহা নিষেধ করে, পূজা লইয়া আইন-পাল-কেরা তাহাতে প্রশ্রয় দেয়। প্রহরী অপেক্ষাও যাঁহারা উচ্চক্ষমতা-প্রাপ্ত, তাঁহারাও যৎসামান্য পূজা পাইলে আইন-অমান্যকারিগণকে পালকে ঢাকিয়া রাখেন। কলিকাতামধ্যে গৃহস্থগণের দুগ্ধ প্রায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে, গোয়ালারা দুগ্ধের সহিত অধিক পরিমাণে জল মিশ্রিত করে, পুলিসের কর্ত্তারা তাহা জানিয়া-ছেন। ধরিয়া দিতে পারিলে গোয়ালাগণের জরিমানাও হয়, ইহাও আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। জলমিশ্রণ অপেক্ষা অধিক দৌরাত্ম্য ফুঁকা দেওয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৎসগণকে কসাইয়ের হস্তে বিক্রয় করিয়া দুরাচার নিষ্ঠুর গোয়ালারা গাভীর যোনিপথে ফুঁকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করে, পুলিসের কর্ত্তারা ইহাও জানিয়া-ছেন, ধরিয়া দিতে পারিলে ফুঁকাওয়ালাগণের অধিক পরিমাণে জরিমানা হয়, পুলিসের বিচারের রিপোর্টে তাহাও আমরা মধ্যে মধ্যে পাঠ করি। যে কার্য্য নগরীমধ্যে নিত্য নিত্য চলিতেছে, সেই কার্য্যের পরিচয় দিবার সময় "মধ্যে মধ্যে" বলিতে হইল কেন, এই একটী বিচারযোগ্য সমস্যা। জল না মিশাইয়া নগরের কোন গোয়ালাই দুগ্ধ বিক্রয় করে না। নিত্যই নগরীমধ্যে দুগ্ধ বিক্রীত হয়। নিত্য নিত্য কেন তাহারা ধরা পড়ে না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই। ফুঁকার কারবার নিত্য নিত্য চলে। ফুঁকাওয়ালারা নিত্য নিত্য কেন ধরা পড়ে না, মনে করিলে সকলেরই বিস্ময় জন্মে।

রাত্রি নবম ঘটিকার সময় সহরে আবকারী দোকান বন্ধ থাকিবার কথা; কিন্তু প্রায় সমস্ত রজনী শৌণ্ডিকালয়ের খরিদ্দারেরা বঞ্চিত হয় না। যাহারা ধরা পড়িলে দণ্ড পায়, অপরাধ করিয়া তাহারা ধরা পড়ে না কেন? পুলিসের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতেও তাহা উল্লেখ থাকে না। মিউনিসিপালিটী হইতে বাজারের খাদ্য-

পরীক্ষক ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত আছেন ; তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে, বেতনও নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহারাও পুলিসের ক্ষমতা রাখেন। আমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাই, একজন ইন্‌স্পেক্‌টর পচামাছের ঝুড়ী লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহার পরেই কতিপয় উপাসক সেই ইন্‌স্পেক্‌টরকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, গোপনে গোপনে উভয় পক্ষের অভ্যাসমত কার্য্য হইয়া গেল, আর কোন গোলমাল থাকিল না। তখন আবার পচা, ধসা, গলা, পোকাধরা সমস্তই অবাধে বিক্রীত হইতে লাগিল। একজন ইন্‌স্পেক্‌টর একজন ভারবাহী গোপের একভার দুগ্ধের হাঁড়ী ফেলিয়া দিলেন, গোয়ালা প্রথমে কাঁদিল, তাহার পর চক্ষের জল মুছিয়া সেই স্থানেই প্রায়শ্চিত্ত করিল, আর কোন উৎপাত থাকিল না। যাঁহারা আইন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাঁহারা প্রজালোকের মঙ্গলার্থী, কিন্তু আইনমত কার্য্য হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আইনকে পদতলে দলন করিতেছেন আইন বরং তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে। যাহারা রক্ষক, তাহারা ভক্ষক হইলে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, সহরের অনেক স্থলে অনেক বিষয়ে সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। আইনকর্ত্তাদিগের কোন অপরাধ নাই।

এ সকল বরং সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত, বঙ্গ-পুলিসের যে দৃষ্টান্তটী আমরা দেখাইব, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ইংরাজী ফৌজদারী আইনের মর্ম্ম এইরূপ যে, "শত-করা নিরানব্বই জন অপরাধী যদি মুক্তি পাইয়া যায়, যাউক, একজন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন দণ্ড পায়।"

গোড়ার কথাটী ততদূর সন্তোষকর না হইলেও আইনটী দিব্য পরিষ্কার। আই-নের ঐরূপ সাধু উদ্দেশ্য বাস্তবিক সুসিদ্ধ হইতেছে কি না, তাহার বিচার করিবার অগ্রে অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা বলিতে পারি, সকল স্থলে সুসিদ্ধ হইতেছে না। প্রমাণের গোলযোগে, প্রবল পক্ষের যোগাড়ে, রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষী প্রভাবে অথবা অন্য প্রকার গুহ্য কারণে অনেক স্থলে অনেক নির্দ্দোষ লোক দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেছে। দুই এক মাস কারাবসের কথা দূরে থাকুক, ঐ প্রকার গুহ্য গুহ্য কারণে শতকরা অন্ততঃ দুই পাঁচ জনের ফাঁসী পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে। ভাগ্যফলে কোন কোন কুচক্রজাল হইতে যাহারা পরিত্রাণ পায়, পরিত্রাণের পূর্ব্বে তাহাদের উৎকট যন্ত্রণার সীমা-পরিসীমা থাকে না। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে তাহা সপ্রমাণ হইবে।

ভবতারণ শ্রীমানী বঙ্গের মফস্বলের একজন ভূম্যধিকারী। একটী নদী-তীরের উদ্যানে বৈঠকখানাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেখানে থাকিতেন না, বাবু কেবল নিজের পারিষদ্‌বর্গ-বেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে বিষয়-কার্য্যাদি করিতেন। বাবুর ইংরাজী জানা ছিল না, ইংরাজী শিখিবার জন্য তাঁহার অনুরাগ জন্মে। একজন ভদ্রসন্তানকে তদর্থে মনোনীত করিয়া তিনি সেই উদ্যানবাটীতেই যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। শিক্ষকটীর নাম জীবনবন্ধু মিত্র। দেড় বৎসর সেই মনোরম উদ্যানে বাস করিয়া তিনি ভবতারণ বাবুকে দুই তিনখানি ইংরাজী পুস্তক পড়াইলেন। ভবতারণের বুদ্ধি কিছু মোটা ছিল, পক্ষান্তরে তাঁহার বিলাসবাসনা অত্যন্ত প্রবল ছিল, তিনখানি পুস্তক পাঠ করিয়াও তিনি কিছু শিখিতে পারিলেন না। তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিত, সুতরাং ইংরাজী পুস্তকের প্রতি অটলভাবে মন দিতে পারিতেন না। শিক্ষা হইল না বটে, কিন্তু জীবনবন্ধুকে তিনি বড় ভাল-বাসিলেন। জীবনবন্ধু সচ্চরিত্র, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান, বশংবদ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। জমীদারী বিষয়-কার্য্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ভবতারণ বাবু তাঁহার পরামর্শ লইয়া অনেক কার্য্য করিতেন। পল্লীগ্রামে তাঁহার নিবাস। কিন্তু সেই পল্লীগ্রামের অদূরে শান্তিপুরের তুল্য একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম অথবা ক্ষুদ্র নগর ছিল; সেই স্থানটী মিউনিসিপাল টাউন নামে বিখ্যাত। সেইখানে মিউনিসিপালিটী ছিল, সেই টাউনে ভবতারণের বাসস্থানটী মিউনি-সিপালিটীভুক্ত। ভবতারণ বাবু একজন মিউনিসিপাল কমিশনর ছিলেন। মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই জীবনবন্ধু মিত্রের সৎপরামর্শ এবং সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তদনুসারে কার্য্য করিয়া গ্রামবাসিগণের নিকটে এবং মিউনি-সিপাল-সভাপতির নিকটে তিনি প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। দেড় বৎসরের পর আরও ছয় মাস জীবনবাবু সেই স্থানেই থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ভবতার-ণের এতদূর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন যে, জমীদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। জীবনবন্ধুর নিকটে তিনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জীবনবন্ধু অসম্মত হইলেন। তিনি কহিলেন, তাঁহার উকীল হইবার ইচ্ছা আছে, জমীদারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে আইন অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটিবে, অতএব তিনি এক্ষণে অন্য কোন প্রকার চাকরী স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না।

ভবতারণের ইচ্ছা ফলবতী হইল না বটে, কিন্তু জীবনবন্ধুর অস্বীকারে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন না, পূর্ব্বাপেক্ষা বরং তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবৃদ্ধি হইল। অধ্যয়নকাল ব্যতীত অবকাশকালে জীবনবাবু প্রায় সর্ব্বক্ষণ ভবতারণের নিকটে নিকটে থাকিতেন, দুই ঘণ্টা ইংরাজী পড়াইতেন, প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাসের গল্প বলিতেন, প্রয়োজন হইলে বিষয়কর্ম্মের পরামর্শও চলিত। এই প্রকারে দিন দিন ভবতারণের সংসারে জীবনবন্ধুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ হইল।

ভবতারণ নিজে সকল বিষয়ে সচ্চরিত্র ছিলেন না। তাঁহার একটী উপসর্গ ছিল। জীবন বাবু প্রথম প্রথম তাহা জানিতে পারেন নাই, শেষে জানিয়াছিলেন; কিন্তু একদিনও কাহারও নিকটে সে কথা উত্থাপন করেন নাই। রাত্রিকালে ভবতারণ বাবু কখন্ বাহির হইয়া যাইতেন, কখন্ ফিরিয়া আসিয়া আপন শয্যায় শয়ন করিতেন, জীবন বাবু তাহা জানিতে পারিতেন না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বাবুকে নিজশয্যায় দেখিতে পাইতেন; বাবুর মনেও কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিত না।

ভবতারণের তিনজন মোসাহেব ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, সে ব্যক্তির নাম জটাধারী সরকার। লোকটা গণ্ডমূর্খ, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান ছিল না; অত্যন্ত গোঁয়ার, দেখিতেও কদাকার। আকারের সহিত ভবতারণের কোন সম্বন্ধ ছিল না, কার্য্য লইয়াই কথা। জটাধারীর দ্বারা তাঁহার গুপ্তকার্য্যের সবিশেষ সহায়তা হইত। রাত্রিকালে ভবতারণ যেখানে যাইতেন, জটাধারী সরকার সেখানকারও সরকার ছিলেন। সেখানকার সমস্ত কার্য্য জটাধারী সর্ব্বদা সন্তোষের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া দিত। আড়তের হিসাব, মুদীর হিসাব, স্বর্ণকারের হিসাব, বিচালীওয়ালার হিসাব সমস্তই জটাধরীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহাতে তাহার বেশ দশ টাকা উপরি-লাভ হইত। তাহা ছাড়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জটাধারী মধ্যে মধ্যে এক একটা কুৎসিত কার্য্যে প্রলোভন দেখাইয়া বাবুর সন্তোষ উৎপাদন করিত; বাবুও তাহার পরামর্শমতে কতক কতক কার্য্য করিতেন। মোসাহেব লোকেরা সর্ব্বদা বাবুলোকের কাছে কাছে থাকিতে ভালবাসে; গদীর উপর জানু রাখিয়া, তাকিয়ার একধারে কণুই রাখিয়া, বাবুর কাণে কাণে কথা কহে। সেই ধরণের মোসাহেব ঐ জটাধারী সরকার।

ডাক্তারী, মোক্তারী, ওকালতী ও দারোগাগিরী প্রভৃতি পরীক্ষার ন্যায় মোসাহেবী পরীক্ষা আছে। মোসাহেবী পরীক্ষার প্রণালী বোধ হয় সকলে অবগত নহেন। এক বাবুর একটী মোসাহেব প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বাদশজন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়। এগার জন একে একে পরীক্ষা দিল, একজনও বাবুর মনোনীত হইল না। বাবু তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি পারিবে?" প্রত্যেকেই উত্তর দিয়াছিল, 'আজ্ঞা হাঁ, পারিব।' বাবু দ্বিতীয়বার বলিয়াছিলেন, "না, তুমি পারিবে না।" মোসাহেবেরা সকলেই বলিয়াছিল, "আজ্ঞা হাঁ, অবশ্যই পারিব।" দুইজন আরও কিছু বেশীদূর অগ্রসর হইয়া দম্ভসহকারে বলিয়াছিল, "আমরা নবদ্বীপের রাজসভায় ছিলাম, বর্দ্ধমানের রাজদরবারে ছিলাম, মেদিনীপুরের রাজসভায় ছিলাম; প্রশংসাপত্র প্রয়োজন হইলে আনিয়া দেখাইতে পারি।" বাবু তাহাদিগের সকলকেই অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলেন। বাকী রহিল কেবল একজন। বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, তুমি পারিবে?" মোসাহেব উত্তর করিল, 'আজ্ঞা হাঁ, আমি পারিব।" মস্তকসঞ্চালন করিয়া বাবু কহিলেন, "না না, তুমি পারিবে না। তোমার চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, কখনই তুমি পারিবে না।" মোসাহেব তখন বাবুর ন্যায় মস্তকসঞ্চালন করিয়া বলিল, 'আজ্ঞা না, কখনই আমি পারিব না।' বাবু সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে। তুমিই পারিবে।" বাস্তবিক সেই লোকটী সেই বাবুর মোসাহের নিযুক্ত হইয়াছিল। বাবু যখন বলিলেন পারিবে, সে তখন বলিয়াছিল পারিব। বাবু যখন বলিয়াছিলেন, তুমি পারিবে না, সে তখন বলিয়াছিল, আজ্ঞা না, কখনই পারিব না। বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করাই মোসাহেবের গুণ। যে ব্যক্তি প্রতিধ্বনি করিল, সেই ব্যক্তিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সেই ধরণের মোসাহেব ঐ জটাধারী সরকার।

জীবনবন্ধু মিত্রের তখন শনির দশাভোগ হইতেছিল। ঝাড়ন্ত শনি। ভবতারণের নিকটে তিনি প্রতিপত্তিলাভ করিলেন, ভবতারণ তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিতে লাগিলেন, ভবতারণ তাঁহাকে ভালবাসিলেন, তিনিও সর্ব্বদা ভবতারণের নিকটে নিকটে থাকিতে লাগিলেন। জটাধারীর পসার কমিয়া আসিবার উপক্রম হইল, সে আর বাবুর কর্ণে মন্ত্র দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না, ইষ্টসিদ্ধির

ফিকির করিতে পারে না, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল। জীবনবন্ধুর উপরে তাহার মহা আক্রোশ জন্মিল। কিসে তাঁহাকে সে স্থান হইতে দূর করিতে পারে, কিসে তাঁহার দুর্নাম রটাইতে পারে, কিসে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিতে পারে, অহরহঃ সেই জন্য তাঁহার ছল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

দুই তিন মাস গেল, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কোন প্রকার কলঙ্ক আরোপ করিবার সুবিধা পাইল না, জটাধারী কেবল অন্তরে অন্তরে ফুলিতে লাগিল। জীবনবন্ধুর সঙ্গে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে প্রকার সাদা সাদা কথা কহিত, সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাঁকা বাঁকা কথা কহিতে আরম্ভ করিল। কথা কহিবার সময় হাস্য করা তাহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু এই সময় অবধি জীবনবন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতে হইলে অগ্রে হাস্য করিয়া তাহার পর কথা আরম্ভ করিত। কথায় কথায় হাস্য, দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্তে হাস্য, কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রে হাস্য, হাসির কথা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হাস্য, কেবল হাস্যতরঙ্গ ভিন্ন অন্য তরঙ্গ জটাধারীর মুখে তখন আর খেলা করে না। এক একবার জীবনবন্ধুর সঙ্গে আত্মীয়তা দেখায়, এক একটা কথায় তাঁহার প্রশংসা করে, যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, তজ্জন্য বাবুকে অনুরোধ করিবে, এইরূপ আশ্বাস দেয়। জীবনবন্ধু চুপ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব হইতেই জীবনবন্ধু সেই লোকটীর প্রকৃতি বুঝিয়াছিলেন, অকারণে লোকের মন্দ করিতে তাহার পরমানন্দ, লোকের ভাল হইতে দেখিলে মুখে হাস্য করে, ভিতরে ভিতরে বুক ফাটে, ভাল লোকের ছল অন্বেষণ করে, ইহা তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার উপরেও শত্রুতা জন্মিয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতেন। সাবধান হইয়াও কোন ফল হইল না।

গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাসের অবসানপ্রায়। বাবুর সেই উদ্যানটী বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে সুসজ্জিত। বৈশাখ মাসে বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুল ধরিয়াছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কতকগুলি পক্ষী উড়িয়া আসিয়া উদ্যানের উচ্চ উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, দুই একটী পক্ষী মধুরস্বরে গান করিতেছে। দিবা অবসান। সেই সময় উদ্যানের উত্তরপ্রান্তে প্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপর ভবতারণ বাবু পাঁচজন বন্ধুবান্ধব লইয়া মজলীস করিয়াছেন, দুইজন চাকর, দুই ধারে দাঁড়াইয়া দুইখানা

বৃহৎ বৃহৎ আড়ানী দ্বারা বাতাস করিতেছে, সারি সারি চারি পাঁচটা বাঁধা হুঁকা পড়িয়াছে, হুঁকার ধূমের সুগন্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়াছে, একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা সহসা সেইখানে উপস্থিত হইয়া বাবুর তাকিয়ার নিকটে কতকগুলি চাঁপাফুল রাখিয়া গেল। বাবু সেই ফুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে বলে চাঁপাফুলের মধু নাই, সে কথাটা আমার সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যে ফুলের মধু থাকে না, সে ফুলে সুবাস পাওয়া যায় না। চাঁপাফুলে দিব্য সুগন্ধ; লোকের কথাটা তবে কি প্রকারে সত্য বলিয়া মানি?"

মজ্‌লীসে একজন অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। অনেকগুলি প্রাচীন কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিল, একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া বাবুকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, চাঁপাফুলে ভ্রমর বসে না, চাঁপা সেই দুঃখে ক্রন্দন করিতেছিল, কবি তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "কেন চাঁপা, তুই কাঁদিস্ কেন? ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ, তোর ঐ স্বর্ণ-অঙ্গে কৃষ্ণ ভ্রমর বসিতে পারে না, সেই জন্যই বসে না, তাহাতে তোর দুঃখ কি? সুন্দরী সুন্দরী কৃষ্ণনয়না কৃষ্ণ-কুন্তলা কামিনীকুল পরম সমাদরে তোরে কবরী-বেষ্টন করিয়া মাথার উপর স্থান দেয়, তাহা অপেক্ষা কি ভ্রমরের গৌরব অধিক?"

ভবতারণ বাবু হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভ্রমর বসে না বলিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত করেন—চাঁপা-ফুলের মধু নাই। আমরা দেখিতে পাই, অনেকগুলি সুন্দর পুরুষ বিদ্যা-ভূষাবিবর্জ্জিত। তাহাদের রূপ দেখিয়া লোকে বিমোহিত হয়, কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাহাদিগকে বিষধর সর্প অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর মনে হয়। কতকগুলি সুন্দরী রমণী বিষধরী ভুজঙ্গিনী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী।"

মজ্‌লীসে জীবনবন্ধু ছিলেন, তিনি ঐ সকল কথা কতক কতক শুনিয়াছিলেন; অধ্যাপকের কবিতাটীও তিনি শুনিলেন, চাঁপা-ফুলের বর্ণনাও শুনিলেন, বাবুর বক্তৃতাটীও শুনিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গল্পের, কবিতার, বক্তৃতার পরস্পর কি সঙ্গতি আছে, অনেকক্ষণ তিনি ভাবিলেন, ভাবিয়াও কিছু স্থির হইল না, আকাশপানে চাহিয়া তিনি যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল, জটাধারী সেখানে ছিল না, জীবনবন্ধুর যখন সেই প্রকার ভাব, সেই সময় দক্ষিণদিক্ হইতে কতই যেন উল্লাসে হাসিতে

হাসিতে জটাধারী দ্রুতপদে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জটাধারীর প্রতি একবারমাত্র চাহিয়াই জীবনবন্ধু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে জটাধারী সরকার বাবুর তাকিয়ার নিকটে হেলিয়া বসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি কতকগুলি কথা বলিল, জীবনবন্ধুর দিকে কটাক্ষ-পাত করিয়াই বাবু শিহরিয়া উঠিলেন জীবনবন্ধু তাহা দেখিলেন, কারণ বুঝিলেন না, কিন্তু মনে মনে কোন প্রকার কুতর্কের উদয় হইতে লাগিল। মজ্‌লীসে সর্ব্ব-বদনে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি। "কি নিষ্ঠুর ব্যাপার! এমন কাণ্ডও মানুষে করিতে পারে? স্ত্রীলোকের উপর এতদূর দৌরাত্ম্য? মানুষ চিনিতে পারা বড়ই কঠিন ব্যাপার! যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করা যায়, তাহার পেটে যে কালকুট হলাহল লুক্কায়িত থাকে, কিরূপে তাহা জানা যাইবে?"

জটাধারী সরকার দুই তিন বার জীবনবন্ধুর দিকে ভ্রূকুটিভঙ্গীতে দৃষ্টিপাত করিল; যাঁহারা গুঞ্জনধ্বনি করিলেন, তাঁহারাও যেন সঘৃণ সক্রোধ নয়নে জীবনবন্ধুর দিকে দুই তিনবার কটাক্ষবর্ষণ করিলেন। জীবনবন্ধু সেইরূপ অভিনয়ের ভাবভক্তি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। চাঁপাফুলের প্রসঙ্গে ইতি-পূর্ব্বে যেরূপ অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে যেরূপ গোলমাল ঠেকিয়াছিল, এই শেষোক্ত অভিনয়ে তদপেক্ষাও অধিক গোলমাল। সকলেই কথা কহিলেন, সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু জীবনবন্ধুকে কেহই কিছু বলিলেন না। ভবতারণ বাবু প্রায় সকল কথাতেই জীবনবন্ধুকে মধ্যস্থ মানিতেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি একটীবারও তাঁহাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলেরই চক্ষু এক একবার জীবনবন্ধুর দিকে ঘূরিল, কিন্তু সেই সকল চক্ষুর ভাব জীবন-বন্ধুকে বড় ভাল লাগিল না, তিনি আর অধিকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে পারি-লেন না, উন্মনা হইয়া আসন হইতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়াই তিনি মন্থরগমনে দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলেন, উদ্যান হইতে বাহির হইলেন।

ইহার পর যে যে ঘটনা হইয়াছিল, জীবনবন্ধু বাবুর নিজ মুখেই তাহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। যাঁহারা তাহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই চমকিয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই। যে ঘটনার পর যে ঘটনা, ঠিক ঠিক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আমরা আমাদের নিজের ভাষাতেই তাহা পাঠকমহাশয়গণকে শ্রবণ করাইব।

অস্পষ্ট অভিনয়ের পর জীবনবন্ধু উদ্যানবাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, উদ্যানে কেহই নাই, মজ্‌লীস ভঙ্গ হইয়াছিল, হুঁকা, তাকিয়া আর সেই চাঁপাফুল-গুলি পূর্ব্বোক্ত বেদীর উপরেই পড়িয়া ছিল; চাকরেরা [illegible] চাকরেরাও কেহ তখন বাগানবাড়ীতে উপস্থিত ছিল না, বাগান তখন জনমানব-শূন্য। বাবুর উপবেশন গৃহের বামে ও দক্ষিণে দুটী সুন্দর সুন্দর চান্‌কা। জীবন-বন্ধু একটী চান্‌কার মধ্যে অন্যমনস্কভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন; কি শুনিয়াছেন, কি ঘটিয়াছে, বাবুরা কে কোথায় গেলেন, এক একবার মনোমধ্যে সেই চিন্তা আসিতেছে, এক একবার পরিক্রমণে ক্লান্ত হইয়া চিন্তাকুলবদনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন, এক একবার দুই একটী কুসুম চয়ন করিয়া শ্লথহস্তে নাসাগ্রে লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু আঘ্রাণ পাইতেছেন না, এতদূর অন্যমনস্ক। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল, জীবনবন্ধু আকাশপানে চাহিলেন, চন্দ্র দর্শন করিলেন, চন্দ্রও যেন তাঁহার চক্ষে তখন মলিন মলিন দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রের উপর দিয়া কিম্বা নীচে দিয়া তরল শুভ্র মেঘমালা চলিয়া যাইতেছে, চন্দ্র যেন রথচক্রের ন্যায় গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছেন, জীবনবন্ধুর তখন এইরূপ মনে হইল। আর কিয়ৎক্ষণ তিনি সেই স্থানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন, আবার দাঁড়াইলেন, মনে যেন কিছুমাত্র সুখ নাই। কি যে অসুখ, তাহা তিনি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। গন্ধরাজ বৃক্ষ হইতে একটী প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ-কুসুম তুলিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চন্দ্রকিরণে সেইটা দর্শন করিতেছেন, এমন সময় কিঞ্চিৎ দূরে দুটী লোকের কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; তাহারা যেন পরস্পর কথা কহিতে কহিতে বৈঠক-খানার দিকে আসিতেছে, এইরূপ তিনি বুঝিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই দুটী লোক সেই চান্‌কার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু ভবতারণ আর তাঁহার প্রিয় মোসাহেব জটাধারী। চান্‌কার মধ্যে জীবনবন্ধু ছিলেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না, সেইখানে তাঁহারা দাঁড়াইলেনও না, যেমন চলিয়া আসিতে-ছিলেন, সেই ভাবে চলিয়া চলিয়া বৈঠকখানার সিঁড়িতে গিয়া উঠিলেন। জটা-ধারীর মুখে কি কি কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, সকলগুলি জীবনবন্ধু শুনিতে পান নাই, কেবল এইটুকু মাত্র শুনিয়াছিলেন যে, জটাধারী বলিয়াছিল "ভয়ঙ্কর লোক! এইবার উচিতমত শিক্ষা হইবে!"

কাহার উদ্দেশে জটাধারীর ঐরূপ মন্তব্য, কোন্ ব্যক্তি ভয়ঙ্কর লোক, কোন্ ব্যক্তি এইবার উচিতমত শিক্ষা পাইবে, জীবনবন্ধু তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্ত কিন্তু বিচলিত হইল। মোসাহেবের সঙ্গে বাবু গিয়া বৈঠকখানায় উঠিলেন, জীবনবন্ধু সেই চানকাতেই রহিলেন; প্রচ্ছন্ন ছিলেন না, কিন্তু কল্প হইল যেন প্রচ্ছন্ন। বাবু বৈঠকখানায় উঠিয়া বারান্দায় একখানি কৌচের উপর বসিলেন, পার্শ্বের একখানি চেয়ারে জটাধারী। বাবু কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। গলা মোটা, রাগ-তাল-বোধও অল্প, কিন্তু এক এক সময় আপন মনে দুটী একটী গীত গাইয়া আমোদ অনুভব করিতেন। মোসাহেব হইতেই ইহার হয়; বাবু যাহা করেন, মোসাহেব তাহার অনুকরণ করে; বাবু যেরূপ চলেন, মোসাহেব সেইরূপ চলনের ভঙ্গী অভ্যাস করে; বাবু যে সুরে কথা কহেন, মোসাহেব সেই সুরে গলা সাধে; এইরূপ সকল কার্য্যেই অনুকরণের চেষ্টা। বাবু গীত গান, সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেবও গীত গায়। চানকায় দাঁড়াইয়া জীবনবন্ধু শুনিলেন, ভবতারণ বাবু একটী পুরাতন গীত ধরিলেন; শানায়ের পোঁ-ধরা লোকের ন্যায় জটাধারীও সেই গানের সুরে যোগ দিতে লাগিল। গীতটী এইরূপ :—

ঝিংলা—পোস্তা।

যারে রত্ন ভেবে, যত্ন করে রাখ্‌লেম এত দিন।
কে জানে সে গিল্টি করা ভিতরে ভরা টীন॥
সোণা ব'লে জ্ঞান ছিল, কসিতে পিতল হইল,
এক পোড়েতে চ'টে গেল, এম্নি বস্তুহীন, বেটা এম্নি বস্তুহীন॥

গীতটী শ্রবণ করিয়া জীবনবন্ধুর মন চঞ্চল হইল; তিনি ধীরে ধীরে বৈঠকখানার বারান্দায় গিয়া উঠিলেন। তখনও গীত চলিতেছিল, জীবনবন্ধু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র গীত থামিল। বাবু একটীও কথা কহিলেন না, জটাধারীও নিস্তব্ধ।

জীবনবন্ধুর চিত্ত আরও চঞ্চল। যিনি তাঁহাকে তত ভালবাসেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ হইতে তিনি যে প্রকার উদাসীন, তাহাতে ত চাঞ্চল্যবৃদ্ধি হইবারই কথা। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল তিনি সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভবতারণ বাবু তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না, জটাধারী যেন

কতই আনন্দে গুঞ্জনস্বরে কি একটা রাগিণী ভাঁজিতে লাগিল। জীবনবন্ধু ঐরূপ ভাবের কিছুমাত্র অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া সম্মুখের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত গৃহটী পাটাতনে মোড়া, পাটাতনের উপর সতরঞ্চি, তাহার উপর ফুলকাটা জাজিম, জাজিমের উপর এগারটী তাকিয়া জীবনবন্ধু একটী তাকিয়ায় মস্তক রাখিয়া, একটী তাকিয়া পার্শ্বে রাখিয়া নিঃশব্দে শয়ন করিলেন; নিদ্রার নিমিত্ত শয়ন নহে, অনিশ্চিত বিষয়ের চিন্তা করিবার নিমিত্ত। কত কি যে তখন তিনি ভাবিলেন, তিনি নিজেই তাহার সঙ্গতি রাখিতে পারিলেন না। অল্পে অল্পে চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল, যেন তন্দ্রার আবির্ভাব। সেই ভাব প্রায় দশ মিনিট। সেই ভাবে তিনি আছেন তন্দ্রায় যেমন স্বপ্ন হয়, তাঁহার মানসিক চিন্তাগুলি যেন সেইরূপ স্বপ্ন জানাইয়া দিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার মাথার বালিসের কাছে একটী লোকের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। স্বর বলিল, "কাশীতে মেথর বড় সস্তা।"

চমকিত হইয়া জীবনবন্ধু পাশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দক্ষিণদিকের চৌকাঠ পার হইয়া একটা লোক চলিয়া যাইতেছে। লোকটা জটাধারী সরকার।

জটাধারী ঐ কথাটা বলিবার জন্য কেন তাঁহার বিছানার উপর বসিয়াছিল জীবনবন্ধু তাহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ হইতে উদ্যান মধ্যে যে প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত অভিনয় চলিয়া আসিতেছিল, কোন বিষয়েই তিনি লিপ্ত নহেন, তথাপি সেই সকল অভিনয়ের গুহ্যতত্ত্ব চিন্তা করিয়া এক একবার তাঁহার হৃৎকম্প হইতেছিল। বাবুরা গীত গাহিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর কাশীতে মেথর সস্তা, জটাধারীর মুখে সেই কথা শুনিলেন কথাটা বলিয়াই জটাধারী পলাইল। ব্যাপার কি? এক চিন্তার উপর জীবন বন্ধুর অন্তরমধ্যে অন্য চিন্তার অবির্ভাব। চিন্তা সর্ব্বদাই চঞ্চলা, চিন্তার ক্রিয়া গুলিও চঞ্চলা, নিজেও তিনি চঞ্চল।

রাত্রি প্রায় দশটা। আহারের আয়োজন হইল। অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে বলিয়া জীবনবন্ধু সে রাত্রে কিছুই আহার করিলেন না; বারম্বার নিদ্রাকে আহ্বান করিলেন, নিদ্রা আসিল না। ভবতারণবাবু প্রভৃতি রজনীতে জীবনবন্ধু সহিত একগৃহে শয়ন করেন, সে রজনীতে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন না

দরোয়ানেরা সচরাচর যেরূপ খাটিয়ায় শয়ন করে, বারান্দায় সেইরূপ একখানি খাটিয়া পাড়িয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। জটাধারী কোথায় গেল, জানা গেল না। খাটিয়ায় শয়ন করিয়া ভবতারণ বাবু আপন মনে মিহি সুরে গুটীকতক গীত গাহিলেন, সকল গীতের অর্থই বাঁকা বাঁকা। রাত্রিকালে তাঁহার বাহিরে ভ্রমণ করিতে যাওয়া অভ্যাস, সে রাত্রে কিন্তু তিনি বাহির হইলেন না। রাত্রি দুই প্রহরের পর বাবু নীরব হইলেন, বোধ হয় ঘুমাইলেন। জীবনবন্ধু কিন্তু একবারও চক্ষের পাতা বুজিতে পারিলেন না।

রজনীপ্রভাত হইল। বাবু উঠিয়া বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া আলবোলা টানিতে লাগিলেন। মুখে বাক্য নাই। জীবনবন্ধু তামাক খান। চাকরেরা প্রতিদিন উষাকালে বাবুকে আর জীবনবন্ধুকে একসঙ্গে তামাক দিয়া যায়; সেদিন বাবু তামাক খাইতে লাগিলেন, জীবনবন্ধুর খোঁজ হইল না। শুইয়া শুইয়া জীবনবন্ধু শুনিলেন, কৃপারাম নামে একজন চাকর সর্দার চাকরকে বলিতেছে, "জীবনবন্ধুকে তামাক দেওয়া হইল না?" একটু হাসিয়া সর্দার বেহারা বলিল, "আর কেন জীবন বাবুর কথা? জীবন বাবুর দফা ত রফা হয়ে গিয়েছে।"

স্পষ্ট স্পষ্ট ঐ কথাগুলি জীবনবন্ধুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার বিস্ময় বাড়িল। কি অপরাধ তিনি করিয়াছেন, কি অপরাধে তাঁহার দফা রফা হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়, এমন লোক তিনি দেখিতে পাইলেন না। কাশীতে মেথর সস্তা, চুপি চুপি সেই কথা বলিয়া জটাধারী চলিয়া যাইবার পর সমস্ত রাত্রির মধ্যে কেহই আর সে ঘরে প্রবেশ করে নাই; প্রাতঃকালেও কেহ আসিল না। প্রতিদিন প্রভাতে ভবতারণ বাবু আদর করিয়া জীবনবন্ধুকে ডাকেন, সে দিন আর তাঁহার মুখে জীবনবন্ধুর নাম গন্ধও কেহ শুনিল না।

রৌদ্র উঠিল। বৈঠকখানার চারি পাঁচটী দ্বার। সমস্ত দ্বার অনাবৃত, গৃহমধ্যে রৌদ্র আসিল। জীবনবন্ধু সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন, সকালেও জাগিয়া আছেন গায়ে রৌদ্রের উত্তাপ লাগিতেছে, তথাপি শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেছেন না। বাবু একবার আপনা আপনি সক্রোধ-গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "টেনে আন্,—টেনে আন্! বা হয় ক'রে ফেল্!"

কাহাকে টানিয়া আনিবার হুকুম, কাহাকে বাহির করিয়া ফেলিবার হুকুম, কাহার প্রতি হুকুম, তাহা প্রকাশ হইবার অগ্রেই বাবু আসন হইতে উঠিয়া

ধর-ধর গতিতে বারান্দা হইতে নামিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চাকরেরা কে কোন্ দিকে থাকিল, জীবনবন্ধু তাহা জানিলেন না। নেত্রমার্জ্জন করিয়া তাকিয়াটী ঠেস্ দিয়া তিনি একটু উঁচু হইয়া বসিলেন; পশ্চিমের দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন ফরিঙ্গী। মিট্‌মিট্ করিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া সেই ফিরিঙ্গী দুই তিনবার হাতছানি দিয়া জীবনবন্ধুকে বাহিরের দিকে ডাকিল; কথা কহিল না। জীবনবন্ধুও শয্যা হইতে উঠিলেন না। ফিরিঙ্গী তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের আস্তিন গুটাইয়া সেই হাতখানা ঘরের দিকে বাড়াইয়া দিল;—ইংরাজী ভাষায় বলিল, "Examine my pulse."

জীবনবন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ফিরিঙ্গীটা তাঁহাকে তাহার নাড়ী দেখিতে বলিতেছে; বুঝিতে পারিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় বলিলেন, "আমি ডাক্তার নহি, আমি নাড়ী দেখিতে জানি না।" ফিরিঙ্গী তথাপি হস্তসঙ্কেতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে ডাকিল, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া তিনি চৌকাঠের নিকটে আসিলেন; হাত দেখাইবার সঙ্কেতে ফিরিঙ্গী পুনর্ব্বার তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁহার হাতখানা ধরিলেন। নাড়ীজ্ঞান না থাকিলেও অনেক বুদ্ধিমান্ লোক মানুষের নাড়ীর স্বাভাবিক গতি বুঝিতে পারেন, দুই তিনবার হাত টিপিয়া টিপিয়া ফিরিঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া জীবনবন্ধু বলিলেন, "তোমার নাড়ীতে কোন প্রকার বিকার নাই, তুমি বেশ আছ।"

ফিরিঙ্গী তখন হাস্য করিয়া বক্র-নয়নে অনেকক্ষণ ধরিয়া জীবনবন্ধুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, আর কোন কথা বলিল না; মস্ মস্ শব্দে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল, খানিকদূর গিয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ আর একটা পেন্সিল বাহির করিয়া আর একবার জীবনবন্ধুর দিকে ফিরিঙ্গী চাহিল, থর্ থর্ করিয়া সেই কাগজে কি কি কথা লিখিয়া লইল, পরক্ষণেই অদৃশ্য।

ভবতারণ বাবু ফিরিয়া আসিলেন, স্নান করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, সর্দ্দার বেহারাকে বলিলেন, "তোদের জীবনবাবুর মাথায় আধসের ফুলেল তেল ঢেলে দে। আহা! হঠাৎ ঐ বাবুটীর মাথা গরম হয়েছে, সাত কলসী জল ঢেলে দে, বড় বড় ডাব পেড়ে এনে একটা বড় পাত্রে সব ডাবের জল একত্র ঢেলে ঢক্ ঢক্ ক'রে খাইয়ে দে। না না,—থাক্ থাক্,—রোস্ রোস্,—আগে একটা নাপিত ডেকে আন্, মাথাটা মুড়িয়ে দে।"

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য নামে একজন পণ্ডিত বাবুর আশ্রয়ে বাস করেন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী ছিলেন। ললিত রাগিণীতে একটী গাত গাহিতে গাহিতে সেই সময় তিনি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বাবুও তাঁহার সঙ্গে সেই রাগিণী ধরিলেন। গীতটী সমাপ্ত হইবার অগ্রেই জীবন-বন্ধুর সম্বন্ধে নানাকথা তুলিয়া বাবু সেই পণ্ডিতটীকে কিছু বিষণ্ণ করিয়া দিলেন। বিষণ্ণ করিয়া দেওয়া কেন বলা গেল, তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়। জীবনবন্ধু দুই বৎসরের অধিক কাল সেই আশ্রমে আছেন, বাবুর আমলাবর্গ, পারিষদবর্গ, পণ্ডিতবর্গ, ভৃত্যবর্গ, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করেন, হঠাৎ জীবনবন্ধুর মাথা খারাপ হইয়াছে, বাবুর মুখে সেই কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ পণ্ডিত বিষণ্ণ হইলেন।

স্নানের আয়োজন। জীবনবন্ধুর স্নানের ব্যবস্থা যে প্রকার হইতেছিল, বাবু তজ্জন্য যে হুকুম করিয়াছিলেন, সত্য সত্য সে হুকুম তামিল হইল না, জীবনবন্ধু নিত্য যেরূপে স্নান করিয়া থাকেন, সেইরূপে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। কাপড় ছাড়িবার বিভ্রাট। বাবুর প্রিয়পাত্র শিক্ষক, কাপড়ের অভাব ছিল না, চারি পাঁচ জোড়া কাপড় প্রস্তুত, কিন্তু সেদিন চাকরেরা তাঁহাকে একখানিও কাপড় দিল না। বাবু বলিলেন, "তোদের যদি ছেঁড়া কাপড় থাকে, তাই একখানা এনে দে।"

জীবনবন্ধু অনেকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিলেন, শেষকালে সর্দ্দার বেহারা একখানা ছেঁড়া কাপড় আনিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি কাপড় ছাড়িলেন, ভিজা কাপড়খানা সেইখানে পড়িয়া থাকিল, কেহই তাহা স্পর্শ করিল না। বাবুর পূর্ব্ব-হুকুমের একটী কথা সেইখানে পালিত হইল। সর্দ্দার বেহারা দুটী ডাব কাটিয়া জীবনবন্ধুকে জল খাওয়াইল। সমস্তই অন্ধকার, জীবনবন্ধু যে বিষয়টী চিন্তা করেন, সেইটীতেই গোলমাল ঠেকে, একটীরও মীমাংসা খুঁজিয়া পান না।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, চারি পাঁচজন আমলা সেইখানে আসিল, সকলেরই মুখ ভার। জীবনবন্ধুকে দেখিবামাত্র যাঁহারা সহাস্যবদনে আলাপ করিতেন, তাঁহারা কেবল চঞ্চল-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। দুইজন মোসাহেব আসিল, তাহারা জীবনবাবুর চক্ষু

নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর-বদনে কহিল, "সত্যই ত বটে! চক্ষু দুটী ভয়ানক লাল হইয়াছে, অকস্মাৎ এমন ভাব কেন হইল, বুঝা যাইতেছে না।" একজন বলিল, "ভূতে পাইয়াছে।" বাবু উরু চাপ্‌ড়াইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেই কথাই ঠিক। চাঁপাফুলের গাছে ভূত থাকে, কল্য সন্ধ্যার সময় জীবনবাবু চাঁপাতলায় বসিয়াছিল, ভূত নামিয়া আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে।"

অনেকে অনেক রকম মন্তব্য দিল, সকলের কথাতেই বাবু হাসিয়া হাসিয়া আমোদ করিলেন। অধোবদনে জীবনবন্ধু ম্রিয়মাণ। একে একে সেইখানে অনেকেই আসিল, অনেকেই জীবনবন্ধুর জন্য আপ্‌শোষ করিল, তাহার পর সকলেই স্নান করিতে চলিয়া গেল। জটাধারী আসিল না।

বাবু স্নান করিয়া রুদ্রাক্ষমালা লইয়া পূর্ব্বকথিত বেদীর উপর জপ করিতে বসিলেন, জীবনবন্ধু বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ১১টা, সেই সময় আর একজন ফিরিঙ্গী আসিল। প্রাতঃকালের ফিরিঙ্গী শ্বেতবর্ণ, এখনকার ফিরিঙ্গীটা কৃষ্ণবর্ণ। বাবুর নিকটে না গিয়া জীবনবন্ধুর নিকটে আসিয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ ফিরিঙ্গী অগ্রে একটা সেলাম দিল, তাহার পর আপনার পেটে দুইবার হাত বুলাইল। জীবনবন্ধু ভাবিলেন, লোকটা হয় ত বোবা, ক্ষুধা হইয়াছে, হয় ত কিছু খাইতে চায়, ইঙ্গিতে তাহাই জানাইতেছে। মনে মনে এইরূপ অনুমান করিয়া ফিরিঙ্গীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

লোকটা বোবা ছিল না, প্রশ্নের উত্তরে বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথায় বলিল, "খিচুড়ী খাইতে চাই।"

আশ্রমের সকলেই জীবনবাবুর কথা শুনিত, বাবুদের আহার-সামগ্রী আনিয়া দিবার অগ্রে একজন ভাণ্ডারী আসিয়া স্থান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। ফিরিঙ্গীর সহিত জীবনবাবুর কথা হইতেছিল, সেই সময়ে সেই ভাণ্ডারী আসিয়া উপস্থিত। ফিরিঙ্গীর দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ পূর্ব্বক জীবনবাবু সেই ভাণ্ডারীকে কহিলেন, "এই সাহেবটী খিচুড়ী খাইতে চান, ইহাঁকে একটা সিধা দিবার ব্যবস্থা কর।"

কেহই আর তাঁহার কথা শুনিবে না, জীবনবাবু তাহা জানিতেন না। তাঁহার হুকুম শুনিয়া ভাণ্ডারী মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। ফিরিঙ্গী খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিল। প্রাতঃকালের শ্বেত ফিরিঙ্গী যেমন জীবনবাবুর

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এই কৃষ্ণ ফিরিঙ্গীও সেইরূপ তীব্র কটাক্ষে জীবনবাবুর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল; কিছুরীর কথা আর মুখে আনিল না। বাহির হইয়া যায়, সেই সময় জপমালা-হস্ত বাবুর প্রতি তাহার চক্ষু পড়িল। মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে সে ব্যক্তি তখন বাবুর দিকে অগ্রসর হইল। জপ করিতে করিতে কথা কহিতে নাই, ফিরিঙ্গী তাঁহাকে কি কি কথা বলিল, মাথা নাড়িয়া হুঁ হাঁ দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

আহারের সময় জীবনবন্ধু আহার করিতে বসিলেন; আহার নামমাত্র, কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না। বাবু তাহা দেখিলেন, মাথা নাড়িয়া হাসিলেন, কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। সেই ভাবে দিনমান কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পর বাবু সেই বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, পুলিসের একজন দারোগা সেইখানে উপস্থিত হইলেন, জীবনবন্ধু নিকটে ছিলেন না। বাবুর সহিত দারোগার দুটী পাঁচটী কথা হইবার পর জীবনবন্ধুকে আহ্বান করা হইল, জীবনবন্ধু আসিলেন।

দারোগাটী ব্রাহ্মণ। দারোগাকে প্রণাম করিয়া জীবনবন্ধু তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। দারোগাকে তিনি চিনিতেন, দারোগাও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। আলাপের সময় উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কথা কহিতেছিলেন। জীবনবন্ধুর মনে অন্য ভাবের সঞ্চার ছিল না, দারোগার মনে কিছু চাপা চাপা ছিল। জীবনবন্ধুর সপ্রতিভ ভাব দর্শনে তাঁহার বিস্ময় জন্মিল; বিস্মিত-নয়নে দুই তিনবার তিনি ভবতারণ বাবুর বদন নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার নিরীক্ষণের ভাব ভবতারণ বাবু বুঝিতে পারিলেন না। চারিদণ্ড পরে ভবতারণ ও জীবনবন্ধু উভয়ের সহিত পাণিমর্দ্দন করিয়া দারোগা বাবু বিদায় হইলেন। ভবতারণ কিছু বিমর্ষ।

জটাধারী আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবনবন্ধু সরিয়া গেলেন। মনিবের সহিত মোসাহেবের রঙ্গরস চলিল। লোকের উদ্দেশে উদ্দেশে জটাধারী সরকার অনেক প্রকার শ্লেষ বর্ষণ করিল। ভবতারণ তাহাতে আমোদ পাইলেন। জীবনবন্ধু অধিক দূরে ছিলেন না, জটাধারীর শ্লেষবাক্যগুলা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কর্ণে যেন শূল বিদ্ধ করিল। পূর্ব্বরজনী যে প্রকারে যাপিত হইয়াছিল, এ রজনীও

সেই প্রকারে স্থাপিত হইল। জীবনবন্ধুর সহিত ভবতারণের একটীও কথা নাই। জীবনবন্ধু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভবতারণ উত্তর দেন না, মুখ ফিরাইয়া বসেন, সম্পূর্ণ ভাবান্তর।

পাঁচ দিন এই ভাব। জীবনবন্ধু কোন না কোন প্রকারে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে প্রহার করিয়া পুলিসের লোকের হাতে ধরাইয়া দেওয়া জটাধারীর সঙ্কল্প। ভবতারণের উদ্যানবাটীতে যত লোকের সঙ্গে জীবনবন্ধুর আলাপ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন ভীরু। যাঁহাদিগকে তিনি বন্ধু বলিয়া জানিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে দেখিলে তাঁহারা সকলেই মুখ ভারী করেন, কেহই আর ভাল করিয়া কথা কহেন না। যদিও দুই একটা কথা হয়, তাহাও বড় বড় ফৌজদারী-মোকদ্দমার নজীর। কোথায় কোন্ আসামী কি প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া কি প্রকারে ধরা পড়িয়াছিল, কি প্রকার সাজা পাইয়াছিল, সেই সকল কথাই বেশী হয়। জীবনবন্ধু তাঁহাদের কোন কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার প্রতি সকলেরই ঔদাস্য, সকলেরই ক্রোধ, সকলেরই ঘৃণা। লোকের যখন এইরূপ অবস্থা ঘটে, তখন তাহার মনে বিন্দুমাত্রও শান্তি থাকে না; নিরীহ জীবনবন্ধুর হৃদয়েও শান্তি নাই। আহার করেন, তাহা কেবল প্রাণধারণের জন্য; কথা কহেন, তাহা কেবল না কহিলে নয়, সেই জন্য। সকল কার্য্যেই উদাসীনভাব, সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন প্রকার অজ্ঞাত আতঙ্ক। নিদ্রা আসলেই নাই। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই ভাবে কাটিল। জীবনবন্ধু এরূপ ভাব আর অধিকদিন সহ্য করিতে পারিবেন না, এইরূপ স্থির বুঝিলেন। দুষ্টলোকে কুচক্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার মহা বিপদে ফেলিতেছে, ইহা যেন তিনি কাহার উপদেশে মনে মনে বুঝিয়া লইলেন। চক্রান্তকারীরা তাঁহাকে প্রহার করিবে, অপমান করিবে, মিথ্যা অপবাদে ধরাইয়া দিবে, বড় ভয়ঙ্কর ভাবনা। সে স্থানে থাকিলে আর মঙ্গল নাই, কখন্ কি ঘটে, সর্ব্বদাই এই ভয়। মিত্রপুরী এখন শত্রুপুরী, শত্রুপক্ষের লোকেরা ভিতরে ভিতরে কি যে চক্রজাল বিস্তার করিয়াছে, তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। এরূপ অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা, স্থানটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যেখানে নিরাপদে থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, অনিশ্চিত আপদের দুর্ভাবনায় অন্তরাত্মা যেখানে অন্তর্দাহে অহরহঃ অনুক্ষণ দগ্ধীভূত হইতে থাকে, প্রবোধ দিবার অথবা সত্য

বৃত্তান্ত জানাইবার লোক যেখানে একজনও নাই, সে স্থানে বাস করিলে অচি-রাৎ জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে। শঙ্কিতচিত্তে এইরূপ কল্পনাকে স্থানদান করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করাই জীবনবন্ধুর সঙ্কল্প হইল।

কিন্তু কিরূপে পলায়ন করা হয়? সর্ব্বদাই নিকটে নিকটে লোক থাকে, লোকেরা সকলেই বিপক্ষ। তাহাদিগের নেত্রগোচরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে নূতন বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহাও যদি না হয়, যে বিপদে ফেলিবার জন্য চক্রী লোকেরা চক্রসৃষ্টি করিয়াছে, সত্য সত্য সে বিপদ্‌টা পাকিয়া উঠিবার অধিক সম্ভাবনা। পলায়ন করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু কিরূপে পলায়ন করা হয়?

চিন্তা করিতে করিতে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। এক সপ্তাহ অতীত। অষ্টম দিবসের মধ্যাহ্নে জটাধারীর সঙ্গে নূতন পরামর্শ করিবার জন্য ভবতারণ বাবু বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। গ্রীষ্মকাল;—দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া ধনবান্ লোকদিগের নিত্য অভ্যাস, ভবতারণ বাবু নিদ্রা গেলেন, চাকরেরা ইহাই বুঝিল, তাহাদের আনন্দ হইল। তাহারাও আপন আপন কক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে গেল। জীবনবন্ধু একাকী বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। বেলা আড়াই প্রহর। উদ্যানের সকলেই নিদ্রাগত; কেবল চাঁপা-ফুলের গাছের উচ্চ শাখায় বসিয়া দুই একটী কাক কা কা রবে চীৎকার করিতেছিল। কাকের ডাকে অমঙ্গল হয়, রব শুনিয়া জীবনবন্ধু তাহাই ভাবিতেছিলেন, ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একবস্ত্র পরিধান, সঙ্গে একটীও পয়সা নাই। তিন মাস পূর্ব্বে তিনি এক যোড়া চীনের বাড়ীর বার্ণিস-করা জুতা কিনিয়াছিলেন। সেই জুতা-যোড়াটী বাহিরে ছিল। একবস্ত্রে সেই জুতা পায়ে দিয়া চুপি চুপি তিনি উদ্যান হইতে বাহির হইলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

বিপদ্‌ক্ষেত্র হইতে জীবনবন্ধু বাহির হইলেন, কিন্তু যান কোথায়? সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, পথের সম্বল নাই, নিরুপায়। ইতিপূর্ব্বে যে একটী গণ্ড-গ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গ্রামখানি ভবতারণের উদ্যান হইতে তিন ক্রোশ দূর। সেই গ্রামে জীবনবন্ধুর কতিপয় বন্ধুলোক বাস করেন। তাঁহা-দের একজনের বাটীতে উপস্থিত হইতে পারিলে, বোধ হয়, নিরাপদ হইতে পারিবেন, সেই আশায় তিনি সেই গণ্ডগ্রামের অভিমুখে চলিলেন। কাহারও

কাছে কোন অপরাধ করেন নাই, মনে মনে তাহা ঠিক জানেন, অথচ ভয়। প্রকাশ্ত রাস্তা দিয়া যাইতে তাঁহার মন সরিল না, গ্রামের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পথে আতঙ্কে আতঙ্কে অতি দ্রুতবেগে তিনি যাইতে লাগিলেন। পদব্রজে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া যাওয়া;—বিশেষতঃ সে অবস্থায়, ভদ্রসন্তানের পক্ষে বহুক্ষণ-সাধ্য। বেলা আড়াই প্রহরের সময় তিনি বাহির হইয়াছিলেন, সূর্য্যাস্তের পর সেই গ্রামের এক বন্ধুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুটীর নাম মাণিকচাঁদ বসু। জীবনবন্ধুকে দেখিয়া তিনি আদর করিয়া আপন কক্ষে বসাইলেন। চাদর নাই, জামা নাই, মুখ শুষ্ক, কারণ কি, মাণিকচাঁদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে জীবনবন্ধু ঠিক ঠিক উত্তর প্রদান করিলেন না; কোন দুর্ঘটনায় ভদবস্থায় তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, এইমাত্র উত্তর দিয়া মাণিকচাঁদকে তিনি একপ্রকার সন্তুষ্ট করিলেন। হয় ত কিছু আহার হয় নাই, এইরূপ অনুমান করিয়া মাণিকচাঁদ আপনাদের দাসীর দ্বারা বাজার হইতে কিছু জলখাবার আনাইয়া বন্ধুকে খাইতে দিলেন। জীবনবন্ধু একটী সন্দেশ খাইয়া এক গেলাস জল খাইলেন মাত্র; অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে, বসিয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে, এই বলিয়া বন্ধুর বিছানার একপার্শ্বে শয়ন করিলেন; শয়ন করিয়াই চক্ষু বুজিলেন।

মাণিকচাঁদ সেই সময় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যে দাসী জলখাবার আনিয়াছিল, রেকাব-গেলাস লইয়া যাইবার জন্য সেই দাসী সেই সময় গৃহমধ্যে আসিয়া দেখিল, জীবনবন্ধু গৃহমধ্যে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। সে মনে করিল, ঘুমাইতেছেন। জীবনবন্ধুকে পূর্ব্বে অনেকবার সে দেখিয়াছিল, ভালরূপ চিনিত, ভক্তি-শ্রদ্ধাও করিত। সে দিন কিন্তু ভাবান্তর। বাহির হইতে কি কথা শুনিয়া আসিয়াছিল, সেই কথা মনে করিয়া দাসী আপনা আপনি বলিল, "এইবার হয়ে গেল। জীবনবন্ধুকে ধর্‌তে এসেছে। শান্তিপুরে কাপড়, ঢাকাই চাদর, আলপাকার কোট, চীনের বাড়ীর জুতা, এইবার সব বেরিয়ে যাবে।"

দাসী চলিয়া গেল। দাসীর কথাগুলি জীবনবন্ধু শুনিলেন। তিনি ভাবিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ! এখান পর্য্যন্ত সেই চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। ব্যাপার বড় সহজ হইবে না! ভাবিলেন বটে, তথাপি মনে মনে বিশ্বাস, অপরাধ করি নাই, ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর সেই বাড়ীর সদরদরজার বাহিরের রাস্তায় বহুজনের

কোলাহল। লোকেরা বলিতেছে, "বাহির করিয়া দাও।" বাড়ীর একজন লোক বলিতেছে, "ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।" লোকেরা বলিতেছে, "আর ঘুমাইতে হইবে না, তুলিয়া দাও, দড়ী নাই, পাট আছে, পাট পাকাইয়া লইয়া বান্ধিয়া লইয়া যাই।"

ঐ সকল ভয়ঙ্কর কথাও জীবনবন্ধুর কর্ণে গেল। নির্দ্দোষ হৃদয় কাঁপিল। একটু পরে দূরে দূরে বহুলোকে বাঁশীর সুরে শীস দিতে আরম্ভ করিল। আরও দূরে দূরে উচ্চৈঃস্বরে "চোর!—চোর!—ডাকু!—ডাকু!—খুন!—খুন!" ইত্যাকার ভীষণ চীৎকার!

প্রায় সমস্ত রজনী ঐরূপ চীৎকার চলিল, জীবনবন্ধুর নিদ্রা নাই, সমস্ত রজনী তিনি ঐ প্রকার বিকটধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ভবতারণের উদ্যানে যাহা হইয়াছিল, এই দিন সন্ধ্যাকালে ঐ বাটীতে যাহা হইয়াছিল, জীবনবন্ধু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রাত্রিকালের চীৎকারে তিনি এইমাত্র অনুমান করিয়া লইলেন, ব্যপার অত্যন্ত গুরুতর। কোথায় কি প্রকার ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছে, চোর, ডাকাত অথবা খুনে আসামী পলায়ন করিয়াছে, আসল আসামী ধরিতে না পারিয়া অথবা সন্ধান না পাইয়া পুলিসের লোকেরা অনুসন্ধান করিতেছিল, জটাধারী সরকার আমাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের কর্ণে হয় ত আমার নাম বলিয়া দিয়াছে, তাহাতেই আমাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত পুলিসের লোকেরা গুপ্তভাবে আমার সঙ্গ লইয়াছে।

মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া জীবনবন্ধু সে বাড়ী হইতেও স্থানান্তরে যাইবার যুক্তি স্থির করিলেন। ভবতারণের বাগানে সকলেই তাঁহার মিত্র ছিল, কেবল শত্রু ছিল জটাধারী সরকার। সেই জটাধারী কুচক্র সৃষ্টি করিয়া সকলকেই তাঁহার উপর চটাইয়া দিয়াছে, গুরু অপরাধের গুপ্ত অভিযোগ পুলিসের কাছে জানাইয়া দিয়াছে, এ চক্র হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। বিষম সঙ্কটের অবস্থা। নির্দ্দোষ লোকের নামে গুপ্ত অভিযোগ। কি প্রকারের অভিযোগ, ঘটনা কোথায় হইয়াছে, কি প্রকারের ঘটনা, তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানা নাই। পুলিসের লোক সম্মুখে আসিতেছে না, বাজেলোকে চীৎকার করিতেছে, সত্য জানিবার সম্ভাবনা অতি অল্প, কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ গুপ্ত অত্যাচারের বিষয় জানাইবেন, জীবনবন্ধু একবার এইরূপ স্থির করিলেন,

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। কাহারা অত্যাচার করিতেছে, কেন করিতেছে, কোথায় কি ঘটনা হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া আসিতে পারিলেন না। ব জেলোকে সর্ব্বদা ত্যক্ত করিতেছে, কেবল এই কথা শুনিলে মাজিষ্ট্রেট হয় ত হাস্য করিবেন, নয় ত রাগ করিবেন, না হয় পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। আসল কথা কিছু ব্যক্ত না হইলে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহার কোন প্রকার এজাহার শুনিতে চাহেন না। এলোমেলো আলাত-পালাত বকিলে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, সমস্ত যখন অনিশ্চিত, সমস্ত যখন অজ্ঞাত, তখন মাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে গেলে নূতন বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে, মাজিষ্ট্রেটকে জানান হইতে পারে না, কোন ভদ্রলোকের নিকটে ঐ কথাগুলা বলিলে তিনিও পাগলের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন; মনে মনে চাপিয়া রাখিলেও সর্ব্বদা ঐ প্রকারে জালাতন হইতে হইবে। ভয়ের কোন কারণ নাই, অথচ ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা দিনযামিনী যাপন করিতে হইবে, কখন্ কি হয়, কখন্ কে আসিয়া কি বলে, কখন কে আসিয়া গ্রেপ্তার করিতে চায়, সেই ভয়ে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। কথা বড় সহজ নহে! দুই দিকেই সঙ্কট, মনে রাখিলেও শান্তি নাই, অপরকে জানাইলেও প্রতীকারের উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। এটা যে কি প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা, যাঁহারা ভুক্তভোগী হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। গল্প করিয়া অপরকে বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

জীবনবন্ধু এইরূপ অনেক ভাবিলেন, ভাবনামাত্রই সার। যতই ভাবেন, ভাবনা ততই বাড়িয়া যায়। প্রভাত হইল, সে বাড়ী হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। সদর-দরজার উভয়পার্শ্বে পাঁচ সাতটী লোক। কাহারও হস্তে হুঁকা, কাহারও হস্তে চা খাইবার পাত্র, কাহারও ক্রোড়ে ক্ষুদ্র শিশু। জীবনবন্ধুকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যেন চমকিত হইলেন। "আমি চলিলাম" বলিয়া জীবনবন্ধু সদর-দরজার চৌকাঠ পার হইয়া রাস্তায় পদার্পণ করিলেন; রাত্রিকালে যে দিক্ হইতে চীৎকারধ্বনি আসিয়াছিল, সেই দিকে একবার চাহিলেন। রাস্তা পরিষ্কার, সেদিকে কেহই নাই, তিনি তখন উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার কর্ণে আসিল, "তিন বৎসরের পর তিন বৎসরের কম নয়।" ধীর

সেই বাড়ীর সদর-দরজার ধারে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ঐ কথা বলিলেন, জীবনবন্ধু তাহা ঠিক বুঝিলেন। তাঁহার নিজের অনুমানের সহিত সেই কথা মিলিল। ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রায় আধক্রোশ চলিয়া গেলেন। সেইখানে তাঁহার আর একজন আত্মীয়ের বাড়ী, সেই বাড়ীতে তিনি প্রবেশ করিলেন। যিনি তাঁহার আত্মীয়, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া একবার একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটী জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা! আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, সেইখানে আমি চলিলাম, তুমি আজ আর এখানে কোথায় থাকিবে, স্বস্থানে চলিয়া যাও।"

জীবনবন্ধু আত্মীয়ের আত্মীয়তা বুঝিলেন; নিজের যেরূপ দুঃসময় উপস্থিত, তাহার উত্তম পরিচয় পাইলেন; আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ভগ্নান্তঃকরণে অন্য একজন বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই বন্ধুটী জাতিতে সদ্গোপ, নাম রামহরি ঘোষ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া রামহরি যথেষ্ট সমাদর করিল, একবস্ত্রে তাদৃশী অবস্থায় বিশুষ্ক-বদনে কোথা হইতে আসা হইল, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। জীবনবন্ধু সত্যপরিচয় দিলেন না, সে পরিচয় দিলে নিজেই অপ্রস্তুত হইবেন, ইহা ভাবিয়া, অন্য প্রকারে রামহরিকে বুঝাইয়া দিলেন। সেইস্থানে স্নান করিয়া জীবনবন্ধু যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন, সেদিন সেখানে থাকা হইবে না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে চলিয়া যাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। রাখিবার জন্য রামহরি বিস্তর জিদ করিল, জীবনবন্ধু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। রামহরি ঘোষ সদাশয় ব্যক্তি, বন্ধু থাকিলেন না, তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে একখানি বস্ত্র, একটী মিরজাই, একখানি চাদর আর পাথেয়স্বরূপ পাঁচটী টাকা প্রদান করিল।

গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সময় যেরূপ, তাহাতে অস্বীকার করিতেও পারিলেন না, বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়া জীবনবন্ধু অগত্যা তাহা গ্রহণ করিলেন। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে সে বাড়ী হইতে তিনি বাহির হইলেন। নিঃসম্বল ছিলেন, কিঞ্চিৎ সম্বল সংগৃহীত হইল, মনের পূর্ব্বকল্পনা আবার জাগিয়া উঠিল। ঘোরতর অপবাদ, সইচন্দ্রদর্শনের কলঙ্ক, ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। শান্তিরক্ষকের শরণাপন্ন হওয়াও বিফল, পরিত্রাণের উপায়াভাব, এ অবস্থায় আত্মগুপ্ত পাই সদুপায়। কোন দিকে কিছু উপায় না পাইলে অজ্ঞলোকেরা এক সময়ে

মোরিয়া হয়; মোরিয়া হইলে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয়, অজ্ঞ না হইলেও জীবনবন্ধুর মনে সেইরূপ ইচ্ছার উদয় হইল। জীবন নিষ্কলঙ্ক, কখন তিনি কাহারও কোন মন্দ করেন নাই, কখন কোন দোষ করেন নাই, অথচ তাঁহার মস্তকে ঘোর বিপদ,—কুচক্রঘটিত বিপদ্। সে অবস্থায় আত্মজীবনবিসর্জ্জন দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সুতরাং তাহাই তিনি স্থির করিলেন। পথে যাইতে যাইতে একখানা বেণের দোকান হইতে আধতরি আফিং কিনিয়া লইলেন। নিকটেই নদী, সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি সেই নদীকূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শীঘ্র সে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এই মৎলবে সেইখানে একখানা নৌকা ভাড়া করিলেন। যেখানে যাইবার ইচ্ছা, তথাকার ভাড়া সে স্থান হইতে ঊর্দ্ধসংখ্যা একটাকা; কিন্তু জীবনবন্ধুর শীঘ্র প্রস্থান করা প্রয়োজন, ভাড়ার কসাকসি করিবার সময় পাইলেন না, অন্য নৌকা আসিবার বিলম্ব সহিল না, দুই টাকা ভাড়া স্বীকার করিয়া সেই নৌকাতেই তিনি আরোহণ করিলেন। দাঁড়ী-মাঝী ভিন্ন সে নৌকায় আর কেহ ছিল না, অন্ধকার হইলে নৌকায় বসিয়াই বিষ খাইয়া জলে পড়িবেন, এইরূপ মৎলব।

নৌকা ছাড়িয়া দিল; প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গেল; সেই সময় জীবনবন্ধু পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে একখানা ক্ষুদ্র নৌকা শন্ শন্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সেই নৌকার দুইদিকে দুইটা লাল নিশান; সেই লক্ষণে জীবনবন্ধু বুঝিলেন, পুলিসের নৌকা। তিনি নৌকা করিয়া যাইতেছেন, কি প্রকারে পুলিসের লোকেরা সেই সন্ধান পাইয়াছে, সন্ধান পাইয়াই তাঁহার পাছু লইয়াছে।

পুলিসের লোক এক এক বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক। জীবনবন্ধুর নৌকা অধিক বেগে যাইতেছিল না, অল্পক্ষণমধ্যেই পুলিসের নৌকাখানা তাঁহার নৌকাকে পশ্চাতে রাখিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেল। জীবনবন্ধু একটী নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি ভাবিলেন, পূর্ব্বে যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পুলিসের নৌকা অন্য কার্য্যে অন্যদিকে চলিয়াছে, তাঁহার ভয় নাই। তিনি সেই সময় আফিংটুকু বাহির করিয়া, ছোট ছোট করিয়া গুলী পাকাইয়া বামহস্তে রাখিলেন, জল দিয়া গুলিয়া খাইবার পাত্রাভাব; ছোট ছোট গুলী একটী একটী করিয়া ভক্ষণ করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। অনেকক্ষণ সেই আফিঙের গুলীর

দিকে চাহিয়া রহিলেন, চক্ষু দিয়া জল পড়িল, প্রাণের মায়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল; বিষ খাইতে সাহস হইল না। পুনর্ব্বার তেজপত্র মুড়িয়া সেই আফিংটুকু জামার পকেটে লুকাইয়া রাখিলেন।

বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করা হইল না। জীবনবন্ধু কিন্তু প্রাণপরিত্যাগ করিতে একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প। বিষ খাওয়া অপেক্ষা অন্য কোন সহজ উপায়ে যদি শীঘ্র প্রাণ বাহির হয়, তিনি তখন সেই পন্থা দেখিতে লাগিলেন। এক একবার মনে করিলেন, নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দিবেন, দুই তিনবার সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, তাহাতেও সাহস হয় নাই।

সমস্ত রাত্রি নৌকা চলিল না, একটা গঞ্জের নিকটে, আট দশখানা নৌকার নিকটে আপনাদের নৌকা নোঙ্গর করিয়া দাঁড়ী-মাঝীরা ঘুমাইল। জীবনবন্ধুর নিদ্রা নাই, তিনি জাগিয়া রহিলেন। উষাকালে পুনরায় নৌকা ছাড়া হইল, যেখানে যাইবার কথা, সেইখানে পৌঁছিল, ভাড়া লইয়া মাঝী তাঁহাকে নামাইয়া দিল।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। পল্লীগ্রাম, পল্লীগ্রামের ভদ্র ভদ্র গৃহস্থের রমণীরা বেলা এক প্রহরের মধ্যেই স্নান করেন। নৌকা যে ঘাটে পৌঁছিল, সেটা স্নানের ঘাট। ঘাটে স্ত্রীলোক ছিল না, দুই একজন পুরুষ স্নান করিতেছিল, জীবনবন্ধু সেই ঘাটের একটা সিঁড়ির উপর স্থির হইয়া বসিলেন। দুই প্রহরের রৌদ্রে মাথা ফাটিতে লাগিল, ভ্রুক্ষেপ নাই। যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারা উঠিয়া গেল, ঘাট নির্জ্জন হইল জীবনবন্ধু সেই সময় গায়ের জামা খুলিয়া জলে নামিবেন, সাঁতার জানেন না, একটু বেশী জলে গিয়াই ডুবিয়া মরিবেন, এইটাই তখন তাঁহার নূতন সঙ্কল্প।

স্নানের ঘাট প্রায়ই শূন্য থাকে না; আবার দুটী একটী লোক আসিয়া স্নান করিতে লাগিল, জীবনবন্ধুর আশা পূর্ণ হইল না। বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া তিনি সে স্থান হইতে একটা আঘাটার দিকে চলিলেন। যেদিকে কেহ স্নান করে না, সেইদিকে জলে ডুবিবার সুবিধা হইবে, ইহাই তিনি ভাবিলেন। আঘাটার নিকটে গিয়া জুতা-কাপড় রাখিয়া জলে নামিলেন। জল আজানু, তত অল্পজলে মানুষ ডুবিয়া মরিতে পারে না। জীবনবন্ধু ক্রমে ক্রমে উরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া এক-কোমর জলে গিয়া দাঁড়াইলেন। আর সাহস হইল না প্রাণের মায়া বড় মায়া।

নিতান্ত মোরিয়া না হইলে, মোরিয়া হইয়া পাগল হইয়া না গেলে মানুষ কখন আপনি আপন জীবন বাহির করিতে পারে না। জলে ডুবিয়া জীবনবন্ধু আত্ম-হত্যা করিতে পারিলেন না, সেইখানেই ডুব দিয়া স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন; সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামের দিকে চলিলেন।

গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই একটা বাজারে উপস্থিত হইতে হয়। ছোট ছোট অনেকগুলি দোকান, খানকতক ছোট ছোট চালাঘর, তাহাই সেখানকার বাজার। বেলা দুই প্রহরের সময় বাজারে বেশী লোকজন থাকে না, চালাঘরগুলি খালি পড়িয়া ছিল, যাহারা দিবারাত্রি দোকানে থাকে, তাহারাই দোকান খুলিয়া বসিয়া ছিল। জীবনবন্ধু একজন ময়রার দোকানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন; ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইয়াছিল, এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া জল খাইলেন। একে দুর্ভাবনায় বক্ষ শুষ্ক, তাহার উপর জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বিপ্রহরের দিবাকরের প্রচণ্ড কিরণ, ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসা বলবতী, দোকানের পিতলের ঘটীর দুই ঘটী জল দুই নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। দুই ঘটী জল আড়াই সেরের কম নহে, সুতরাং সেই জলেই উদর পূর্ণ হইল; আর ক্ষুধা থাকিল না।

রৌদ্রের তেজ কিছু অল্প হইলে জীবনবন্ধু ধীরে ধীরে দোকান হইতে উঠিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গ্রামে কাহাকেও তিনি চিনিতেন না। কলিকাতায় একবার একজন বৈদ্যের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার বাড়ী সেই গ্রামে, সে পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার বাটীর উদ্দেশেই চলিলেন; পাঁচ সাত জন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ধান পাইলেন, সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈদ্যরাজের নাম গিরিশিখর গুপ্ত। ব্যবহারে তিনি লোক ভাল, গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ে দশ টাকা আয়ও আছে, তদ্ভিন্ন তিনি একজন তালুকদার। স্বচ্ছন্দে সংসার চলে, বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে ক্রিয়া-কর্ম্মও হয়। প্রতিদিন বৈকালে পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে তাস খেলে, পাশা খেলে, তামাক খায়, গল্প করে,—রাত্রি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত সেখানে মজ্‌লীস্ হয়।

জীবনবন্ধু যখন উপস্থিত হইলেন, তখন চণ্ডীমণ্ডপে পাশা-খেলা হইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া গৃহস্বামী গিরিশিখর কেমন এক প্রকার ভঙ্গীতে যেন কাষ্ঠ-

লৌকিকতার ধরণে শুষ্ককণ্ঠে "আসুন আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। অভ্যর্থনার ভঙ্গীতেই জীবনবন্ধু বুঝিলেন, অগ্নিশিখা এ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে।—বুঝিলেন বটে, মুখ শুষ্ক হইল বটে, বক্ষঃস্থল কম্পিত হইল বটে, কিন্তু মনোভাব কিছুই প্রকাশ না করিয়া তিনি সেই পাশাখেলার সতরঞ্চির একধারে গিয়া বসিলেন। গিরিশিখর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসময়ে এখানে কোথা হইতে আসিলেন? আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছেন, আছে কি কিছু বিপদ্?"

জীবনবন্ধু কিরূপ উত্তর দেন, তাহা না শুনিয়াই,—শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই,—খেলা বন্ধ করিয়া খেলোয়াড় লোকগুলির সহিত গিরিশিখর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। বাড়ীর বাহিরে সদরদরজার দক্ষিণদিকেই এক ঝাড় কলাগাছ। সেই কলাতলায় বসিয়া তাঁহারা সকলে তামাক খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিলেন। বাড়ীর ভিতর জীবনবন্ধু রহিলেন, বাহির হইবার সময় গিরিশিখর তাঁহাকে ডাকিলেন না। অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া থাকিয়া জীবনবন্ধু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "গ্রহ যখন বিগুণ হয়, তখন সকলেই বাম হইয়া থাকে। কলিকাতায় এই লোকের সহিত যখন প্রথম আলাপ হইয়াছিল, তখন ইনি কতই শিষ্টাচার জানাইয়া সরলতা দেখাইয়াছিলেন, বাড়ীতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এখনকার ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইল।" জীবনবন্ধু এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে বাহিরের কলাতলা হইতে কে একজন বলিল, "সাত বৎসরের কম নয়।"

জীবনবন্ধু মনে করিলেন, "যাহা ভাবিলাম, তাহাই ঠিক, আমার ভাগ্যটা দশদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ভাগ্যচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় গিয়া থামিবে, তাহার ঠিক নাই। হয় ত অনন্ত কাল,—যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিনই আমার পক্ষে অনন্ত কাল, তত দিন আমাকে অন্ধকার যন্ত্রণানলে এইরূপে দগ্ধবিদগ্ধ হইতে হইবে।" অদৃষ্টের কথা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জীবনবন্ধু চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া সেই কলাতলায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

গিরিশিখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" জীবনবন্ধু নির্ব্বাক্। বন্ধুর ভবনে তিনি আশ্রয় লইতে আসিয়াছিলেন, বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইবেন? এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর কি হয়? গ্রহবৈগুণ্য স্মরণ

করিয়া, অন্তরে বেদনা পাইয়া জীবনবন্ধু উত্তর করিলেন, "তীর্থপর্য্যটনে যাইব, এইরূপ বাসনা; অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম করিবার আকিঞ্চন।"

জীবনবন্ধু মিথ্যাকথা কহিলেন না। অকারণে বিনা দোষে অজ্ঞাত শত্রুর প্রপীড়নে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও শান্তি পাইলেন না, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য তীর্থ-যাত্রা করিয়া শান্তি অন্বেষণ করিবেন, মনে মনে তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল, গিরিশিখরের প্রশ্নের উত্তরে সেই কথাই তিনি প্রকাশ করিলেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, গিরিশিখর বলিলেন, "আমার পরিবার অত্যন্ত পীড়িত, আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত, পীড়া অত্যন্ত কঠিন, আমার এখানে আপনার বিশ্রাম করিবার সুবিধা দেখিতেছি না। এ গ্রামে যদি অপর কাহারও সহিত আপনার জানাশুনা থাকে, তাঁহার বাটীতে যাইলেই সুবিধা হইতে পারিবে।"

জীবনবন্ধু তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। সে গ্রামে আর তিনি কখন যান নাই, কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় নাই, কেবল গিরিশিখরের সঙ্গেই পূর্ব্বে কলিকাতায় একবার আলাপ হইয়াছিল, কয়েকদিবস একসঙ্গে থাকাতে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। গিরিশিখর সেই বন্ধুত্বের উত্তম পরিচয় দিলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া, বন্ধুকে একটী নমস্কার করিয়া, চিন্তাকুল অন্তরে জীবনবন্ধু তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, পাঁচ জনে আমোদ করিয়া পাশা খেলিতেছিলেন, হঠাৎ বন্ধু-দর্শনে মজ্‌লীস ভঙ্গ করিয়া বন্ধুটী উঠিয়া আসিলেন, তৎক্ষণাৎ পরিবারের পীড়া উপস্থিত হইল, একটী রাত্রি বন্ধুকে আশ্রয় দিবার ব্যাঘাত জন্মিল, স্পষ্ট কথায় বিদায় করিয়া দিলেন।

দিনমান না হইলে, অপরিচিত অজ্ঞাত স্থানে জীবনবন্ধুকে মহাসঙ্কটে পড়িতে হইত, সূর্য্যদেব তাঁহার প্রতি তখন অনুকূল ছিলেন, অবশ্যই কোন না কোন বাড়ীতে অতিথি হইয়া দিবসের অবশিষ্টকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া নিশাযাপন করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা হইল। গ্রামখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, পাঁচ সাত-খানি বাড়ী অতিক্রম করিয়া একখানি বাড়ীর সম্মুখে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

সদরদরজার নিকটে তিনটী বালক দাঁড়াইয়া ছিল, জীবনবন্ধুকে দেখিয়া তাহারা করতালি দিয়া ইংরাজী ভাষায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "The same,

The same, The same !"—বলিয়াই বালকেরা হাস্য করিতে করিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়াই সদরদরজা বন্ধ করিয়া দিল।

জীবনবন্ধু বুঝিলেন, যে কারণে গিরিশিখর তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন, এই বালকেরাও সেই অজ্ঞাত কারণটা পরিজ্ঞাত হইয়াছে, এখানে আমার প্রার্থনা করা বিফল। কুণ্ঠচিত্তে ইহা স্থির করিয়া শীঘ্র শীঘ্র তিনি সেই পল্লী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। দ্বিতীয় পল্লীতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, দিব্য একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, বাহিরে প্রাচীর দেওয়া নাই, চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে সারি সারি পাঁচ সাতটী নারিকেলবৃক্ষ, একধারে একটী তুলসীমঞ্চ, মঞ্চসমীপে একটী প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ। বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, ফুলের সাজি হস্তে লইয়া একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা সেই বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র পাড়িতেছিল, জীবনবন্ধু তাহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীখানি কাহার ?" বালিকা উত্তর করিল, "হারাণ ঠাকুরের।"

মানুষকে ঠাকুর বলিলেই ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণের বাড়ী, এখানে আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা আছে, এই আশ্বাস জীবনবন্ধুর মনে আসিল। পুনরায় তিনি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারাণ ঠাকুর তোমার কে হন ?"

বালিকার উত্তরে জীবনবন্ধু জানিলেন যে, সেই বালিকাটী হারাণ ঠাকুরের কন্যা। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, নদীতীরের দোকানে এক পয়সার বাতাসামাত্র তিনি খাইয়াছিলেন, তাহার পর আর জলবিন্দুমাত্রও না। কেবল ঐ কথাই বা কেন, ভবতারণের উদ্যান-বাড়ীতে কয়েকদিবস প্রায় উপবাস করিয়া তাহার পর যে যে স্থানে গিয়াছেন, কোথাও কিছুমাত্র আহারের সুবিধা হয় নাই, কিছু কিছু জলযোগ করিয়াছেন মাত্র, মনের অবস্থা ভাল নয়, আহারে তাদৃশী প্রবৃত্তিও ছিল না ; কিন্তু যে দিনের কথা বলা হইতেছে, সেই দিন কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল ; গিরিশিখরের নির্ঘাতবাক্য শ্রবণের পর সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা উড়িয়া গিয়াছিল।—যাউক, সম্মুখে নিশাকাল, একটী আশ্রয়স্থান আবশ্যক ; নিশাকালে আশ্রয় না পাইলে অজ্ঞাত স্থানে অসহ্য কষ্ট হইবে, অতএব বালিকাকে তিনি বলিলেন, "তোমার পিতাকে গিয়া বল, আমি অতিথি।"

"বাবা বাড়ীতে নাই, আপনি বসুন, আমি আসছি।" এই কথা বলিয়া বিল্বপত্রের সাজি-হস্তে বালিকাটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইয়া

জীবনবন্ধু সেই চণ্ডীমণ্ডপের রকের উপর উঠিয়া বসিলেন। একটু পরে নূতন একটী সপ্ বগলে করিয়া সেই বালিকা ফিরিয়া আসিল, সপ্‌টী চণ্ডীমণ্ডপের উপর বিছাইয়া দিয়া অতিথিকে বসিতে বলিল। জীবনবন্ধু বসিলেন, বালিকার মুখে সদ্‌বুদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া, তাহার মিষ্টবাক্য শুনিয়া, অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া বালিকা উত্তর করিল, "আমার নাম কুসুমকুমারী।"

উত্তর দিয়া কুসুমকুমারী সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল না, চণ্ডীমণ্ডপের একটী খুঁটি ধরিয়া একদৃষ্টে অতিথির মুখপানে চাহিয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

কি এক প্রকার সন্দেহ মনে আনিয়া জীবনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

কুসুমকুমারী বলিল, "মা জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, সেই জন্য।"

জীবনবন্ধু বলিলেন, "না, আমি ব্রাহ্মণ নই, কায়স্থ।"

কি যেন ভাবিতে ভাবিতে কুসুমকুমারী আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, জীবনবন্ধু ক্ষণকাল একাকী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রহিলেন। আশ্রয় পাইবেন, মনে মনে ইহা স্থির জানিতে পারিয়া তাঁহার আনন্দ হইল। গৃহস্বামী বাড়ীতে নাই, সেই একটী বাধা; কিন্তু যদি তিনি গ্রামান্তরে না গিয়া থাকেন, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আর কোন বাধা থাকিবে না, এটীও তিনি বুঝিলেন।

এক গাড়ু জল লইয়া একজন স্ত্রীলোক চণ্ডীমণ্ডপে আসিল, অতিথিকে পদপ্রক্ষালন করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তামাক খান?"

অতিথির উত্তর প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্ত্রীলোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তামাক সাজিয়া হুঁকা আনিয়া অতিথির হস্তে দিয়া গেল। জীবনবন্ধু বুঝিলেন, সেই স্ত্রীলোকটী ঐ বাটীর দাসী। পদপ্রক্ষালন করিয়া তিনি তামাক খাইতে লাগিলেন, জলযোগের সামগ্রী লইয়া কুসুমকুমারী আসিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি আসন হস্তে সেই দাসী আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একধারে স্থানমার্জ্জনা করিয়া দিল, আসন পাতিয়া দিল। জলযোগের ব্যবস্থা দেখিয়া জীবনবন্ধু সন্তুষ্ট হইলেন। পল্লীগ্রাম, সর্ব্বদা সকল জিনিস পল্লীবাসীর গৃহে থাকে না, বাড়ী হইতে কেহ

বাহিরেও গেল না, অথচ যথাসম্ভব সমস্তই প্রস্তুত; জলের গেলাসের মুখে ক্ষুদ্র একখানি রেকাবে চারিটী তাম্বূল।

জীবনবন্ধু জল খাইলেন, দাসী পুনরায় তামাক সাজিয়া দিয়া আসন ও পাত্রাদি লইয়া গেল। কুসুমকুমারী গেল না।

ব্যবহার-দর্শনে জীবনবন্ধু বুঝিতে পারিলেন, এই বিপ্র-পরিবার অতিথি-সেবায় অনভ্যস্ত নহেন; ক্ষুদ্র বালিকাটী পর্য্যন্ত অতিথি-সেবার সর্ব্বাঙ্গ অবগত আছেন। কুসুমকুমারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা কোথায় গিয়াছেন?"

কুসুমকুমারী উত্তর করিল, "জমীদারের বাড়ীতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন।" গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে পূর্ব্বে যেরূপ একটু একটু সন্দেহ আসিয়াছিল, কন্যার মুখে "শীঘ্র আসিবেন," শুনিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুসুমকুমারীকে তিনি বসিতে বলিলেন; নতমুখে মৃদু হাসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সর্দ্দলের উপর পা ঝুলাইয়া কুসুমকুমারী বসিল। অল্পক্ষণ বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া জীবনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম! তুমি কি লেখা-পড়া শিখিতেছ?"

কুসুমকুমারী উত্তর করিল, "আমাদের গ্রামে মেয়ে পড়িবার পাঠশালা নাই, বাবার কাছে আমি ছোট ছোট বই পড়ি। গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদ-চরিত্র পড়িয়াছি; বাবা আমাকে চাণক্য-শ্লোক আর হিতোপদেশের ছোট ছোট শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেছেন।"

সন্তুষ্ট হইয়া জীবনবন্ধু তাঁহাকে দুটী একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন, প্রথমে অল্প অল্প লজ্জা আসিল, তাহার পর অতিথির দ্বিতীয়বার অনুরোধে অতি কোমলস্বরে বালিকা একে একে তিনটী চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ বলিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। শ্লোকের যেখানে যেখানে থামিতে হয়, ঠিক ঠিক যতি মাত্রা বজায় রাখিয়া, সেই স্থানে থামিয়া থামিয়া বালিকা দিব্য সরলভাবে আবৃত্তি করিল। জীবনবন্ধু একটী শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃদু হাসিয়া কুসুমকুমারী বলিল, "অর্থ এখনও আমার শিক্ষা হয় নাই।"

বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা হইতেছিল, এমন সময় হারাণ ঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কুসুমকুমারী কথা কহিতেছে,

তদ্দর্শনে প্রথমে তাঁহার একটু বিস্ময় জন্মিল, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি নীরবে অতিথির মুখের দিকে চাহিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কতক্ষণ? কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কুসুমকুমারী বলিল, "বাবা, ইনি আমাদের অতিথি।"

বালিকার সম্বোধনবাক্যে জীবনবন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ইনিই গৃহস্বামী। প্রণাম করিয়া বিনম্র-বচনে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "অনেক দূর হইতে আসা হইয়াছে, প্রায় দুই ঘণ্টা হইল আসিয়াছি, আমি কায়স্থ-সন্তান, বিপদ্গ্রস্ত, রাত্রের নিমিত্ত আশ্রয়প্রার্থী।"

জীবনবন্ধু এইরূপ উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু গৃহস্বামী প্রথমে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সহসা তাঁহার আশ্চর্য্য-বোধ হইয়াছিল। "আপনি এখানে কতক্ষণ?" পরিচিত লোক ভিন্ন অপরিচিত লোককে কেহ কখন ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না,—করেনও না, তবে এই হারাণ ঠাকুর তাঁহাকে ঐরূপ ঘনিষ্ঠতাজ্ঞাপক, আত্মীয়তাজ্ঞাপক প্রশ্ন করিলেন কি জন্য? কস্মিন্‌কালেও হারাণ ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ নাই, তবে ঐরূপ প্রশ্নের হেতু কি?

জীবনবন্ধু এইরূপ ভাবিতেছেন, সহাস্য-বদনে হারাণ ঠাকুর সেই সপের উপর তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, বসিয়াই পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি ভাবিতেছেন কি?"

বিস্ময়ের উপর জীবনবন্ধুর আরও বিস্ময় হইল। মনে মনে তিনি ভাবিতেছিলেন, ভাবনার কোন লক্ষণও প্রকাশ পায় নাই, তবে হারাণ ঠাকুর তাঁহার মানসিক ভাবনার বিষয় কিরূপে জানিতে পারিলেন?

কুসুমকুমারী উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। অতিথিকে সম্বোধন করিয়া হারাণ ঠাকুর বলিলেন, "আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম। আপনি ভদ্র-সন্তান, আপনি নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক, অকারণে বিপদ্‌-গ্রস্ত, তাহাও আমি জানিয়াছি; আপনার ললাট দর্শন করিয়া অনেক তত্ত্ব আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি, আপনি এখানে এক রাত্রি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, এক রাত্রি কেন, শত রাত্রি আপনি এখানে নির্ব্বিঘ্নে সুখে অবস্থান করিতে পারেন। অতিথিরূপে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি সুখী হইলাম।"

পুনরায় করযোড়ে হারাণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জীবনবন্ধু হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ; কিন্তু তাঁহার কথাগুলির ভাবার্থ কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আমি আজ এখানে আসিব, তাহা ইনি পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন, আমি নিষ্কলঙ্ক, আমি অকারণে বিপদগ্রস্ত, তাহাও ইনি জানিয়াছেন। ব্যাপার কি ? ইনি কি ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন ? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া জীবনবন্ধু একবার ভাবিলেন, এই রহস্যের বিষয়টা হারাণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, দ্বিতীয় চিন্তায় তাহা অনুচিত ভাবিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। গৃহস্বামীর সহিত অপরাপর প্রসঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। সেই দাসী আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। রাত্রি এক প্রহরের সময় জীবনবন্ধু আহার করিলেন ; চণ্ডীমণ্ডপেই উত্তম শয্যা প্রস্তুত হইল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় হারাণ ঠাকুর নিকটে আসিয়া বসিলেন। পূর্ব্বে যে সকল কথা হইয়াছিল, সে সকল কথা উত্থাপন না করিয়া হারাণ ঠাকুর তাঁহাকে কিছুদিন নিজ বাড়ীতে রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। সম্মত হইবেন কি না, তাহা চিন্তা করিয়া জীবনবন্ধু কহিলেন, "অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা বুঝিয়া কল্য আমি আপনার নিকট এই সাধু প্রস্তাবের মতামত প্রকাশ করিব।" নানা-কথা-প্রসঙ্গে রাত্রি অনেক দূর অগ্রসর হইল, অতিথিকে শয়ন করাইয়া হারাণ ঠাকুর দ্বিতীয় শয্যায় সেই চণ্ডীমণ্ডপেই শয়ন করিলেন। তাঁহার সততা ও সাধুতা দর্শনে অপরিচিত জীবনবন্ধু পরম আপ্যায়িত হইলেন। আপ্যায়িত হইলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুরুতর সন্দেহের সঞ্চার। আগন্তুকের প্রতি হঠাৎ ইনি এতদূর সদয়, ইহার ভাব কি ? পূর্ব্বেও লক্ষণে লক্ষণে বুঝা হইয়াছে, কোন নিদারুণ মিথ্যা অপবাদে পুলিসের লোকেরা তাঁহার পাছু পাছু ঘুরিতেছে ; সম্মুখে আসিয়া দেখা দিতেছে না, কিন্তু পাছু লইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই হারাণ ঠাকুর যদি পুলিসের লোক হন, তাহা হইলে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ঐরূপ আত্মীয়তা জানান অসম্ভব বোধ হয় না। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে রজনীপ্রভাতে নিশ্চয় আমি মহা বিপদে পড়িব। যাহা করেন ভগবান্, যাহা থাকে ভাগ্যে, তাহাই ঘটিবে, কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বিনা দোষে বিদেশে বিঘোরে আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, উপায় নাই। এইরূপ নানা চিন্তা

করিতে করিতে এক প্রহর রজনী থাকিতে জীবনবন্ধু তন্দ্রাভিভূত হইলেন, তন্দ্রা-বেশে কতই ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলেন, স্বপ্নে যেন কতই বিভীষিকা তাঁহার চক্ষের কাছে নৃত্য করিতে লাগিল; উষাকালেই তন্দ্রাভঙ্গে তাঁহার স্বপ্ন-ভঙ্গ হইল।

পূর্ব্ব-রজনীতে হারাণ ঠাকুর যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথার প্রতি অধিক নির্ভর না রাখিয়া রজনীপ্রভাতে জীবনবন্ধু বিদায় চাহিলেন। হারাণ ঠাকুর বলিলেন, "এত শীঘ্র আপনাকে বিদায় দিতে চাহি না, অনূ্যন এক পক্ষকাল আপনাকে আমার এই আশ্রমে অবস্থান করিতে হইবে। আমি আপনার পূর্ব্বতত্ত্ব সকলই অবগত আছি, যে আকস্মিক বিপদে বিনা কারণে আপনি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি; যাহাতে আপনার যন্ত্রণার উপশম হয়, এক পক্ষের মধ্যে আমি তাহার উপায় অবধারণ করিব, এই আমার বাসনা।"

পূর্ব্ব-রজনীর কথা জীবনবন্ধুর স্মরণ হইল। তিনি তখন মনে করিলেন, লৌকিকতার অনুরোধে মৌখিক সদ্ব্যবহার-বিবেচনায় এই সাধু লোকটীর প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এখনকার ভাব দেখিয়া বুঝিতেছি, বাস্তবিক সেটী মৌখিক নহে, আন্তরিক। অন্তরে কৃতজ্ঞতা রাখিয়া মুখে তিনি তখন হারাণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কি প্রকারে অবগত হইলেন? বিনা দোষে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, তাহাই বা আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া হারাণ ঠাকুর উত্তর দিলেন, "একজন অবধূত গুরুর নিকটে আমি যথাসম্ভব জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; শাস্ত্র-অধ্যয়নে যত দূর পূর্ণ-জ্ঞান জন্মিতে পারে, ততদূর জ্ঞানের অধিকারী আমি হইতে পারি নাই, কিন্তু নরনারীর ললাট-চিহ্ন দর্শনে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমি নির্ণয় করিতে শিখিয়াছি। কল্য সন্ধ্যাকালে আমার বালিকা-কন্যার সম্মুখে আপনাকে প্রথম দর্শন করিয়া অগ্রেই আমি আপনার ললাট-ফলকের প্রতি দৃষ্টিদান করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। সেই দর্শনেই আমি আপনাকে চিনিয়াছি, আপনার পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থাই জানিয়াছি। একপক্ষ কাল এখানে অবস্থান না করিয়া আপনি কোথাও যাইতে পারিবেন না, আমিও আপনাকে ছাড়িয়া দিব না।"

জ্যোতিষ-বিদ্যা জানি বলিয়া কতকগুলি লোক অপরের নিকটে ভাণ করে, গরিমা প্রকাশ করে, অপরকে প্রতারণা করিয়া অর্থ-গ্রহণের চেষ্টা পায়, ইহাই জীবনবন্ধু জানিতেন; হারাণ ঠাকুরের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া একবার তাহার মনে সেই ভাব আসিল, পরক্ষণেই আবার হারাণ ঠাকুরের দুই একটী বাক্যের গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। প্রণাম করিয়া ঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জন্মাবধি আপনাকে আমি চক্ষে দেখি নাই, আপনার আশ্রমে আমি আগন্তুক, আমাকে দেখিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'আপনি এখানে কতক্ষণ?' সেই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াই আমার বিস্ময় জন্মিয়াছিল। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন, সাহস করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, অকারণে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছেন? আকস্মিক বিপদের প্রকৃতি কিরূপ, দয়া করিয়া তাহা যদি আপনি আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার মানসিক যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হয়। অহরহ আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছি, সেই দাহ যাহাতে নিবারিত হইতে পারে, সেইরূপ মহৌষধ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার অন্তরাত্মা ব্যাকুল।"

পুনরায় জীবনবন্ধুর ললাট দর্শন করিয়া হারাণ ঠাকুর বলিলেন, "ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার অন্তরাত্মাকে আপাততঃ শান্তিজলে স্নান করাইতেছি। আপনি একজন ভূম্যধিকারীর উদ্যান-বাটিকায় অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই ভূম্যধিকারী আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসিয়াছিলেন, সেই ভালবাসায় ঈর্ষান্বিত হইয়া, ভূম্যধিকারীর একজন প্রিয়পাত্র আপনাকে বিপদে ফেলিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল; আজীবন আপনি নিষ্কলঙ্ক, কার্য্যে অথবা বাক্যে কোন প্রকার ছল প্রাপ্ত না হইয়া সেই দুষ্টবুদ্ধি চক্রীলোক মনে মনে নানা চক্র সৃষ্টি করিতে থাকে, সে চক্রের ঘূর্ণনে আপনাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই; তাহার পর, সেই লোক একটা সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যেখানে আপনি ছিলেন, তাহার এক ক্রোশ দূরে একটী বিধবা স্ত্রীলোকের বাটীতে এক রাত্রে ডাকাত পড়িয়াছিল, বিধবার প্রাণ-সংহার করিয়া ডাকাতেরা তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া দূরদেশে পলায়ন করে। যাহারা শান্তি-রক্ষক নাম ধারণ করিয়া, অজ্ঞাত অপরাধের অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এক এক সময় তাহারা এক এক প্রকার ভেল্কীতে বিমোহিত হইয়া নির্দ্দোষ লোকের সর্ব্বনাশসাধনে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে; তাহারা নিজেও

নানাপ্রকার ভেল্কী জানে; গ্রহদোষে আপনি তাহাদের একটা ভেল্কীর শিকার হইয়াছেন। পূর্ব্বকথিত ভূম্যধিকারীর সেই প্রিয়পাত্রের মন্ত্রণায় পলাতক আসামীর পরিবর্ত্তে, সেই লোক একজন শান্তি-রক্ষকের নিকটে আপনার নাম বলিয়া দেয়। দস্যুদলের সর্দ্দারের নামের সঙ্গে আপনার নামের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ভেল্কী-মোহিত শান্তি-রক্ষক সেই সাদৃশ্যের উপর ভর করিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে, দেশের যেখানে যত শান্তি-রক্ষকের আড্ডা আছে, সর্ব্বত্রই সেই মিথ্যা-সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে; সেই কারণে কোথাও আপনি সুস্থির হইতে পারিতেছেন না; দুইবার দুই প্রকারে আপনি আত্ম-বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন; ভয়ঙ্কর সংকল্প, সেপ্রকার পাপ সংকল্পকে আপনি আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না। যাহারা আপনাকে অন্বেষণ করিতেছে, তাহারা কেহই আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

ঠাকুরের প্রতি জীবনবন্ধুর ভক্তি হইয় ছিল, ঐ বৃত্তান্তগুলি শ্রবণ করিয়া সেই ভক্তি চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ঈর্ষা-পরায়ণ চক্রী লোকটাকে আমি বিশেষরূপে চিনিয়াছি, শান্তি-রক্ষকগণের ভেল্কীও বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু যে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের আশ্রয়ে আমি ছিলাম, বুঝিয়াছিলাম, তিনি সদাশয় লোক, তিনি কি প্রকারে অকস্মাৎ আমার প্রতি বিরূপ হইলেন?"

হারাণ ঠাকুর বলিলেন, "যে সকল লোকের সঙ্গে এই ঘটনার সংস্রব, তাহাদের মুখ না দেখিলে সকলের মনোভাব আমি বুঝিতে পারিব না; তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি, ভূম্যধিকারীটী একান্ত আশু-প্রত্যয়ী; যে যাহা বলে, তাহাতেই তাঁহার বিশ্বাস হয়, বিশেষতঃ প্রিয়পাত্রের কোন কথায় তিনি অবিশ্বাস করেন না। একটী গো-বৎস এক বাঘিনীর স্তনদুগ্ধ পান করিতেছে, একজন আশু-প্রত্যয়ী লোকের শ্যালক সেই অদ্ভুত সংবাদ আনাইয়াছিল, তিনি তাহা দেখিতে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হইতেছে, আপনার আশ্রয়-দাতা সেই ভূম্যধিকারীও সেই প্রকৃতির লোক। বিশেষ সংবাদ আমি কিছু বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনাকে অভয় দিয়া আমি বলিতেছি, অনিষ্টকল্পনায় কোন ব্যক্তি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

জীবনবন্ধু বুঝিলেন, ঠাকুরের সমস্ত কথাই সত্য; কয়েক দিবসাবধি তাঁহার

মনে যে অন্ধকার-ভীতির ক্রীড়া হইতেছিল, সেই ভীতিভাব কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইল; বিপদের কারণ তিনি জানিতে পারিলেন। ঠাকুরকে তিনি আর তখন বেশী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, বেলা হইল, স্নানাহার সমাপন করিয়া জীবন-বন্ধু চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিতে লাগিলেন; আপন ভাগ্যের সহিত মিলন করিবার অভিলাষে অভিমন্যু-বধের অংশটী পাঠ করিতে তিনি সমুৎসুক হইলেন।

দিন দিন দিন গত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে একপক্ষ অতীত হইয়া গেল; হারাণ ঠাকুর নিত্য নিত্য জীবনবন্ধুকে নানাপ্রকার প্রবোধ দেন, তাঁহার অবস্থার ন্যায় নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত বলেন, জীবনবন্ধু কতক কতক আশ্বস্ত হন। পক্ষান্তে হারাণ ঠাকুরকে তিনি বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা আমি পালন করিলাম, একপক্ষ গত হইল, এখন আমি বিদায়প্রার্থনা করি।"

হারাণ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবার অভিলাষ?" জীবনবন্ধু উত্তর করিলেন, "এখন আমি তীর্থযাত্রায় অভিলাষী।"

মানুষের মনে যে প্রকার অভিলাষ জাগে, প্রকাশ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনা হইতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। হারাণ ঠাকুর সন্তোষপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "উত্তম অভিলাষ; আপাততঃ কিছুদিন তীর্থবাস করাই আপনার পক্ষে শ্রেয়; অনেক পরিমাণে শান্তি প্রাপ্ত হইবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন, "দেখুন, যেখানেই যাইবেন, যেখানেই থাকিবেন, সাবধানতা পরিত্যাগ করিবেন না; অপরিচিত লোকের সঙ্গে অধিক কথা কহিবেন না; যে অবস্থা এখন দাঁড়াইয়াছে, সে অবস্থার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না; যদি কোথাও কোন আত্মীয়লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাহার কাছেও মনের কথা বলিবেন না। আর দেখুন, যে সাংঘাতিক কল্পনা দুইবার আপনার মনে উদয় হইয়াছিল, সে কল্পনা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন; ভগবান্দত্ত জীবন মহামূল্য, সে জীবন আপনি বাহির করিবার ইচ্ছা করিবেন না; আত্মহত্যা মহাপাপ, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। বিপদ্ ঘটিয়াছে, কোন কারণ নাই, অথচ বিপদ্ আসিয়াছে; সংসারে অনেকের ভাগ্যেই এইরূপ হয়; বিপদে অবসন্ন হইতে নাই, অবসন্ন হইবেন না, মনে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি রাখিবেন; বিপদ্ আপনাকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; ভগবান আপনাকে রক্ষা করিবেন।"

সুস্থির হইয়া জীবনবন্ধু ঐ উপদেশগুলি শুনিলেন, পালন করিবেন, বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সে দিন আর যাত্রা করা হইল না, পরদিন পঞ্জিকা বাহির করিয়া হারাণ ঠাকুর একটী শুভদিন দেখিয়া দিলেন, সেই শুভদিনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, কুসুমকুমারীকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া জীবনবন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাথেয়ের অভাব হইবে বিবেচনা করিয়া হারাণ ঠাকুর তাঁহাকে কুড়িটী টাকা দিলেন, নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, টাকা কয়েকটী গ্রহণপূর্ব্বক জীবনবন্ধু বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে বিপন্মুক্ত হইলে পুনরায় আসিয়া চরণ দর্শন করিব।" হারাণ ঠাকুর পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অদূরেই গঙ্গা। জীবনবন্ধু গঙ্গাতীরে। একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক ভব-তারণের উদ্যান হইতে হারাণ ঠাকুরের গৃহবাস পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া জীবনবন্ধু পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি ঘটনা একত্র মিলাইলেন। যাহাদের সহিত পূর্ব্বে পরিচয় ছিল, তাহাদের ব্যবহার আর যাঁহারা নিজ-সম্পর্ক, তাঁহাদের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধ হইল। গিরিশিখর গুপ্ত তাঁহার বন্ধু, হারাণ ঠাকুর একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ; গিরিশিখর মুখে দুটা মিষ্টকথা না বলিয়াই মিথ্যা একটা অছিলা করিয়া ধূলাপায়েই বিদায় করিয়া দিলেন, আর এই হারাণ ঠাকুর কতদূর উপকার করিলেন, ইহা তাঁহার মনে আসিল। হারাণ ঠাকুর টাকা দিলেন, সুসময় হইলে সে টাকা তিনি পরিশোধ করিবেন, এরূপ ইচ্ছা থাকিল। অর্থ-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা, যে গুহ্যকারণে তিনি বিপদ্গ্রস্ত, যে গুহ্য-কারণের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যন্ত্রণানলে তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন, হারাণ ঠাকুর সেই কারণ প্রকাশ করিয়া দিলেন। জ্বলন্ত আগুনে শান্তিজল নিক্ষেপ করি-লেন। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ বিপদ্মুক্ত হইলেন না, কিন্তু মিথ্যাকথা অধিক দিন ঢাকা থাকিবে না, সেই আশ্বাসে তিনি শীতল হইলেন। গিরিশিখর কি করিলেন? ভাগীরথীকে সাক্ষী করিয়া বার বার জীবনবন্ধু আপন মনে প্রশ্ন করি-লেন, "এ কালের বন্ধুলোকের কি এই ব্যবহার?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলেন, "এখন আমি যাই কোথায়?"

মা গঙ্গা এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, জীবনবন্ধু নিজেই উত্তর দিলেন। হারাণ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, তীর্থযাত্রা করিবেন। কোন্ তীর্থে গেলে সুখী হইতে পারিবেন? গিরিশিখরের অভদ্রতা স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়া মনকে বুঝাইলেন,

তাহাই এখন তাঁহার পক্ষে শ্রেয় বোধ হইল। মনকে যাহা তিনি বলিলেন, একজন সুরসজ্ঞ সুপণ্ডিত কথক-ঠাকুরের একটী গীত এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-মহাশয়কে তাহা আমরা বুঝাইব।

আলাইয়া—একতালা।

"চল রে মন বারাণসী।
কেন ত্রিতাপে তাপিত, সদা ভীত চিত,
হয়ে থাক দিবানিশি॥
সংসারের সুখে, থোকোনাকো আর,
হবে না হবে না, সে সুখ তোমার,
বৃথা কেন আর, আশা ক'রে তার,
বাঁধ গলে মায়া-ফাঁসী।
কলির কুহকে, ন্যায়-সরলতা,
রসাতলে গেছে নিঃস্বার্থ মমতা,
সুহৃদে মিশেছে ঘোর কুটিলতা,
সুহৃদ শোণিত-অভিলাষী॥"

* * * *

গঙ্গার দিকে চাহিয়া এই গীত গাহিয়া জীবনবন্ধু আপন মনকে প্রবোধদান করিলেন। কাশীযাত্রা করাই সংকল্প স্থির হইল। এককালে কাশীধামে উপস্থিত না হইয়া স্থানে স্থানে থামিয়া যাইবেন, নানাস্থানের লোকের ভাব-ভক্তি বুঝিবেন, সেই ইচ্ছায় একখানি তরণীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, যে স্থানে অনেক নৌকা বাঁধা থাকে, সেই স্থানে নৌকা খুঁজিতে হয় না; পথের মাঝখানে চল্‌তী নৌকার অপেক্ষা করিতে হয়। অর্দ্ধঘণ্টা পরে একখানি খালি নৌকা উত্তরমুখে যাইতেছিল, মাঝীকে ডাকিয়া জীবনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা কোথায় যাইবে?" মাঝী উত্তর করিল, "হুগলী।"

হুগলীতে যাওয়াই সৎপরামর্শ। সেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন পাওয়া যাইবে, যাত্রা করিবার আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, বিলম্ব হইবে না; তাহাই ভাল। এই স্থির করিয়া তিনি মাঝীকে ডাকিলেন। মাঝী নৌকা ভিড়াইল, তিনি আরোহণ করিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে হুগলীর কাছারী-ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। তাড়া চুকাইয়া দিয়া জীবনবন্ধু তীরে উঠিলেন। বেলা অনুমান দেড় প্রহর। আদালত তখন গুল্‌জার। জীবনবন্ধু মনে করিলেন, যে জন্য তিনি দেশত্যাগী, সেই অপরাধের কথাটা দেশব্যাপ্ত হইয়াছে, পুলিসের পরোয়ানায় হুলিয়া লেখা আছে, তাহাও নিশ্চয়। সেটা নিশ্চয় না হইলে পূর্ব্বকথিত গ্রামের বালকেরা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র "The same! The same! The same!" বলিয়া ভয় পাইয়া পলায়ন করিত না। ঐ ইংরাজী কথার অর্থ সেই লোক! সেই লোক! সেই লোক! মানুষের চেহারাকে পুলিসের ভাষায় হুলিয়া বলে। হুগলীর ফৌজদারী কাছারীর লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া হুলিয়া মিলাইতে পারে। তাহাতে কিরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে খানিকক্ষণ তিনি কাছারীর সম্মুখে সম্মুখে ধীরে ধীরে বেড়াইলেন। চাপরাশীরা বাহিরে আসিতেছে, ভিতরে যাইতেছে, আসামী-ফরিয়াদীর নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে; কাণে কলম গুঁজিয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন আমলাও বৃক্ষতলে পান-তামাক খাইয়া যাইতেছে; মোক্তারেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; ইচ্ছা করিয়া না হউক, হঠাৎ দৃষ্টিপাতে তাহারা সকলেই জীবনবন্ধুকে দেখিল; কেহ কেহ অল্পক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল, তাহার পর স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল; কেহই কিছু বলিল না। জীবনবন্ধু বুঝিলেন, এ প্রকার খোলা জায়গায় কেহ তাঁহাকে ধরিবে না, গোয়েন্দা হইয়াও পুলিসে খবর দিবে না। তিনি কোথাও আশ্রয় লইলে পুলিস গুপ্তভাবে তাঁহাকে উত্তংখুত্তং করিবে।

যেখানে যাহাই হউক, বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া যাত্রা করাই ভাল। কাছারীর সম্মুখে অনেকগুলা ভাড়াটীয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি হুগলী ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। বেলা অনেক হইয়াছিল, স্নানাহার হয় নাই, একটী পল্লীগ্রামে নামিয়া স্নানাহার করা আবশ্যক, ইহা ভাবিয়া খনিয়ান ষ্টেশনের টিকিট কিনিয়া অবিলম্বে তিনি খনিয়ানে পৌঁছিলেন; নিকটে একখানা দোকান, সেই দোকানে বস্ত্রাদি রাখিয়া একটী সরোবরে স্নান করিয়া দোকানে কিছু জল খাইলেন, জলখাবার সামগ্রী এক পয়সার কিনিয়া। দোকানীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস আছে?" দোকানী বলিল, "অনেক।"

পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জীবনবন্ধু এক ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার পরিচয় লইয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করাইলেন। কিন্তু কর্ত্তার মুখের ভাব দেখিয়া জীবনবন্ধু বুঝিলেন, এই ব্রাহ্মণের মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছে। বাড়ীর নিকটে একখানা সেক্‌রার দোকান। সেক্‌রা দুই তিন বার জেল খাটিয়াছিল, ঐ ব্রাহ্মণের মুখে "জীবনবন্ধু" নাম শুনিয়া তাহার আহ্লাদ হইল। আহারান্তে জীবনবন্ধু একটী বাহিরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেক্‌রার দোকানের দিকে সেই ঘরের একটা জানালা ছিল। জানালার কপাট বন্ধ ছিল না। জীবনবন্ধু দুইবার সেই জানালায় মুখ বাড়াইয়া সেক্‌রাদের কথা শুনিলেন। একজন বলিল, "কোথাকরে পাপ কোথায়! এ যদি রাত্রে এখানে থাকে, গ্রামশুদ্ধ লোককে জাগাবে। এই বেলা থানায় খবর দেওয়া যাক্।"

যে লোক ঐ কথা বলিল, সে জীবনবন্ধুকে দেখিতে পায় নাই; দোকানের কেহই দেখিতে পায় নাই। বাড়ীর কর্ত্তা একবার সেই দোকানে গেলেন, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জীবনকে কহিলেন, "আমার বাড়ীতে ঘর কম, রাত্রিতে তোমার এখানে থাকা হইবে না।" মৃদু হাসিয়া জীবনবন্ধু কহিলেন, "থাকিবার জন্য আমি আসি নাই, নিকটেই ষ্টেশন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি রওনা হইব।"

গৃহস্বামী সন্তুষ্ট হইলেন, আর একবার সেই দোকানে গেলেন। জীবনবন্ধু শুনিলেন, সর্দ্দার সেক্‌রা বলিল, "তবে ত একটা বড় মাছ হাত-ছাড়া হয়ে যায়। ঐ লোককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে, এই বেলা খবর দেওয়া যাক।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অতিথি;—আমার বাড়ী হইতে অতিথিকে ধরাইয়া দেওয়া হইবে না। চোর বটে;—সেটা ঠিক; কেবল ফ্যালফেলে চাহনি। দুইবার জানালা দিয়া উঁকি মারিয়াছিল, ছট্‌ফট্ করিতে-ছিল; তাহা আমি দেখিয়াছি। কিন্তু আমার বাটী হইতে ধরান হইবে না। তোমরা যদি পুলিসে খবর দিতে চাও, দাও। চোর ষ্টেশনে যাইবে, সেইখানে যাহা হয় ঘটিবে। এখান হইতে যাইতে দাও।"

সকল কথাই জীবনবন্ধুর কর্ণে গেল। সেক্‌রার লোকেরা পুলিসে গেল কি না, তাহা তিনি জানিলেন না। শেষবেলায় ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ষ্টেশনে গেলেন। সেখানে কেহই তাঁহাকে কিছু বলিল না। মেমারীর

টিকিট কিনিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে তিনি রওনা হইলেন। যে গাড়ীতে তিনি যাইতেছিলেন, বৈঁচী ষ্টেশনে সেই গাড়ীতে একটী ভদ্রলোক উঠিলেন। তাঁহার সহিত জীবনবন্ধুর আলাপ হইল। লোকটীর নাম দেবকুমার তরফদার।

পরিচয়-প্রসঙ্গে দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি মেমারীতে যাইতেছেন, সেখানে কি আপনার আত্মীয়লোক কেহ আছে?" জীবনবন্ধু উত্তর করিলেন, "আত্মীয় কেহ নাই, কোন বাড়ীতে অতিথি হইয়া নিশাযাপন করিব, এই আমার অভিলাষ। সমস্ত দিন আহার হয় নাই।"

মুখপানে তাকাইয়া দেবকুমার বলিলেন, অতিথি হওয়া ভিন্ন অন্য কার্য্য যদি না থাকে, তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমার নিবাস রাজবঙ্গে; সেখানে আপনি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন, কোন কষ্ট হইবে না, আপনার গুণে আমি প্রীত হইয়াছি, আহার হয় নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। চলুন, একসঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া সুখী হইব।"

টিকিটের কথা উঠিল। দেবকুমার বলিলেন, "মেমারী হইতে রাজবঙ্গের যত ভাড়া, তাহা সেইখানে নগদ দিলেই চলিবে।"

জীবনবন্ধু সম্মত হইলেন, রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রাজবঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবকুমারের বাটীতে গেলেন। বাড়ীখানি দোতালা, সদর-বাড়ীতে নাটমন্দিরের উঠানে একখানি লম্বা ঘর, সম্মুখে বড় বড় থাম, থামে থামে নানাজাতি পশু-পক্ষীর আকৃতি খোদিত করা। সেই ঘরে জীবনবন্ধুকে বসাইয়া দেবকুমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইল।

জীবনবন্ধুকে সেই নাটমন্দিরে একাকী থাকিতে হইল না। একধারে বৃহৎ একখানা সতরঞ্চ পাতা, সতরঞ্চের উপর পাঁচ সাত জন খড়ি মাখা জটাধারী সন্ন্যাসী বসিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া মাথা ঘুরাইয়া গান গাহিতেছিল, নিকটে জীবনবন্ধু বসিয়া সেই গীত শুনিতে লাগিলেন। গীতের সুর ছাপাইয়া বাদ্যধ্বনি উপরে উঠিতেছিল, গীতের একটী বর্ণও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। একটী ত্রিপদী লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে সন্ন্যাসিগণের চেহারা তিনি দর্শন করিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গীত-শ্রবণে তুষ্ট হইল না, দর্শনেন্দ্রিয়ও সন্ন্যাসি-গণের মূর্ত্তি-দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। বেলা হইয়াছে, খড়ি-মাখা সন্ন্যাসী, সর্ব্বাঙ্গেই খড়ি, চক্ষের কোলে কোলে রক্তবর্ণ রেখা টানা, ভ্রূর

উপরিভাগে এক অঙ্গুলি প্রশস্ত পীতবর্ণ রেখা, ললাটে সিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্রক, অধরোষ্ঠে তাম্বূলরাগের ন্যায় রক্তবর্ণ রেখা, গলদেশে দীর্ঘ দীর্ঘ রুদ্রাক্ষমালা, বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধান কৌপীন। জীবনবন্ধু তাহাদের নিকটে বসিয়াছিলেন, তাহাদের গায়ের দুর্গন্ধে অধিকক্ষণ সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, যেস্থানে আলো জ্বলিতেছিল, সেই স্থানে সরিয়া গিয়া নিরাসনে বসিলেন। সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

গীত থামিল। ঢাকের বাদ্য থামিলে লোকের কর্ণ যেমন জুড়ায়, সন্ন্যাসিদের সঙ্গীত থামিলে জীবনবন্ধুর কর্ণ সেইরূপ জুড়াইল। কর্ণ জুড়াইল, কিন্তু চক্ষু জুড়াইল না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর একটা উৎকট গন্ধে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। সন্ন্যাসীরা গাঁজা খাইতে আরম্ভ করিল। গাঁজা না খাইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করা হয় না, প্রায় সমস্ত ভণ্ড সন্ন্যাসীর এইরূপ সংস্কার। লোকালয়ে দলে দলে সন্ন্যাসী বেড়ায়, নদীতীরে, বৃক্ষতলে, প্রান্তরে যে সকল সন্ন্যাসী আড্ডা করে, গৃহস্থকে ভয় দেখাইয়া কুলকন্যাগণকে ঔষধ দিবার ভাণ করিয়া, নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া, যে সকল সন্ন্যাসী ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে চৌর্য্যবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহারা সকলেই প্রায় ভণ্ড; তাহাদের দলে ছেলে-করা সন্ন্যাসীও দুই একজন দৃষ্ট হয়; কার্য্যতঃ এই প্রকার, কিন্তু সকলেই তাহারা ধূনী জ্বালাইয়া গাঁজা খায়। কৈলাসধামে অথবা শ্মশানবাসে সদাশিব কি করিতেন, মানুষে তাহা জানে না, মহাযোগী মহেশ্বরকে স্বচক্ষে কেহ দর্শন করে নাই, তথাপি ঐ দলের সন্ন্যাসীরা স্পষ্টই বলে, "সন্ন্যাসী শিব গাঁজা খাইতেন, এই কারণে আমাদিগকেও গাঁজা খাইতে হয়। গাঁজা খাওয়াই সন্ন্যাস।" ভণ্ড সন্ন্যাসীর বাক্যে ইহাই লোকে শুনিতে পায়, প্রকৃত সন্ন্যাসের বিষয়, প্রায় কাহারও মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় না। "আনন্দলহর" অভিধেয় একখানি সঙ্গীত-পুস্তক হইতে একটী গীত এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

ঝিঁঝিঁট মিশ্র—একতালা।

"লাল-কাপুড়ে যারা ভবে,
সাধু সন্ন্যাসী কি তারাই হবে?
ঢের দেখি ত জটাধারী, বেড়ায় ঘুরে সাধু ভাবে,
অথচ হয় কার্য্য এমন পাপী যা না কর্ত্তে চাবে।

গৃহীর মাঝে এরূপ সাধু অনেক আছে দেখ্‌তে পাবে,
যাদের কাছে ভস্মমাখা জন্তুগুলা মানুষ হবে।
প্রকৃত হয় সাধু যেবা কাঁধে ধ্বজা সে না লবে,
গাছের তলে আড্ডা ক'রে হরদম্ না গাঁজা খাবে।
গৃহ ছেড়ে মাঠে প'ড়ে ভূতের মত ক্লেশ যে সবে,
নিশ্চয় সে ভণ্ড পাকা সাধু নামে কালি দিবে।
হবিষ্যে সে নয় সাধুত্ব নয় তা অসার পূজা-স্তবে,
কিম্বা না হয় হুজুগ ব্রতে সাম্প্রদায়িক মহোৎসবে।
সৎশব্দটা সাধু-বাচক সাধুর মনে মল না রবে,
সরস সরল প্রাণ যাহার প্রশংসা তার সাধু রবে।
আত্মধর্ম্মে সাধ থাকিলে সাধু শ্রেষ্ঠ তাকেই কবে,
কিন্তু বলি তেমন সাধু ঘর বন না তফাৎ ভাবে।
প্রীতির চোকে সবকে দেখে সদাই যেন প্রেমভাবে,
বরঞ্চ সে পাপীজনে রাখে কাছে সুগৌরবে।
হয়ে দীন নিরভিমান যে কোন কাজ করে যবে,
পরকে করি তুষ্ট আগে নিজে তুষ্টি লভে তবে।
আনন্দ কয় ধর্ম্মধ্বজীর সুবিধা এই আছে তবে,
গৃহে যত হইত দোষী তত না দোষ লোকে গাবে॥"

সন্ন্যাসীদের গাঁজা খাওয়া হইল, পুনরায় তাহারা কর্ণবধিরকারী খচমচ বাদ্য বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত ধরিল। জীবনবন্ধু ক্রমাগত বিরক্ত হইতে লাগিলেন। দেবকুমার বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী-দের উপর দেবকুমারের অচলা ভক্তি। প্রায় নিত্যই তাঁহার বাটীতে অতিথি-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়, সেবা হয়, গীত হয়, গাঁজা খাওয়া হয়, মহা মহোৎসব। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর জন্য একসের আটা, এক পোয়া ঘৃত, আধসের আলু, এক ছটাক গাঁজা বরাদ্দ। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় চারিজন সন্ন্যাসী বড় বড় পাত্রে আটা মাখিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে গীত চলিল। জীবনবন্ধুর জঠরা-নল জ্বলিতেছিল, তিনি ভাবিতেছিলেন, তরফদার কি জাতি? তরফদার ব্রাহ্মণ

হয়, অন্য জাতিও হয়, কিন্তু এই দেবকুমার তরফদার ব্রাহ্মণ কি না, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। অসৎজাতি হইলে তাঁহাকে তত রাত্রে নিজে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়।

দেবকুমার তরফদার সন্ন্যাসীদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জীবনবন্ধুর নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "বড় দুঃখিত হইতেছি, সমস্ত দিন আপনার আহার হয় নাই, আমাদের বাড়ীতে রাত্রিকালে কেহ অন্নাহার করেন না, আপনার আহারের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়? নিকটে এক ঘর ব্রাহ্মণের বাড়ী আছে, অতি নিকটে, যাইতে কষ্ট হইবে না, আমার চাকর লণ্ঠন ধরিয়া লইয়া যাইবে; সেখানে গিয়া আহার করিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?"

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আহার করিতে কায়স্থ-সন্তানের আপত্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ সমস্ত দিন পেটে অন্ন নাই। জীবনবন্ধু তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাড়ীর একজন উৎকলী ভৃত্য লণ্ঠন ধরিয়া তাঁহাকে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গেল, তত রাত্রে ব্রাহ্মণ-পরিবারের আহারাদি চুকিয়া গিয়াছিল, উদ্বৃত্ত অন্নে জল দেওয়া ছিল, জীবনবন্ধু সেই পর্য্যুষিত অন্ন অম্লান-বদনে ভোজন করিলেন। উপকরণ ছিল যৎকিঞ্চিৎ মাছের টক আর কিঞ্চিৎ লবণ, আর কিছুই না।

আহারান্তে জীবনবন্ধু দেবকুমারের নাটমন্দিরে আসিলেন, সেইখানেই শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া দেবকুমার তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন;—অন্দরমহলে নয়, মাঝের মহলে; সে মহলে স্ত্রীলোকেরা আসে না। একটী গৃহে দুটী শয্যা প্রস্তুত হইল;—একটীতে দেবকুমার, দ্বিতীয়টীতে জীবনবন্ধু শয়ন করিলেন। রেলওয়ে শকটে জীবনবন্ধু একটী গল্প আরম্ভ করিয়াছিলেন, গল্পের নাম নারদের সংসারী হওয়া। গল্পটী দেবকুমারকে বড় ভাল লাগিয়াছিল, শয়ন করিয়া সেই গল্পটী সমাপ্ত করিবার জন্য জীবনবন্ধুকে তিনি অনুরোধ করিলেন। জীবনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের জলপিপাসায় ক্লান্তিবোধ হওয়া পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় বাটীর বাহিরে উচ্চৈঃস্বরে চৌকীদার ডাকিল। জীবনবন্ধুকে বাটীতে আনিয়া দেবকুমার নিজ পাড়ার চৌকীদারকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় সে যেন তাঁহাকে জাগাইয়া দেয়। জাগাইতে হইল না, তিনি জাগিয়াই ছিলেন, উঠিয়া বসিয়া জীবনবন্ধুকে বলিলেন,

"আধ ঘণ্টা পরে রেল-গাড়ী ছাড়িবে, আপনি এই বেলা চৌকীদারের সঙ্গে ষ্টেশনে যান।" জীবনবন্ধুও শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

তরফদার মহাশয় চৌকীদারকে ডাকিলেন, চৌকীদার আসিল। বিশেষ শিষ্টাচার জানাইয়া জীবনবন্ধুকে সেই চৌকীদারের সঙ্গে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। জীবনবন্ধু সেই ঘরের চৌকাঠ পার হইবার পর একটী নিশ্বাস ফেলিয়া দেবকুমার অনুচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, "বাঁচা গেল! পুলিসের পলাতক আসামী!"

অনুচ্চকণ্ঠে উক্ত হইলেও কথাগুলি জীবনবন্ধুর কর্ণে প্রবেশ করিল। অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়া আপন মনে তিনি ভাবিলেন, "ওঃ! এই জন্যই আজ রাত্রে ইনি ঘুমাইলেন না, আমাকেও ঘুমাইতে দিলেন না। গল্প শুনিবার ছল! যদি ইনি জানিতেন, যাহা বলিলেন, তাহাই আমি, তবে আদর করিয়া রেল-গাড়ী হইতে আমাকে নিজ বাটীতে আনিয়াছিলেন কি জন্য? সেই সেক্‌রার দোকানে একজন বলিয়াছিল, আমাকে ধরিয়া দিবার জন্য হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে, এই তরফদার মহাশয় বোধ হয় সে কথা শুনিয়া থাকিবেন; সেই পুরস্কারের লোভেই হয় তো সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; শেষে আবার কি ভাবিয়া রাত্রি জাগাইয়া অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করিয়া দিলেন; হঠাৎ ধরাইলে পাছে কোন প্রকার ফঁ্যাসাদে পড়িতে হয়, সেই ভয়েই হয় তো ধরাইলেন না। ভবতারণের বাগান হইতে বাহির হইবার পর যে যে স্থানে আমি গিয়াছি, যে সকল লোকের সঙ্গে দেখা করিয়াছি, হারাণ ঠাকুর ছাড়া সকলেই বোধ হয়, ঐরূপ ফঁ্যাসাদের ভয়ে আমাকে ধরাইয়া দেয় নাই। দিলে কিন্তু ভাল হইত, শীঘ্র আমি এই বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইতাম। যে ব্যক্তি ধরাইত, নিশ্চয়ই তাহাকে ফঁ্যাসাদে পড়িতে হইত, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য যাহারা অপরাধ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, আমি যে তাহাদের দলের কেহই নই, তাহা প্রমাণ হইতে পারিত। অন্য লোকে ধরাইয়া দিলে যদি প্রমাণ হইতে পারিত, আমি নিজে ধরা দিলে প্রমাণ হইতে পারিবে না কেন, তাহাও আমি অনেকবার চিন্তা করিয়াছি। ধরা দিয়া কাহাকে আমি কি বলিব, তাহা আমি জানি না; কি প্রকার অপরাধ, কোথায় সেই অপরাধ হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত আমি অজ্ঞাত; নিজে ধরা দিবার উপায় নাই।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চৌকীদারের সঙ্গে জীবনবন্ধু উষাকালে রাজবল্লভ ষ্টেশনে পৌছিলেন, টিকিট কিনিয়া শকটে আরোহণ করিয়া যথাসময়ে মোগল-সরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের স্বতন্ত্র শকটে আরোহণ করিয়া বারাণসী রাজঘাটে উপস্থিত। সেই স্থানে আট দশ জন গঙ্গাপুত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একা ভাড়া করিয়া দিবে, বাসা ঠিক করিয়া দিবে, ঠাকুর দেখাইবে, এই সকল তাহাদের কথা। জীবনবন্ধু তাহাদের মধ্যে একজনকে একটু ভালমানুষবিবেচনা করিয়া, তাহাকে বলিলেন, "বাসা করিতে হইবে না, সোণারপুরা মহল্লার রামজীবন পাঠকের বাড়ীতে আমি যাইব, তুমি সেইখানে আমাকে লইয়া চল, আমি তোমাকে চারি আনা পয়সা দিব।"

সেই লোকটীর নাম জংলু। চারি আনা পুরস্কারের নামে সন্তুষ্ট হইয়া, জংলু একখানা একা ভাড়া করিয়া জীবনবন্ধুকে সোণারপুরায় লইয়া গেল; রামজীবন পাঠকের বাড়ী তাহার জানা ছিল, সেই বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া চারি আনা বক্‌সীস লইয়া ফিরিয়া আসিল।

জীবনবন্ধু স্বদেশে যখন ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, ঐ রামজীবন পাঠক সেই সময়ে সেই বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ছিলেন; জীবনবন্ধু তাঁহার নিকটে চারি বৎসর কাল ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। রামজীবন তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। দশ বৎসর হইল, রামজীবন পাঠক কাশীবাস করিয়াছেন, জীবনবন্ধু তাহা জানিতেন। সোণারপুরায় তিনি থাকেন, পত্র দ্বারা তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। যখন তিনি উপস্থিত হইলেন, রামজীবন তখন বাড়ীতে ছিলেন না; তাঁহার দুটী পুত্র একটী ঘরে বসিয়া ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেছিল। তাহারা জীবনবন্ধুকে চিনিত না, চিনিল না; কিন্তু অভ্যর্থনা করাইয়া বসাইয়া শিষ্টাচারে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল; স্নান-আহার হয় নাই শুনিয়া স্নানের আয়োজন করিয়া দিল; জীবনবন্ধু স্নান করিলেন। বালকেরা জলখাবার আনিয়া দিল, তিনি জল খাইতেছেন, এমন সময় পাঠক মহাশয় বাড়ী আসিলেন, অপ্রত্যাশিতরূপে প্রিয় ছাত্রকে নিজালয়ে দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, আদর করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যতদূর কুশল, যতদূর অকুশল, জীবনবন্ধু সংক্ষেপে সংক্ষেপে পণ্ডিত মহাশয়কে তাহা জানাইলেন। উপস্থিত বিপদের স্বরূপ কি, তাহা তিনি নিজে জানিতেন

না, সুতরাং "সম্প্রতি একটা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি" এই মাত্র বলিয়াই তাঁহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে হইল।

পাঠক মহাশয় বলিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার প্রকৃতি আমি জানি, তুমি কোন অপরাধ করিতে পার না। তোমার দ্বারা কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব। মিথ্যা অপবাদে যদি তুমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক, কুজ্‌ঝটিকা সরিয়া গেলে সূর্য্য যেমন অধিক তেজে প্রকাশিত হন, তোমার অপবাদরূপ কুজ্‌ঝটিকা বিদূরিত হইলে তুমিও সেইরূপ সূর্য্যের ন্যায় বিমল দীপ্তি প্রাপ্ত হইবে। যতদিন ইচ্ছা, আমার এখানে তুমি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার।"

আহারাদি হইল। বৈকালে জীবনবন্ধুকে নিকটে বসাইয়া নানাকথা-প্রসঙ্গে পাঠক মহাশয় তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রামজীবন পাঠক স্বদেশে যদিও স্কুল-পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অধিক আয় ছিল না, কিন্তু তাঁহার মাতামহের মৃত্যুর পর তিনি তদীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। মাতামহ নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার বিষয়ের আয় ছিল বার্ষিক পাঁচশত টাকা। রামজীবন স্বদেশে বাস করা অসুখের হেতু মনে করিয়া, সেই সকল বিষয় বিক্রয় করেন; অনন্তর স্ত্রী-পুত্র লইয়া কাশীবাস করিয়াছেন। কাশীতে বাড়ী খুব সস্তা, সোণারপুরা মহল্লায় তিনি দুইখানি বাড়ী খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। একখানিতে সপরিবারে বাস করেন, দ্বিতীয়খানি ভাড়া দেওয়া হয়। যে সময় জীবনবন্ধু উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভাড়াটিয়া বাড়ীখানি সে সময় খালি ছিল; সেই বাড়ীতেই জীবনবন্ধুর থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বাড়ীতেই তিনি রহিলেন। রামজীবনের বাসভবনেই আহারাদি চলিতে লাগিল, নিশাকালে সেই নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে শয়নের বন্দোবস্ত। অবকাশকালে জীবনবন্ধু সেই বাড়ীতে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, মনে যাহা উদয় হইত, সেই সকল বিষয় লিখিয়া লিখিয়া রাখিতেন; ভবতারণের উদ্যান হইতে প্রস্থান করিবার পর যে দিন যেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, একখানি খাতায় তাহাও লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালয় হইতে আসিয়া রামজীবনের পুত্রেরা জীবনবন্ধুর বাড়ীতে গিয়া বসিত, পড়া জানিয়া লইত, কোন বস্তু আবশ্যক হইলে বালকেরাই তাহা আনিয়া দিত। বাসবাটী হইতে সে বাটী অধিক দূর ছিল না; রামজীবন নিজেও দিনের মধ্যে দুইবার সেই বাড়ীতে গিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেন।

একমাস এই ভাবে চলিল। মাথার উপর কোন প্রকার বিপদ্ আছে, ঐ একমাসের মধ্যে জীবনবন্ধু তেমন কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, সে সংবাদটা কাশী পর্য্যন্ত আইসে নাই, সেই কারণেই কাশীধাম তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্। নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন, পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করেন, মধ্যে মধ্যে অপরাপর দেব-দেবীগুলিও দর্শন করিয়া আইসেন। এক একদিন সিক্রোলে গিয়া আদালতগুলি দর্শন করেন, আদালতেও আপন ভাগ্যের কোনরূপ বিপরীত লক্ষণ জানিতে পারেন না। চিত্ত অনেকটা সুস্থির।

এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল, দেড় মাস কাটিয়া গেল, সেই সময় একটী কথা জীবনবন্ধুর মনে পড়িল। যে গ্রামে তাঁহার নিবাস, সেই গ্রামে রতিকান্ত মিত্র নামে তাঁহার একটী সহপাঠী বন্ধু আছেন, অনেকদিন তাঁহার সমাচার প্রাপ্ত হন নাই, নিজ বাঁড়ীর সমাচারও জানিতে পারেন নাই; বাড়ীতে পত্র না লিখিয়া সেই রতিকান্তের নামে একদিন তিনি একখানি পত্র লিখিলেন; কোথায় আছেন, সে ঠিকানাও সেই পত্রে লিখিয়া দিলেন; উপস্থিত বিপদের কথা কিছু লিখিলেন না।

দশ দিন গেল। রামজীবন পাঠকের একটী নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন, বাসভবনে শতাধিক ব্রাহ্মণ-ভোজনের স্থান সঙ্কুলান হইবে না, তজ্জন্য জীবনবন্ধুর বাসস্থানেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইল। অনেকগুলি নূতন লোক সেই দিন সেইখানে জীবনবন্ধুকে দেখিল। রামজীবন তাহাদের নিকটে জীবনবন্ধুর পরিচয় দিয়া দিলেন। পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া গেল, ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইবার অল্পক্ষণ বাকী। উচ্ছিষ্ট-পত্রাদি প্রাঙ্গণে পড়িয়া ছিল, একটী দশমবর্ষীয়া হিন্দুস্থানী বালিকা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সকল পত্রের অবশিষ্ট সন্দেশ, জিলিপি, আম্র, মৎস্য ইত্যাদি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইতে লাগিল, আপনার জীর্ণ মলিন বসনাঞ্চলে কতক কতক সামগ্রী বাঁধিয়া লইতে লাগিল। লোকের দুঃখ দেখিলে জীবনবন্ধুর কষ্ট হইত, দরিদ্র বালিকার সেইরূপ কার্য্য দর্শনে তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল। একস্থানে দাঁড়াইয়া কাতর-নয়নে তাহা তিনি দেখিতেছেন, এমন সময় বাটীর বাহিরে উচ্চ গম্ভীর আওয়াজে কাহারা তাঁহার

নাম উচ্চারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, সেই আওয়াজ তিনি শ্রবণ করিলেন। মন চমকিয়া উঠিল। এতদিনের পর এখানে আবার এ কি কাণ্ড, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুলোকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, পূর্ব্বকথিত শত্রুর আওয়াজের মধ্যে সেই ভাবের অনেক কথা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন। এতদিন যাহারা নিস্তব্ধ ছিল, হঠাৎ তাহারা কেন এমন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রথমে তাহা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। চিত্ত অস্থির অনেক ভাবনা একত্র হইল।

চারি পাঁচজন মেট্রো স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া, উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া, পরিত্যক্ত পত্রাদি স্থানান্তরিত করিল। সন্ধ্যা হইল। জীবনবন্ধু আপন শয়নগৃহে আলো জ্বালিলেন। অপরাহ্ণে ভোজন করা হইয়াছিল, রাত্রে আর খুব ক্ষুধা হইবে না, রামজীবনের বাটীতে আহার করিতে যাইতে হইবে না, উদ্বিগ্ন-চিত্তে একখানি পুস্তক লইয়া তিনি পড়িতে বসিলেন। পুস্তক ভাল লাগিল না, পাঠের দিকে মন গেল না, অক্ষর দেখিতেও যেন ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে ঝাপ্‌সা আসিতে লাগিল। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একটী গবাক্ষের নিকটে গিয়া চঞ্চল-দৃষ্টিতে রাস্তা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাস্তা দিয়া দুই একজন লোক চলিয়া যাইতেছে, উপরদিকে কেহ চাহিয়া দেখিতেছে না, কেহ কোন কথাও কহিতেছে না। পুনর্ব্বার হঠাৎ বাড়ীর অন্তদিকে পূর্ব্বরূপ চীৎকার। "জীবনবাবু—জীবনবাবু বাঙ্গালী ভারী তুখোড় লোক, হাতকড়ি বাঁধিতে হইবে—হাট-চোর—ভারী বদমাস্।"

বার বার ঐ সকল কথা। জীবনবন্ধুর বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার অজ্ঞাতে দুটী চক্ষু দিয়া জল পড়িল, গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া শয্যার উপরে তিনি বসিলেন; বসিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, শয়ন করিলেন। শয়নেও শান্তি নাই; দিব্য পরিষ্কৃত শয্যা, তথাপি তাঁহার গাত্রে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল। বারকতক এপাশ ওপাশ করিয়া মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। সেই প্রকার বিকট চীৎকার পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, আবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ললাটে করমর্দ্দন করিতে করিতে অস্থির চরণে গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যে বাড়ীতে তাঁহার বাসা, সেই বাড়ীর অদূরে একটা পুলিসের ফাঁড়ী। সেই ফাঁড়ীর সম্মুখে গোলমাল হইতেছিল। কে একজন বলিতেছিল, "নকুল তোরা কেন ওটাকে রেখেছিস্? বদমাস! তাড়িয়ে দে! চোর! তাড়িয়ে দে! পরোয়ানা আছে! গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! এতদিন জানা যায় নাই। ভারী ধড়ীবাজ!"

কে কাহাকে ঐ সকল কথা বলিল, জীবনবন্ধু তাহা বুঝিতে পারিলেন। রামজীবন পাঠকের একটী পুত্রের নাম নকুলেশ্বর। সেই নকুলেশ্বর এক একবার ফাঁড়ীর জমাদারের কাছে যাইত, হিন্দুস্থানী গল্প শুনিত, জমাদার তাহাকে মিঠাই খাইতে দিত। নকুলেশ্বর আজিও জমাদারের কাছে আসিয়াছে, জমাদার তাহাকেই ঐ সকল কথা বলিতেছে। পূর্ব্বে দুই তিনবার আভাষ পাওয়া গিয়াছিল, সুতরাং উহা বুঝিতে জীবনবন্ধুর বাকী রহিল না। নকুলেশ্বর কিরূপ উত্তর দিল, তাহা তিনি শুনিতে পাইলেন না।

চিত্ত যতদূর অস্থির হইতে হয়, তাহা হইল, জীবনবন্ধু আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার আসিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। প্রায় দেড়মাস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছে, কোন উৎপাত ছিল না, হঠাৎ কেন এমন হইল? কে আসিয়া এখানকার পুলিসে সেই মিথ্যা সংবাদটা প্রচার করিয়া দিল? ভাবিতে ভাবিতে তিনি একবার উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, রাস্তায় বাহির হইয়া যে দিকে গোলমাল হইতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কেহ কোথাও নাই, সমস্তই পরিষ্কার!

জীবনবন্ধু পুনরায় চিন্তাকুল-অন্তরে উপরে গিয়া উঠিলেন, শয়ন করিলেন। এ সংবাদ কাশীতে কিরূপে আসিল, অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা। যখন তাঁহার বিপদ্ ঘটে নাই, তখন তিনি একবার শুনিয়াছিলেন, পলাতক আসামীর সন্ধান করিবার জন্য পুলিসের লোকেরা অনেক জায়গায় গোপনে গোপনে এক একটা খবর দিয়া রাখে, সেই নামের আসামী যেখানে যেখানে যায়, যেখানে যেখানে তাহার সম্বন্ধ, যেখানে যেখানে তাহার কোন আত্মীয়লোক থাকে, আসামী কোথায় আছে, সেই সেই স্থানের লোকেরা যদি লোক-মুখে কিম্বা পত্রদ্বারা সংবাদ পায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ পুলিস-থানায় যেন জানাইয়া আইসে। সেই কথা জীবনবন্ধুর মনে পড়িল, স্বগ্রামে রতিকান্ত মিত্রকে তিনি এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই কথা মনে পড়িল। তখন তিনি স্থির করিলেন, তাহাই ঠিক।

রতিকান্ত মিত্র পুলিসের উপদেশে সেই পত্রের কথা পুলিসে জানাইয়াছে, তাহার পরেই কাশীতে সংবাদ আসিয়াছে। তবে ত কাশী আর এখন তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্ নহে, কাশীপুরী পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। শীঘ্র যদি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে একপ্রকার ধরা দেওয়া হইবে, রামজীবনের মনেও সন্দেহ জন্মিবে, শীঘ্র পরিত্যাগ করা হইবে না, উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে তাহাই তিনি অবধারণ করিলেন।

সপ্তাহ অতীত হইল, গোলমালের কথাটা রামজীবন পাঠক শুনিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না, তিনিই জানিতেন; নিজে কিন্তু জীবনবন্ধুকে কোন কথা বলেন নাই, পুত্রেরাও কিছু না বলে, তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্তাহান্তে জীবনবন্ধু রামজীবন পাঠকের বাটী হইতে আহার করিয়া নিজের বাসায় আসিতেছিলেন, রক্তবর্ণ ছিটের চাপকান-পরা দীর্ঘ টিকীধারী একটা লোক হো- -হো করিয়া হাসিয়া, দুর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "চোর পালায়! চোর পালায়!" ঐ কথা বলিয়াই সেই লোকটা পার্শ্বের একখানা বাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া গেল। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া, জীবনবন্ধু আপন বাসাবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেই দিনেই কাশী ছাড়িয়া প্রস্থান করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না। দুই দিন পরেই রামজীবনের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া, এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর, একটু ভূমিকা করিয়া বলিলেন, "মন বড় উতলা হইয়াছে, অনেক দিন দেশে যাওয়া হয় নাই, একবার দেশে যাইব। আপনার আশ্রয়ে পরমসুখে ছিলাম, আপনাকে প্রণাম করি। অনুমতি করুন, কল্যই আমি এখান হইতে যাত্রা করিব।"

রামজীবন বলিলেন, "তোমার শরীর, মন উভয়ই অসুস্থ আছে, প্রত্যেক লক্ষণে তাহা আমি বুঝিতে পারি, এত শীঘ্র প্রস্থান করিবার আকিঞ্চন কেন? আর কিছু দিন থাক, গঙ্গাস্নান কর, অন্নপূর্ণা দর্শন কর, মন সুস্থ হইলে আমি নিজেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

জীবনবন্ধু নির্ব্বন্ধ জানাইলেন, বারান্তরে আসিয়া কিছু বেশী দিন থাকিব, এই কথা বলিলেন। রামজীবন আর বাধা দিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী-ভাড়া রাহা-খরচ সঙ্গে আছে?" জীবনবন্ধু উত্তর করিলেন, "দশটাকা

মাত্র সম্বল আছে, কলিকাতায় পৌঁছিবার খরচের কোন অভাব হইবে না।" রামজীবন চুপ করিয়া রহিলেন। সে দিন সে রাত্রে কোন প্রকারে অতিবাহিত হইল, পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া জীবনবন্ধু গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। রামজীবনের পুত্রের অন্নপ্রাশনের পরদিন হইতে তিনি আর গঙ্গাস্নানে যান নাই, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন যাইতেন, তখন মনে কোন প্রকার শঙ্কার উদয় হইত না, সে দিন কেমন এক প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। পথে যাইতেছেন, পার্শ্ব দিয়া কেহ চলিয়া গেলে সন্দেহ জন্মে, তাহার দিকে একদৃষ্টে চান, পশ্চাতে কে যেন আসিতেছে, কে যেন কি বলিতেছে, এইরূপ মনে হয়; ক্ষণে ক্ষণে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চান, মন অত্যন্ত চঞ্চল। চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক, ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক। মনের সেইরূপ অবস্থায় চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে স্নান করিলেন, স্নানান্তে অন্নপূর্ণার বাড়ীতে গেলেন, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে কতকটা যেন আশ্বাস পাইয়া বাসায় আসিলেন; উদ্দেশে বিশ্বেশ্বরকে বলিলেন, "বাবা বিশ্বেশ্বর! আর আমি তোমাকে দেখিব না, তোমার কালভৈরব আমাকে তাড়া করিল না, পিশাচে তাড়া করিল, আমি কাশী ছাড়িয়া চলিলাম, যদি ভাগ্যে থাকে, আবার আসিব, এই মুক্তিক্ষেত্রে জীবনের অবশিষ্ট কালযাপন করিব।"

যথাসময়ে আহার করিয়া, রামজীবনের নিকটে বিদায় লইতে গিয়া, জীবনবন্ধু তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। অপরাহ্নের গাড়ীতে যাত্রা করা হইবে, এই কথা জানাইলেন। বসিতে বলিয়া রামজীবন একবার অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, ফিরিয়া আসিয়া জীবনবন্ধুর হস্তে দশটী টাকা আর এক যোড়া বস্ত্র প্রদান করিলেন;—কহিলেন, "দশ টাকা তোমার আছে, কি জানি, যদি কিছু অপ্রতুল হয়, পরে যদি কিছু লাগে হয়, সেই জন্য এই দশ টাকা আমি তোমাকে দিলাম, ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিও না, আশীর্ব্বাদী মনে করিয়া গ্রহণ কর।" মনে যাহা থাকিল, তাহা প্রকাশ না করিয়া জীবনবন্ধু পুনরায় গুরুচরণে প্রণাম করিলেন। তিনি উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সবুজবর্ণ পাগড়ী মাথায়, মুখবন্ধ চাপকান গায় একজন হিন্দুস্থানী লোক সেই স্থানে আসিল। জীবনবন্ধু পূর্ব্বে তাহাকে দেখেন নাই। তিনি কলিকাতায় আসিবেন, এই কথা শুনিয়া, সেই লোকটী বলিল, "আমিও যাইব; আমার এক্কা আছে, একসঙ্গে ষ্টেশনে চল যাই।"

সন্দেহ প্রবণ মনে শীঘ্র শীঘ্র নূতন নূতন সন্দেহ আইসে, লোকটীকে পুলিসের লোক বিবেচনা করিয়া জীবনবন্ধু বলিলেন, "আমার যাইবার বিলম্ব আছে, আপনি অগ্রে যাইতে পারেন।" লোক বলিল, "আমারও বিলম্ব আছে, এক-সঙ্গেই যাওয়া ভাল।"

আর কথা-কাটাকাটি করা ভাল হয় না, ইহা ভাবিয়া, জীবনবন্ধু অগত্যা সম্মত হইলেন; কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচিল না। অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় আপনার যৎসামান্য জিনিসপত্র লইয়া এক্কা আরোহণে সেই লোকের সঙ্গে তিনি রাজঘাটে আসিলেন। অপরিচিত লোকের সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ নয়, ইহা ভাবিয়া, মোগলসরাই পর্য্যন্ত আসিয়া, তিনি মোকামা পর্য্যন্ত টিকিট লইলেন। হিন্দুস্থানী লোকের টিকিট হইল কলিকাতা। জীবনবন্ধু তখন একটী নিশ্বাস ফেলিলেন। গাড়ী মোকামায় পৌঁছিল, জীবনবন্ধু নামিলেন। সেখানে একটা হোটেল আছে, সেই হোটেলে রাত্রিবাস করিলেন, পরদিন মোকামা-ঘাটের জাহাজে পার হইয়া ত্রিহুত রেলওয়ের মতিহারী ষ্টেশনের টিকিট [illegible]। মতিহারীর টিকিট লইবার কারণ এই যে, সেখানে [illegible] একজন পরিচিত বন্ধু চাকরী করেন, তিনি সেখানে [illegible] দুই পাঁচ দিন তাঁহার বাসায় থাকিয়া কলিকাতায় যাইবেন, এইরূপ [illegible]।

মতিহারীতে গাড়ী পৌঁছিল, অন্বেষণ করিয়া জীবনবন্ধু তাঁহার সেই বন্ধুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধু তখন বাসায় ছিলেন না, [illegible] ছিলেন। বন্ধুর পরিবার জীবনবন্ধুর নাম জানিতেন, তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া বাহিরের ঘরে বসাইবার আদেশ দিয়া বাসার একজন চাকরকে [illegible] দিলেন। বন্ধুর নাম রসিকলাল ভট্ট। সাধারণ কথায় ভট্ট বলিলে ভাট বুঝায়, কিন্তু রসিকলাল ভট্ট ভাট নহেন, রাঢ়ী শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। বন্ধু আসিয়াছেন শুনিয়া আফিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া শীঘ্র শীঘ্র তিনি বাসায় আসিলেন। বহুদিনের পর বন্ধুসম্মিলনে পরস্পর আনন্দবিনিময় হইল। জীবনবন্ধুর মুখখানি কিছু বিশুষ্ক দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই রসিকলাল মনে করিলেন, আহার হয় নাই, সেই জন্যই হয় তো এইরূপ ম্লান। তৎক্ষণাৎ তিনি রন্ধন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাসায় একজন বেহারী ব্রাহ্মণ ছিল, সেই ব্যক্তি রন্ধন করিল, অপরাহ্নে স্নান করিয়া জীবনবন্ধু আহার করিলেন। সন্ধ্যায় পঞ্চ

দুই বন্ধুতে একত্র বসিয়া অনেক রকম গল্প হইল, রাত্রিকালে সে বাসায় শয়নের স্থান দুর্লভ, অতএব আফিস-বাড়ীতেই শয্যাদি প্রেরণ করিয়া রসিক স্বয়ং সঙ্গে গিয়া বন্ধুকে সেইখানে শয়ন করাইয়া আসিলেন। নিতান্ত অপরাহ্ণে আহার করা হইয়াছিল, রাত্রে আর কিছু আহার করিবার প্রয়োজন হইল না, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া জীবনবন্ধু শয়ন করিলেন। রজনীপ্রভাতে রসিকলালের চাকর আসিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেল। শয্যাপত্রাদি সেইখানে থাকিল।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি জীবনবন্ধু এক প্রকার মনের সুখে বন্ধুর বাসায় রহিলেন। বেলা দশটা পর্য্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ হয়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে রসিকলাল বাসায় আসেন, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমোদ-আহ্লাদ চলে। রাত্রি দশটার পর কুঠীবাড়ীতে গিয়া জীবনবন্ধু শয়ন করেন।

রবিবার। রসিকলাল প্রাতঃকালে উঠিয়া মজঃফরপুর আসিলেন; সে দিন আর জীবনবন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। রাত্রি দশটার পর আহার করিয়া, তিনি কুঠীবাড়ীতে শয়ন করিতে গেলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় বহুলোকের গোলমালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিসের গোলমাল, জানিবার জন্য তিনি একবার দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন; দেখিলেন, প্রায় দুই শত হিন্দুস্থানী লোক সম্মুখ-দিকে ঘুরিতেছে, বাঙালী বাঙালী বলিয়া গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিতেছে। কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, কেহ দাঁড়াইয়া সেই সকল লোকের চীৎকারের প্রতিধ্বনি করিতেছে, কেহ কেহ মন্তব্য দিতেছে। জীবনবন্ধু তাহাদের কথার ভাব, জমায়েত হইবার কারণ, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দরজা বন্ধ করিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। সমস্ত রজনী ঐ প্রকার গোলমাল, কত ভাবের কত রকম কথা, তাহার একটী কথার অর্থও জীবনবন্ধুর কর্ণগোচর হইল না, অথচ সমস্ত রাত্রি তিনি জাগরণ করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া যখন তিনি বাহির হইয়া আইসেন, তখন সম্মুখের প্রাঙ্গণে দুই জন সাহেব হস্তের যষ্টির দ্বারা জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে কুঠীর দিকে যাইতেছেন দেখিয়া, সসম্ভ্রমে তিনি তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলেন, আসিতে আসিতে শুনিলেন, একজন সাহেব বলিল, "Who is that man?" আর একজন বলিল, "That is the man." প্রশ্নের অর্থ—ও লোকটা কে? উত্তরের অর্থ, ঐ সেই লোক।

প্রশ্নোত্তরের অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু তাহার ভাব জীবনবন্ধুর বোধগম্য হইল না; আর কিছু ভাবিতে ভাবিতে রসিকলালের বাসায় তিনি পৌঁছিলেন। অনেক রাত্রে রসিকলাল বাসায় আসিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে জীবনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু রসিকলালের মুখখানি কিছু ভার ভার। একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ তাঁহার হস্তে ছিল, সেইখানা খুলিয়া তাহার একাংশে দৃষ্টিদান পূর্ব্বক ভ্রূকুটিভঙ্গীতে জীবনবন্ধুর মুখের দিকে তিনি একবার চাহিলেন, ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। আহারের পর পোষাক পরিয়া আফিসে যাইবার সময় জীবনবন্ধুকে তিনি বলিয়া গেলেন, "এক ঘণ্টা পরে তুমি আমার আফিসে যাইও, বিশেষ কথা আছে।"

জীবনবন্ধু বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিলেন; বেলা ১১টার পর আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুর টেবিলের উপর রাশি রাশি মাছি বসিতেছিল, একখানা পাখা লইয়া জীবনবন্ধু মাছি তাড়াইতেছিলেন, পাখার আঘাতে গোটাকতক মাছি মরিয়া গেল। চকিতে চাহিয়া রসিকলাল বলিলেন, ও কি কর? মাছি মারিও না; মাছি মারিতে নাই; অমঙ্গল হয়।"

এই পর্য্যন্ত কথা। প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত জীবনবন্ধু সেইখানে বসিয়া রহিলেন, রসিকলাল আর একটীও কথা কহিলেন না। জীবনবন্ধু ভাবিলেন, বিশেষ কথা আছে, বন্ধু ইহাই বলিয়াছিলেন; বিশেষ কথা ত কিছুই শুনিলাম না; তবে আমাকে এখানে আসিতে বলিবার মতলব কি ছিল? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় বাহিরের দিকে অনেক লোকের কথা শুনিতে পাইলেন; গত রাত্রে যে প্রকার কথা শুনিয়াছিলেন, সেই প্রকার কথা। মন উচাটন হইল, পূর্ব্ব-সন্দেহ জাগিল। তিনিও নীরব, রসিকলালও নীরব। পাঁচটা বাজিল। আফিসের ছুটীর সময়। কাগজপত্র গুছাইয়া রসিকলাল আসন হইতে উঠিতেছিলেন, জীবনবন্ধু সেই সময় বলিলেন, "আর আমি এখানে থাকিব না, আজ রাত্রেই কলিকাতায় যাইব।"

এই কটী কথা জীবনবন্ধু কিছু উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, বাহিরের লোকেরা তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। পাঁচ সাতজন লোক সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল, "পালাবে পালাবে—কোথায় পালাবে—টিকিট কাড়িয়া লইব" এই কথা তাহারা বলিতে বলিতে গেল।

মনের সন্দেহ আরও বাড়িল, রসিকলালের দিকে চাহিয়া জীবনবন্ধু বলিলেন, "এইখান হইতেই আমাকে বিদায় করিয়া দাও, আর আমি বাসায় যাইব না।"

রসিকলাল বলিলেন, "আর একটু থাক, সন্ধ্যাকালেই গাড়ী ছাড়ে, রাত্রে আর গাড়ী নাই, রাত্রে তোমার আহার হইবে না, শীঘ্র আমি ফিরিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়াই রসিকলাল চলিয়া গেলেন, জীবনবন্ধু রহিলেন। বিপরীত বিপরীত অনেক কথা সেই সময় তাঁহার কর্ণে আসিল; অনেক লোক ছুটাছুটী করিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, সাহেবের একজন বৃদ্ধ খানসামা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "চল, আমি তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিব। বাবু ষ্টেশনেই আসিবেন, টিকিট কিনিয়া দিবেন।"

খানসামার সঙ্গে জীবনবন্ধু ষ্টেশনে গেলেন, রসিকলাল সেইখানে ছিলেন, বন্ধুর বস্ত্রগুলি এবং একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধা খানকতক লুচি আর কিঞ্চিৎ চিনি তিনি সঙ্গে করিয়া আ[illegible] কলিকাতার টিকিট ক্রয় করিলেন। যে কয়েকটী [illegible], তাহাও জীবনবন্ধু[illegible] দিয়া, তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া, রসিকলাল বি[illegible] করিলেন। যে গাড়ীতে জীবনবন্ধু উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] একটী লোক সেই গাড়ীতে উঠিল। ঠিক সন্ধ্যার সময় গাড়ী ছাড়িল। সেই নূ[illegible] বসিয়া একটু হাসিতে হাসিতে [illegible]ও, আমি তোমার সঙ্গে আছি, কেহ কিছু [illegible] জীবনবন্ধু [illegible]লেন, "আমার টিকিট কাড়িয়া লইবে।" লোকটী [illegible], "কাহার সাধ্য? কোম্পানীর এমন হুকুম নাই; তুমি জল খাও।"

চারিখানি লুচি খাইয়া জীবনবন্ধু একটু জল চাহিলেন। লোকটী বলিল, "এখানে জল মিলিবে না, একটা বড় ষ্টেশনে জল পাইবে।"

গাড়ী মজঃফরপুরে পৌঁছিল। সেইখানে জল চাহিয়া লইয়া সেই নূতন লোকটী জীবনবন্ধুকে পান করিতে দিল। লোকের সঙ্গে দুটী একটী কথা কহিতে কহিতে জীবনবন্ধু আপন মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার মনেই রহিল। গাড়ী সমস্তিপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, সেই নূতন লোকটী সেইখানে একবার নামিল। সমস্তিপুরে অনেকক্ষণ গাড়ী থাকে। একজন ফিরিঙ্গী সাহেব, দুই জন হিন্দুস্থানী চাপরাশী আর ষ্টেশনের দুইজন বাঙ্গালী বাবু প্রত্যেক গাড়ীর দরজার কাছে কাছে বেড়াইয়া শান্তিজল ছড়াইয়া মন্ত্রের জন্য

প্রত্যেক গাড়ীর আরোহিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে?" কে কি রকম উত্তর দিল, জীবনবন্ধু তাহা শুনিতে পাইলেন না; যাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারাও উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিল না। যে গাড়ীতে জীবনবন্ধু, সেই গাড়ীর দরজায় আসিয়া ফিরিঙ্গী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকিট?" জীবনবন্ধু বলিলেন, "কলিকাতার।"

বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। সেই গাড়ীতে আর যাহারা ছিল, তাহারা উত্তর করিবার অগ্রেই ফিরিঙ্গী সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। যে লোকটী নামিয়া গিয়াছিল, সে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল. তিন মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল।

মোকামা-ঘাট, সেই ঘাটে জাহাজে পার হইয়া আরোহীরা পর-পারে আসিল, যাহার যেখানে যাইবার টিকিট, তাহারা অন্য গাড়ীতে উঠিয়া সেই সেই স্থলে চলিয়া গেল। জীবনবন্ধু ভাবিলেন, রাত্রে না যাওয়াই সৎপরামর্শ। মোকামা-হোটেল পূর্ব্বে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, সেই হোটেলেই রাত্রিবাস করিবেন, সেই ইচ্ছায় তিনি একাকী সেই হোটেলের দিকে চলিলেন যে লোকটী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কোথায় গেল, আর তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রাত্রি তখন অধিক হয় নাই, তথাপি হোটেল-বাড়ীর দরজা বন্ধ। রেলওয়ে ষ্টেশনের হোটেল তত শীঘ্র বন্ধ হইল কেন, দরজার ধারে দাঁড়াইয়া জীবনবন্ধু অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর দ্বারে আঘাত করিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর ভিতরদিকে একজন লোক আসিয়া কর্কশ আওয়াজে বলিল, "এ দরজায় নয়—এ দরজায় নয়—পূর্ব্ব দিকের দরজায় যাও। সন্ধ্যাকালে এ দরজায় চাবী-বন্ধ হয়।"

পূর্ব্বদরজা দিয়া জীবনবন্ধু প্রবেশ করিলেন, যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। আহারের উপকরণ চারি পাঁচখানি শুষ্ক রুটী আর ইলিস মাছের টক। তাহার খরচা তিন আনা।

প্রভাতে উঠিয়া সেইখানে তিনি স্নান করিলেন, হোটেলের চাকর স্নান করাইয়া দিল, তাহার খরচা তিন পয়সা। বেলা দশটার গাড়ীতে তিনি রওনা হইলেন, পথে আর কোথাও নামিলেন না, সরাসর হাওড়ায় আসিয়া পৌছিলেন।

কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিল, সে যাত্রা কাহারও সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না, বাড়ীতে যাওয়াই শ্রেয়, এই বিবেচনায় স্বতন্ত্র লাইনের গাড়ীতে স্বগ্রামে যাত্রা করিলেন। যে ষ্টেশনে নামিতে হয়, সেই ষ্টেশনের নিকটে একখান মনোহারী দোকান, সেই দোকানে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, ক্লান্ত হইয়া তিনি সেই বেঞ্চের একধারে বসিয়া উত্তরীয়বসনে বাতাস খাইতে লাগিলেন। তাঁহার গ্রামের দুটী লোক সেই গাড়ীতে আসিয়া সেই দোকানে উপস্থিত হইল। তাঁহাদের একজনের নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, দ্বিতীয়ের নাম রামযাদু পালধি। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কোথা হইতে আসিতেছ ?"

জীবনবন্ধু উত্তর দিবেন মনে করিতেছিলেন, সে উত্তর না শুনিয়া তাহারা পরস্পর নয়ন-ঠারাঠারি করিয়া তৎক্ষণাৎ দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। নিকটে একটা পুলিসের থানা ছিল, সেই থানার একজন পাহারাওয়ালা অনতি-বিলম্বে দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল, যে বেঞ্চে জীবনবন্ধু বসিয়া ছিলেন, দাঁড়াইয়া আড়ে আড়ে তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া, পাহারাওয়ালাটা সেই বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল। জীবনবন্ধুর গায়ে তাহার পা ঠেকিল, বিরক্ত হইয়া জীবনবন্ধু উঠিয়া পড়িলেন। সেই অবসরে পুনরায় সেই দুইজন। শ্রীকৃষ্ণ আর রামযাদু।

সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া তাঁহাদের গ্রামে যাইতে হয়, দূর প্রায় তিন ক্রোশ। রামযাদু একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিল, জীবনবন্ধুকেও সেই গাড়ীতে উঠিতে বলিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া জীবনবন্ধু সম্মত হইলেন। অগ্রেই তিনি গো-শকটে আরোহণ করিলেন, তাহার পর রামযাদু আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। গাড়ীর মাথায় ছত্রী দেওয়া ছিল, রৌদ্র লাগিল না, কিন্তু গরুর গাড়ীর গতিকে গ্রামে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল।

বাড়ীতে পৌঁছিতে অনেকটা রাত্রি হইয়া গেল। জীবনবন্ধু সে রাত্রে গ্রামের আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা বর্ত্তমান ছিলেন না, বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, ছোট ছোট দুটী পুত্র, একটী বিধবা ভগ্নী, সেই ভগ্নীর এক পুত্র, এক কন্যা ; তদ্ব্যতীত রাধানাথ নামে একজন ছোকরা চাকর, তাহার বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর।

প্রাতঃকালে সেই রামযাদু আর শ্রীকৃষ্ণ পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া জীবনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। একটী ভদ্রলোক জীবনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইয়াছে কি? তোমার চেহারা এমন কেন? এতদিন কোথায় ছিলে?"

জীবনবন্ধু উত্তর করিলেন, "হইয়াছে কি, তাহা আমি জানি না। অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকেরা যেখানে সেখানে আমার উপর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়াছে, সম্মুখে কেহ দেখা দেয় নাই। আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কোথাও একটু শান্তি পাই নাই, চেহারা কেমন হইয়াছে, দর্পণে তাহা আমি দেখি নাই; যদি বিকৃত হইয়া থাকে, সেটা কেবল দুর্ভাবনার ফল।"

ভদ্রলোকটী মুখ টিপিয়া হাস্য করিলেন, ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "কিছুই নয়, মনের বিকার, বোধ হয়, বায়ু-রোগের লক্ষণ, বাড়ীতেই থাক, কোথাও বাহির হইও না। বাড়ী হইতে বাহির হইলে বিপদ্ ঘটিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ আর রামযাদু স্কন্ধ নাচাইয়া মুখ ফিরাইয়া হাস্য করিল। ভদ্র-লোকেরা চলিয়া গেলেন। ঐ দুজন খানিকক্ষণ থাকিল, বায়ু রোগের কত রকম ব্যাখ্যা করিল, পাঁচ রকম দৃষ্টান্ত দিল, এ অবস্থায় কি রকম পথ্য দিতে হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিল, তাহার পর চলিয়া গেল। যখন তাহারা চলিয়া যায়, তখন একজন চুপি চুপি দ্বিতীয় জনকে বলিল, "বেশ হইল, বাহির-ভিতরেই কয়েদ।"

জীবনবন্ধু সেই কথা শুনিতে পাইলেন, বাড়ীতেও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারি-বেন না, তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ, নাম অখিলচন্দ্র। অনেক দিনের পর পিতাকে দেখিয়া অখিলচন্দ্র সম্মুখে আসিয়া একটা প্রণামও করিল না, ভাল করিয়া কথাও কহিল না, ঘন ঘন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। একবার একটা লোক সঙ্গে করিয়া গোটাকতক ডাব আনিয়া ফেলিল, পিসীকে বলিল, "পিসীমা, পুকুরের পাঁকের ভিতর এই ডাব কটা পুতিয়া রাখিয়া রোজ রোজ দুটা তিনটা তুলিয়া উহাকে খাওয়াইতে হইবে, টাট্‌কা মাছের ঝোল দিতে হইবে, মাথা মুড়াইয়া দিতে হইবে, বৈকালে ডাক্তার আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

জীবনবন্ধু অবাক্। স্ত্রী, ভগিনী, ভাগিনী-পুত্র, ভগিনী-কন্যা প্রভৃতি বাড়ীতে

যাহারা ছিল, তাহারা কেহই প্রায় নিকটে আসে না, মুখের দিকে চাহে না, লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়, দুটী দুটী অন্ন দিতে হয়, তাহাই দেয়। 'বকালে' নাপিত আসিয়া মাথা নেড়া করিয়া দিল। • জ্যেষ্ঠপুত্রটী এক একবার আসিয়া সেই নেড়া মাথায় জল ঢালিতে লাগিল, তাহার পর ডাক্তার আসিলেন, নাড়ী দেখিয়া তিনি বলিলেন, "জ্বর নয়, বায়ুরোগে নাড়ীর গতি যেমন থাকে, সেই রকম; ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, কোন ভয় নাই।"

ডাক্তারের সঙ্গে জীবনবন্ধুর বন্ধুত্ব ছিল, তিনি ভিজিট লইলেন না, অখিলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তিন শিশি ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, চিকিৎসা আরম্ভ হইল। রাত্রিকালে বাড়ীর তিন দিকে মহা গোলমাল। তিন দিকেই খোলা জায়গা, বাগান আর একটা পুষ্করিণী; কেবল একদিকে প্রতিবাসী গৃহস্থ লোকের বাড়ী। গভীর চীৎকারধ্বনিতে কাহারও নিদ্রা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু প্রতিবাসী লোকেরা কারণ জানিয়াছিল, তাহারা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইল, জীবনবন্ধু ঘুমাইতে পারিলেন না, বাড়ীর পরিবারেরাও ঘুমাইতে লাগিল। ভোরবেলা জীবনবন্ধু শুনিলেন, অতি উচ্চ চীৎকারে তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীর ছাদ হইতে বহুকণ্ঠমিলিত শ্মশানধ্বনি;—"বল হরি হরি বোল হরি!"

জীবনবন্ধুর হৃৎকম্প উপস্থিত। বাড়ীর পরিবারেরা দূরে দূরে থাকিয়া খিল খিল করিয়া হাসে, হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জীবনবন্ধুকে তাহারা গঞ্জনা দেয়, মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়, বাড়ীর চাকর রাধানাথ তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না, অখিলবাবুর হুকুমে রাধানাথ এক একবার অখিলবাবুর পিতার মুখের কাছে লম্বা লম্বা বেত নাচায়, নৃত্য করিতে করিতে হাস্য করে।

দিন দিন এইরূপ চলিতে লাগিল, দিন দিন নিশাকালে উৎকট চীৎকার; দিন দিন উষাকালে পাশের বাড়ীতে "বল হরি হরি বোল" ধ্বনি! প্রতিবাসীরা কেহই আর জীবনবন্ধুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেই পাঁচজন ভদ্রলোক প্রথমে একবার দেখা দিয়া গিয়াছিলেন, কয়েদ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর দেখা দেন না। গ্রামের সকলেই জীবনবন্ধুর আত্মীয়। কায়স্থ-জাতির মধ্যে প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁহার সম্পর্ক ছিল, সকলেই তাঁহাকে ভাল-বাসিত। এই অবস্থায় সকলেই বিরূপ।

একমাস অতীত হইল, পাগলের চিকিৎসা হইতে লাগিল, রাত্রিকালে চীৎকার

ক্রমশঃ বাড়িল, উষাকালের হরিধ্বনি সমভাবে চলিল, বাড়ীর পরিবারগণের অবহেলা, বিদ্রূপ, তিরস্কার দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। একদিন প্রাতঃকালে পাড়ার দুই তিনজন বালক একটা কলাগাছের উপর ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া, একখানা ডুলীর ন্যায় বাঁশের চৌকীতে রাখিয়া, মধ্যস্থলে একটা বাঁশ বাঁধিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া, বাড়ীর মধ্যে জীবনবন্ধুর সম্মুখ দিয়া লইয়া গেল; মুখে বলিল, "বল হরি হরি বোল!" সেই কলাগাছের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আট দশটা ঢাক বাজাইয়া আট দশ-জন চর্ম্মকার নাচিয়া নাচিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল; গাজ-নের সন্ন্যাসীরা যেমন নাচে, জনকতক লোক অষ্টাঙ্গে কাদা ধূলা মাখিয়া ঢাকের তালে নৃত্য করিতে করিতে জীবনবন্ধুর সম্মুখে নানাপ্রকার ভঙ্গী করিতে লাগিল। জীবনবন্ধু বিষম দায়ে পড়িয়া মনের ঘৃণায় গৃহমধ্যে গিয়া লুকাইলেন।

আরও একমাস গেল। ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি। প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের পঞ্চাশজন ভিখারী জীবনবন্ধুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, "ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধা-কৃষ্ণ বল মন," এই সুরে অনেক ভিখারী ভিক্ষা চায়। যে সকল ভিখারী খোল বাজাইয়া গান গাইয়া ভিক্ষা করে, জীবনবন্ধুর সম্মুখে খোলের তালে তাহারা ভয়ানক ভয়ানক গীত গায়। "ভাবলনে মন সে দিন কেমন যে দিন জীবন যাবে রে," "রঙ্গরসে পালংপোষে কে আর এসে শোবে রে"; "মন তোমারে আজ বাদে কাল ভবের পটল তুলতে হবে," "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর", "গোবরছড়া দিয়ে দ্বারে দ্বারে বাহির করে দিবে," "দীন দেখে হরি কেন লুকালে চরণ," এইরূপ ভাবের যে সকল গীত শুনিলে সাধারণ মানুষের মনে ভয় হয়, ভিখারীরা সেই ভাবের গীত গাইয়া জীবনবন্ধুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে। আরও এক তামাসা। নিত্য যাহারা ভিক্ষা করিতে আইসে, তাহারা সকলে যে সত্য ভিখারী নয়, তাহাও জীবনবন্ধু বেশ বুঝিতে পারেন। গ্রামের চৌকীদার—কক্ষে ভিক্ষার ঝুলি, বাবুর বাড়ীর দরোয়ান—হস্তে ভিক্ষাপাত্র, গৃহস্থ বাড়ীর বেতনভোগী নাপিত, তাহার কক্ষেও ভিক্ষার ঝুলী; কুম্ভকার, মালাকার, বাদ্যকর, রজক, দোকানদার প্রভৃতিও ছলের ভিখারী সাজিয়া নানা খেলা খেলাইয়া যায়। অনেক মুখ জীবনবন্ধুর চেনা, সে সব মুখের অধিকারীরা ভিখারী নহে, তাহাও জীবনবন্ধুর জানা, তথাপি "কবে তোরা অধিকারী হলি" এ প্রশ্নটী তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই।

নিশাকালের চীৎকারের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি পাইল। খেঁউড়ের শ্রাদ্ধ! যে সকল কথা শুনিলে দুই কর্ণে অঙ্গুলী দিতে ইচ্ছা হয়, যে সকল কথা শুনিলে কুলস্ত্রীরা জলে ডুবিতে ইচ্ছা করেন, নিত্য রজনীতে গৃহস্থালয়ের সকলের নিকটে সেই সকল গীতের মহা মহা ঘটা! অধিক কথা কি, যাহারা ভদ্রসন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ একসময়ে পাঁচালীর দলে পচা পচা খেঁউড়-গীত বাঁধিয়া দিত, বাহাদুরী লইবার জন্য সেই সকল লোকও ঐ সকল বাজেলোকের সঙ্গে যোগ দিয়া নাচিয়া গাহিয়া আমোদ করিয়াছিল, কুলকামিনীগণের নাম লইয়াও গীত বাঁধিয়া দিয়াছিল। পশ্চাতে পুলিস ছিল, ইহাও জীবনবন্ধু বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "পুলিসের ভেল্কী!"

পুলিসের ভেল্কীর আর একটী দৃষ্টান্ত জীবনবন্ধুর মুখে শুনা হইয়াছে। রাত্রিকালে যখন বাগানে বাগানে খেঁউড়গীত চলিত, সেই সময় তিনি আপন গৃহের গবাক্ষে বসিয়া ভাবিতেন, "কোন দোষ আমি করি নাই, হাকিমের কাছে উপস্থিত হইতেও সন্দেহ হয়, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারিব না, হাকিমেরা আমার কথা শুনিবেন না, দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন, মিথ্যা বিপদটা সত্য হইয়া দাঁড়াইবে।" এইরূপ তিনি ভাবিতেন আর চক্ষের জলে ভাসিতেন। বাহিরের গীতওয়ালারা ঠিক ঠিক সেই কথাগুলির প্রতিধ্বনি করিত। ইহাতেই জীবনবন্ধু বুঝিয়াছিলেন, মানুষের মনের ভাব যাহারা দূর হইতে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, চলিত কথায় যাহাদিগকে মনোভাবজ্ঞ বলা যায়, ইংরাজীতে যাহাদিগকে "Thought reader" বলে, পুলিসের ভিতর সেইরূপ ক্ষমতা-প্রাপ্ত একটা একটা পণ্ডিত থাকে। যাহারা সত্য অপরাধী, তাহাদের মনের চিন্তা জানিতে পারিয়া সেই সকল পণ্ডিত পুলিসের কাছে তাহা ব্যক্ত করিয়া দেয়, পুলিসের লোকেরা সেই সকল লোককে গ্রেপ্তার করে। নিরপরাধ জীবনবন্ধুর মনে সেরূপ চিন্তা আসিত না, সেইজন্য পুলিস তাঁহার সম্মুখে দেখা দিত না।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। জীবনবন্ধুর মনের ভিতর যন্ত্রণার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। যে ভদ্রলোকটী প্রথম দিন তাঁহাকে কয়েদ রাখিবার মন্ত্রপাঠ করিয়া গিয়াছিলেন, এই সময় একদিন বৈকালে তিনি আসিয়া জীবনবন্ধুকে বলিলেন, "তোমার রোগ বাড়িয়াছে, তুমি মোটা হইয়াছ, আহারের কষ্ট থাকিলেও এক একটা পাগল বেজায় মোটা হয়, বায়ু উদরস্থ হইয়া উদর

ফুলাইয়া দেয়। এখন অবধি তুমি আর একজায়গায় বসিয়া থাকিও না, একজন লোক সঙ্গে করিয়া এক একবার গ্রামে বাহির হইও, ভোরবেলা একটু একটু বেড়াইও, ভোরের বাতাসকে বীর-বাতাস বলে, বীর-বাতাস গায়ে লাগিলে তোমার অনেকটা উপকার হইবে। বাহির হইও, বেড়াইও, বীর-বাতাস লাগাইও, কিন্তু গ্রামের বাহির হইও না।”

এই পর্য্যন্ত উপদেশ। জীবনবন্ধু তদবধি সেই উপদেশ পালন করিতে লাগিলেন। সকালে ও বৈকালে গ্রামের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হন, এক একজনের বাড়ীর মধ্যেও প্রবেশ করেন। তাহাতেও শান্তি প্রাপ্ত হন না। দূরে দূরে নানারূপ দুর্জ্জয় চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। তিনি একদিন একজন প্রতিবাসীর সদরবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পূজার দালানে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে একজন জটাধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন; সম্মুখে হোমকুণ্ড, বামভাগে বৃহৎ তাম্রপাত্রে অনেকগুলি জবাফুল রহিয়াছে; মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সন্ন্যাসী সেই হোমকুণ্ডে এক একটী জবাফুল আহুতি দিতেছেন। সন্ন্যাসীর কপালে চীনের সিন্দূরের দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরিধান রক্তবাস।

দালানের ইতস্ততঃ চারি পাঁচটী বালক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, জীবনবন্ধুকে দেখিবামাত্র তাহারা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল; সন্ন্যাসীও একবার আরক্ত-নয়নে জীবনবন্ধুর ম্লানবদন নিরীক্ষণ করিলেন।

বাড়ীর কর্ত্তা বাহির হইলেন। জীবনবন্ধুকে দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল। রাগের ভাব বুঝিতে পারিয়া জীবনবন্ধু সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; আর এক বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বৃহৎ এক অগ্নিকুণ্ড, বড় বড় তেঁতুল-কাষ্ঠের গুঁড়ি সেই অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিতেছিল, সেই আগুনের উপর বৃহৎ এক লৌহকটাহ; প্রায় অর্দ্ধমণ তৈল সেই কটাহে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল। জীবনবন্ধু একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, একজন চাকর তাঁহাকে নিষেধ করিল। ঘরের ভিতর একটী বাবু বসিয়া ছিলেন, পূর্ব্বে সেই বাবুটী জীবনবন্ধুকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। চাকর নিষেধ করিল, সে নিষেধ অমান্য করিয়া জীবনবন্ধু দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। চক্ষু পাকল করিয়া বাবু কহিলেন, “যাও যাও, তফাৎ যাও!”

জীবনবন্ধু দেখিলেন, বন্ধুলোকেরাও এখন শত্রু, বন্ধুলোকেরাও এখন তাঁহাকে

ঘৃণা করেন। আর তিনি সে বাড়ীতে থাকিলেন না, একে একে আরও দশ বাড়ী বেড়াইলেন, কোথাও আদর পাইলেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইল, কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর ভিতর তুমি কেন প্রবেশ করিয়াছ?" কাহারও কোন কথায় উত্তর না দিয়া জীবনবন্ধু অভিমানে বাহির হইয়া আসিলেন। এক বাড়ী হইতে যখন তিনি বাহির হন, সেই সময় শুনিলেন, একটা গবাক্ষ হইতে একজন বলিল, "থাক তুমি, বাগাইতেছি।"

গ্রামের ভাবভঙ্গি বুঝিয়া জীবনবন্ধু আপন বাড়ীতে ফিরিলেন। আপন বাড়ী তখন তাঁহার পক্ষে অধিক ভয়ঙ্কর স্থান। স্ত্রী, ভগিনী, পুত্র, ভৃত্য সকলেই যেন পুলিস অপেক্ষাও প্রবল-প্রতাপ ধারণ করে। পুত্র একদিন বলিয়াছিল, "পুলিস-কেস্," রক্ষা করিবার উপায় নাই, বাঁধিয়া দিতে হইবে।" পিতার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুত্র ঐ সকল কথা বলে নাই, অসাক্ষাতে দর্প করিয়া বলিয়াছিল; জীবনবন্ধু তাহা শুনিয়া বসনে নেত্রমার্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা পূর্ব্বে তাঁহার সদ্গুণের পক্ষপাতী ছিল, এখন তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, সে পক্ষপাতিতা কেবল মৌখিক, অন্তরে অন্তরে তাহারা সকলেই তাঁহার হিংসা করিত, কোন সুযোগ পায় নাই বলিয়া সে সকল হিংসা মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহারা বুঝিয়াছে, জীবনবন্ধু বিপদ্গ্রস্ত, তাহাতে তাহাদের আহ্লাদ হইয়াছে; জীবনবন্ধু যাহাতে ধরা পড়েন, যাহাতে তিনি বাঁধা পড়েন, যাহাতে তিনি জেলে যান, তাহাদের সকলেরই সেই ইচ্ছা।

জীবনবন্ধু গৃহে আসিলেন। শান্তিলাভের জন্য সকলেই গৃহে যায়, অশান্তির অনলে দগ্ধ হইবার জন্য জীবনবন্ধুর গৃহে যাওয়া। স্ত্রী ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, ভগিনী গালাগালি দিলেন, পুত্র মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। জীবনবন্ধু ভাবিলেন, ঘরে আসিলে অধিক জ্বলিতে হয়। পূর্ব্বে যাহারা সুহৃদ্ ছিল, তাহারা এখন তাঁহার পরিবারস্থ লোকগুলিকে মন্ত্রণা দিয়া, যাহাতে তিনি অধিক ক্লেশ পান, তাহাই শিখাইয়া দিয়াছে। জীবনবন্ধুর দিবারাত্রির মধ্যে আর নিদ্রা হয় না। পূর্ব্ব-সুহৃদ্বর্গের মধ্যে একজন তাঁহার ভগ্নীকে বলিয়া গিয়াছে, "নিদ্রা না হইলে বায়ুরোগ শীঘ্র আরাম হয়। উহাকে ভাল বিছানায় শুইতে দিও না, বিছানার উপর বালি ছড়াইয়া দিও, আমিষমিশ্রিত জল বিছানায় ঢালিয়া দিও।" জীবনের ভগিনী তাহাই করিতেছেন, জীবনবন্ধু আর ঘুমাইতে পারেন না।

যে দিন তিনি সন্ন্যাসীর হোম দেখিয়া আসিলেন, অগ্নিকাণ্ডে তৈলপাক বর্ণন করিলেন, সেই দিন রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় শয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে তিনি এক ভয়ঙ্কর কথা শুনিলেন। তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে এক প্রাচীরে তাঁহার এক জ্ঞাতির ভদ্রাসন, সেই বাড়ীর এক ধারে একতালা ছাদ, সেই ছাদের উপর কাহারা দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছিল, দুইবার দুইজন ডাক ছাড়িয়া বলিল, "ঘর ভেঙ্গে দে, মেয়েছেলে ধরে আন্!"

জীবনবন্ধু বেশ বুঝিতে পারিলেন, সেই ভবতারণের আর জটাধারী সরকারের কণ্ঠস্বর। কথা শুনিবামাত্র তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিল, তৎক্ষণাৎ শয়ন-গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি বাহির হইলেন, যে বাড়ীর ছাদ হইতে ঐরূপ ভয়ঙ্কর কথা বর্ষিত হইয়াছিল, সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাড়ীতে অনেক লোক। কি যেন একটা সমারোহ আছে, বহুলোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সেইরূপ বুঝিলেন। যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত, তাহাদের মধ্যে গ্রামবাসীই অনেক: অন্য গ্রামের দুই পাঁচ জন মাত্র। দুটী লোককে তিনি দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি চিনিতে পারিলেন না, হেঁয়ালী প্রবন্ধের ন্যায় গোটাকতক কথা শুনিয়া বুঝিয়া লইলেন, তাহারা পুলিসের লোক। জীবনবন্ধুকে দেখিয়া তাহারা সেই বাড়ীর কর্ত্তার পদধূলি লইয়া আপনাদের মস্তকে দিল, হয় ত মনে করিল, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। জীবনবন্ধু তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে দিলেন না, সেই দুইজনের সহিত পরিষ্কার পরিষ্কার বাক্যালাপ করিয়া তাহাদিগকে চমকাইয়া দিলেন। যত লোক সেখানে জড় হইয়াছিল, সেই দুইজন লোককে তাহারা কত রকম ইসারা করিল, দুই হাতে হাতকড়ি বাঁধিবার সময় যেমন আসামীর হাতের উপর হাত থাকে, আপনাদের হাতের উপর সেইরূপ হাত রাখিয়া সঙ্কেত বুঝাইয়া দিল, জীবনবন্ধু তাহা দেখিলেন; দেখিলেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ছাদের উপর হইতে যে দুইজন লোক গর্জ্জন করিয়াছিল, জনতামধ্যে তাহারা আছে কি না, তাহাই অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বার বার তিনি চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইলেন; কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছিলেন, ভবতারণ শ্রীমানী আর জটাধারী সরকার, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই দুইজনকে তিনি দেখিতে পাইলেন না। অত লোক সেখানে কেন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কারণ জানিবার জন্য খানিকক্ষণ তিনি সেখানে রহিলেন, শেষে জানিতে পারিলেন, সত্যনারায়ণের

সিন্নি। কাহার কি মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, কিসের আনন্দে সিন্নি দেওয়া, না বুঝিলেও তাহা তিনি বুঝিলেন। পুলিসের লোক সিন্নিতে নিমন্ত্রিত হয়, তাহা তিনি জানিতেন না, থানা নিকটে থাকিলেও কতকটা সম্ভব হইত, তাহাও নয়, থানা সেখান হইতে একক্রোশ দূরে। অনুমান করিয়া জীবনবন্ধু স্থির করিলেন, তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার আহ্লাদেই সত্যনারায়ণের পূজা, সেই আহ্লাদেই পুলিসের লোকের নিমন্ত্রণ, সেই আহ্লাদেই ভবতারণ ও জটাধারীর আগমন। ঘর ভাঙ্গিয়া মেয়ে ছেলে ধরিবার হুকুম দিয়া তাহারা প্রস্থান করিয়াছে, তাহাই তিনি বুঝিলেন; মনে মনে গ্রামের লোকগুলকে ধন্যবাদ দিলেন। লোকগুলি তাঁহার বন্ধু, আসামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বিপদ্ উপস্থিত হইবার অগ্রে তাহাই তিনি জানিতেন; লোকেরাও সেই ভাব জানাইত, এখন সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবনবন্ধু মনে করিলেন, মানুষ চেনা বড় কঠিন। আমরা এইখানে পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর আনন্দলহরী নামক সঙ্গীত-পুস্তক হইতে ঐ ভাবের একটী গীত তুলিয়া লইলাম। জীবনবন্ধু যখন মানুষ চিনিবার তর্ক ভাবিতেছিলেন, সেই সময় আমরা সেইখানে উপস্থিত থাকিলে এই গীতটী তাঁহাকে শুনাইয়া প্রবোধ দিতাম। গীতটী এই—

খাম্বাজ—লোফা।

"কথায় মানুষ অনেক মিলে, কাজের মানুষ মিলা ভার।
হয় কথায় কেহ রাজা উজীর কাজে ক্ষুদে চৌকীদার॥
কথা কাজে মিল রাখে যে জন, হয় সদ্ভাবে মগন,
দেয় যারে তারে অকাতরে প্রেম-আলিঙ্গন;
বলি মানুষ মানুষ মানুষ সে জন দেব-ঋষি-অবতার॥
মানুষ যত কব কি মানুষ ভাই, খুঁজে মানুষ অল্প পাই,
দেখি বাইরে বটে নরাকার, ভিতরজরা ছাই,
শুধু মানুষ বল্‌তে নামে মানুষ, হিংস্র-পশু-ব্যবহার॥
সুহৃদ স্বজন যেই না কেন হোক, ইচ্ছা সুখে সদা রোক,
ছলে দেখায় এমন সরল মন কত নিজের লোক,
তাই কয় আনন্দ বিনা দ্বন্দ্ব মানুষ চেনা সাধ্য কার॥"

সত্যনারায়ণের সিন্নির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জীবনবন্ধু ঘরে গিয়া সেই বালি-শয্যায় শয়ন করিলেন। নিদ্রা তাঁহার ত্রিসীমায় আসিল না, নিশা তাঁহার যন্ত্রণা-দর্শনের নিমিত্ত মানুষের মত আমোদ করিয়া অধিকক্ষণ থাকিল না, প্রভাত হইয়া গেল।

জীবনবন্ধু স্বগৃহে পূর্ণ একবৎসর কাল এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিলেন; মনে ভাবিলেন, স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশ বরং ভাল, আত্মীয় অপেক্ষা অপরিচিত লোক ভাল, নিজের সংসার যেন তাঁহার পক্ষে ঐ এক বৎসর কারাগার-স্বরূপ বোধ হইয়াছিল। গ্রামের লোকেরাও বাহিরে বাহিরে তাঁহার পুত্রকে এবং তাঁহার ভগিনীকে বারম্বার উত্তেজনা করিয়া বলিয়াছিল, "বাহির করিয়া দাও, একটা লোকের জন্য গ্রামস্থ সমস্ত লোক জ্বালাতন, সমস্ত লোকের সুখ-নিদ্রার অভাব, উঁহাকে বাহির করিয়া দিলেই এ উৎপাত চুকিয়া যায়।"

লোকেরা যখন কথা কহিত, তখন চুপ চুপি কহিত না, জীবনবন্ধু যাহাতে শুনিতে পান, সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার করিত, উচ্চৈঃস্বরেই উপদেশ দিত। জীবনবন্ধু সকল কথাই শুনিতেন, মানুষ দেখিতে পাইতেন না, পুলিসের লোক-টোক আসলেই তাঁহার সম্মুখে আসিত না; যদি কখন কাহারও সহিত দেখা হইত, ছদ্মবেশ দেখিয়া কাহাকেও তিনি চিনিতে পারিতেন না।

বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, বাড়ীতে শান্তিলাভের আশা মিটিল. বাড়ীর লোককে তিনি চিনিয়া লইলেন, গ্রামের বন্ধুবান্ধবকেও চিনিতে পারিলেন, গৃহবাসের সাধ তাঁহার ফুরাইল। কাহাকেও বাহির করিয়া দিতে হইল না, অঙ্গে বীর-বাতাস লাগাইবার নাম করিয়া একদিন উষাকালে তিনি নিজেই বাহির হইয়া পড়িলেন।

বিদেশী বন্ধুবান্ধবগণের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়া, নানাস্থানী হইয়া, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিলেন; জ্বালাতন হইবার ভয়ে একস্থানে অধিক দিন থাকিলেন না, কোথাও পাঁচদিন, কোথাও দশদিন, কোথাও একমাস, কোথাও কিছু বেশী, এই রকম অবস্থা; ক্রমাগত পর্য্যটন। দুঃসময়ে অনেক নিরীহ লোকের পক্ষে এক এক প্রকার সুযোগ উপস্থিত হয়, দুর্যোগেও সুযোগ; দুর্যোগকে সুযোগ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া সেই দ্বাদশ বৎসর তিনি প্রায় অজ্ঞাতবাসেই কাটাইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, জীবনবন্ধুর দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। সেই

বাসের সময়ে তিনি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। শরীর নিষ্পাপ, মন নিষ্পাপ, তথাপি যাহা কিছু মনের গ্লানি ছিল, তীর্থবাসে তাহা ক্ষয় হইয়া গেল। বৃন্দাবনে বসিয়া তিনি একখানা সমাচারপত্রে জানিতে পারিলেন, জীবনকৃষ্ণ ঘোষ নামক এক দস্যুদলপতি পঁচিশজন সঙ্গীলোকের সহিত দূরদেশে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ভবতারণ শ্রীমানীর বাগানের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাটীতে ডাকাতী করিয়া, সেই স্ত্রীলোকটীকে খুন করিয়া, পলাইয়া গিয়াছিল, উপযুক্ত আদালতে তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহারা উচিতমত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিসের লোকের আলস্যবশে দ্বাদশ বৎসর তাহারা ধরা পড়ে নাই, একটী নির্দ্দোষী লোককে নিপীড়ন করিয়া পুলিসের ধীরেরা কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়াছিল, সেই নির্দ্দোষী লোক আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত বাবু জীবনবন্ধু মিত্র।

দুষ্টলোকের কুচক্রে জীবনবন্ধু মিত্র বিনা দোষে গুরুতর ফৌজদারীর আসামীস্বরূপ হইয়া কত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, সকলে তাহা অনুভব করুন। ডাকাতের নামের সহিত তাঁহার নামের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকাতেই দুষ্টচক্রে ইন্দ্রজালচক্রের ন্যায় তাঁহাকে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে হইয়াছিল। সমাচার-পত্রপাঠে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আইসেন, দুই তিন জন ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট এবং পাঁচ ছয় জন পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি আপনার যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। পাছে পুলিসের নামে নালিশ হয়, সেই সন্দেহে দুই জন উপযুক্ত ইন্‌স্পেক্টর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; জীবনবন্ধু কিন্তু কাহারও নামে নালিশ করেন নাই, নালিশ করিবার উপায়ও ছিল না। পুলিস বড় হুঁসিয়ার। অনিশ্চিত ব্যাপারে ও অনিশ্চিত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে বিপদ্ আছে, ইহা তাহারা জানে, গ্রেপ্তার করা দূরে থাকুক, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাহারা কেহ জীবনবন্ধুর সম্মুখে দর্শনও দেয় নাই। পুলিসের ভেল্কী কি রকমে চলে, বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এই একটী তাহার ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত।

রাহুমুক্ত হইয়া একবার ভবতারণ শ্রীমানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে জীবনবন্ধুর ইচ্ছা হয়, তিনি ভবতারণের উদ্যানবাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় গিয়া শুনিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত হইয়া ভবতারণ আটমাস শয্যাগত

ছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয় বিকল হইয়াছিল, মহা যন্ত্রণাভোগ করিয়া তাঁহার প্রাণপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে। ক্ষত-রোগে প্রায় এক বৎসর যন্ত্রণাভোগ করিয়া জটাধারী সরকারও ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাহার জিহ্বা পচিয়া পচিয়া খসিয়া গিয়াছিল। নারায়ণকে নমস্কার করিয়া, আকাশের পানে চাহিয়া, জীবনবন্ধু ভাবিলেন, "পৃথিবীতে মানুষের দত্ত দণ্ড তত দূর ফলোপধায়ক হয় না, ভগবানের দত্ত দণ্ডই প্রকৃত দণ্ড। কোন্ পাপের কিরূপ দণ্ডবিধান করিতে হয়, ভগবান্ তাহা জানেন, পৃথিবীর লোকে সেরূপ সুবিচার জানে না।" জীবনবন্ধু আরও ভাবিলেন, ঈর্ষা-বশে অকারণে তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার মূল ছিল জটাধারী সরকার, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, সর্প যাহাকে দংশন করে, কেবল সেই লোকের মৃত্যু হয়, খলেরা অপরের কর্ণমূলে দংশন করিয়া অপরলোকের প্রাণবিনাশ করে, অতএব সর্প অপেক্ষা খল ভয়ঙ্কর। খল জটাধারী ভবতারণের কর্ণমূলে দংশন করিয়াছিল, পুলিসের কর্ণমূলে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার (জীবনবন্ধুর) মহাবিপদ্ উপস্থিত হয়। তিনি কাহাকেও অভিসম্পাত করেন নাই, অথচ ভগবানের সুবিচারে ভবতারণ এবং জটাধারী উভয়েই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল। প্রকৃতির নিখিল সংসারের এই একটা মহৎ উপদেশ।

সংসারের প্রতি জীবনবন্ধুর বিরাগ জন্মিয়াছিল, তিনি আর গৃহে গমন করিয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখেন নাই, গ্রামের লোকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন নাই, বিরাগী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ নাই।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

দুর্গাপূজা।

কলিযুগের অশ্বমেধ-যজ্ঞ দুর্গোৎসব। সেই দুর্গোৎসবের দিন দিন কিরূপ পরিণাম হইয়া আসিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া দিন দিন আমরা পরিতপ্ত হইতেছি বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসবে হিন্দু সন্তানের কিরূপ আমোদ ছিল, কিরূপ উৎসাহ ছিল, হিন্দুর হৃদয়-সাগরের আনন্দ-স্রোতের সহিত কিরূপ ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা যাঁহাদের মনে হয়, তাঁহারা এখন বিষাদে অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন। দুর্গা-পূজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের সে সাধুকভাব এখন আর প্রায়ই দৃষ্টি-গোচর হয় না; সে ভাব এখন কেবল তামাসায় পরিণত হইয়াছে। দুর্গানাম করিতে করিতে লোকের মনে দুর্গা-নামের বিমলানন্দ সমুদিত হইত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দুর্গা-প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহাদের গৃহে গৃহে আনন্দময়ীর আনন্দময় নাম পূজার পূর্ব্বে দুই মাস কাল মহানন্দে পরিকীর্ত্তিত হইত। প্রতিমার গঠন আরম্ভ হইলে বালক-বালিকারা অবকাশ পাইলেই কারিকরগণের নিকটে বসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত, কোন কার্য্য যেন তাহাদের ভাল লাগিত না। এখন আর সে ভাব নাই, সে আনন্দ নাই, সে ভক্তি নাই, সে স্ফূর্ত্তিও নাই। দুর্গোৎসব আমাদের দেশে জাতীয় সাধারণ পর্ব্ব। মুসলমানেরা দুর্গাপূজা করে না, কিন্তু দুর্গোৎসবের সময় হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বজাতিই এক এক প্রকার অনুরাগে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, হিন্দু-মুসলমানাদি সকলেই নববস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়,

ব্যবসায়ী লোকেরা পূজার উৎসবে বিলক্ষণ লাভবান্ হয়, এই কারণে দুর্গোৎসবকে জাতি-সাধারণ পর্ব্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। আজকাল বাহ্য অঙ্গগুলি বজায় আছে, বরং দিন দিন বাড়িতেছে, কুৎসিত অঙ্গ প্রবল হইতেছে, বৎসর বৎসর নূতন নূতন ফ্যাসনের পুষ্টিবর্দ্ধন হইতেছে। যাঁহাদের বাড়ীতে মহামায়ার আগমন হয়, তাঁহারা মুখে বলেন দুর্গোৎসব; কিন্তু মনে মনে অনেকেই ভাবেন দুর্গাদায়। পূজার তিনটী দিন কাটিয়া গেলে তাঁহারা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

কুৎসিত অঙ্গের কতদূর প্রবলতা হইয়াছে, একে একে দেখাইয়া দিতে হইলে দুর্গা-পূজা-পদ্ধতি অপেক্ষাও বৃহৎ পুথি প্রস্তুত হইতে পারে। সাত্বিকভাবের পরিবর্ত্তে তামসিক ভাবের এতদূর আধিক্য হইয়াছে যে, সাহেবেরা বাজনা বাজাইবে, সাহেবেরা নিমন্ত্রণ পাইয়া ভোজন করিতে আসিবে, সাহেবভোজনের জন্য বিবিধ মদ্য-মাংসের আয়োজন হইবে, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের জন্য কেবল ফল-জল-তাম্বূলের ব্যবস্থা হইবে, বাই-খেম্‌টা নাচিবে, আলিবাবা, আলাদীন্ ও আবুহাসেনের অভিনয় হইবে, সহরের অনেক বড়লোকের বাড়ীতে দুর্গা-পূজায় এইরূপ বন্দোবস্ত। যে বড়মানুষের বাড়ীতে সাহেবের আদর ও সাহেবের সংস্রব না থাকে, ফ্যাসন্-প্রিয় লোকেরা সে বাড়ীর পূজাকে পূজা বলিয়াই গণনা করে না। সাহেব লোকের বড় আদর, পূজার সময় সাহেবেরা বাজনা বাজাইবে, বিসর্জ্জনের সময় সাহেবেরা ছত্র-চামর ধরিবে, সাহেব প্রহরীরা আগে আগে ছুটিবে, তবে বাবু লোকের আমোদ বাড়িবে। ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল রত্ন স্বর্গগত বাবু রাজনারায়ণ বসু একদা একটা বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর্য্যগৃহের প্রায় সমস্ত ক্রিয়া-কলাপেই সাহেবের সমাদর দৃষ্ট হইতেছে। ইহার পর এতদূর হইয়া পড়িবে যে, গোরারা লুচি না ভাজিলে হিন্দুর কোনও কার্য্যে বৃথা হইবে না।" রাজনারায়ণ বসুর এই ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্র একদিন এই দেশে সফল হইবে, রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া আমাদের এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইতেছে। মনে হয় যেন, সাহেবে লুচি ভাজিয়া না দিলে মা দুর্গার ভোগ হইবে না।

যাঁহাদের বাড়ীতে পূজা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কেবল বাহ্য আমোদে রত থাকেন, ইয়ার-বন্ধু লইয়া আমোদ করিবার জন্য তাঁহারা দুর্গা-পূজার আড়ম্বর করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একবার এক বাড়ীতে

মহাষ্টমী পূজার দিন বাড়ীর কর্ত্তা রত্নকুমার যে কীর্ত্তি করিয়াছিলেন, এইখানে তাহার একটু পরিচয় রাখা ভাল।

পূজার দালান পশ্চিমদ্বারী, পুরোহিত পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজা করিতেছিলেন। দালানের দক্ষিণদিকে দোতালার বৈঠকখানায় এক বৃহৎ জানালা; জানালায় বসিলে প্রতিমাখানি বেশ দেখা যায়। দুই বৎসর পূর্ব্বে রত্নকুমারের পিতা পরলোক-গমন করিয়াছেন। রত্নকুমার বাড়ীর কর্ত্তা, তাঁহার বয়ক্রমঃ পাঁচশ বৎসর। দালানে পূজা হইতেছে, রত্নকুমার বৈঠকখানায় বসিয়া দশজন বন্ধু-বান্ধব লইয়া কাঁচের বাসনের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। প্রতিমার যে দিকে কার্ত্তিক, সেই দিকেই বৈঠকখানা। খেলা করিতে করিতে রত্নকুমার একবার জানালার ধারে আসিয়া বসিলেন, আরক্ত-নয়নে কার্ত্তিককে দেখিলেন; দেখিয়াই তাঁহার রাগ হইল, জড়িতস্বরে কার্ত্তিকের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "বাবু হইয়াছে, ময়ূরে বসিয়াছে, গহনা পরিয়াছে, চুলের কেয়ারি করিয়াছে! অসভ্যের শিরোমণি! এমন আনন্দের দিনে একবিন্দু মধু পান করে না!" বলিতে বলিতে রত্নকুমারের স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া উঠিল, মধুপূর্ণ একটী পাত্র হস্তে লইয়া গবাক্ষপথ দিয়া কার্ত্তিকের গাত্রে ছুড়িয়া মারিলেন। কার্ত্তিকের দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলী ভাঙ্গিয়া গেল, পাত্রস্থ সমস্ত মদিরা তসরপরা পুরোহিতের গাত্রে পড়িল, পূজার বাসন ও নৈবেদ্যাদিও অপবিত্র হইয়া গেল, তন্ত্রধারকের পুথি ভিজিয়া গেল, পুরোহিতেরা উঠিয়া পলাইলেন, সেইখানেই অষ্টমী-পূজা সমাপ্ত।

রত্নকুমার অনেক প্রকার। আর একটী রত্নকুমার আপনাদের বাড়ীর দুর্গা-পূজায় নূতন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। বাহ্যাড়ের প্রতি তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম সাগরলাল। পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর হইল, সাগরলাল কর্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহার পিতা যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় বাড়ীর একটা বিড়াল পূজার সময় প্রতিমার নিকটে বড় দৌরাত্ম্য করিত, পূজার দ্রব্যে মুখ দিত, ভোগ উচ্ছিষ্ট করিত, পুষ্পপাত্রে প্রস্রাব করিত। সেইজন্য কর্ত্তা হুকুম দিয়াছিলেন, "ষষ্ঠীর দিন হইতে বিজয়া পর্য্যন্ত ঐ বিড়ালটাকে দালানের একধারে বাঁধিয়া রাখিও।" দুই তিন বৎসর তাহাই হইত। তাহার পর কর্ত্তার মৃত্যু; সাগরলাল কর্ত্তা। ষষ্ঠীর অধিবাসের সময় মদ খাইয়া টলিতে টলিতে সাগরলাল একবার নীচে নামিয়া আসিয়া দালানের এধার ওধার দর্শন করিয়া বলিলেন, "বিড়াল

কোথায় ? বিড়াল বাঁধা হয় নাই ? কিসের অধিবাস ? সমস্তই অঙ্গহীন। বিড়াল বোলাও !”

সাগরলালের জানা হইয়াছিল, বিড়াল বাঁধা পূজার একটী প্রধান অঙ্গ। বিড়াল বাঁধা হয় নাই, সেই জন্যই তিনি বলিলেন, সমস্তই অঙ্গহীন ; সেই জন্যই বিড়াল তলব হইল।

বাড়ীর প্রধান সরকার হরেকৃষ্ণ বাগ্‌চী সম্মুখে আসিয়া বলিল, “আজ্ঞে, সে বিড়ালটা মরিয়া গিয়াছে।” বাবু সক্রোধে বলিলেন, “মরিয়া গিয়াছে, দেশে কি আর বিড়াল পাওয়া যায় না ? যেখানে পাও, শীঘ্র একটা বিড়াল ধরিয়া আন, অধিবাস এখন বন্ধ থাকুক।”

পুরোহিত হাত গুটাইলেন, হরেকৃষ্ণ বিড়াল অন্বেষণে ছুটিল ; পাড়া হইতে একজনের একটা কালো বিড়াল ধরিয়া আনিয়া লম্বা দড়ী দিয়া দালানের একটা থামে বাঁধিয়া দিল। সাগরলাল সন্তুষ্ট হইলেন, অধিবাস করিবার হুকুম দিলেন। অধিবাসের সময় বাড়ীর কর্ত্তাকে উপস্থিত থাকিতে হয়, সাগরলালের সময়াভাব, তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না, বৈঠকখানায় ইয়ারেরা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি তাড়াতাড়ি মদ খাইতে চলিলেন।

ফ্যাসনের অনুরোধে, বাহ্য-শোভার অনুরোধে, তামাসার অনুরোধে দুর্গাপূজা এখন বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। কি সহর, কি পল্লীগ্রাম, সকল স্থলেই মা দুর্গা কেবল তামাসা দেখিয়া বিদায় হন। দু-এক বাড়ীতে শাস্ত্রমত পূজা হয়, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদিও হয়, এ কথা না বলিলে সত্যের মানরক্ষা হয় না, সেই জন্য বলিতে হইল; নতুবা দুর্গা-বাড়ীর কর্ত্তাপক্ষগণের ইচ্ছানুসারে পূজা-পদ্ধতি উল্টাইয়া যাইতেছে, এই কথা বলাই ন্যায়সঙ্গত। কলিকাতা সহরের যে যে বাড়ীতে আনন্দময়ীর অধিষ্ঠান হয়, সেই সকল বাড়ীতে আনন্দ থাকে না, এ কথা বলাও একপ্রকার সত্যের অপলাপ। আনন্দ অবশ্যই থাকে, কিন্তু দুর্গানন্দ আর ভোগানন্দ অনেকটা অন্তর। বাবুদের ভোগবিলাসে দুর্গাপূজা সমাপ্ত করা যদি যথার্থই দুর্গোৎসব নামে অভিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাদৃশ দুর্গোৎসব এ দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়াই মঙ্গল। সত্যের অনুরোধে আর একটী কথা এখানে বলিতে হইল। নবদ্বীপের তারকচন্দ্র প্রামাণিক কলিকাতা কাঁসারী-পাড়ায় প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবে দুর্গাপূজা করিতেন। এখনকার দুর্গাপূজা কত স্থানে

কত প্রকারে হইতেছে, তাহার আর একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত পাঠক মহাশয়েরা দর্শন করুন।

অবাক্-রাণীর দুর্গা-পূজা।

কুঁকড়োগাছী মহল্লার মধ্যে একটী মনোহর কুঞ্জ, সেই কুঞ্জমধ্যে দিব্য একখানি বাড়ী,—নিকটস্থ পল্লীসমূহে সেই বাড়ীখানি রাণী-বাড়ী নামে বিখ্যাত। বিখ্যাত হইবার কারণ এই যে, একটী রাণী সেই বাড়ীতে বাস করেন। রাণীর স্বামী জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়, রাণীর নাম পদ্মাবতী। যৌবনে পতিহীনা হইয়া রাণী পদ্মাবতী স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কুঁকড়োগাছীতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বাড়ীখানি পূর্ব্বে ছিল না, নিভৃতকুঞ্জ অতি সুরম্য, তদ্দর্শনে সেই স্থানটীই নির্ব্বাচন করিয়া রাণী স্বয়ং ঐ বাড়ীখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভদ্রতার অনুরোধে যে কথাটী প্রকাশ করা উচিত ছিল না, প্রসঙ্গানুরোধে কর্ত্তব্য-বিবেচনায় অগত্যা তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হইল, পাঠক-মহাশয়েরা ইহাতে কোন দোষ বিবেচনা করিবেন না।

রাণী পদ্মাবতী যৌবনে বিধবা, পুত্র কন্যা জন্মে নাই, অধিক দিন বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বিরহ-শান্তির অভিলাষে তিনি স্বয়ং একটী উপরাজা মনোনীত করিয়া লইয়াছেন। রাণীকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ঐ উপসর্গ অবগত আছেন বলিয়াই আমাকে এই পরিচয়দানের সময় লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইল।

রাণী পদ্মাবতী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষয় বিভব কিছুই নষ্ট করেন নাই। এই নূতন বাড়ীতে তাঁহার রীতিমত সেরেস্তা আছে; সেরেস্তায় অনেকগুলি কর্ম্মচারী আছে। রাণীর নির্ব্বাচিত উপরাজাটী সেই সেরেস্তার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

বাড়ীতে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সমস্তই হয়। রাজা বৈষ্ণব ছিলেন, রাণীও সুতরাং বৈষ্ণবী ছিলেন। বিধবাবস্থায় কুঁকড়োগাছীতে আসিয়া তিনি এখন শাক্ত বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মের মানরক্ষা করেন। ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা এই চারিটী বৈষ্ণবপর্ব্বে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন ঘটা হইত, এখন তত হয় না; কিন্তু কলিকাতা সহরের ধনবান্ সুবর্ণবণিক্-মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ যেমন ঐ সকল পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অপেক্ষা গোপীগণের মহিমা-

বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কলিকাতার আভ্যন্তরিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না থাকিয়াও রাণী পদ্মাবতী সেইরূপ পদ্ধতির আদর করিতে ভালবাসিয়াছেন। ঠাকুর-সেবার জন্য যেখানে পঞ্চাশ টাকার বরাদ্দ, খেমটা-নাচ, বাইনাচ, যাত্রা, রোসনাই এবং অপরাপর বাহ্যাঙ্গে সেখানে পঞ্চাশের দক্ষিণাঙ্গে একটী শূন্য (০) অঙ্ক-পাত করা হয়। বিষ্ণুমহিমার পরিচয় এই পর্য্যন্ত।

শাক্তমতে দুর্গা-পূজা।

যে দিনের কথা বলা হইতেছে, সে দিন রথযাত্রা। রাণীবাড়ীর প্রতিমার কাঠামো-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কাঠামোতে সিন্দুর-চন্দনাদির পরিবর্ত্তে বিলাতী পোমেটম-লেভেণ্ডারাদি লেপন করা হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের কারিকর। বঙ্গ-দেশের পাঠক-মহাশয়েরা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, কৃষ্ণনগরের কারিকরগণকে যিনি যেরূপ পুত্তলিকাদি গঠন করিবার ফরমাজ করেন, তাহারা অতি পরিপাটী-রূপে তাহাই সম্পাদন করিয়া দেয়। দেবতা হইতে ভূত-প্রেত পর্য্যন্ত সমস্ত গঠনেই কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা চিরবিখ্যাত। কথিত আছে, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদা একজন বৃদ্ধ কারিকরকে ডাকাইয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "পালের পো, তুমি ত সকল প্রকার গঠনেই পরিপক্ক, কিন্তু আমাকে কোন একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইতে পার কি না?" বৃদ্ধ পাল করযোড়ে উত্তর করিয়াছিল "মহারাজের যদি অনুমতি হয়, তিন পক্ষ পরে তাহা আমি দেখাইতে পারি।" মহারাজ তাহাতেই সম্মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেই বৃদ্ধ কারিকরের প্রকৃত নাম এখন স্মরণ হইতেছে না, মনে করুন, তাহার নাম উদ্ধব পাল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই উদ্ধবকে সখ্যভাবে সম্ভাষণাদি করি-তেন, এক এক সময়ে মহারাজ সেই উদ্ধবের সঙ্গে সতরঞ্চ-খেলা করিতেন। যেদিন তিন পক্ষ অতীত হইবার শেষদিন, সেই দিন অপরাহ্নে উদ্ধব পাল একটা গরদের যোড় পরিধান করিয়া, প্রায় অর্দ্ধহস্তপরিমিত একখানি সোণার কবচ বাহুদেশে সংলগ্ন করিয়া, সোণার মাদুলিগ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা গলায় দিয়া মহারাজের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সতরঞ্চখেলা চলিতে থাকে। প্রথম বাজীতে উদ্ধব পালের জিত। মহারাজ কিছু বিমর্ষ। প্রাচীন উপকথায় আমাদের শুনা আছে, সে কালের রাজারা প্রায়ই এক একটা গুরুতর বিষয় রাজভোলে ভুলিয়া থাকিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তিনপক্ষ পূর্ব্বে উদ্ধব পালকে

যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা তিনি সেইপ্রকার রাজভোলে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। খেলায় হারিয়া মহারাজ বিমর্ষ হইলেন দেখিয়া উদ্ধব পাল একটা হাই তুলিয়া বলিল, "মহারাজ! আজি আর খেলা করিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, হুজুর কিছু অন্যমনস্ক আছেন। কিয়ৎক্ষণ বাহিরের হাওয়া খাইয়া আসিলে আরাম বোধ হইতে পারিবে।" মহারাজও তাহাতেই সম্মতি দিলেন; ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই উদ্ধবের সহিত হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। অধিকদূর যাওয়া হইবে না, নিকটে নিকটেই ভ্রমণ করা হইবে, অতএব যান-বাহনাদির প্রয়োজন হইল না, উদ্ধবের সহিত মহারাজ পদব্রজেই চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই কিঞ্চিদ্দূরে কি একটা পদার্থ দেখিয়া মহারাজ থমকিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধবকে বলিলেন, "পালের পো, ও দিকে কোথায় যাইতেছ? ও দিকে গো-ভাগাড়; অন্য পথ ধর।" মনে মনে হাস্য করিয়া উদ্ধব বলিল, "আজ্ঞে, না মহারাজ! ভাগাড়টা অনেক দূরে। উহার পার্শ্বে পরিষ্কার রাস্তা আছে।" মহারাজ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, উদ্ধবের সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন; কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়াই দেখিলেন, একটা শ্বেতবর্ণ ষাঁড় মরিয়া পড়িয়া আছে। চারি হাত-পা বাঁধা; শূন্যপথ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি উড়িয়া সেইস্থানে নামিতেছে, কিন্তু ষাঁড়কে স্পর্শ করিতেছে না, হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পালের পো, ও কি আশ্চর্য্য তামাসা! ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া শকুনিরা পলায়ন করিতেছে, ইহার কারণ কি?" উদ্ধব তখন হাস্য করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! উহার কারণ—এই আজ্ঞাধীন উদ্ধব পাল।"

এই স্থানে রহস্যভেদ হইয়া গেল। মাটীর ষাঁড় গঠন করিয়া উদ্ধব পাল ঐ স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতেই শকুনি বসিয়াছিল। মহারাজ মহা বিস্মিত হইলেন, উদ্ধব পাল নগদ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক ও দুই শত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইল।

কৃষ্ণনগরের কারিকরদিগের নৈপুণ্য ও কারিকুরী আছে। প্রতিমার কাঠাম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী পদ্মাবতী মনে মনে একটা নূতন ভাব আনয়ন করিয়া মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। এ বৎসরের প্রতিমার গঠন কিরূপ হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ তিনি আপন কল্পনাপথে আনিয়াছিলেন, কল্পনার পূর্ণাংশ একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির পরামর্শের অপেক্ষায় মুলতুবী ছিল। কুঞ্জপ্রাসাদের দক্ষিণদিকের

টানা-বারান্দায় একখানি কৌচ পাতিয়া রাণী পদ্মাবতী অর্দ্ধশায়িনী হইয়া সোণার আঁলবোলায় তাম্রকূটের সুগন্ধি ধূমসেবন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ভোলানাথ। ভোলানাথকে দেখিবামাত্র রাণী মৃদু হাসিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরমহলের দিকে চলিলেন, যতক্ষণ চলিলেন, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে একটীও বাক্য-বিনিময় হইল না। রাণী অগ্রগামিনী, পশ্চাতে ভোলানাথ।

ভোলানাথকে একটী কক্ষমধ্যে বসাইয়া, পদ্মাবতী ঘন ঘন পদবিক্ষেপে কতই যেন অন্যমনস্কভাবে ভিতরদিকের বারান্দায় পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি যেন মনে আসিতেছে, কি যেন দেখিবেন, কি যেন ভুলিয়া যাইতেছেন, কি যেন দেখিবার ইচ্ছা, পরিক্রমণশীলা পদ্মাবতীর এই প্রকার ভাব। একবার এধার, একবার ওধার, একবার সিঁড়ির নিকটে যান, আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বারান্দার প্রান্তে গিয়া কুঞ্জের বৃক্ষবাটিকার বৃক্ষলতাদি দর্শন করিতেছেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া বারান্দার রেলের উপর বক্ষস্থাপনপূর্ব্বক নিম্নদৃষ্টিতে নিম্নপ্রাঙ্গণে কি যেন দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। বড় বড় দুটী পদ্মচক্ষু চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। দৃষ্টিরও স্থিরতা নাই, দর্শনীয় পদার্থেরও স্থিরতা নাই। দর্শন, পরিক্রমণ, স্তম্ভন, তিনপ্রকার ভাব একত্র; বার বার এইরূপ। সময় প্রদোষ।

দেখিতে দেখিতে প্রদোষকাল অতীত হইল; অন্ধকার আসিয়া বাড়ীখানি ঢাকিল; আকাশে নক্ষত্র উঠিল। আশ্চর্য্য, অত বড় বাড়ীতে একটীও দীপ জ্বলিল না। একঘরে একটী ভোলানাথ, বারেন্দায় একটী রাণী, তদ্ভিন্ন সে সময় সে বাড়ীতে জনপ্রাণীরও সমাবেশ নাই। সমস্তই নীরব। অন্ধকার-ঘরে ভোলানাথ একাকী বসিয়া নিষ্কর্ম্মা অবধূত যোগীর ন্যায় আপন মনে ঢুলিতেছেন; ঢুলিতে ঢুলিতে একবার একটু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, রাণি!"

রাণী তখন কি চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁহার গতি ক্রিয়া-দর্শনে যাঁহারা তাঁহার চিন্তার বিষয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। অনুমান করিয়াছে কাহারা? গতি ক্রিয়া দর্শন করিয়াছে কাহারা? বারান্দার থামের, কুঞ্জবনের তরুলতারা আর আকা-

শের নক্ষত্রেয়। আরসুলা, টিক্‌টিকি, মাকড়সা গৃহস্থ-গৃহের এক প্রকার আভরণ, সজীব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে রাণীবাড়ীর তখনকার অবস্থায় কেবল সেইগুলিকেই মনে পড়ে। দ্বিপদবিশিষ্ট মানব বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, ঐ দুটী মানব-মানবী ব্যতীত সে বাড়ীতে তখন আর তেমন পদার্থ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চকণ্ঠে ভোলানাথ পুনর্ব্বার ডাকিলেন, "রাণি!" এইবার রাণীর যেন একটু চমক হইল। রাণী তখন বারান্দার রেলে বুক রাখিয়া নিম্নস্থ শূন্য প্রাঙ্গণভূমি দর্শন করিতেছিলেন। ভোলানাথের দ্বিতীয় আহ্বানে তিনি কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তর করিলেন—না না, উত্তর করিলেন না, প্রশ্ন করিলেন, "কি ?"

অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া তো ভোলানাথের বিস্ময় জন্মিতেছিলই, রাণির ঐ অদ্ভুত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার আরও অধিকতর বিস্ময় জন্মিল। চকিতস্বরে তিনি কহিলেন, "রাত্রি চারিদণ্ড হইতে যায়, এখনও পর্য্যন্ত গৃহে সন্ধ্যা জ্বলিল না, তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, কি ? তোমার আজিকার ভাব-ভক্তি কিছুই ত বুঝিতেছি না।"

কথার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ না দিয়াই রাণী গদগদবচনে বলিলেন, "তুমি এখানে আছ, ওটা আমার মনেই ছিল না, সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিবে কে ? দেখিতেছ না, জনপ্রাণীও আজ বাড়ীতে নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া আত্মগত বাক্যের ন্যায় রাণী অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি একটা আলো জ্বালিয়া দিতেছি।"

বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য। ঘরের একধারে ডবল-বাতীযুক্ত একটী সেজ জ্বলিল। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে জনপ্রাণী নাই, এ কথার অর্থ কি ? লোকেরা সব গেল কোথা ?"

রাণী।—থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছে।

ভোলা।—কিসের থিয়েটার ? কোথাকার ?

রাণী।—কিসের, কোথাকার, কি বৃত্তান্ত, অত শত নিকেশ আমি জানি না। তারা ব'লে গেল, চর্কী-থিয়েটার। কোথা থেকে এক দল চর্কীওয়ালা এসেছে, চর্কী-বাজী দেখায়, যে দেখে, সেইখানেই তার মুণ্ড ঘুরে যায়। বাড়ীর সব লোকগুলা একেবারে যেন ঝেঁটিয়ে চলে গেল;—ঝেঁটিয়ে চ'লে গেল!—দাসীগুলা পর্য্যন্ত!

ভোলা।—(সবিস্ময়ে) চর্কী-থিয়েটারের নাম তো কখন শুনি নাই।

রাণী।—কে কোন্ কালে শুনেছে, আমি তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

ভোলা।—যে লোকটা তাদের পালের গোদা, সে লোকটা তোমায় কিছুই ব'লে যায় নাই?

রাণী।—কে? সেই প্রেমদাস? সে ব'লে গেল চর্কী-থিয়েটার। সে থিয়েটারের লোকেরা দেখায়—সসাগরা পৃথিবীর স্থাবরজঙ্গম চরাচর, সব পদার্থ ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘোরে। আকাশ আসে পাতালে, পাতাল যায় স্বর্গে। আমাদের এই পৃথিবী রথচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হয়।

ভোলা।—পৃথিবী ঘূর্ণায়মান হয়, সেটা মিথ্যাকথা। থিয়েটারে হয় তো দেখাতে পারে, কিন্তু আসলে কিছুই নয়।

রাণী।—তুমি মূর্খ। ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা না থাকলে এখনকার দিনে সংসার-জ্ঞানে অধিকার জন্মে না। আমার মেম সাহেব ব'লেছেন, তাঁদের কে একজন নিউটন কি ওলটম সাহেব আবিষ্কার ক'রে গিয়েছেন, পৃথিবী ঘোরে। সেই দৃষ্টান্তে বিদ্যালয়ের বালকেরা, এমন কি, বালিকারা পর্য্যন্ত আজকাল বাহু তুলে নৃত্য কোত্তে কোত্তে ব'লে থাকে—পৃথিবী বাতাবী-লেবুর মত গোলাকার। জাহাজ যখন তীরে আসে, তখন অগ্রে মাস্তুল দেখা যায়, তলভাগ যেন জলে ডুবে আছে এইরূপ মনে হয়, যতই নিকটে আসে, ততই সম্পূর্ণ জাহাজখানা আমরা দেখ্‌তে পাই। অতএব পৃথিবী গোল, সেই গোল পৃথিবী নিত্য নিত্য ঘোরে, বৎসরে বৎসরেও ঘোরে।

ভোলা।—তাও ত বুঝ্‌লেম, কিন্তু আমাদের আমলারা, দাসী-চাকরেরা থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছে, রাত্রের মধ্যে ফিরে আস্‌বে কি না?

রাণী।—আমি মেয়েমানুষ, ঘরেই বসে আছি, সে কথার উত্তর আমি কি দিব? থিয়েটারের পৃথিবী যদি সারারাত ঘোরে, তাহা হইলে বোধ হয়, তারা আস্‌তে পার্‌বে না। ঘুরে ঘুরে তারাও যদি পথের মাঝখানে প'ড়ে যায়, প্রাণ হারাবে, সেই ভয়েই হয় তো আস্‌বে না। আচ্ছা ভোলানাথ, ও সব কথা থাক্, থিয়েটারের কথা থিয়েটারেই থাক্, একটা পরামর্শ তোমাকে আজ আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।

ভোলা।—হুকুম হোক্।

রাণী।—আজ তো রথযাত্রা, প্রতিমার কাঠামোও প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে, প্রতিমার গঠন এ বৎসর কিরূপ করা যায়? সেই সেকেলে দশভুজা দুর্গা—সেই লক্ষ্মী-সরস্বতী—সেই কার্ত্তিক-গণেশ—সেই চোরা-সিঁদ আর ত আমার ভাল লাগে না। এবার কিছু নূতন দেখান আমার ইচ্ছা, বল দেখি, নূতনত্বের কি প্রকার অঙ্গ হলে ভাল দেখায়?

ভোলা।—সে পরামর্শ আমার কাছে নাই। দুর্গা-প্রতিমা নূতন ধরণের হবে, হিন্দু-সন্তানের কাছে সে পরামর্শ লওয়াই তোমার ভুল!

রাণী।—বুঝেছি তোমার বিদ্যাবুদ্ধি, অনেকদিন বুঝেছিলেম, আজ আবার ঘোল আনার উপর। আচ্ছা, আমি একটা কল্পনা করেছি, আগে সেইটী শোনো, তার পর মতামত দিও। আমার কল্পনা এই যে, ভগবতী দশভুজা হবেন না, দুখানি হাত থাকবে; এক হাতে রুমাল, এক হাতে একখানি ফুলদার পাখা; পোষাক বিবিয়ানা—মাথায় বনেট; লক্ষ্মী-সরস্বতীরও বিবিয়ানা পোষাক, মাথায় বনেট। সরস্বতীর হাতে বীণা থাকবে না, তিনি শাস্ত্রানুসারে নৃত্য-গীতবিনোদিনী, সেই মানরক্ষার্থে—তাঁকে এবারে আমার বাড়ীতে হারমোনিয়ম বাজাতে হবে। লক্ষ্মীর হস্তে পদ্মফুল দেওয়া হবে না, তিনি ফ্লুট বাজাবেন; ভগবতীর পায়ে সিংহ রাখা হবে না, শিব স্বয়ং দরিদ্র, সুতরাং অশ্ব সরবরাহ কোত্তে অক্ষম, নিজে একটী গরু চড়েন, দুর্গাকে বনের পশুপতি ধ'রে সাজিয়ে রেখেছেন, কার্ত্তিককে একটী বনের ময়ুর দিয়েছেন, লক্ষ্মীকে পেঁচা দিয়েছেন, গণেশকে একটী ইঁদুর দিয়েছেন, কিছুই রাখা হবে না, সকলেই ঘোড়ায় চড়ে প্রতিমাতে বার দিবেন। কার্ত্তিক হচ্চেন দেবসেনাপতি, সাঁওতালদের মত তীর-ধনুকে যুদ্ধ করা এখন আর মানায় না; মিলিটারী পোষাক পোরিয়ে, মিলিটারী ক্যাপ মাথায় দিয়ে, কার্ত্তিক একজোড়া বন্দুক ঘাড়ে ক'রে সরস্বতীর বামভাগ উজ্জ্বল করবেন। গণেশ পাদ্রী হবেন, তাঁর স্কন্ধের উপর হাতীর মুণ্ড রাখা হবে না, পাদ্রীর মুণ্ড বসাতে হবে, কালা গাউনে ভুঁড়িটী সাজাতে হবে। যদি তুমি বল, গণেশের ধ্যানে গজেন্দ্রবদন পাঠ পাওয়া যায়, মুণ্ডটী গজেন্দ্রের না থাকলে ধ্যানটী অশুদ্ধ হয়ে যাবে—তা'র উপায় কি? উপায় আমি বলি—গণেশের বাহন ইঁদুর ছল, আমি বলছি ঘোড়া হোক্। ধ্যানের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ঘোড়ার পরিবর্ত্তে একটা হাতী গণেশের বাহন ক'রে দেওয়া হবে। কেমন, এ কথার উপর তোমার আর কি কথা আছে?

ভোলা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) রাণীর কথার উপর আমার কথা কওয়া বেয়াদবী. যা তুমি ইচ্ছা করেছ, তাই হোক্, তাতে ক'রে একটী লোকের বিলক্ষণ উপকার হবে। সে লোকটী মহিষাসুর, অর্দ্ধেক মহিষ, অর্দ্ধেক অসুর; বক্ষে ত্রিশূল, অঙ্গে নাগপাশ, ভগবতীর হস্তে কেশাকর্ষণ, সিংহের বারা তীক্ষ্ণ দংশন, অসুর বেচারা সে যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে।

রাণী।—তুমি তবে দেবতার মঙ্গল চাও না, মানুষের মঙ্গল চাও না, অসুরের মঙ্গল চাও। তোমাকে আমি এবারে দেওয়ানজীগিরী থেকে উচ্চে তুলে রায় বাহাদুরগিরী কর্ম্ম দিব, কারিকর এসে উপস্থিত হলে প্রতিমা-নির্ম্মাণে যখন আমি নূতন প্রকার আদেশ প্রদান করবো, সেই সময় মহিষাসুরের বদলে তোমার একখানি প্রতিমা দুর্গার পদতলে বসাবার অনুমতি দিয়ে দিব। আর দেখ, গণেশের দক্ষিণপার্শ্বে একটী কলাবউ দেওয়া হয়, কার্ত্তিকের বামপার্শ্বে কিছুই দেওয়া হয় না, এ বৎসর আমি উভয়ের বামে দক্ষিণে দুটী ফরাসী বিবি দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করাব, বিবিরা একদিকে মা দুর্গার বউ-মা হবে, অন্যদিকে জয়া-বিজয়ার কাজ করবে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাণী পদ্মাবতী যেন বিদ্যুদ্‌গতিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, পুনর্ব্বার সেই বারান্দায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। মন চঞ্চল, নয়ন চঞ্চল, চরণ চঞ্চল, গতি চঞ্চল। কি তিনি অন্বেষণ করিতেছেন, বারম্বার রেলে বুক রাখিয়া নিম্ন-প্রাঙ্গণে কি দর্শন করিবার আশা করিতেছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ তাহা জানে না, জানিতেও পারে ও না, শীঘ্র হয় ত পারিবেও না।

ভোলানাথ একাকী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অন্ধকার ছিল, এখন আলো হইয়াছে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল এইটুকু।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। বারান্দার সিঁড়িতে হঠাৎ মানুষের পদশব্দ হইল, ভোলানাথ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি আর রাণী ব্যতীত সে রাত্রে বাড়ীতে আর জনপ্রাণীও ছিল না, মনুষ্য কোথা হইতে আসিতেছে, এই বিস্ময়ে ভোলানাথের মন চঞ্চল। রাণীর মুখে এতক্ষণ হাসি ছিল না, সিঁড়িতে মনুষ্যের শব্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুখে হাসি আসিল, দ্রুতপদবিক্ষেপে সিঁড়ির দিকে অগ্রগামিনী হইয়া তিনি সেই আগন্তুকের প্রত্যুদ্‌গমন করিতে চলিলেন।

পরক্ষণেই একটী মনুষ্যকে সঙ্গে লইয়া রাণী পদ্মাবতী সহাস্যবদনে গৃহের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে গৃহে ভোলানাথ, সেই গৃহের চৌকাঠ। নূতন মনুষ্য দর্শন করিয়া ভোলানাথ অবাক্! মনে মনে তর্ক, এ মনুষ্য কে? লোকটীর পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য দর্শনে তাঁহাকে নিতান্ত সামান্য লোক বলিয়া বোধ হইল না। দিব্য গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, স্থূলোদর, অঙ্গে মহামূল্য বসন, বদনমণ্ডল পূরন্ত, দিব্য গোঁফ, দিব্য চক্ষু, দিব্য নাসিকা, মস্তকে গুচ্ছ গুচ্ছ সুকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, সেই কেশের অগ্রভাগ ক্রমশঃ বিকুঞ্চিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে গ্রীবা অতিক্রম করিয়া ঝুলিয়াছে। নবীন যৌবন, দিব্য সুপুরুষ।

ভোলানাথের বক্ষঃস্থল কম্পিত হইল। ভোলানাথ রাণী পদ্মাবতীর সদর সেরেস্তার দেওয়ানজী, সেই পদের উপর আর কোন্ পদে সে ব্যক্তি নিযুক্ত, পূর্ব্বে তাহার একটু আভাব দেওয়া হইয়াছে। রাণীর সহিত ঐ অভিনব যুবাপুরুষের আগমন দর্শনে ভোলানাথ আপন মনে কতপ্রকার কুতর্ক আনয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা কেবল ভোলানাথই জানিলেন, তাঁহার তখনকার মুখের ভাব দর্শন করিয়া রাণী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বাহিরে অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া রাণী শীঘ্র শীঘ্র গৃহপ্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই নূতন লোকটী। রাণী সেই লোকটীকে বসিতে বলিলেন, লোকটী বসিল, রাণীও প্রফুল্লবদনে তাহার পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের প্রায় তিন হস্ত দূরে ভোলানাথ; ভোলানাথের মুখ বিশুষ্ক, হৃদয় বিকম্পিত, অন্তরে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত। রাণী তাহা দেখিলেন, অন্তরে কি আছে, তাহা দেখিতে পাইলেন না, হৃদয়ের কম্পনও সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন না, কিন্তু শুষ্ক মুখখানি মুক্তনেত্রে দর্শন করিলেন; দর্শনে কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না, যেমন প্রফুল্ল, ঠিক সেই প্রকার প্রফুল্লই রহিল।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তাহার পূর্ব্বে পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতীত হইয়াছিল। অভিনব কুঞ্জাশ্রমে রাণী পদ্মাবতী পঁচিশ বৎসর দুর্গাপূজা করিয়াছেন। এই বৎসর ষড়্বিংশ-বার্ষিক মহোৎসব। ভোলানাথের সহিত প্রতিমা-গঠনের যেরূপ কল্পনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, নূতন লোকটী উপস্থিত হইলে রাণী আর সে প্রসঙ্গ কিছুমাত্র উত্থাপন করিলেন না, নূতন লোকের সহিত নূতন প্রকার রসাভাবের আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোলানাথ আর সহ্য করিতে

পারিলেন না। পাঠক-মহাশয়গণের মধ্যে যাঁহারা এই প্রকার অতৃপ্তিকর অভিনয়ের সাক্ষী হইয়াছেন, সাক্ষী হইয়া প্রকারান্তরে ভুক্তভোগী হইয়াছেন, তাঁহারাই ভোলানাথের তখনকার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

নূতন লোকটীর নাম রসময়। রসময়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাণী এক একবার ভোলানাথের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন, কিছু যেন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, না করিলে যেন দোষ হয়, এই ভাব জানাইয়া রাণী মধ্যে মধ্যে উদাসভাবে ভোলানাথকে দুটী একটী কথায় সাক্ষী মানিতেছেন; ভোলানাথ কথা কহিতেছেন না, রাণী যখন তাঁহার দিকে চাহেন, তিনি তখন মুখখানি অবনত করেন; রাণী যখন প্রেমপ্রফুল্ল-নয়নে রসময়ের বদন নিরীক্ষণ করেন, ভোলানাথ তখন আড়ে আড়ে সেই দিকে আরক্তনয়ন নিক্ষেপ করে। যাহাদের হৃদয় প্রণয়ের ঈর্ষানলে কখনও জ্বলিয়াছে কিম্বা এখনও জ্বলে, তাঁহারাই বুঝিবেন ভোলানাথের নয়ন আরক্ত হইবার কারণ কি?

অতি কম দশবার রাণী পদ্মাবতী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নে ভোলানাথের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন, ভোলানাথ একটীও উত্তর দিলেন না, ভোলানাথ নীরব; কিন্তু সেই নীরবতা ভেদ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ নাসিকা পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাণী বুঝিলেন ভোলানাথের ভাব, ভোলানাথ বুঝিলেন রাণীর ভাবান্তরের ভাব। ভোলানাথ সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাণীর প্রিয়পাত্র হইলেও অধীনস্থ বেতনভোগী কর্ম্মচারী, নীরব হইয়া থাকা ভিন্ন মুখামুখী কোনরূপ কথা-কাটাকাটি করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব।

রসময়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে ভোলানাথকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীরবদনে রাণী কহিলেন, "ভোলানাথ, পূজা আসিতেছে, এ সময় তোমার ঐ প্রকার নিরপেক্ষতার কোনরূপ পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা করা আমার উচিত হয় না। বৎসরাবধি আমি দেখিয়া আসিতেছি, আমার প্রতি তোমার অনেকটা ঔদাস্যভাব, সরকারী কার্য্যেও মধ্যে মধ্যে তুমি ঔদাসীন্য প্রকাশ কর, বিষয়কর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি যেন তাচ্ছল্যভাবে নিস্তব্ধ হইয়া থাক, সমস্তই আমি বুঝিতে পারি; অগ্রে না ভাবিয়া আমি তোমাকে অনুচিত প্রশ্রয় দিয়াছিলাম, তাহারই এই ফল, এখন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না, তুমি তোমার নিজের অনিষ্ট করিতে যত্নবান

হইতেছ। তোমার প্রতি আমার স্নেহ বসিয়াছিল, তুমি সেই স্নেহের দুর্ব্যবহার করিতেছ, বুঝিতে পারিয়াও আমার অনুতাপ আসিতেছে না। আমি তোমাকে পদচ্যুত করিয়া বিদায় দিব, এমন অভিপ্রায়ও আমার নহে, অনেকদিন তুমি আছ, কখনও অবিশ্বাসের কার্য্য কর নাই, তাহাও আমি জানি। ইংরাজের রাজত্ব, তুমি ইংরাজীভাষা জান না, মাঝে মাঝে কার্য্যের অসুবিধা ঘটে, তাহাও আমি সহ্য করি, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া আমি তোমাকে কদাচ একটী রুক্ষ কথাও বলি না, কিন্তু আজ তুমি আমার সম্মুখে যেরূপ বিসদৃশভাব দেখাইতেছ, তাহাতে আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেছি। এই ভদ্রলোকটী তোমার ঔদ্ধত্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেছেন, ইহাতেও আমি লজ্জা পাইতেছি। ভোলানাথ! অসন্তুষ্ট হইও না, এখানে বসিয়া থাকিতে যদি তোমার এখন কোন প্রকার অসুখ বোধ হয়, উঠিয়া যাইতে পার।"

"উঠিয়া যাইতে পার" এই নির্ঘাতবাক্যটী শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্রই ভোলানাথ যেন মর্দ্দিতলাঙ্গুল ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া মস্তক উন্নত করিলেন, কি যেন বলিবেন, আর যেন ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, এই ভাব জানাইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "রাণি!"—সম্বোধনটী মাত্র করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার যেন ভোলানাথের কিঞ্চিৎ চৈতন্য ফিরিয়া আসিল; ক্রোধবেগ সংবরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, "উঠিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই ভদ্রলোকটী যদি কোন বিষয়কার্য্যের অনুরোধে আসিয়া থাকেন, এই ক্ষেত্রে যদি কোন বিষয়-কার্য্যের কথা উত্থাপিত হয়, তাহা শ্রবণ করা আমার প্রয়োজন, সেই নিমিত্তই অপেক্ষা করিতেছিলাম; তুমি কিন্তু যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই আগন্তুকের সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমার বিবেচনায় তাহা তোমার তুল্য ভদ্র-মহিলার উপযুক্ত হইতেছে না।"

শেষের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, "দেখ ভোলানাথ, যে বিষয়ের আলোচনা যেখানে হয়, সেখানে সেই বিষয়ের অনুগত হইয়া চলাই ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। তুমি মনে করিতেছিলে, এখানে বিষয়-কার্য্যের কোন কথাবার্ত্তা চলিবে, সেটী তোমার ভুল, আনন্দময়ী আগমন করিতেছেন, এই তিন মাস আমি কেবল আনন্দই করিব, তোমরাও বিষয়-কার্য্যের অবসরকালে আনন্দময়ীর নামকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে থাক।

ক্ষণেক মৌনাবলম্বন করিয়া অধোবদনে থাকিয়া পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক ভোলানাথ কহিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, এই বাবুটী হয় ত একজন উকীল।"

রসময়ের দিকে বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিয়া পদ্মা কহিলেন, "তাই যদি হন, তাহাতে তোমার কি উপকার? ইনি কদাচ তোমার অনুকূলে ওকালতনামা গ্রহণ করিবেন না। যদি তুমি এখানে বসিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, বসিয়া থাকিতে পার, অনধিকারচর্চ্চা করিও না। এই বাবুটীর সহিত তোমার আলাপ নাই, থাকাও অসম্ভব; কেন না, ইনি হইতেছেন একটী মফস্বল-কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক। গণিতশাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহাও বোধ হয় তোমার জানিতে বাকী আছে। বুঝিতেছি, তোমার মনের ভিতর একপ্রকার কুৎসিত তরঙ্গ খেলা করিতেছে, সে তরঙ্গের মুখ তুমি ফিরাইয়া লও, উজান বহিত আরম্ভ হইলে সমস্তই ঠিক হইবে।"

পাঠকমহাশয়! আপনি বোধ হয় চিন্তা করিতেছেন, রাণী পদ্মাবতীকে এখানকার লোকেরা অবাক্-রাণী কেন বলে? যাহারা কথা কহিতে পারে না, লোকে তাহাদিগকে বোবা বলিয়া থাকে; একটা কোন অত্যদ্ভুত কথা শুনিলে লোকে অবাক্ হয়। রাণী পদ্মাবতী সে প্রকার কোন অদ্ভুত কথা শুনিয়া অবাক্ হন নাই—তিনি বোবাও নহেন। বোবা হওয়া দূরে থাকুক, সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, শিবনারায়ণ, শশধর অথবা এ দিনের অন্যান্য বড় বড় বাগ্মী মহাশয়েরা বড় বড় সভায়, বড় বড় ময়দানে, বড় বড় চত্বরে যে প্রকার দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, রাণী পদ্মাবতী তদপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত দীর্ঘ দীর্ঘ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে জানেন; তবে কেন লোকে ইঁহাকে অবাক্‌রাণী বলে, তাহার একটী কারণ আছে, সে কারণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইবে, আপাততঃ এইটুকু মাত্র আপনারা জানিয়া রাখুন যে, ইঁহার সাংসারিক ব্যবহার অতি অদ্ভুত; সেই সকল ব্যবহার দেখিয়াই লোকে অবাক্ হয়। এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, প্রায় সকল লোকেই বহুব্যয় স্বীকার করিয়া এক একটা উপাধিলাভ করিবার অভিলাষে উন্মত্তপ্রায় হয়; রাণী পদ্মাকে সেরূপ উন্মাদগ্রস্ত হইতে হয় নাই, পল্লীস্থ লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইঁহার উপাধি দিয়াছে অবাক্‌রাণী।

রসময়ের সহিত পদ্মাবতীর অনেকপ্রকার কথা হইল ; করাসী মুলুক হইতে চর্কী-থিয়েটার এ দেশে আসিয়াছে, রাণী। আমলারা, স্বজনবর্গ, দাসদাসীবর্গ সকলেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে, এ কথাগুলিও রসময়কে তিনি বলিলেন। ভোলানাথ হাঁ করিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। থিয়েটারের কথাটা অগ্রেই তিনি শুনিয়াছিলেন, আশ্চর্য্য বোধ হইল না, কিন্তু চর্কী-থিয়েটারে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ-সংসার ঘুরিয়া বেড়ায়, রাণীর মুখে সেই কথা শুনিয়া অবধি ভোলানাথের মস্তক বন্ বন্ শব্দে ঘুরিতেছিল, অনতিকালমধ্যেই একটা তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন ; ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঘুরিলেন কি না, নিদ্রাভঙ্গের পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা না করিলে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না।

রসময় সে রাত্রে কতক্ষণ রাণীর নিকটে ছিলেন, কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কি কি কথা হইয়াছিল, পাঠকমহাশয়ের তাহা শ্রবণ করিবার প্রয়োজন নাই ; প্রয়োজন থাকিলেও, কৌতূহল জন্মিলেও এ ক্ষেত্রে তাহা প্রকাশ করিবার কিছু বাধা আছে।

রজনী অবসান হইবার চারি ছয় দণ্ড পূর্ব্বে রসময় বিদায় হইলেন। ভোলানাথ জাগিলেন না, রাণী কিন্তু সমস্ত যামিনী জাগিয়াই কাটাইলেন। যাহারা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল, রাত্রির মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আসিল না।

বঙ্গদেশের সকলেই জানেন, সকলেই বলেন, সত্য-মিথ্যা বিচার করিবার আবশ্যক নাই, শ্রুতি এইরূপ যে, ভগবতীর আগমনের উল্লাসে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই তিনটী মাসের দিবা-যামিনীগুলি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়। যে বৎসরের কথা আমরা বলিতেছি, সে বৎসরেও ঐ তিনটী মাস শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গিয়াছিল, সেই বৎসর কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে দুর্গাপূজা।

প্রতিমা-নির্ম্মাণের যেরূপ কল্পনা পদ্মাবতীর মানসে সমুদিত হইয়াছিল, সেই কল্পনানুসারেই কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা দুর্গা-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল, গঠন, বাহন, ভূষণ, পূজার উপকরণ সমস্তই সেই কল্পনার অনুগত ; মন্ত্রগুলি কিরূপ হইয়াছিল, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরাই তাহা জানিবেন, নূতন মন্ত্র রচনা করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, অবলীলাক্রমে তাঁহারা তাহা ঠিক করিয়া লইবেন। যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা প্রাপ্ত হইলেই এ দেশের ভট্টাচার্য্য-

মহাশয়েরা শাস্ত্রের অনেক পাঠ উল্টাইয়া দিতে পারেন, এইরূপ প্রবাদ আমরা শ্রবণ করিয়াছি; শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সকল ভট্টাচার্য্যেরই যে সেরূপ অভ্যাস আছে, তাদৃশ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছিতে পারি না; সুতরাং তেমন খাসকেও অন্তরে স্থান দান করিতে কিছু কিছু সঙ্কোচ আইসে।

ষষ্ঠীর যামিনী সমাগত। ষষ্ঠীর প্রদোষে মা দুর্গার অধিবাস হয়, রাণী পদ্মাবতী কি প্রকার পদ্ধতিতে সেই অধিবাসটী সমাধা করাইলেন, সকলে তাহা জানিতে পারিল না। পূজাবাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হয়, ষষ্ঠীর রাত্রেও লোক-সমাগমের নিতান্ত অভাব থাকে না, তবে কেন অধিবাসের প্রণালী লোকেরা জানিল না, অবশ্যই এ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। এক কথায় সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। রাণী কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই।

এ কথাটীও বড় আশ্চর্য্য। যে কোন দেবদেবীর পূজাই হউক, সামাজিক লোকগুলিকে প্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করা চিরপ্রসিদ্ধ; সামাজিক প্রথা। বিশেষতঃ রাণী-বাড়ীর প্রতিমা সে বৎসর নূতন প্রকারের, সে প্রতিমা দর্শন করিবার আগ্রহ সকলেরই জন্মিতে পারে। বিনা নিমন্ত্রণে যাঁহারা কোন উৎসব দর্শনে কাহারও ভবনে যাইতে ইচ্ছা করেন না, নূতন প্রকার প্রতিমা-দর্শনের কৌতূহল সকলেরই মনে সমানভাবে প্রদীপ্ত হওয়া সম্ভব, নিমন্ত্রণের মহত্ত্ব তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প, তবে কেন অধিবাসের সময় কৌতূহলী লোকেরা আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পায় নাই? কৌতূহল অপেক্ষা মানের খাতির যাঁহাদের অধিক, বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহারা যান নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে প্রতিমা দেখিতে গিয়াছিল, অধিবাসক্রিয়া কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইল, তাহা তাহাদের জানিবার প্রয়োজন ছিল না, প্রতিমার অতি নিকটে উপস্থিত হইবার অধিকারও ছিল না, অতএব সে পদ্ধতি কেবল রাণী জানিলেন আর ভট্টাচার্য্যেরাই জানিলেন।

সপ্তমী-পূজা। যে প্রণালীতে উষাকালে অথবা প্রাতঃকালে নবপত্রিকা-স্নান করাইবার ব্যবস্থা আছে, রাণীর বাড়ীতে তাহা হইল না। না হইবার কারণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে, গণেশের পার্শ্বে কলাবউ বসিবে না, যিনি বসিবে, তিনিরা সরোবরে, নদীতে অথবা অন্য কোন প্রশস্ত জলাশয়ে স্নান করে না, তাহাদের নামও নবপত্রিকা হয় না, সুতরাং নবপত্রিকা স্নান বন্ধ। পূর্ব্বাহ্নে

সপ্তমীপূজা সমাপ্ত; ছাগবলি, মেষবলি, আকবলি, এই তিনটী বলি বাদ গেল না। ভোগের ব্যবস্থা অবশ্যই নূতন প্রকার। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অন্নভোগ হয়, রাণী পদ্মাবতী ব্রাহ্মণী নহেন, উগ্র-ক্ষত্রিয়া, সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্য বলা উচিত আগুরী। আগুরীর বাড়ীতে অন্নভোগ হইতে পারে না, বেশী করিয়া এ কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই; লুচিভোগ হইতে পারিত, কিন্তু রাণী পদ্মা লুচির উপর ভারী চটা। একদিন তিনি ভোলানাথকে বলিয়াছিলেন, "আতপতণ্ডুল, চালভিজা, লতাবৃক্ষের ফল, আগা-তোলা সন্দেশ এই সকল দ্রব্য দুর্গাকে নিবেদন করা আমার অভিপ্রেত হয় না। যাহাদের বাড়ীতে অন্নভোগ নিষিদ্ধ, তাহাদের সকলের বাড়ীতেই মা দুর্গা প্রতিবৎসর সেই সকল দ্রব্যের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানুষেরা বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করে, দুর্গাকে অপক্ক আতপতণ্ডুল দিয়া ফাঁকি দেয়; তাহাতে পাপ আছে। সচরাচর লোকের মুখে শুনা যায়, দেবতার সেবা মনুষ্যের আত্মবৎ হওয়াই উচিত। যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে আমি ভালবাসি, দেবতাকে সেইরূপ বস্ত্র প্রদান করাই কর্ত্তব্য; যেরূপ দ্রব্যভক্ষণে আমার নিজের সুরুচি, দেবতাকে সেইরূপ দ্রব্য প্রদান করাই কর্ত্তব্য। শীতকালে শালগ্রামশিলার গাত্রে লেপ প্রদান করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে, গ্রীষ্মকালে বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নারায়ণকে বাতাসে রাখিবার প্রথা আছে, ইহাতেই বুঝা যায়, আত্মবৎ সেবাই প্রকৃত দেবসেবা। আমার বাড়ীতে এ বৎসর কি প্রকার ভোগ দেওয়া হইবে, ভোলানাথ, তুমি তাহা স্থির কর।"

ভোলানাথ বলিয়াছিলেন, "প্রতিমা যখন তোমার নিজের কল্পনানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে, ভোগের ব্যবস্থাও তখন তোমার নিজের ইচ্ছানুসারে স্থির হওয়া বিধেয়।"

রাণী বলিয়াছিলেন, "তুমি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কর নাই অথচ পান-ভোজনে ইংরাজী পদ্ধতি পালন করা তোমার অভ্যাস হইয়াছে। যাহারা ইংরাজীতে সুপণ্ডিত, তাহাদের মধ্যে শতকরা দুটী পাঁচটী ব্যতীত আজকাল প্রায় সকলেই ইংরাজী পান-ভোজন ভালবাসে। আমার মেম-সাহেব ইংরাজী ভোজের সুখ্যাতি করেন। আমি ইংরাজী শিখিতেছি, আমিও এক একদিন সখের খাতিরে ইংরাজী

পান-ভোজনের পক্ষপাতিনী হই ; অতএব আমার ইচ্ছা হইয়াছে, মা দুর্গাকে এ বৎসর স্যাণ্ড উইচের ভোগ লাগাইব। প্রতিমার গঠনে যখন ইংরাজী রীতি পালন করিলাম, ভূষণ-বাহনেও যখন ইংরাজী কেতার মান রাখিলাম, ভোগের ব্যবস্থাতেও তখন সেইরূপ মান বজায় রাখা আমার কর্ত্তব্য।"

কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া ভোলানাথ বলিয়াছিলেন, "আমি তাহা পারিব না, দুর্গাকে ইংরাজী হোটেলের খাদ্যসামগ্রী ভোগ প্রদান করিতে হিন্দুসন্তান মহাপাপ জ্ঞান করিয়া থাকে।"

রাণীর সহিত ভোলানাথের হাস্য-পরিহাস চলিত। সোজাসুজি উত্তর দান করিয়া ভোলানাথ শেষকালে পরিহাসচ্ছলে আরও বলিয়াছিলেন, "পৌঁচঘরের ভোগ লাগান অপেক্ষা দুর্গাপূজা না করাই ভাল। ইংরাজেরা যে দেবতার আরাধনা করে, সেই দেবতার সেবায় তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি প্রদান করিতে পার, কিন্তু আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্‌ আমার মতে কখনই বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না।"

রাণী বলিয়াছিলেন, "হইতেই হইবে। তোমার মতে বিধিসিদ্ধ না হইলেও আমার মতে যেটী বিধিসিদ্ধ, সেটী তোমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। কলিকাতা সহর এখান হইতে দূর, এই এক আপত্তি ; কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানী অনেকানেক দূরস্থানকে অতি নিকট করিয়া দিয়াছে। তুমি কলিকাতায় যাও, কলিকাতা হইতে উত্তম উত্তম ইংরাজী খাদ্য আনয়ন কর।"

রসালাপ চলিলেও কার্য্য-সম্বন্ধে ভোলানাথ চাকর। মনিবের আজ্ঞায় অবাধ্য হওয়া চাকরের উচিত নহে, সাধ্যও নহে ; কাজে কাজেই ভোলানাথকে রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে হয়। ভোলানাথ সপ্তমী-পূজার পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া মা দুর্গার ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, পূজার দিন সেই সকল ভোগের সামগ্রী বিচিত্র বাক্সবন্দী হইয়া রেলওয়ে শকটযোগে কুঁকড়োগাছী কুঞ্জে আনীতে হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্যেই আনন্দময়ীর ভোগ হইল, শীতল হইল, যাহারা প্রসাদপ্রত্যাশী, তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন। সপ্তমী-পূজার সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লুচির উপর পল্লাবতী বড় চটা, পূজার বাড়ীতে লুচি হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। যেখানে লুচি হয় নাই, সেখানে ব্রাহ্মণ-ভোজন

হয় নাই, অপরাপর জাতিও রাণীর বাড়ীতে লুচি পায় নাই, কলিকাতায় যেমন পূজা-পার্ব্বণে কাঙ্গালী-ভোজনের বন্দোবস্ত অল্প, মফস্বলের সর্ব্বত্র সেরূপ নহে,* সুতরাং কাঙ্গালী-ভোজনের ঝঞ্ঝাটে রাণী পদ্মাবতীকে বিব্রত হইতে হইল না। দুর্গোৎসবের প্রধান লক্ষ্য ব্রাহ্মণ-ভোজন, সেটা ত হইলই না, অপরাপর জাতিও প্রতিমা দর্শন করিয়া রুক্ষহস্তে ফিরিয়া গেল। অনেকটা ব্যয়লাঘব হইল। রাণীর ইচ্ছা ছিল, কলিকাতার কেল্লা হইতে গোরাবাজনা লইয়া তিন দিন আমোদ করেন, কোন প্রকার বিঘ্নবশতঃ তাঁহার সেই ইচ্ছাটা ফলবতী হয় নাই, দেশীয়বাদ্যকরেরাই ইংরাজী পোষাক পরিয়া ইংরাজী তালে যন্ত্র-বাদন করিয়াছিল। রাত্রিকালে কি হয়? যাত্রা, কবি, খেম্‌টানাচ এ সকল আমোদে রাণীর অরুচি জন্মিয়াছিল। আষাঢ় মাসে তিনি শুনিয়াছিলেন, ফরাসী-রাজ্যের চর্কী থিয়েটার বঙ্গরাজ্যে আমদানী হইয়াছে, ভোলানাথের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই সেই থিয়েটার কোম্পানীকে তিনি তিন রজনীর জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক এক রজনীর মজুরা এক এক সহস্র মুদ্রা। সপ্তমী রজনীতে চর্কী থিয়েটার চর্কীবাজী দেখাইল; চর্কী-বাজী অর্থে পৃথিবী ঘোরা, পৃথিবী ঘুরিল, কুশীলবেরা ঘুরিল, রঙ্গমঞ্চ ঘুরিল, সোপানমঞ্চ ঘুরিল, বিবিরাও ঘুরিল, আমোদের চূড়ান্ত হইয়া গেল। যাহারা দেখিতে বসিয়াছিল, তাহারা ঘুরিল না, যিনি ইহা শুনিবেন, তিনিই আশ্চর্য্য ভাবিবেন; তিনি মনে করিবেন, থিয়েটারে পৃথিবী ঘোরে, থিয়েটারের লোকেরাই সেই পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করে। দর্শকেরা, শ্রোতারা, পরিচর্য্যাকারকেরা কেহই ঘোরে না, কেন ঘোরে না, ন্যায়শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা আইসে, তাহারা হয় ত পৃথিবী ছাড়া।

সপ্তমী-নিশা অবসান। অষ্টমীপূজা যথারীতি সম্পাদিত হইল, সন্ধিপূজা হইল, বলিদান হইল, ভোগ হইল, শাতল হইল, আরতি হইল, সে বিষয়ে কিছু অঙ্গহীন থাকিল না। গণেশ পাদরী হইয়াছেন, ইংরাজী ভোগ অক্লেশেই তিনি উপভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু রাণীবাড়ীর ভট্টাচার্য্যেরা গণেশকে ইংরাজী খানা খাওয়াইতে নারাজ হইলেন; রাণাকে বলিলেন, "গণেশ-পূজায় ইংরাজী ভোগ নিবেদন করিবার মন্ত্র পাওয়া গেল না। রাণী হাস্য করিলেন, পাদরী-গণেশ ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই এক প্রকার উপবাসী রহিলেন।

অষ্টমীর রজনীতে চর্কী-থিয়েটার কোম্পানী আকাশমণ্ডলকে ধরণী

মণ্ডলে আনয়ন করিল। নীলচন্দ্রাতপে মণিমুক্তার ঝালরের ন্যায় নক্ষত্রমালা শোভা পাইল। একজন সুরসিক গায়কের একটী গীতে আমরা একদা শুনিয়াছিলাম, একটী রূপবান্ গায়ককে নয়নগোচর করিয়া একটী সুন্দরী গায়িকা বলিয়াছিল, "আমারই ভাগ্যের ফলে ভূতলে চন্দ্র-উদয়।" পাঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাষ্টমী-যামিনীতে কুঁকড়োগাছী-প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চে রাণী পদ্মাবতীর ভাগ্য-ফলে ভূতলে চন্দ্রোদয় হইল। থিয়েটার কোম্পানীর নৈপুণ্য অতি চমৎকার। মহাষ্টমীর চন্দ্র রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত আকাশে বিরাজ করেন, চর্কী-থিয়েটার ভূতলে আকাশ আনয়ন করিয়া ঠিক তাহাই দেখাইলেন। প্রাসাদের ঘটিকা-যন্ত্রে যখন ঠিক বারোটা বাজিল, সেই সময় চন্দ্রদেব অস্ত গেলেন। চন্দ্র-বিরহে নক্ষত্রমালাও অদৃশ্য হইলা গেল; আকাশে মেঘোদয় হইল। ঘোর অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসিল; বায়ু বহিল, অর্দ্ধরাত্রিকালে বায়সেরা কা কা রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। পৃথিবীর জীবজন্তু নিশাকালে নিদ্রা যায়, কেবল নিশাচর-বিহঙ্গ আর শ্বাপদজন্তুগণ জাগিয়া থাকে; তাহারা কেহ আকাশে উঠিতে পারিল না, কেবল গোটাকতক পক্ষী গগনতল স্পর্শ করিবার আকিঞ্চনে শূন্যপথে উড়িল, অল্পক্ষণ পরেই উষা আসিল। উষাকে সঙ্গে লইয়া আকাশ যখন স্বস্থানে চলিয়া যায়, সেই সময় উষাপক্ষিগণ মধুরস্বরে প্রভাতী গীত গাইল, প্রভাত হইল। আকাশ আর পৃথিবীতে আসিল না, সূর্য্যদেবকে ক্রোড়ে লইতে হইবে, সেইজন্য আকাশ শীঘ্র শীঘ্র আকাশে উঠিয়া গেল, সেইখানেই থিয়েটারের যবনিকা-পতন।

এ পূজার সমস্তই নূতন পদ্ধতি। অষ্টমী-নিশা প্রভাত হইলে নূতন পদ্ধতি-ক্রমেই মহানবমী-পূজা সমাপন হইল। দক্ষিণান্ত হইল না। দেবদেবীর পূজাবসানে দক্ষিণান্ত করা রাণী পদ্মাবতীর অভিপ্রেত নহে। তিনি বলেন, "যাঁহারা কোথাও যান না, তাঁহাদের দক্ষিণান্ত নাই। বিশেষতঃ ভক্তের গৃহে সংবৎসর প্রতিমা বিদ্যমান না থাকিলেও দেবতাদের বিদ্যমানতা অবশ্যই থাকে, যাঁহারা দক্ষিণান্তের ব্যবস্থা দেন, তাঁহারা ভক্তের প্রাণে বেদনা দিয়া থাকেন।" এই হেতুবাদে রাণী পদ্মাবতীর দুর্গা-প্রতিমার দক্ষিণান্ত হইল না।

দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যাকালে যথাকর্ত্তব্য আরতি ও শীতলাদি নির্ব্বাহিত হইয়া গেল। রাত্রি একপ্রহরের পর নাট্যাভিনয়, সেই চর্কী-থিয়েটার। নাট্যাঙ্কের নাম খণ্ডপ্রলয়। রঙ্গমঞ্চ জলময়। প্রবলবেগে তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে, নিম্নভাগে

আসিতেছে, দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, কিঞ্চিৎ দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন, অকূল সমুদ্র! একখানি জাহাজ নাই, নৌকা নাই, আমাদের শাস্ত্রসম্মত প্রলয়-কালীন বটপত্রও নাই। সমুদ্রের উপরিভাগে শূন্যমার্গে একটী পক্ষীও উড়িতেছে না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল দর্শকমণ্ডলী ঐরূপ দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহার পর সমুদ্রতল হইতে সহসা একদল সখী সমুত্থিত হইল, সখীরা জলের উপর নৃত্য করিল, গীত গাইল, দর্শকগণের প্রতি অপাঙ্গভঙ্গীতে বারকতক নয়ন ফিরাইল, দেখিতে দেখিতে সমুদ্রজলে বিলীন হইয়া গেল। মঙ্গলবাদ্যধ্বনি। কোথা হইতে ধ্বনি আসিতেছে, তাহা কেহ জানিতে পারিল না, কেহ কেহ মনে করিলেন আকাশে, কেহ কেহ ভাবিলেন রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে সাজঘরে নেপথ্যে, উভয় শ্রেণীর উভয় প্রকার অনুমান; কিন্তু একটী অনুমানও সত্য হইল না, সহসা জলতল হইতে একদল পরী বিবিধ যন্ত্রযোগে সুমধুর বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে জলের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। পরীগণের মধ্যে একটী পরী রাণী, তাঁহার বসিবার জন্য সিংহাসন পড়িল, সিংহাসনখানি জলের উপর ভাসিতে লাগিল। পরীরা সেই রাণীর বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল যন্ত্রবাদন করিল। যন্ত্রধ্বনির সহিত সঙ্গীতধ্বনি, সে সঙ্গীতে পরী-রাণীর স্তুতি। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। পুষ্পবৃষ্টির কায়দা অতি সুন্দর, প্রত্যেক পরীর গলদেশে এক একছড়া পুষ্পমাল্য। পরী-রাণীর কণ্ঠে দশছড়া পুষ্পমাল্য পরি-বর্ষিত। একটুকুও এদিক ওদিক হইল না, যাহাকে যখন লক্ষ্য করিয়া পুষ্পবৃষ্টি হয়, পুষ্পমাল্য ঠিক তাহারই কণ্ঠদেশে আসিয়া দোদুল্যমান হইতে থাকে। আর একটী আশ্চর্য্য—পরীরা যন্ত্রবাদন করিল, গীত গাইল, কিন্তু তাহাদের হস্তপদাদি কম্পিত হইতেছে কিম্বা কোনদিকে সঞ্চালিত হইতেছে, দর্শকেরা তেমন ভাব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ধাতুপ্রতিমা, পাষাণপ্রতিমা, দারু-প্রতিমা এবং মৃণ্ময়ী প্রতিমা যেমন অচলা, রঙ্গমঞ্চের সেই পরীগুলিও সেইরূপ অচলা, সুন্দরী সুন্দরী পরী। তাদৃশী সুন্দরী সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। বর্ণ হেমাভ; সেই বর্ণের উপর শ্বেত, পীত, লোহিত, নীল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের বসন-ভূষণ, দেখিতে অতি চমৎকার। আপন আপন কার্য্য শেষ করিয়া পরীরা সাগর-জলে ডুবিল। পুনর্ব্বার রঙ্গমঞ্চ নীরাকার। প্রবল তরঙ্গক্রীড়া; মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জন, লম্ফন, উল্লম্ফন, বক্রগমন। নীল জলরাশি ক্ষণে ক্ষণে ঊর্দ্ধে

উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে সমতলে আসিয়া ক্রীড়া করিল, তরঙ্গমালার মুখে মুখে বিন্দু-মাত্র ফেণরেখা দৃষ্ট হইল না। তরঙ্গক্রীড়ার অবসানে কৃত্রিম জলনিধি স্থির, গম্ভীর, নিশ্চল। সেই সময় শূন্যপথে বৃহৎ একটী কপোত পরিলক্ষিত হইল। সেই কপোতের চঞ্চুপুটে দিব্য একটী নধর বটপত্র। দর্শকেরা হিন্দু, তাঁহারা মনে করিলেন, প্রলয়পয়োধিনীরে বিষ্ণু আসিয়া বটপত্রে ভাসিবেন, কমালয় প্রেরিত ঐ কপোত তজ্জন্য বটপত্র বহন করিতেছে। শনৈঃ শনৈঃ কপোত নামিয়া আসিল, জলের উপর বসিল, বটপত্রটী কিন্তু চঞ্চু হইতে জলে রাখিল না।

দর্শকমণ্ডলীর পূর্ব্ব-আশা বিফল হইল। হইবারই কথা, যাঁহারা অভিনয় করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষবাসী নহেন, ভারতের আর্য্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি সমুদ্র-সলিলে বটপত্রে ভাসাইবেন, এমন আশা করাই ভুল। দর্শকেরা সে অংশে হতাশ হইলেন। বিষ্ণু আসিলেন না, বটপত্রে শয়ন করিলেন না, কমলা আসিয়া সেবা করিলেন না, সমুদ্রজল শুকাইয়া গেল। যেথানে সমুদ্র হইয়াছিল, সহসা সেইখানে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূতা। ফরাসী প্রণালীতে সেই মূর্ত্তি সম্মুখস্থ দর্শকগণকে অভিবাদন করিল, যবনিকাও পতিত হইল।

বিজয়া-দশমী। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিবে না। পন্না বলিয়া দিয়াছেন, আমাদের বিজয়া-দশমী রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, পঞ্জিকাতেও এই উৎসব মঙ্গল-উৎসব নামে কীর্ত্তিত। এরূপ স্থলে উৎসবে শোক-বাদিত্র বাদিত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। বিসর্জ্জনের বাদ্যের স্থর, দুর্গা-বিসর্জ্জন; প্রত্যাগমনের বাদ্যের স্থর আরও অধিক শোকাবহ। রাণার ইচ্ছাতেই শোকবাদ্য রহিত হইল। রাণী একটী দ্বিতীয় প্রস্তাব করিলেন। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের ধূমধাম কলিকাতাতেই বেশী হয়, অতএব তাঁহার প্রতিমাখানি কলিকাতায় আনিয়া নৌকার বাচ্ খেলাইয়া গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করাই যুক্তিসঙ্গত। কলিকাতা অনেক দূর, কি প্রকারে লইয়া যাওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। রাণা বলিলেন, রেলওয়ের ছাদ খোলা মালগাড়ীতে তুলিয়া দিলেই অল্প সময়ের মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছাইবে, হাওড়া হইতে বেহারা নিযুক্ত করিয়া, পরপারে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা ঘটিবে না।

তাহাই মঞ্জুর হইল। রেলওয়ে শকটে রাণী পদ্মাবতীর প্রতিমাখানি

কলিকাতায় আসিল। সমস্ত প্রতিমা অপেক্ষা সেই প্রতিমাই সর্ব্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্থলপথে পরিভ্রমণ করাইয়া, অবশেষে ভাগীরথী-বক্ষে নৌকায় তুলিয়া, উত্তরে বরাহনগর, দক্ষিণে খিদিরপুর পর্য্যন্ত বাচ্ খেলাইয়া সন্ধ্যার সময় প্রতিমাখানি গঙ্গা-গর্ভে বিসর্জ্জন করা হইল।

পূজা ফুরাইল, কার্ত্তিক মাস ফুরাইল, কার্ত্তিক-পূজা হইয়া গেল। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে সেই রসময় বাবু কুঁকড়োগাছি-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, পাঁচ সাতটী ভদ্রলোক বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। বৈঠকখানার পূর্ব্বদিকের কামরার মধ্যদ্বারে চিক্ পড়িল, চিকের অন্তরালে রাণী পদ্মাবতী।

যে কয়েকটী ভদ্রলোক বৈঠকখানায়, তাঁহাদের মধ্যে রাণীর পুরাতন দেওয়ানজী ভোলানাথ উপস্থিত ছিলেন। ভোলানাথের দক্ষিণপার্শ্বে রসময় বাবু। নানাপ্রসঙ্গে কথোপকথনের পর ভোলানাথের কার্য্যদক্ষতার প্রসঙ্গ উঠিল। ভদ্রলোকেরা ভোলানাথকে খোস্‌নামী দিলেন। একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া রসময় বাবু অবনত-মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। সকলের বক্তব্য শেষ হইলে চিকের অভ্যন্তর হইতে রাণী কহিলেন, "ভোলানাথের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় আমার অবিদিত নাই। ভোলানাথ এ সংসারে অনেক দিন আছেন, বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমি জানি; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়,—বৎসরাবধি আমি দেখিতেছি, দিন দিন ভোলানাথের আলস্য-বৃদ্ধি হইতেছে, সরকারী কার্য্যে কিছু কিছু ঔদাস্য জন্মিতেছে, একটী প্রধান ঔদাস্যের দৃষ্টান্ত —আপনাদের সমক্ষে আমি উল্লেখ করিব। পূর্ব্বাঞ্চলের একটী জমীদারীর সরকারী মালগুজারীর লাটবন্দীর শেষ তারিখে জেলার কালেক্টারীতে আমাদের প্রদত্ত খাজানা দাখিল হয় নাই। ভোলানাথের প্রতি বিষয়-কর্ম্মের সমস্ত ভার, শেষ দিবসের সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত মালগুজারী দাখিল না হইলে জমীদারী নীলাম হয়, ভোলানাথ তাহা জানেন, তথাপি সেইরূপ গাফিলী করাপরাধে আমি ভোলানাথকে বরখাস্ত করিতে পারিতাম, আমার তরফের আম-মোক্তার যদ্যপি যত্নবান্ হইয়া সেই দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নিজ তহবিল হইতে খাজানার টাকাগুলি দাখিল না করিতেন, তাহা হইলেই আমার জমীদারী লাটে উঠিত। বহুব্যয়, বহু চেষ্টা ও বহু পরিশ্রমে আপীল করিয়া, নীলাম রদের তদ্বির করা যাইত, তাহাতেও সিদ্ধি অসিদ্ধি স্থির থাকিত না। সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার তাদৃশ ঔদাস্য কদাচ ক্ষমার

যোগ্য হইতে পারে না, তথাপি আমি ভোলানাথকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। সেইবার সেইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও ভোলানাথের চৈতন্য হয় নাই, ভোলানাথ আজ-কাল বড় বড় বিষয়েও আমার অবাধ্য হইতেছেন, অতএব ভোলানাথকে আর অধিক দিন আমি পদস্থ রাখিতে পারিব কি না, তাহাই চিন্তা করিতেছি। ভোলানাথকে বিদায় দিতে অবশ্য আমার কষ্ট হইবে, তাহাও আমি বুঝিতেছি; কিন্তু বিষয়কার্য্যে অবহেলা এবং আমার নিকট অবাধ্যতা এই দুই অপ-রাধের বিচার করিবার সময় দুঃখিত-চিত্তে সে কষ্ট আমাকে ভুলিতে হইবে, তাহাই আমি ভাবিতেছি।"

রাণী আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু একটী ভদ্রলোক অযাচিতভাবে মধ্য-বর্ত্তী হইয়া মন্তব্য দিলেন যে, পুরাতন কর্ম্মচারীকে শীঘ্র অবসর দেওয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী ভূম্যধিকারিণীর পক্ষে কতদূর সঙ্গত, আমার অনুরোধে সেই বিষয়টী আপনি আর একবার উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

রসময় এই সময় একবার চিকের দিকে সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। রাণী পদ্মাবতী সেই সাগ্রহ দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। মধ্যস্থ ভদ্র-লোকের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনার পরামর্শ আমি গ্রহণ করিলাম; আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখিব। আগামী চৈত্রমাসের মধ্যে ভোলানাথ যদি আলস্যত্যাগ করিয়া দস্তুরমত বিষয়-কার্য্যে মনোযোগী হন, তাহা হইলে ভোলানাথকে আমি আর একবার ক্ষমা করিব।"

ভোলানাথ নিস্তব্ধ হইয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, একটীও উত্তর দান করেন নাই, আর একবার ক্ষমা পাইবেন, রাণীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান করিলেন। দুর্গা-পূজার যাহা হইয়াছিল, উপস্থিত ভদ্রলোকেরা তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানেন না, সেই কথাগুলি সেই মজলীসে প্রকাশ করিয়া দেওয়া ভোলানাথের ইচ্ছা হইয়াছিল; কিসে ভোলানাথ অবাধ্য, পূজার ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করিলেই ভদ্রলোকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন, অতএব তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া ভোলানাথের মৎলব। গাত্রোত্থান করিয়া ভোলানাথ সেই কথা উত্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ কে যেন তাঁহাকে নিষেধ করিল। তাঁহার মন তখন অন্তদিকে ফিরিল, রসময়ের দিকে চাহিতে চাহিতে চঞ্চলচরণে সভাগৃহ হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিষয়-কর্ম্মের কথা। রাণী পদ্মাবতী বিষয়কর্ম্মের কথা তুলিয়া ভোলানাথের সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সেরূপ মন্তব্যে অন্য কোন কারণ আছে কি না, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিলে পাঠক-মহাশয় তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। রসময় বাবু ভোলানাথের কর্ম্ম পাইবার নিমিত্ত উমেদার আছেন, সভাস্থ লোকেরা তাহা জানিতেন না। রসময়কে তাঁহারা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, চিনিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ ভোলানাথের সহিত তাঁহাদের সকলের সহানুভূতি ছিল, ভোলানাথ যাহাতে পদস্থ থাকেন, সেই চেষ্টাই তাঁহাদের মনে জাগরুক হইয়াছিল। ভোলানাথ উঠিয়া গেলেন, রাণী আর একবার বিবেচনা করিবেন, সেই পর্য্যন্তই সে দিনের সভাভঙ্গ করিবার অবসর উপস্থিত হইল। রাণীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া রসময় ব্যতীত সভার অন্যান্য লোকেরা সে দিনের মত বিদায়গ্রহণ করিলেন।

এখন দেখা যাউক, কাহার ভাগ্যে কি প্রকার ফল হয়। দুই ভাগ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব, ভোলানাথের ভাগ্য আর রসময়ের ভাগ্য। ভোলানাথের সহিত রাণী পদ্মাবতীর দুই প্রকার সম্পর্ক, পাঠক-মহাশয় তাহা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। ভোলানাথ দেওয়ানজীগিরী অপেক্ষা অন্য সম্পর্কে রাণীর কাছে বাঁধা, দেওয়ানজীগিরী ছুটিলেই দ্বিতীয় সম্পর্কটী ছুটিয়া যাইবে, সেই ভাবনাই ভোলানাথের বড়, প্রাণে ব্যথা পাইয়া তিনি রাণীর অনুমতি বিনা—সভ্যজনগণের অনুমতি বিনা—সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রাত্রিকালে সাক্ষাৎ হইলে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিবেন, মনে এইরূপ আশা আছে। আশা থাকুক, আমরা অদ্য তাঁহার আশাকে কোন প্রকার আঘাত করিব না। দুর্গা-পূজার ভাব জানাইবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা। দুর্গা-বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে, অতঃপর ভোলানাথের বিসর্জ্জন হইবে কি না, কৈলাসপতি ভোলানাথই তাহা জানেন। তিনি মহেশ্বর, তাঁহার বিচারে যাহা মীমাংসিত, তাহাই চূড়ান্ত হইবে। আমরা সামান্য মনুষ্য, উপস্থিত-ক্ষেত্রে সে বিচার করিতে অক্ষম।

চিকের মধ্যে পদ্মাবতী, চিকের বাহিরে রসময়, পরস্পরে মুখামুখি কখন্ সাক্ষাৎ হইবে, পাঠক-মহাশয় সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতে পারেন; প্রতীক্ষা করুন।

সপ্তম তরঙ্গ।

বাঙ্গালীর মহাসভা।

সপ্তাহ পূর্ব্বের বিজ্ঞাপন অনুসারে একদিন অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকার সময় সহরের কলেজষ্ট্রীটের একখানি বৃহৎ বাটীতে এক সভা বসিয়াছে। বাঙ্গালীর মহা সভা। সভাতে বাঙ্গালী ভিন্ন অপর জাতির বিদ্যমানতা ছিল না। শুনিতে উত্তম, কিন্তু সভায় প্রবেশ করিয়া চিনিতে পারা গেল না, কোন্ কোন্ লক্ষণে সভ্যেরা বাঙ্গালী। কতকগুলি সভ্য সাদা ধুতি পরা, মোজা পায়, মিরজাই গায়, অর্দ্ধমস্তক অনাবৃত, কতকগুলি কালাপেড়ে ধুতি পরা, ইংরাজী জুতা পায়, চাপ্‌কান গায়, মাথায় বাঁকা সিঁতাকাটা, কতকগুলি পায়জামা পরা, গায়ে কোর্ত্তা, ফতুয়া পরা, মাথায় তাজ; কতকগুলি ইজের-চাপকান পরা, ঘড়ীচেন বক্ষে, মাথায় সামলা; কতকগুলি তসরকাপড় পরা, অনাবৃত অঙ্গ, চটিজুতা পায়, মাথায় টিকী; কতকগুলি বেনিয়ান গায়, কপালের উপর কর্ণ-বেষ্টনে মণ্ডলাকারে ক্ষৌরি-করা, জগন্নাথ-ক্ষেত্রের আগাতোলা জুতা পায়, কতকগুলি কোট-প্যাণ্ট লেন পরা নব্য পুরুষ, মাথায় শোলা-হ্যাট; কতকগুলির মাথায় পয়মালিকের মত হাতে বাঁধা পাগ্‌ড়ী। সভ্যগণের ঐরূপ মূর্ত্তিদর্শনে বাঙ্গালীজাতি নির্ণয় করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়। কলিকাতার রাস্তায় ফেরিওয়ালারা সাড়ে বত্রিশ ভাজা, সাড়ে বিয়াল্লিশ ভাজা বলিয়া ফুকরাইয়া যায়, ঐ সভার সভ্যগণকে ঐরূপ বুলিতে বলা যাইতে পারে, সাড়ে চৌষট্টি ভাজা।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। একজন সামলাধারী গাত্রোত্থান করিয়া ইংরাজী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ইংরাজের আগমনে ভাগ্যক্রমে আমরা সভ্য হইয়াছি। আধার না থাকিলে আধেয় থাকে না, সভা না থাকিলে সভ্য থাকে না, অতএব আমরা সভা করিতে শিখিয়াছি। আমাদের আজকার সভায় কাঁকরোল সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার প্রস্তাব করা হইবে। কাঁকরোল সাহেব বিলাতের একটী সভায় ভারতের মঙ্গলকামনা করিয়া একরাত্রে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বন্ধু, তাঁহার বিয়োগে আমরা ক্রন্দন করিব, তাহার পর তাঁহার স্মরণচিহ্ন রাখিবার বিষয় অবধারণ করিব। আমার বিবেচনায় বাবু নীলমণি মণ্ডল এই সভায় সভাপতির আসনগ্রহণ করুন।"

বাবু সিদ্ধেশ্বর পাত্র এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। বাঁধা-পাগড়ী মাথায় দিয়া বৃদ্ধ নীলমণি বাবু মিষ্টবাক্যে শিষ্টাচার জানাইয়া সভাপতির উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

সাহেবকে আদর্শ করিতে পারিলে এক এক বিষয়ে অনেক উপকার হয়। সাহেবের গুণ অনেক, গুণগুলিকে আদর্শ করিয়া, যদি বাঙ্গালী কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদিন এ দেশের আর একরূপ শ্রী দাঁড়াইত; সেটী হইতেছে না, বাঙ্গালী হামাগুড়ি দিতেছেন, দাঁড়াইতে গেলেই পড়িয়া যান। গুণ থাকিলেও এক একটী বস্তু উপলক্ষ্য রাখিতে হয়। সাহেবের একটী প্রধান বস্তু আছে, সে বস্তুটীর নাম তোপ। সাহেবেরা তোপে হাসেন, তোপে কাঁদেন, তোপে মানুষ মারেন, তোপে বাড়ী ভাঙ্গেন, তোপে পাহাড় ভাঙ্গেন, তোপে নগর উড়াইতে পারেন, এমন কি, বন্যার জল অতি বেগে উচ্চ হইয়া আসিলে, তোপ মারিয়া সে বন্যাকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হন। বাঙ্গালীর তোপ নাই। অনুকরণের ফলে বাঙ্গালী এখন সভা করিতে শিখিয়াছেন, বাঙ্গালীর প্রায় সকল কার্য্যে প্রধান ভরসাই সভা।

ঐ দিন যে সভার অধিবেশন, সে সভার নাম শোক-সভা। শোক-প্রকাশের জন্য সভা করিতে হয় কেন, ইহার উত্তর সাহেবেরা শিখাইয়া দিয়াছেন; বাঙ্গালীও সভা করিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছেন। বাঙ্গালী বুঝিয়াছেন, আত্মীয়-বিয়োগ হইলে কাঁদিতে হয়, বন্ধু-বিয়োগ হইলে কাঁদিতে হয়। একা একা যদি ঘরে বসিয়া ক্রন্দন করা যায়, অন্যলোকে তাহা দেখিতে পায় না, শুনিতেও পায় না,

জাতিসাধারণ সহানুভূতিও প্রকাশ পায় না। দশজনে না শুনিলে সে ক্রন্দনে কি ফল? দশজনে একসঙ্গে মিলিয়া না কাঁদিলে সে ক্রন্দনের গৌরব থাকে না, সেই জন্য সভা করিয়া কাঁদিতে হয়। সাহেব মরিলে বাঙ্গালী কাঁদেন, তাহার কারণ এই যে, সেই সাহেব বাঙ্গালীর পক্ষ কিম্বা ভারতের পক্ষ হইয়া বিলাতের সভায় একদিন মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে কোন গুণবান্ বন্ধুর মৃত্যু হইলে গণ্য-মান্য বাঙ্গালীরা সভা করিয়া কাঁদেন, স্মরণ-চিহ্ন রাখিবার প্রস্তাব করেন, ফল কিরূপ হয়, তাহা সাধারণে দর্শন করিতেছেন। এরূপ সভার একটী ফল—কলেজষ্ট্রীটে কৃষ্ণদাস পালের পাষাণময়ী মূর্ত্তি-স্থাপন।

কাঁকরোল সাহেবের বিয়োগশোকে অনেকগুলি বাঙ্গালী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্তৃতা করিলেন; কিরূপ স্মরণচিহ্ন রাখিলে কাঁকরোলের গুণের পুরস্কার হয়, রামসাগর হালদার দীর্ঘ এক বক্তৃতা করিয়া সকলকে তাহা জানাইলেন। সর্ব্ব-সম্মতিতে স্থির হইল, প্রস্তরমূর্ত্তি সংগঠন করা, সেই মূর্ত্তি বিলাতেই বসুক কিম্বা ভারতের রাজধানীর গড়ের মাঠেই বসুক, মূর্ত্তি-সংগঠনের ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা আবশ্যক। সে টাকা কোথা হইতে আসিবে?—চাঁদা করিতে হইবে। যাঁহারা কাঁদিতেছিলেন, চক্ষের জল মার্জ্জন করিয়া তাঁহারা চাঁদার ফর্দ্দ করিতে বসিলেন। দেশ যাঁহার দ্বারা উপকৃত, তাঁহার স্মরণচিহ্ন রাখিবার নিমিত্ত দেশবাসিগণ অবশ্যই চাঁদা দিবেন, চাঁদার খাতার মাথার উপর এই পাঠ লেখা রহিল।

সেই ক্ষেত্রেই পাঁচ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইল। একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। নীলমণি মণ্ডল, হরেরাম ভঞ্জ, পদ্মলোচন পালুই, সনাতন নাগ, রাম-সর্ব্বস্ব মাইতি, আরও তিন চারি জন সভ্য সেই কমিটীর মেম্বর হইলেন। সভাপতি, প্রতিনিধি সভাপতি, সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন।

সভার কার্য্যাবসানে সর্ব্ববাদিসম্মতিতে প্রস্তাব হইল, মৃত মহাত্মার আত্মার শান্তির নিমিত্ত কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকটে সভার সহানুভূতি-পত্রিকা প্রেরণ করা হইবে। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

কোন বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে যেমন অনেকগুলি কামরা থাকে, এই নভঃ-গৃহের মধ্যেও সেইরূপ ছোট ছোট কতকগুলি কামরা আছে। এক একটী

বিষয়ের জন্ত এক এক কামরায় সভার অধিবেশন হয়। ইহার কারণ এই যে, বাঙ্গালীরা কথায় কথায় সভা করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সভা করিবার ঘর নাই। অপরলোকের কাছে ঘর চাহিয়া লইয়া কিম্বা টাউনহল ভাড়া করিয়া কিম্বা মাঠের মাঝখানে চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া সভা করিতে হয়। বাঙ্গালী সে অভাবটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বড়মানুষ মরিলে কাঁদিবার জন্ত সভা করা আবশ্যক, অত্যাচারনিবারণের উদ্দেশে সভা করা আবশ্যক, আইনের প্রতিবাদ জন্য সভা করা আবশ্যক, ঝড় বন্যা, গৃহদাহ, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সমাজবিপ্লব ইত্যাদিজনিত কষ্টনিবারণার্থ সভা করা আবশ্যক। কত কার্য্যের জন্তই যে বাঙ্গালীকে এখন সভা করিতে হয়, যাঁহারা সভা করেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিয়াছেন। বিদেশের বড়লোক মরিলে বাঙ্গালী সভা করিয়া কাঁদেন, দেশের বড়লোক মরিলেও সভা করিয়া কাঁদেন, কিন্তু সভ্যগণের মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগে সভা করিয়া ক্রন্দন করা হয় না, এই একটী অভাব আছে। মনুষের বিজ্ঞতা ক্রমশই জন্মে; বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে সেই অভাবটীও দূর হইয়া যাইবে কিম্বা হয় তো সে অভাবকে সভ্যবৃন্দ অভাব বলিয়া জ্ঞান করেন না। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সন্তানগণের মধ্যে এমন কতকগুলি সভ্য উদ্ভূত হইয়াছেন যে, মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগে দেশব্যবহারে শোকচিহ্ন ধারণ না করিয়া হ্যাটকোট পরিধান পূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে তাঁহারা মাতা-পিতা-বিয়োগে স্বচ্ছন্দে আফিস করিতে চলিয়া যান, চক্ষে জলবিন্দুও থাকে না।

কাঁকরোল সাহেবের শোকে ক্রন্দন করিবার দশদিন পরে সেই ভাড়াকরা অট্টালিকার আর একটী কক্ষে সমাজ-সংস্কারের সভা বসিল। আমাদের সমাজে কি কি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, আবহমানকালাবধি কি কি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা হইল। কি করিলে ভাল হয়, কিরূপে সংস্কার করিলে হিন্দু-সমাজ সভ্য সমাজনামে গণ্য হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যের ভিন্ন ভিন্ন বক্তৃতায় তাহাই উল্লেখিত হইল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন স্পষ্টবক্তা ভট্টাচার্য্য ছিলেন। তিনি সভ্য নহেন, বাস্তবিক সভা ম সভ্যগণের মতে তিনি অসভ্য, সভ্যশ্রেণীর মধ্যে তাঁহার নাম ছিল না। বক্তৃতা-শ্রবণের আশায় তিনি একজন আগন্তুক। কি কারণে তিনি অসভ্য, তাহা বুঝিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহার পোষাক ছিল না, কোট-প্যাণ্টলেন ত ছিলই না,

পায়ে ইংরাজী জুতা ছিল না, মাথায় বাঁকা সিঁতি ছিল না, এমন কি, গায়ে একটী জামা পর্য্যন্ত ছিল না। সভ্যগণ যেরূপ সজ্জা করিয়া সভাস্থ হয়েন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সকলের বক্তৃতা অবসানে সভার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই ভট্টাচার্য্য-মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই সকল, বাপু সকল, বাবু সকল! তোমরা কে? বাঙ্গালীর ধর্ম্মসংস্কারে, সমাজসংস্কারে তোমরা ব্রতী হইয়াছ, পরম আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু তোমাদিগকে আমি চিনিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালীর যে রকম পরিচ্ছদ থাকে, তোমাদের সকলের তাহা নাই; যে ভাষায় তোমরা কথা কহিলে, তাহা বাঙ্গালীর ভাষা নহে, ইহাও আমি বুঝিলাম। ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমি ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করি নাই, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমি অনেকগুলি ইংরাজী কথা শিক্ষা করিয়াছি; বড় বড় কথা না পারি, চলিতমত ছোট ছোট অনেক কথা আমি বুঝিতে পারি। তোমাদের বক্তৃতার স্থূল স্থূল মর্ম্ম আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অগ্রে আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যে সমাজের সংস্কার তোমরা বাসনা কর, সে সমাজের কি ধার তোমরা ধার? বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ, বাঙ্গালীর ভাষা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ, বাঙ্গালীর ধর্ম্মে তোমাদের বিশ্বাস আছে, তোমাদের বক্তৃতার মধ্যে তেমন ভাবের বেশী কথা আমি শুনিলাম না। ইহাতে আমি অনুমান করিয়া লইয়াছি, বাঙ্গালীর ধর্ম্মেও তোমাদের রুচি কম, অথচ তোমরা বাঙ্গালী সমাজের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত। সত্যই কি তোমরা সমাজ-সংস্কারক? বাঙ্গালীর জাতীয় ব্যবহার পরিবর্জ্জন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় সমাজের পরিবর্ত্তন অভিলাষ, ইহা শুনিতে অদ্ভুত। আমাদের অনেকগুলি সামাজিক নিয়ম আমাদের শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রকারেরা আমাদের অমঙ্গল কামনা করিয়া শাস্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এমন প্রমাণ তোমরা কিছু দেখাইতে পার? তোমাদের জন্মের পূর্ব্বে যতদিন সেই সকল শাস্ত্রানুসারে সমাজ চলিয়া আসিয়াছে, ততদিনের কোন অমঙ্গল তোমরা কি কোন ইতিহাসে পাঠ করিয়াছ? সেই সকল পাঠের ফল তোমরা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার? তবে হাঁ, কালধর্ম্মে কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন না করিলে চলে না, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সে সকল পরি-

বর্ত্তনের উপযোগিতা তোমরা নির্ণয় করিতে পার, এমন আমার বিশ্বাস হইতেছে না। অধিক ইংরাজী আমি শিক্ষা করি নাই, আমার উপর তোমরা কুপিত হইতে পার, কিন্তু যে কার্য্যে তোমরা ব্রতী, কেন তাহার প্রতিবাদী হও? স্বজাতীয় পরিচ্ছদ, স্বজাতীয় খাদ্য, স্বজাতীয় ভাষা এবং স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নূতন পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তনপ্রয়াসী হইলে সমাজসংস্কার হইবে, নমুনা-স্বরূপ আদর্শ-স্থলে দাঁড়াইয়া অগ্রে তোমরা তাহাই দেখাইতেছ। এই আদর্শ-প্রমাণে দেশের লোকে যদি পরিবর্ত্তন শিক্ষা করে, তাহা হইলে বঙ্গ-সমাজ নাম রক্ষা করা উচিত হইবে কি না, তোমরা কি ইহার উত্তর দিতে পার? তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ সংস্কারকে আমি যদি স্বেচ্ছাচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে তোমাদের সমাজচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিবে না? তোমরা আমাকে কি কুসংস্কারবিশিষ্ট পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না? সভায় তোমরা দশজন আছ, দশজনেই লেখাপড়া শিখিয়াছ, শীঘ্র তোমাদের মগজ একেকালে গরম হইয়া উঠিবে না, এই ভরসায় আমি বলিতে চাই, সভা করা তোমাদের একটা রোগ হইয়াছে। এ রোগের রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে না। সভা করিলে ফল হয়, ইহা আমি জানি, ফল আবার দুই প্রকার আছে, অমৃতফল এবং বিষফল। অমৃতফল অন্বেষণ করিতে গিয়া তোমরা যদি বিষফল সংগ্রহ করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে সমাজ ডুবিবে, বঙ্গভূমিও ডুবিয়া যাইবে, বঙ্গের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, কেহই আর বঙ্গবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে সম্মান জ্ঞান করিবে না, আচার-বিচার দেখিয়া অপরাপর দেশের অপরাপর সমাজের বিজ্ঞ লোকেরাও তোমাদিগকে বঙ্গবাসী বলিয়া চিনিবে না।"

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় আরও কহিলেন, "তোমাদের সভা করা হুজুগে এক একটা বিষফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার একটা ক্ষুদ্র প্রমাণ আমি দেখাইতে চাহি। সহরের এক নাট্যশালায় একখানি প্রহসনের অভিনয়ে আমি একবার দেখিয়া আসিয়াছি, নারী-স্বাধীনতা-প্রিয় একটী বাবু আপনার পত্নীকে এবং আরও কতিপয় প্রতিবাসিনী কামিনীকে সঙ্গে লইয়া লাট সাহেবের বাগানে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন, রঙ্গ দেখিবার জন্য আর একজন বাঙ্গালী বাবু মাতাল গোরা সাজিয়া সেই কামিনীগণকে ভয় দেখাইয়াছিল। যে বাবুটী অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী সেই গোরার সম্মুখে আটক পড়িয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল,

অবশিষ্ট সকলে ভয় পাইয়া পলাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইল, অগ্রণী বাবুটিও সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। নিজের পত্নী একাকিনী সেই ছদ্মবেশী গোরার বিলাসিকা দর্শনে ঘন ঘন স্বামীর দিকে চাহিতে লাগিল। স্বামী তখন দূর হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা জুড়িলেন,—ক্রন্দন কর, ক্রন্দন কর, ভয় পাইও না, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি সভা করিব, এ দেশে সভা করিয়া যদি ফল না হয়, বিলাতে গিয়া সভা আহ্বান করিব, নিজে যদি যাইতে না পারি, বাছা বাছা ডেলিগেট পাঠাইব, চাঁদা করিব, এদেশে গোরার দৌরাত্ম্য যাহাতে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়, তজ্জন্য স্থানে স্থানে সভা করিয়া হুজুরে দরখাস্ত পাঠাইয়া, আইন পাশ করাইয়া লইব ইত্যাদি ইত্যাদি।' এই ত বাবু তোমাদের সভ করার ফল! সভা করিয়া সত্য যদি দেশের মঙ্গলসাধন করিতে পার, স্বচ্ছন্দে সভা কর। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আপনারা বাঙ্গালী হও, হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে পালিত হইয়াছ, হিন্দু হও, হিন্দু থাক, আদর্শ দেখাইতে পারিলে সমগ্র বঙ্গ আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন।"

সভার সভ্যগণ বহু কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের ঐ দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। শ্রবণের সময় কেহ কেহ ক্রোধে, ঘৃণায়, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে দন্তে দন্তপেষণ করিয়াছিলেন, মুখে কিছু বলেন নাই। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় নিস্তব্ধ হইলে একজন হ্যাটকোটওয়ালা দীর্ঘকায় সভ্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিদ্রূপভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের কিছু বলিবার নাই, এই লোক—এই বক্তা ভট্টাচার্য্য নিজমুখেই স্বীকার করিতেছেন, কুসংস্কারবিশিষ্ট পাগল; ইহার উপর আমরা আর কি বলিব। ভট্টাচার্য্যেরা দুটী সভার অস্তিত্ব জানেন—বিবাহসভা আর শ্রাদ্ধসভা। ঐ দুই সভায় ইঁহারা বিদায় প্রাপ্ত হন, আমাদের এই সভায় যদি ভট্টাচার্য্য-বিদায়ের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এই বক্তা ভট্টাচার্য্য ঠাকুর আমাদের জয়গান করিয়া আমাদের প্রত্যেক বাক্যে অনুমোদন করিতেন।"

সভার সভ্যগণ সমকণ্ঠে অট্টহাস্য করিয়া করতালি দিলেন। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের পরম ভাগ্য, তিনি ততগুলি উগ্রমূর্ত্তি সমাজ সংস্কারকের সম্মুখ হইতে অক্ষত অঙ্গে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সভার যেরূপ অভিনয় হয়,

নাটকের রঙ্গভূমির অভিনয়ে তেমন সুন্দর অভিনয় হইতে পারে কি না, তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ।

ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়া যাইবার পর আর একটী লোক দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও সেই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত নহেন। ভট্টাচার্য্যের কোন কোন বাক্যের পোষকতা করিয়া তিনি বলিলেন, "আমাদের সমাজ-সংস্কারের জন্য আমাদের নিজেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেই সকল কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক হইতে পারে, নতুবা সকল কার্য্যেই সাহেবের নিকটে দাও দাও বলিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করা উচিত হয় না। আপনারা যতগুলি সভা করেন, সমস্ত সভার মধ্যে বড় সভা কংগ্রেস। সে সভায় বড় বড় বক্তৃতা হয়, বক্তৃতার ফলে বড় বড় দরখাস্ত লেখা হয়, তাহাতে যে কিরূপ ফল ফলে, সকলে তাহা জানিতে পারেন না। কংগ্রেস সর্ব্বদা বসে না, এ দেশে যেমন নানা প্রকার পার্ব্বণ আছে, পঞ্জিকা দর্শন করিয়া সেই সকল পার্ব্বণের দিন অবধারণ করা হয়, কংগ্রেস সভাটীও সেই রকম বার্ষিক পার্ব্বণের দলে দাঁড়াইয়াছে। বর্ষে বর্ষে চৈত্রমাসের শেষে ঢাক বাজাইয়া, চড়ক-সন্ন্যাসের গাজনে যে প্রকার বহু সন্ন্যাসী একত্র হইয়া নাচিয়া গাইয়া ঘুরিয়া লম্ফ দিয়া সং সাজিয়া দিনকতক খেলা করে, কংগ্রেসের হুজুগটাও সেইরূপ গাজনের সামিল, কেহ যদি এমন কথা বলেন, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত অপরাধী বলা যাইবে না। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ভাল, সে কথা স্বীকার করা যায়, কিন্তু কংগ্রেস কি কি চায়, তাহা সকলকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না। কেবল বক্তৃতা শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হন, করতালি দেন, বক্তাকে বাহবা দেন, ইহাই দেখা যায়, আর সমস্ত কার্য্য লুকান থাকে।"

সেই বক্তা আরও কহিলেন, "কংগ্রেস সভা সাজাইতে অল্প টাকা খরচ হয় না, চাঁদা করিয়া সেই সকল টাকা আদায় করা হয়। খরচ হয় কিরূপে? বৃহৎ এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ। ভারতের দূরদুরান্তর প্রদেশে এক এক বৎসর সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এক বৎসর একটা পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলে সকল বৎসরে সকল স্থলে তাহা কার্য্যকর হয় না; নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন মণ্ডপনির্ম্মাণের ব্যয় অনুমান করিয়া ধরিলেও অতি কম দশ হাজার টাকা, তাহা ছাড়া দূরদুরান্তর হইতে নানা শ্রেণীর ডেলিগেটের সমাগম হয়, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত, বাসস্থানের নিমিত্ত, আহারাদির নিমিত্ত, পাথেয়ের নিমিত্ত অনেক

অধিক ব্যয় হয়। সে সকল টাকা কাহাদের ভোগে আইসে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদের রেলওয়ে নাই, জাহাজ নাই, বুলকৃটেণ নাই সমস্তই সাহেবের। ডেলিকেটেরা যে সকল যান বাহনে পঞ্জাব হইতে মান্দ্রাজে, বোম্বাই হইতে কলিকাতায়, কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন, সে সকল যান বাহনের ভাড়া সাহেবের ক্রোড়গত হইয়া থাকে। তোমাদের তাহাতে কি লাভ? আমাদেরই বা কি লাভ? সমস্ত ভারতবর্ষেরই বা কি লাভ? বিশেষতঃ নানা দেশীয় লোকের খাদ্যরুচি এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অনেক ডেলিকেট হয় ত সাহেবীখানা খাইতে ভালবাসেন। সেই সকল সাহেবলোকের হোটেল হইতে যোগাড় করিতে হয়, এদেশী খাদ্য অপেক্ষা এখনকার সাহেবী-খাদ্য মহামূল্য। হোটেলের বিলে, অনেক টাকা অপব্যয় হইয়া যায়, আমাদের লাভ কেবল টাকা খরচ করিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করা। ভারত উদ্ধারের মহৎপ্রস্তাব উত্থিত হইয়া থাকে। সিডিসন বাঁচাইয়া ভারত উদ্ধারের বক্তৃতা করা কতদূর সাবধানতার কার্য্য, সভার বাগ্মীগণকে, তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না। কি প্রকারে ভারত উদ্ধার করিতে হইবে, বাগ্মীমহাশয়েরাই তাহা বুঝিতে পারেন। রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপার দূরে থাকুক, মিউনিসিপাল কার্য্যভার আমরা আপনারা গ্রহণ করিতে পারি কি না, ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া সুচারুরূপে তাহা চালাইতে পারি কি না, কয়েক বৎসরে তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা হইয়াছে। সাহেব-লোকের বিরাগভাজন হইয়াও লর্ড রিপণ বাহাদুর আমাদের জন্য স্বায়ত্বশাসন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছিলেন; সেই প্রণালী কতদূর ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি নাই? ভারতের রাজধানী কলিকাতা; এখানকার স্বায়ত্বশাসন এখানকার লোকের হস্তে ছিল, কার্য্যও কিরূপ হইতেছিল তাহা আমাদের মনে আছে। লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ভারতে পদার্পণ করিয়া কলিকাতার মিউনিসিপাল বিল যে পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্বায়ত্বশাসন একেকালে দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়া গিয়াছে। মিউনিসিপাল রাজ্য উদ্ধারে যখন এই ফল, তখন ভারত-উদ্ধার স্বপ্ন দেখা মহা বিড়ম্বনা; কেবল রাজপুরুষগণের বিরাগভাজন হওয়া মাত্র। কংগ্রেস সভা কোন বিষয়ে কি কি কথা বলেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত থাকে, গুপ্তচর বেড়ায়, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে কংগ্রেস সভার সহিত

রাজপুরুষগণের কতদূর সহানুভূতি। রাজপুরুষগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া আত্মোন্নতির, স্বদেশোন্নতির চেষ্টা পাওয়াই আমাদের উচিত। রাজনৈতিক আন্দোলন কিছু খর্ব্ব করিয়া স্বদেশের উপকারকল্পে মনোনিবেশ করাই আমাদের আশু কর্ত্তব্য। বৃক্ষের মূল অতিক্রম না করিয়া এককালে বৃক্ষচূড়ায় আরোহণ করিবার আশা করা কেবল হাস্যাস্পদ ও নিন্দাস্পদ হওয়া মাত্র। আমাদের দেশের লোক ইংরাজের অনুগ্রহে ইংরাজীবিদ্যা শিখিয়া কেরাণী হইতে শিখিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট বিবেচনা না করিয়া কতকগুলি লোক আর্ত্তনাদ করিয়া বলেন, সাহেব! আমাদিগকে যুদ্ধের চাকরী দাও, দেশের বড় বড় পদ দাও, রাজকার্য্যে স্বাধীনতা দাও, এই সকল উচ্চ আশা পূর্ণ হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। সাহেবেরা স্পষ্টই একথা বলেন, অথচ ঐ সকল প্রার্থনার মধ্যে চাকরীর প্রার্থনাই প্রধান, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "গোলামের জাতি শিখেছ গোলামী" সে কথা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। রাজ্যসম্বন্ধে, রাজনীতিসম্বন্ধে অধিকারলাভ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অগ্রে স্বদেশ-সংস্কারে, সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হওয়া উচিত। এদেশে ঐক্য নাই। সমবেত চেষ্টায় যাহাতে দেশবাসিগণের ঐক্য-সংস্থাপিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া অগ্রে উচিত। আপনাদের চেষ্টায়, আপনাদের শিক্ষায় উন্নতি করা—একান্ত বাঞ্ছনীয়। এতদিন ধরিয়া তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যতদূর করিয়াছেন, তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট আজ কাল এদেশের শিক্ষাসম্বন্ধে হাত গুটাইতেছেন, উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করিতেছেন, এক প্রকার ভালই হইতেছে। উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইলে কেরাণীগিরী ভিন্ন বড় বড় চাকরীর আশা এদেশের লোককে ত্যাগ করিতে হইবে। পেট তাহা বুঝিবে না। পেট-পোষণের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে। কৃষি, শিল্প এবং স্বদেশীয় বাণিজ্যের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইবে, তাহাই এ দেশের মঙ্গল। কংগ্রেস করিয়া, বড় বড় রাজনীতির আন্দোলন ছাড়িয়া ঐ শুভকর বিষয়ে উৎসাহশীল হওয়াই মঙ্গলপ্রদ। কংগ্রেস বহু ব্যয়-সাধ্য, অথচ তদ্দ্বারা কাহারও উপকার অনিশ্চিত।

সভার সভ্যমহোদয়েরা ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুখ ঘুরাইলেন। বক্তা তাহা দেখিলেন, তাঁহাদের মনের ভাবও বুঝিলেন, তথাপি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না

রাখিয়া সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি আরও কহিলেন, আপনারা তুষ্ট হইবেন কি রুষ্ট হইবেন তাহা আমি ভাবিতেছি না, আমার আর একটী কথা বলিবার আছে, কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া সেইটী আপনারা শ্রবণ করুন। বিলাতের কাঁকরোল সাহেবের শোকে ক্রন্দন করিয়া যে দিন আপনারা তাঁহার স্মরণচিহ্ন রাখিবার উদ্দেশে সভা করিয়াছিলেন, সে দিন আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। কার্য্যফল যাহা হইয়াছে তাহাও আমি শ্রবণ করিয়াছি। সেই দিন সেই ক্ষেত্রে যে কথা বলা আমার ইচ্ছা ছিল, অবসরাভাবে সে দিন তাহা বলিতে পারি নাই, অদ্য আমি সেই কথা বলিব। আপনারা অবশ্যই বুঝিতেছেন, আপনাদের সভা করিবার একটী নির্দ্দিষ্ট বাটী নাই, কিন্তু কথায় কথায় আপনাদের সভা করা দরকার। দেশের কিম্বা বিদেশের কোন ধনবান্, গুণবান্, মর্য্যাদাবান্ লোকের মৃত্যু হইলে সভা করিয়া আপনারা কাঁদেন, পাথরের প্রতিমা গড়াইবার প্রস্তাব করেন, হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলেন, আমি বোধ করি, তাহাতে বিশেষ উপকার কিছুই হয় না। আমার বিবেচনায় যাঁহাদের স্মরণচিহ্ন রাখা আপনারা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাঁহাদের একখানি পূর্ণাবয়ব ছবি চিত্র করাইয়া রাখিলেই চলিতে পারে। মাঠে অথবা রাস্তার ধারে পাথরের মুরদ খাড়া করিয়া টাকা নষ্ট করা অপেক্ষা, সেই টাকায় নগরের একটী প্রকাশ্য স্থলে আপনারা আপনাদের একটী সাধারণ সভা-মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে পারেন। সেই সভা-মন্দিরে বিখ্যাত লোকদিগের চিহ্নমূর্ত্তিগুলি ঝুলাইয়া রাখিলেই শোভা পাইতে পারে; তাহা হইলেই উভয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নূতন বক্তা নিস্তব্ধ হইলেন। সভ্যগণের মধ্যে হ্যাটকোট-ধারী একজন যুবা পুরুষ দাড়ি-চসমা-শোভিত-শ্রীমুখমণ্ডল উন্নত করিয়া গাত্রো-থান পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, এ প্রস্তাব মন্দ নয়, কিন্তু একখানি বাড়ীতে বহু লোকের চিত্রপট রাখিলে কজন লোকে দেখিতে পাইবে? স্মরণচিহ্ন বলিয়া কিরূপেই বা তাহা ঘোষণা করা যাইবে? যাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইবে না, তাহাকে স্মরণচিহ্ন বলা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। যিনি বক্তৃতা করিলেন, তিনি যদি এই সভার সভ্য হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রস্তাবকে সভায় তুলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে অগ্রাহ্য করিতাম, কিন্তু তিনি যখন নির্দ্ধারিত সভ্য মধ্যে গণ্য নহেন, তখন তাঁহার কথা লইয়া এ সভায় আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন।

চারিদিকে করতালি পড়িল। যুবা বক্তা সর্ব্বমুখে বাহাদুরী পাইলেন, সে দিনের কার্য্য শেষ করিয়া সভ্যগণ যথাসময়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এক একটী সভার ফল এই প্রকার। কোন ফল অম্ল-মধুর; কোন ফল কেবল শ্রুতি-সুখকর, নয়ন-তৃপ্তিকর, সুমধুর; কোন ফল কটু-তিক্ত-কষায়-মিশ্রিত; কোন কোন ফল, নিরবচ্ছিন্ন অম্ল রসাত্মক।

সভার আলোচনা সম্বন্ধে কথা বলা যাইতে পারে," কিন্তু যাঁহারা সভা করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সদ্বক্তা। তাঁহারা আপনারাই নিশাকালে এক একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, সভার ফল কি প্রকার হইলে সভার নাম সার্থক হইতে পারে।
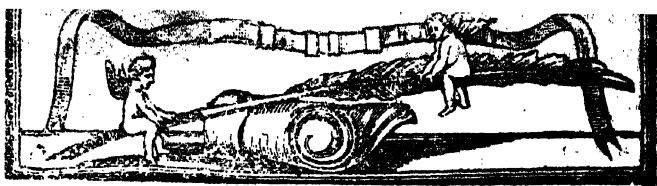
অষ্টম তরঙ্গ।

নবরঙ্গিণী।

চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তীর পুত্র তারাপদ চক্রবর্ত্তী। পুরাতন ডাকঘরের গলির এক উকিলবাড়ীতে মাসিক পঞ্চদশ টাকা বেতনে তারাপদ চাকরী করেন। চন্দ্রচূড় যতদিন জীবত ছিলেন, তারাপদ ততদিন তাঁহাকে উদ্যানের মালী অপেক্ষা অধিক সম্মান দিতেন না। চন্দ্রচূড় মরিয়াছেন, তাহার হাড় জুড়াইয়া গিয়াছে, তারাপদও স্বাধীন হইয়াছেন। পিতার জীবদ্দশায় তারাপদ বিবাহ করেন নাই, না করিবার কারণ পিতা পাত্রী মনোনীত করিয়া পুত্রের বিবাহ দেন, তারাপদ সে রীতিকে কুরীতি বলিয়া জানেন। চন্দ্রচূড় দুই যায়গায় সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, পুত্রের অমতে সে দুটি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তারাপদ অবিবাহিত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। পাত্রীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ, নাম নবরঙ্গিণী।

নবরঙ্গিণী কলিকাতার বেথুন কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, স্বাধীনপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়াছে। সংসারের গৃহিণীপনা করিতে তাঁহার ইচ্ছাও অতি প্রবলা। স্বামীকে স্ববশে রাখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতে হয় নাই, বিবাহের দিন হইতেই তারাপদ সেই নবরঙ্গিণীর পদানত হইয়াছেন। নবরঙ্গিণী বিদূষী, তারাপদ উকিলবাড়ীর কেরাণী, লেখাপড়া অতি কম, কাজে কাজে লেখাপড়ার বিচারে পদে পদে তারাপদকে পরাস্ত হইতে হয়, বিজয়-গৌরবে নবরঙ্গিণী মূর্খ পতির উপর সকল বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করেন।

সংসারটী কেমন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তারাপদের জননী বর্ত্তমান, তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৬৫ বৎসর। শিব-পূজা, গঙ্গাস্নান, বার-ব্রত ইত্যাকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি ভক্তিমতী ; সংসারে গৃহিণী হইয়া যে প্রকারে গৃহ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হয়, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানিতেন। সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি ও সমান দয়া ছিল। পুত্রের জননী হইয়া অবধি তিনি আরও অধিক দয়াবতী হইয়াছিলেন। পুত্রটী যতদিন শিশু ছিল, জননীর স্নেহপ্রাপ্ত হইয়া ততদিন মা বলিয়া ডাকিত, স্তন-দুগ্ধ পান করিত, একটু বড় হইয়া জননী দত্ত উত্তম উত্তম ভোজ্য ভোজন করিয়া পরিতুষ্ট হইত ; যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পুত্রের আর সে ভাব ছিল না। সেই দুঃখে জননী সর্ব্বদা বিষাদিনী থাকিতেন।

তারাপদের দুটী ভগিনী ;—একটী জ্যেষ্ঠা, একটী কনিষ্ঠা। জ্যেষ্ঠা ভগিনীটী বিধবা, নিঃসন্তান, সুতরাং চিরদিন পিত্রালয়ে থাকিতেন ; কনিষ্ঠাটী সধবা, বৎসরের এগার মাস শ্বশুরালয়ে, কেবল পূজার সময় একটী মাস পিত্রালয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইত। তাঁহার দুটী পুত্র। একটী একাদশবর্ষীয়, একটী পঞ্চমবর্ষীয়। একাদশবর্ষীয় পুত্রটী মাতামহীর নিকটেই প্রতিপালিত হইত। তারাপদের চাকরীর পঞ্চাশটী টাকা মাসে মাসে পাওয়া যাইত না ; কলিকাতায় উকীল-বাড়ীর সাধারণ নিয়মও তাহা নহে। ঐ টাকার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, অবশ্যই সংসারে কষ্ট হইত, কিন্তু সে নির্ভর আবশ্যক হইত না। চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী শিষ্যযজমানগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া সময়ে সময়ে যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা জমা করিয়া কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী খরিদ করিয়াছিলেন, প্রায় বিশ বিঘা জমী প্রজাবিলি ছিল, দশ-বিঘা শালী জমীতে ধান্যচাষ হইত। সেই ধান্যে সংবৎসর স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত। কতক কতক ধান্য উদ্বৃত্ত হইলে, তাহা বিক্রয় করিয়া চক্রবর্ত্তীমহাশয় সংসারের অপরাপর ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেন। তারাপদ যখন চাকরী করিতে শিখে নাই, তখন ঐ ভূমি-সম্পত্তি হইতে সমস্ত খরচ চলিত। চাষের জন্য বাড়ীতে চারিটী গরু, দুজন রাখাল আর দুইজন কৃষক ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী দুগ্ধবতী গাভী পুষিয়াছিলেন, সেই গাভী যে কয়েকটী বৎস প্রসব করিয়াছিল, তন্মধ্যে দুটী বৎস নিজ বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। তাহারাও দুগ্ধ দান করে। সংসারে কিছুই কষ্ট ছিল না।

চাকরী করিতে আরম্ভ করিয়া তারাপদ চক্রবর্ত্তী পিতার উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া সেই চাষের জমী প্রজাবিলী করিয়া দিয়াছিলেন; রাখাল, কৃষক, লাঙ্গল, গরু বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, পিতাকে মানিতেন না, সুতরাং পিতার নিষেধ মান্য করেন নাই। একজনমাত্র বালক রাখাল আছে, সে গাভীবৎসগুলির সেবা করে।

জননীর প্রতি তারাপদের কিছু কিছু ভক্তি ছিল, বিবাহ করিয়া অবধি সে ভক্তিটুকু লোপ পাইয়া গিয়াছে। নবরঙ্গিণী আপন বৃদ্ধা শাশুড়ীকে যেন বাড়ীর চাকরাণী মনে করেন, বিধবা ননন্দিনীকে তদপেক্ষা বেশী গৌরবিণী মনে করেন না, তাঁহাদের উভয়ের দ্বারা সংসারের সকল কার্য্য করাইয়া লন। তারাপদের বিধবা ভাগিনীটীর বায়ুরোগ ছিল, অধিক পরিশ্রম অথবা অগ্নির উত্তাপ সহ্য হইত না, তিনি রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেই ধোঁয়া লাগিয়া, উত্তাপ লাগিয়া রোগটা বৃদ্ধি পাইত, এই কারণে তিনি যাহা কিছু পারিতেন, বাহিরের সামান্য সামান্য কাজ-কর্ম্ম করিতেন, বৃদ্ধা গৃহিণীকেই সমস্ত রন্ধন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

নবরঙ্গিণী কি করিবেন, বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী এক পাত্র চা প্রস্তুত করিয়া দিতেন, শয্যায় শয়ন করিয়াই চা খাইয়া তাঁহার বধূমাতা আলস্য ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন, চা হইবার পূর্ব্বে রন্ধনাদি প্রস্তুত হইত, তারাপদ অগ্রে আহার করিয়া আফিসে চলিয়া যাইতেন, কিঞ্চিৎ পরে ফুলল-তৈল মাখিয়া নবরঙ্গিণী উষ্ণজলে স্নান করিতেন, শাশুড়ীই স্নানের জল গরম করিয়া দিতেন, এ কথা বলা বাহুল্য। স্নানের পর বসন পরিবর্ত্তন করিয়া, জামা গায় দিয়া, মোজা জুতা পরিয়া, বৌমা উপরে গিয়া উঠিতেন, শাশুড়ী কিম্বা ননদী শীঘ্র শীঘ্র অন্ন-ব্যঞ্জনপূর্ণ ভোজনপাত্র উপরে তুলিয়া দিতেন, নবরঙ্গিণী আহার করিতেন। তারাপদ ঐ রঙ্গিণীর সেবার জন্য একজন দাসী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রঙ্গিণীর ভোজন সমাপ্ত হইবামাত্র সেই দাসী তৎক্ষণাৎ হস্ত-মুখ-প্রক্ষালনের জল, সুবাসিত তাম্বূল, অগ্নিসংযুক্ত একটী সিগারেট হাতে হাতে যোগাইয়া দিত, নবরঙ্গিণী তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে সিগারেট মুখে করিয়া শয়ন করিতেন, সিগারেট অর্দ্ধভস্ম হইলে সেটা ফেলিয়া দিয়া বৌমা ঘুমাইতেন।

অভ্যাসটী অতি সুন্দর ছিল। এক ঘণ্টামাত্র নিদ্রা। নিদ্রাভঙ্গের পর আর একটী নবীন সিগারেট ধরাইয়া চন্দ্রমুখে সেই অগ্নি সংলগ্ন করিয়া নবরঙ্গিণী একখানি চেয়ারে বসিতেন। হস্তে একখানি নভেল অথবা নাটক, হয় ইংরাজী, নয় বাঙ্গলা। বেলা চতুর্থ ঘটিকা পর্য্যন্ত নবরঙ্গিণীর এইগুলি কর্ত্তব্য-কার্য্য।

চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী অন্দরমহলটী দোতালা করিয়াছিলেন, সদরবাড়ী দোতালা করিতে পারেন নাই। দরজার দুইধারে দুটী একতালা বৈঠকখানা। কর্ত্তার মৃত্যুর পর অবধি একটী বৈঠকখানায় প্রায় সর্ব্বদাই চাবী বন্ধ থাকিত, দ্বিতীয়টী খোলা। কড়িকাঠে একটী বেল-লণ্ঠণ, দেয়ালের দুই ধারে দুই যোড়া দেয়ালগিরি, নীচে নীচে দুইখানি বড় বড় বিলাতী ছবি। বৈঠকখানায় বাঙ্গালীধরণের পাটাতন, জাজিম, তাকিয়া, হুঁকা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। খানকতক মার্কিণ-চেয়ারে ঘরখানি সাজানো। অপরাহ্নে নবরঙ্গিণী উত্তম বেশভূষা করিয়া সেই বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেন, পুস্তক ছাড়িয়া আসিতেন না, কোমল করপল্লবে একখানি আদিরস-পুস্তক বিরাজ করিত। রাজারা যেমন দিবসের মধ্যে একবার অভ্যর্থনা-গৃহে-সমাগত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন, প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই বৈঠকখানায় নবরঙ্গিণী সেইরূপ দরবার করিতেন। স্বামীর দুটী পাঁচটী বন্ধুলোক সেই সময় সেইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নবরঙ্গিণী তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটী সিগারেট দিয়া দস্তরমত মান রাখিতেন; তাহার পর বন্ধুগণের সহিত বিবিধ রহস্যালাপ হইত। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ঐ প্রকার মজ্‌লীস। বৃদ্ধা গৃহিণী সন্ধ্যার সময় দেশীমাত্রায় চা প্রস্তুত করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া বৈঠকখানায় পাঠাইতেন, বন্ধুগণের সহিত নবরঙ্গিণী গরম গরম চা পান করিতেন।

রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় মজ্‌লীস হইত, তারাপদ তখন কোথায় থাকিতেন? কলিকাতার উত্তরে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ একখানি পল্লীগ্রামে চন্দ্রচূড়ের বাস ছিল। বেলা ৮টার পূর্ব্বে আহার করিয়া নৌকাযোগে তারাপদ কলিকাতায় চাকরী করিতে আসিতেন, বাটীতে ফিরিয়া যাইতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া যাইত। বাতাস ও স্রোতের প্রতিকূলতায় এক একদিন আরও অধিক রাত্রি হইত; সুতরাং নবরঙ্গিণী অবাধে বন্ধু-বান্ধব লইয়া বৈঠকখানায় আমোদ করিতে পারিতেন। তারাপদ চক্রবর্ত্তী এ দেশের নারী-স্বাধীনতার বড়

ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পত্নী নবরঙ্গিণী সকল বিষয়ে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতেন, পত্নীর কথার উপর, পত্নীর কার্য্যের উপর কথা কহিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, বন্ধুবান্ধব লইয়া নবরঙ্গিণী যখন বাহিরের বৈঠকখানায় আমোদ করিতে বসিতেন, তারাপদ আপিস হইতে আসিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিতেন, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না; রবিবার কিম্বা অন্যান্য পর্ব্বদিবসে তাঁহাকেও সেই মজ্‌লীসে যোগ দিতে হইত। বন্ধুগণ অনুরোধ করিলে এক এক শনিবারে নবরঙ্গিণী গঙ্গার পরপারে এক একটী বাগানে বেড়াইতে যাইতে বাধ্য হইতেন।

নবরঙ্গিণীর আরও অনেকগুলি কার্য্য ছিল। সংসারের কার্য্যে তিনি উদাসিনী ছিলেন, নিজে এক গ্লাস জল গড়াইয়া খাইতেও তাঁহার কষ্ট হইত, কিন্তু আত্মপ্রীতিকর অপরাপর কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। একটী কার্য্য তন্মধ্যে প্রধান; আজকাল কলিকাতা সহরে অনেক গৃহস্থের অন্তঃপুরে মিশন-হাউসের বিবিরা প্রবেশ করিয়া যুবতী কামিনীগণকে বিদ্যাশিক্ষা দেন। পল্লীগ্রামের সর্ব্বত্র এখনও সে রীতি প্রবেশ করে নাই। যে গ্রামের কথা আমরা বলিতেছি, সে গ্রামে অথবা তাহার নিকটে মিশন-হাউস ছিল না। মেয়ে পড়াইবার বিবিরা সে গ্রামে যাইতেন না; অথচ মেয়েরা যাহাতে লেখা-পড়া শিখিতে পারে, নবরঙ্গিণী তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্নবতী ছিলেন। যেদিন বন্ধুবান্ধবের মজ্‌লীস একটু সকাল সকাল ভাঙ্গিত কিম্বা মজ্‌লীস একটু শেষ-বেলায় বসিত, সেই সব দিবসে নবরঙ্গিণী নবরঙ্গে সজ্জিতা হইয়া পাড়া বেড়াইতে যাইতেন; পাঁচ সাত বাড়ী বেড়াইয়া একখানি বাড়ীতে বৈঠক করিয়া বসিতেন। সেইখানে পাড়ার আট দশটী যুবতী কামিনী একত্র হইত, নবরঙ্গিণী তাহাদিগকে পাঠ দিতেন। এখনকার দিনে যে সকল পুস্তক-পাঠ করিতে যুবতীগণের বেশী আমোদ, যে সকল পুস্তকে নারীজাতির স্বাধীন-প্রেমের গৌরব অধিক, সেই সকল পুস্তক অত্যাদরে পরিগৃহীত হইত। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নবরঙ্গিণী আপন ছাত্রীগণের নিকটে স্বাধীনতার মহিমা বর্ণন করিতেন। পুরুষের ন্যায় নারীগণের সকল বিষয়ে সমান অধিকার, পুনঃ পুনঃ তিনি যুবতীগণকে এই কথা বুঝাইয়া দিতেন। সে শিক্ষার ফল এত দূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, পল্লীবাসী অনেকগুলি গৃহস্থের গৃহে অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পতি-সেবার কথা, পতিভক্তির কথা অনেকেই

হাসিয়া উড়াইয়া দিত, পতিকে যেন চাকর বানাইয়া অনেকগুলি যুবতী আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করিত।

নিজে স্বাধীনা হইয়া পাড়ার কামিনীগণকেও স্বাধীনা করিতে নবরঙ্গিণী সর্ব্বদা অনুরাগিণী ছিলেন। গৃহস্থের কুলবধূ অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া পদব্রজে পাঁচ বাড়ী বেড়াইয়া আসিত, সকলের সহিত কথা কহিত, যাহাদিগকে দেখিলে ঘোমটা দিতে হয়, হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের সঙ্গেও কথা কহিতে অভি-লাষিণী হইত। অপরা গৃহিণীরা তাহাদিগকে বেহায়া বলিয়া নিন্দা করিতেন, তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিত না। এই রকমে নবরঙ্গিণীর দলপুষ্টি হইয়াছিল।

নবরঙ্গিণীর কুটুম্বিনী অনেক। জাতীয় সম্পর্কে কুটুম্ব, অন্যজাতীয় বন্ধুবান্ধব-গণের পরিবারগণও কুটুম্ব; সুতরাং প্রতি শনিবার সেই সকল কুটম্বের নামে তিনি খানকতক পত্র লিখিয়া রাখিতেন। রবিবার আপিসের ছুটী থাকিত, স্বামী দ্বারা প্রতি রবিবার সেই সকল চিঠি তিনি বিলি করাইতেন। পুরুষের নামে চিঠি থাকিত, স্ত্রীলোকের নামেও থাকিত। তারাপদ যেন পেয়াদা হইয়া সেই সকল চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেন। অবশ্য, তিনি অপর লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পাইতেন না, পুরুষগণের হস্তেই স্ত্রীলোকগণের চিঠি তিনি পঁহুছাইয়া দিয়া আসিতেন। স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া পুরুষেরা শিরোনামানুযায়ী চিঠি-গুলি সেই সেই হস্তে প্রদান করিতেন; পুরুষের নামের চিঠিগুলিও অসঙ্কোচে গৃহীত হইত।

তারাপদ চক্রবর্ত্তী ঐরূপ কার্য্য করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ আসিত কি না, তাহা তিনি জানিতেন; বাহিরে কিন্তু কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেন না। চিঠিবিলির কথা দূরে থাকুক, পুরুষের মজলীসে নবরঙ্গিণীর হাস্য-বিলাসাদি ক্রীড়া তিনি স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহাতেও কিছু বলিতে পারিতেন না। পরপুরুষের সঙ্গে তরণী আরোহণে তরুণী ভার্য্যা অপরাপর বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, তাহাতেও তারাপদ বারণ করিতেন না।

উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন নবরঙ্গিণীর সাহস বাড়িল, স্বাধীনতা বাড়িল, স্ফূর্ত্তি বাড়িল, বিলাস বাড়িল। অনেকের মুখে শুনা যায়, লেখা-পড়া শিখিলে

স্ত্রীলোকের অহঙ্কার কমে, হিংসা কমে, স্বার্থপরতা কমে এবং দুষ্প্রবৃত্তিও কমিয়া আইসে। এখনকার দিনে সেরূপ সংস্কারের বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। বাড়ীতে বৃদ্ধা শাশুড়ী আছেন, বিধবা ননদিনী আছেন, সধবা ননদিনীর একটী পুত্র আছে, তাহাদিগকে সংসার হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় নবরঙ্গিণী নিত্য নিত্য স্বামীর কাণে বিষমন্ত্র ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। তারাপদ ঠিক যেন রঙ্গিণীর মন্ত্রশিষ্য,—সকল বিষয়েই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। মনে মনে এক একবার তাঁহার ইচ্ছা হইত, বৃদ্ধা জননীকে বাড়ীতে রাখিয়া বিধবা ভগিনীকে আর সেই একাদশবর্ষীয় বালকটীকে দূর করিয়া দিবেন, কিন্তু রঙ্গিণীকে সে ইচ্ছা জানাইতে পারিতেন না। নিত্য নিত্য মন্ত্রণা দিয়া, ফল না দেখিয়া, এক রাত্রে রঙ্গিণী রোষান্বিতা হইয়া, স্বামীকে বলিলেন, "তোমার সংসার লইয়া তুমি থাক, আমার যেখানে ইচ্ছা, আমি সেখানে চলিয়া যাই। আগাছা পুষিতে তোমার যখন এত সাধ, তখন আর আমি এ সংসারে থাকিয়া কি করিব? আমাকে বিদায় করিয়া দাও। দশজনকে পুষিতে সমস্ত ফুরাইয়া যায়, আমার কি কোন সাধ-আহ্লাদ নাই? একটা ভাল পোষাক কি এক জোড়া জুতা, কি দুখানা গহনা পরিতে কি আমার সাধ হয় না? বার-ভূতের জ্বালায় কিছুই হইবার উপায় নাই। তুমি কেবল ভূত পুষিয়া রাখ, আমি বিদায় হই, ভূতের সংসারে আর মঙ্গল নাই।"

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তারাপদ বলিলেন, "অনেক দিন হইতে তোমার কথা আমি বুঝিয়াছি, যাহা করিতে হইবে, তাহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছি। ভগিনীকে আর সেই ছোকরাকে বিদায় করিয়া দিব, মাকে কিন্তু বিদায় করিতে পারিব না। বৃদ্ধ হইয়াছেন, কোথায় যাইবেন?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া রঙ্গিণী বলিলেন, "কোথায় যাইবে, আমি তার কি জানি? আমি সুখের পায়রা, যেখানে সুখ পাইব, সেইখানেই আমি উড়িয়া যাই; আমাকে তুমি ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।"

চিন্তা করিয়া তারাপদ বলিলেন, "একটু স্থির হইয়া বিবেচনা কর। তোমার উপকারের জন্য মাকে আমি রাখিতে চাই। তুমি রন্ধন করিতে জান না, জল গরম করিতে জান না, সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই শিক্ষা কর নাই, মাকে বিদায় করিয়া দিলে রন্ধন করিবে কে? তোমার জন্য চা প্রস্তুত করিয়া দিবে কে? কাজকর্ম্ম দেখিবে কে?"

মুখ ফুলাইয়া রঙ্গিণী কহিলেন, "কি বোকাই বুঝাইতেছ! রন্ধন করিবে কে? একটা রাঁধুনী রাখিয়া দাও। পাঁচ বাড়ীতে ত রাঁধুনী আছে, তাদের কি আর সংসার চলিতেছে না? বড় জোর পাঁচ টাকা। সে রাঁধুনী আমার গোলাম হইয়া থাকিবে, যাহা বলিব, তাহাই করিবে, বুড়ী কি আমার কথা শুনে? তুমি ত কোন খবর রাখ না, বুড়ী যে আমারে কত গঞ্জনা দেয়, সমস্ত আমি সহ্য করি, বিরলে বসিয়া চক্ষের জলে ভাসি।"

কথা বলিতে বলিতে নবরঙ্গিণী ঠোঁট ফুলাইয়া বক্ষের জলে ভাসিলেন। আর তারাপদ ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না, কোঁচার কাপড়ে প্রিয়তমার নেত্র-জল মুছাইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন "তুমি শান্ত হও, আমি সমস্ত পাপ বিদায় করিয়া দিব, সমস্ত উৎপাত ঘুচাইব।"

পরদিন তারাপদবাবু জননীকে আর ভগিনীকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। বালকটী কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, নবরঙ্গিণীর আপদ্-বালাই দূর হইল। পাড়ার একজন মূর্খ ভট্টাচার্য্যের পুত্র সেই সংসারে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বরাদ্দ হইল, মাসিক বেতন দুই টাকা আর এক বেলা খোরাক।

একমাস এইরূপে কাটিল। বৈকালের বন্ধু-বৈঠক খুব জাঁকিয়া উঠিল। রঙ্গিণীর বন্ধুবর্গের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু একটী ব্রাহ্মণকুমার; তাহার নাম কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী। লেখা-পড়ায় তিনি পরম পণ্ডিত। নবরঙ্গিণী বিদুষী যুবতী, রূপমাধুরীও মনোহারিণী। প্রথম-দর্শনাবধি কুঞ্জবিহারী সেই রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তারাপদ সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকেন না, যাহা কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই বৈঠকখানায় চলিতে পারিত, কিছু কিছু অঙ্গহীন থাকিত। বাড়ীতে গৃহিণী ছিলেন, তারাপদের ভগিনী ছিলেন, একটী বালক ছিল; বালক প্রায় সর্ব্বদা ঘুট্ ঘুট্ করিয়া বৈঠকখানায় আসিত, আরও পাঁচজন বন্ধুবান্ধব থাকিত, কাঙ্ক্ষিত আমোদ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। এখন এক প্রকার নিষ্কণ্টক।

সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া কুঞ্জবিহারী আসিয়া রঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, ভাল ভাল নভেল, ভাল ভাল নাটক, দাশরথি রায়ের চতুর্থ খণ্ড পাঁচালী, রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর রঙ্গিণীর হস্তে পরমাদরে

স্থান প্রাপ্ত হইল। যেখানে যেখানে কূট, কুঞ্জবিহারী সেই সেই স্থানের গুপ্তরস বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। নবরঙ্গিণীর নব-রস উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ভাল ভাল নভেল, ভাল ভাল নাটক, এ কথার অর্থ, রঙ্গিণী বুঝিতে পারিলেন। যাহাতে নব-রসের ছড়াছড়ি, স্বাধীনা কুলাঙ্গনার পক্ষে তাহাই ভাল বলিয়া গণ্য; কেন না, তাহাতে স্বাধীন প্রেমের উচ্ছ্বাস অধিক, গৌরব অধিক।

আরও একমাস গেল। একদিন কুঞ্জবিহারী সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরামর্শক্রমেই হউক কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কারণেই হউক, সে দিন বৈকালে বৈঠকখানায় বৈঠক বসে নাই। শুভ অবসরে রঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুঞ্জবিহারী বলিলেন, "সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। মন্দিরের ঘাটে বজরা বাঁধা রহিয়াছে, এখন প্রস্তুত হইতে পার কি? তিন ঘণ্টা সময় আছে। তারাপদের প্রতি তোমার যেরূপ ভালবাসা, তাহার পরিচয় আমি পাইয়াছি, আমি তোমাকে যতখানি ভালবাসি, তুমি তাহার পরিচয় পাইয়াছ। এখানে থাকিয়া সে ভালবাসার আশা পূরাইতে অনেক ব্যাঘাত হয়। তুমিও তাহাতে সুখী হও না, আমিও সুখী হইতে পারি না। এখন স্থির কর, রাত্রি ৮ টার পূর্ব্বে তুমি প্রস্তুত হইতে পার কি না।"

মৃদু হাস্য করিয়া রঙ্গিণী কহিলেন, "ভালবাসার কথা কেন উত্থাপন কর? যাহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে যদি আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগকে লইয়া প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতে পারিতাম না। যে কথা তুমি এখন বলিতেছ, তাহাতে আমার একবিন্দুও আপত্তি নাই। তবে কি জান, হঠাৎ তুমি আজ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে। এখন আমি প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না। আর একটী দিন অপেক্ষা কর।"

বিস্ফারিত-নেত্রে রঙ্গিণীর মুখপানে চাহিয়া, যেন কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কুঞ্জবিহারী বলিলেন, "অপেক্ষা করিবার কারণ? স্বামীর অনুমতি লইয়া উড়িবার ইচ্ছা কর কি?"

হাস্য করিয়া রঙ্গিণী কহিলেন, স্বাধীনা বিহঙ্গিনী উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে কাহারও অনুমতি অপেক্ষা করে না। তবে কি জান, নিতান্ত নিঃসম্বলে ঘরের

বাহির হইতেনাই। যে সিন্দুকে আমার গহনার বাক্সটী আছে, সে সিন্দুকের চাবী আমার কাছে নাই। আজ রাত্রে আমি চাহিয়া লইয়া রাখিব, কল্য ঠিক প্রস্তুত হইয়া থাকিব, কল্য সন্ধ্যার পরেই——”

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই, ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কুঞ্জবিহারী বলিলেন, “সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেল। একদিন একরাত অপেক্ষা, এ দীর্ঘকাল বিরহ আমার প্রাণে সহ্য হইবে না, ভাঙ্গিয়া ফেল। তুমি না পার, আমিই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি।”

এই বলিয়া কুঞ্জবিহারী গৃহের ইতস্তত চঞ্চলদৃষ্টি ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন; একটা তাকের উপর তবলা-ঠোকা একটী হাতুড়ী ছিল, সেইটী হাতে করিয়া লইলেন। যে সিন্দুকটী ভাঙ্গিবার কথা, সে সিন্দুকে গা-চাবী ছিল না, শিকল দিয়া তালা বন্ধ করা ছিল। দুই তিন আঘাতেই কুঞ্জবিহারী সেই শিকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, গহনার বাক্সটী বাহির করা হইল, রঙ্গিণীর দুইপ্রস্থ পোষাক সেই সিন্দুকে ছিল, তাহাও বাহির করা হইল, রঙ্গিণী কিন্তু পোষাক পরিলেন না, একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। বাক্স ও বস্ত্রাদি লইয়া কুঞ্জবিহারী একটু দূরে দূরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন সন্ধ্যার আবরণ পড়িয়াছিল। রাস্তা দিয়া দুই চারিজন লোক চলিতেছিল, অন্ধকারে কে কোথায় যায়, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কে কাহার খবর রাখে? কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? বিহঙ্গিনী উড়িতেছে, কেহই লক্ষ্য করিল না, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী বাবু যাইতেছেন, তাঁহার দিকেও কেহ চাহিল না, নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদের ইষ্টসিদ্ধি হইল। অগ্রে রঙ্গিণী, তাহার পর কুঞ্জবিহারী বজরায় গিয়া উঠিলেন, নোঙ্গর তুলিয়া বদর বদর বলিয়া বজরা খুলিয়া দিল। বিহঙ্গিনী উড়িল।

সে রাত্রে বজরা আর কোথাও লাগিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্নে একটী সহরে গিয়া বজরা পৌঁছিল। কুঞ্জবিহারী ইত্যগ্রে সেই সহরে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাড়ীর দুইখানি ঘর উত্তমরূপে সজ্জিত করা ছিল, রঙ্গিণীকে লইয়া কুঞ্জবিহারী সেই বাড়ীতে উঠিলেন। এ দিকে পূর্ব্ব-রজনীতে যথাসময়ে তারাপদ বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে, সমস্ত দ্বার উদারমুক্ত, বাড়ীতে জন-মানব নাই, ভগ্ন সিন্দুক পড়িয়া আছে, সিন্দুকের মূল্যবান্ জিনিসপত্র সমস্তই গিয়াছে, সমস্তই শূন্যময়। মাথায় হাত

দিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন, আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলেন। আর ভাবিলে কি হইবে? স্বাধীনা বিহঙ্গিনী স্বাধীন বিহঙ্গের সহিত উড়িয়া পলাইয়াছে। তারাপদ যেমন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, নারীগণকে যাঁহারা স্বাধীনতা-প্রদানে নিত্য উন্মত্ত, তাঁহাদের অনেককেই সেইরূপে সংসার অন্ধকার দেখিতে হইবে। এই দৃষ্টান্তটী পাঠ করিয়া তাহা যেন সকলে মনে করিয়া রাখেন।

নবরঙ্গিণীকে লইয়া কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী এক সহরে রহিলেন। থাকিতে থাকিতে পল্লীর গুটীকতক কামিনীর সহিত নবরঙ্গিণীর আলাপ-পরিচয় হইল। পল্লীবাসিনী কামিনী অপেক্ষা নগরবাসিনী কামিনীদের বিলাসবাসনা এবং স্বাধীনতা-কামনা কিছু অধিক হয়। নগরবাসিনীরা পাড়া বেড়াইতে পায় না, হাওয়া খাইতে পায় না, অপর কাহারও বাড়ীতে গিয়া গল্প করিবার অবসর পায় না, প্রায়ই তাহাদিগকে পিঞ্জরের বিহঙ্গিনার মত সর্ব্বদা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিতে হয়; সেই কারণেই স্বাধীন হইবার জন্য তাহাদের প্রাণ চায়। নবরঙ্গিণী সেই দলের কতকগুলি যুবতীকে লইয়া আপনাদের বাড়ীতে একটী সভা করিলেন। কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী সেই সভায় উৎসাহ দিলেন, যাহাদিগকে লইয়া সভা করা হইল, তাহারা তাহাদের গুরুজনের ভয় রাখিত না; পতিগণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নাটক নভেল প্রভৃতি যে সকল পুস্তক পাঠ করিলে স্বাধীন প্রেমে অভিলাষ বাড়ে, সেই সকল পুস্তক তাহাদের অঙ্গ-ভূষণের মধ্যে গণ্য ছিল। নগরে নবরঙ্গিণী আসিয়াছেন, তিনি বিদ্যাবতী, নারী-হিতৈষিণী, নব সভ্যতার পক্ষপাতিনী, স্বাধীনতার ধ্বজাধারিণী, তাঁহার তুল্য গুণবতী হইবার বাসনায়, তাঁহার মতাবলম্বিনী কামিনীগণ ঐ সকল কথা তাঁহাদের স্বামীগণের নিকটে গল্প করিল, একটী সভা হইতেছে, সেই সভায় তাঁহারা যাইতে ইচ্ছা করে, এ কথাও স্বামীগণকে জানাইল, স্বামীরাও অনুমতি দিলেন।

শনিবারে শনিবারে সভা হয়; সভার নাম ঘোম্‌টা-নিবারিণী সভা। কতিপয় যুবক ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা সহরে একটী চাদর-নিবারিণী সভা করিয়াছিলেন, নগরবাসী যুবক অপেক্ষা মফস্বলের যুবকের সংখ্যা সেই সভায় অধিক ছিল। সভ্যেরা দিনকতক বিনা চাদরে বিচরণ করিয়া বেড়াইলেন, তাহার পর দিনকতক সরু সরু চাদরগুলি পাকাইয়া, ছোট ছোট পদ্মফুলের মতন করিয়া বুক-পকেটে রাখিতে লাগিলেন, তাহার পর আবার ঐ চাদরগুলি লম্বা করিয়া

পাকাইয়া পাকাইয়া, মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগীরা যেমন করিয়া কাচা গলায় দেয়, দিনকতক সেই রকমে সাজিতে আরম্ভ করিলেন। সভা ভাঙ্গিয়া গেল। নবরঙ্গিণীর ঘোম্‌টা-নিবারিণী সভার পরিণাম সেই রকম হইবে কি না, সভা করিবার সময় সেটী বিবেচনা করা হইল না। নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য চলিতে লাগিল।

একদিনের অধিবেশনে কুঞ্জবিহারী সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমেই নবরঙ্গিণীর বক্তৃতা। সভাস্থ ভগিনীগণকে সম্বোধন করিয়া নবরঙ্গিণী বলিলেন, "রমণীগণের মুখের সৌন্দর্য্যই সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। চন্দ্রমুখ, পদ্মমুখ এই দুটী কথা বলিলে, কেবল স্ত্রীলোকের মুখ আর শিশুর মুখ বুঝায়। সূর্য্যমুখ, অগ্নিমুখ অথবা ব্যাঘ্রমুখ বলিলে, সে সকল মুখ দেখিবার জন্য কাহারও আগ্রহ জন্মিত না, তাপে অথবা ত্রাসে সে সকল মুখের দিকে কেহ চাহিতেও পারিত না। চন্দ্রমুখ আর পদ্মমুখ সকলেই দেখিতে অভিলাষ করে। যাহারা দেখে, তাহাদের নয়ন জুড়ায়, মন প্রফুল্ল হয়। সুন্দর সুন্দর শিশুর মুখ দর্শন করিয়া লোকের মনে কত আনন্দ জন্মে, লোকেরাই তাহা বুঝিতে পারে, সকলেই তাহা স্বীকার করে। আমরা কেন তবে আমাদের মুখগুলি বড় বড় ঘোম্‌টা দিয়া ঢাকিয়া রাখি; যে মুখ লোকে দেখিতে চায়, যে মুখ দেখিলে লোকের আনন্দ হয়, বিধাতার অনুগ্রহে সেই মুখ আমরা পাইয়াছি। ঘোম্‌টায় লুকাইয়া রাখিয়া কেন আমরা সেই মুখের গৌরব নষ্ট করি? সকলকে আমরা আমাদের মুখগুলি কেন না দেখাই?"

কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী সোৎসাহে অগ্রে প্রশংসা করিয়া করতালি দিলেন। শৃগালের কলরবের ন্যায় সভা-কামিনীরা সেই ধুয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিয়া ঘন ঘন করতালি দিলেন। নবরঙ্গিণী আবার বলিতে লাগিলেন :—

"সকলকে আমরা মুখ দেখাই না, যাঁহাদিগকে দেখাইলে কোন দোষের কারণ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে না, তাঁহাদের কাছেই আমরা আরও অধিক লজ্জা জানাইয়া মুখ ঢাকি। পিতৃতুল্য শ্বশুর, ভাসুর, মামা-শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনেরা আমাদের মুখ দেখিতে পান না, কিন্তু যাহাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই অথবা যাহারা তামাসার সম্পর্ক ধরে, তাহারা স্বচ্ছন্দে আমাদের মুখদর্শন করিয়া রহস্যালাপ করিয়া থাকে। ভগিনীপতি সম্পর্ক, দেবর সম্পর্ক, পাড়ার জামাই সম্পর্ক জানাইয়া যত যুবাপুরুষ গৃহস্থ-ভবনে

আগমন করে, গৃহস্থ কুলবধূরা তাহাদিগকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না, একটুকু মাথামাথি থাকিলে বেশ হাসিখুসী করিয়া তাহাদের সঙ্গে রসিকতা করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ছুতোর-মিস্ত্রী, রাজ-মিস্ত্রী, রং-রাজ, স্বর্ণকার, রজক, বেহারা, নাপিত, এমন কি, ষণ্ডা ষণ্ডা ফিরিওয়ালা পর্য্যন্ত অবধি অন্দরে যায়, অবাধে কুলবধূগণ তাহাদের সম্মুখে ঘোমটা খুলিয়া কত কথা কহে, কত রকম কচাল করে, জিনিসের দর-দস্তুর করে, লজ্জা তখন তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না, দেয়ও না, কেবল সাধুলোক দেখিলেই বধূগণের নিকটে লজ্জা অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে। ভাল বস্তু লুকাইয়া রাখিলে স্বভাবের অমর্য্যাদা করা হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পদ্মফুল, গোলাপফুল এবং পারিমলময় অপরাপর সুন্দর সুন্দর ফুল সকলেই দেখতে পায়, সকলের দেখিবার নিমিত্ত যে সকল বস্তুর সৃষ্টি, সে সকল বস্তু লুকাইয়া রাখা সৃষ্টি-কর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। অতএব আমরা ঘোমটা রাখিব না। ঘোমটা রাখিলে অনেক লোকের আশা বিফল করা হয়, সুন্দরীগণের সুন্দর বদন দর্শনে যাহারা অভিলাষ রাখে, তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয়, অতএব আমরা এ কুপ্রথার উন্মূলন করিব।"

পুনরায় শোভান্তরী বর্ষিত হইল। সকলে সমবেত বাক্যে ঐ বাক্যে সায় দিলেন। যাঁহাদের মস্তকে অল্প অল্প আবরণ ছিল, তাঁহারা ব্যগ্র-হস্তে সেই সকল আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। অনেকগুলি কুসুম-শোভিত কবরী প্রকাশিত হইল; সভা-সরোবরে কতকগুলি কামিনী-বদন যেন শরতের পদ্মফুলের ন্যায় বিকসিত হইল। শোভা চমৎকার। যাঁহারা সভায় আসিয়া-ছিলেন, তাঁহারা আর কেহ ঘোমটা দিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

দুই বৎসরকাল কুঞ্জবিহারীর সহিত নবরঙ্গিণী সেই সহরে বাস করিলেন; যাহাতে নারীজাতির উপকার ও উন্নতি হয়, সেই সকল বিষয়ে অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, এক এক বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঘোমটা-নিবারিণী সভার ন্যায় নবরঙ্গিণী আর একটী সভা করিলেন। সে সভার নাম স্বাধীনতা-প্রদায়িনী সভা। সে সভায় স্ত্রীপুরুষ একত্র সমবেত হইতেন। স্ত্রীলোকেরা

স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবার অধিকারিণী, নানা যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া নবরঙ্গিণী এক অধিবেশনে এক বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতার খণ্ডনার্থ প্রতিবাদ হয়। একটী বাবু প্রতিবাদ করেন, বাবুর নাম রত্নেশ্বর চম্পটী। তিনি একজন জমীদার, লেখাপড়া কিছু অল্প জানেন, ধর্ম্মের মর্য্যাদাও অল্প রাখেন, গুণের মধ্যে বাক্‌-পটুতা বিলক্ষণ। নবরঙ্গিণীর যুক্তিগুলির প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা কি রকম স্বাধীনতা চাও ? হিন্দু-সংসারের রমণীগণের কোন্ বিষয়ে স্বাধীনতা নাই ? হিন্দু-সংসারের রমণীগণ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; তাঁহারা হাতে করিয়া যাহাকে যাহা দেন, সেই তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরিতোষ লাভ করে। রমণীগণ পুরুষগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট রাখেন। বুদ্ধিমান্ কর্ত্তারা বুদ্ধিমতী নারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সংসারের অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পাঁচটী রমণী একত্র হইয়া গঙ্গা-স্নান করিতে যান। গঙ্গা অধিক দূরবর্ত্তিনী হইলেও ঢাল-তরবারিধারী প্রহরীরা রমণীগণকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্গে যায় না, একজন পুরুষ অভিভাবকও সঙ্গে থাকে না। দূরে, নিকটে কোন বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া থাকেন। সহরে বরং শিবিকারোহণে যাইবার পদ্ধতি আছে, পল্লী-গ্রামে সে পদ্ধতি নাই। যুবতী কুলবধূরা পর্য্যন্ত পদব্রজে এক পাড়া হইতে অন্যপাড়ার নিমন্ত্রণে যান। সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রার আবশ্যক হইলে পুরুষ অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে স্ত্রীলোকেরা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। কেহ তাহাতে বাধাও দেয় না, নিষেধও করে না। তবে অধীনতা অধীনতা বলিয়া আজকাল তোমরা যে উচ্চচীৎকার আরম্ভ করিয়াছ, তাহার হেতু কি ? কি প্রকার স্বাধীনতা তোমরা চাও ? হাট, বাজারে, মেলাস্থলে চরিয়া বেড়াইবে, পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমানন্দে বাক্যালাপ করিবে, পরপুরুষের সহিত প্রেমানন্দে উদ্যানবিহারে যাইবে, সাহেবলোকের আপিসে আপিসে চাকরী করিবে, লাট-সাহেবের লেভি-সভায়, দরবার-সভায় উপস্থিত হইবে, বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া, সুগন্ধি মাখিয়া, স্বর্ণরজতের উষ্ণানমণ্ডিত কবরী দেখাইয়া, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সহরের রাজপথ বহিয়া ভজনালয়ে প্রবেশ করিবে, সেই অধিকার পাইলেই কি তোমরা সন্তুষ্ট থাক ? স্ত্রীজাতির ঐরূপ স্বাধীনতায় সতীত্বের কতদূর

ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহা কি তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ? সর্ব্বদা বহু পুরুষ-সঙ্গে একত্র বাস, যাত্রোৎসবে গমন, স্বামীর সহিত কলহ, ব্যাঁকা হইয়া বহু পুরুষের সম্মুখে উচ্চহাস্য ইত্যাদি হেতুতে সতী নারীর চিত্ত বিচলিত হয়, ইহা শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রবাক্য অমান্য করিয়া তোমরা পুরুষের উপর টেক্কা দিতে চাও, তাহাতে গৃহস্থ-সংসার অনেক প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে, তাহা তোমরা নূতন উৎসাহে ভাবিতে পার না। পুরুষের অধিকার স্ত্রীজাতির অধিকার চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সেই অধিকার উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকারপ্রবেশে—অনধিকারচর্চ্চায় তোমাদের মতি ফিরিতেছে, সে মতিকে কুমতি বলিয়া বুঝিয়া লও। এখন যেরূপ স্বাধীন আছ, তাহার অধিক স্বাধীনতা লইবার আশা পরিত্যাগ কর। সংসারে এখন শান্তি আছে, তোমরা উচ্চ-স্বাধীনতা পাইলে সে শান্তি পলায়ন করিবে, ভারতের সতীত্বগৌরব কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তোমাদের উচ্চ আশার অঙ্কুরে সেই লক্ষণ অল্প অল্প দৃষ্ট হইতেছে। তোমরা সর্ব্বমঙ্গলা। তোমরা সৎপথে থাক বলিয়া সংসারের মঙ্গল হয়। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া তোমরা যদি উড়িয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কর, হিন্দু-সংসার অমঙ্গলের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, এই কথা তোমরা স্মরণ রাখিও। তোমাদের মধ্যে যাহারা অহঙ্কারে উন্মত্ত, নিজের বুদ্ধি বড় বলিয়া যাহাদের ঘোর অভিমান জন্মিয়াছে, হিতকথা বলিলে তাহারা বিপরীত বুঝিবে, আপনাদের মঙ্গল আপনারা বুঝিবে না, ইহাই সর্ব্বনাশের হেতু হইতেছে।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নবরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, “দেখ নব-রঙ্গিণি! তুমি বিদ্যাবতী হইয়াছ, তোমার অনেক গুণের কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি। গুণের অপব্যবহার যদি তুমি না কর, চিরদিন সুখে থাকিতে পারিবে, পতিকেও সুখী করিতে পারিবে। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি এক একদিন আসিয়া তোমাকে আমাদের শাস্ত্রকথা বুঝাইয়া দিতে পারি।”

নবরঙ্গিণী এক সময়ে চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এখন লাহিড়ী হইয়াছেন। যে সহরে তাঁহারা এখন আছেন, সে সহরের লোকেরা সে পূর্ব্বতত্ত্ব জানে না। তাহারা জানে, নবরঙ্গিণী কুঞ্জবিহারী লাহিড়ীর বিবাহিতা পত্নী। বস্তুতঃ কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী অতি সাবধানেই নবরঙ্গিণীকে এই নূতন সহরে রাখিয়াছেন, স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় বাস করিতেছেন। ব্যবহার দেখিয়া লোকে কোন বিরুদ্ধ ভাব মনে আনিতে

পারে না। স্বাধীনতাপ্রদায়িনী সভায় যখন বক্তৃতা হয়, তখন কুঞ্জবিহারী উপস্থিত ছিলেন। রত্নেশ্বরবাবু নবরঙ্গিণীকে শাস্ত্রকথা বুঝাইবেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দ হইল; আহ্লাদ পূর্ব্বক তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন। রত্নেশ্বরবাবু কুঞ্জবিহারীর বন্ধু, এ কথা এখানে প্রকাশ থাকুক।

শাস্ত্রের উপদেশ শুনাইবার নিমিত্ত রত্নেশ্বরবাবু প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া নবরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। একঘণ্টা কাল উভয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। নবরঙ্গিণী স্বাধীন জেনানা, তাঁহার তর্ক নারী-স্বাধীনতার অনুকূলে, রত্নেশ্বরের তর্ক তৎপ্রতিকূলে। কেবল যে সেই তর্কই হয়, কেবল সেইরূপ উপদেশ দেওয়াই যে রত্নেশ্বরের সঙ্কল্প, তাহা মনে করিতে হইবে না; যুবতী স্বাধীনা কুলাঙ্গনার সহিত প্রেমালাপ করিতেও রত্নেশ্বরের আনন্দ হইত। নবরঙ্গিণী সুন্দরী, বিদুষী, তাঁহার নয়নের কটাক্ষভঙ্গী অতি সুন্দর; তাঁহার তর্কের বাক্যগুলিও অতি মধুর; রত্নেশ্বরবাবু বাস্তবিক তর্কে ঠকিলেন না, কিন্তু ঠকিবার সাধ হইল, ছয়মাস যুদ্ধ করিয়া রঙ্গিণীর নাগপাশে বাঁধা পড়িলেন, ইচ্ছা করিয়াই ঠকিলেন।

আসিবার নিয়ম হইয়াছিল সপ্তাহে দুই দিন; ক্রমে ক্রমে সে নিয়ম উল্টাইয়া গেল। রঙ্গিণীর ইচ্ছাতে রত্নেশ্বর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দর্শন দিতে লাগিলেন। রঙ্গিণীর ইচ্ছা বলা হইল, কিন্তু রত্নেশ্বরের ইচ্ছাও সেই ইচ্ছার সহচরী। দুইজনে বেশ মিল হইল। দু-দিন পাঁচদিন কথার কৌশলে একটু একটু মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া শেষে একদিন রত্নেশ্বর বলিলেন, "রঙ্গিণি! এখানে কি তুমি অক্ষুণ্ণ মনের সুখে আছ? স্বাধীনতার তর্কে তোমার কাছে আমি পরাস্ত হইয়াছি, নারীজাতির স্বাধীনতা থাকা ভাল, এতদিনের পর তাহা আমি বুঝিয়াছি। তুমি স্বাধীনা, তাহার পরিচয় তুমি কি দেখাইতেছ? মুখে কেবল স্বাধীনতার গৌরব করিলে স্বাধীনতার মানরক্ষা হয় না, কার্য্যে দেখাইতে হয়। কার্য্যের মধ্যে দেখিতেছি, তুমি ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়াছ, আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, অথচ স্বচ্ছন্দে হাসিয়া হাসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছ, ঘোম্‌টা-নিবারিণী সভা করিয়াছ, স্বাধীনতা-প্রদায়িনী সভা করিয়াছ, এই পর্য্যন্তই পরিচয় দিয়াছ; আসল পরিচয় কিছুই দিতে পার নাই।"

রঙ্গিণী। কেন পারি নাই?

রত্ন। কি পারিয়াছ? কুঞ্জবিহারীর অধীন হইয়া রহিয়াছ, তাহাতে কি স্বাধীনতার সুখলাভ হয়?

রঙ্গিণী। (হাস্য করিয়া) তবে ত তুমি সকল কথাই জান। আমি কি কুঞ্জবিহারীর অধীন? কুঞ্জবিহারীই বরং আমার গোলাম হইয়া আছে।

রত্ন। (সবিস্ময়ে) গোলাম! ও বাবা! তবে ত তুমি নবাব-সাহেবের বেগম আছ!

রঙ্গিণী। (হাস্য করিয়া) যাহা বল, তাহাই আমি।

রত্ন। (চিন্তা করিয়া) যাহা বলি, তাহাই তুমি?

রঙ্গিণী। আমি ত তাহাই মনে করি।

রত্ন। আমাকে তুমি কি রকম মনে কর?

রঙ্গিণী। তোমাকে আমি মনে করি, একজন জমীদার, অনেক টাকার মালিক, দিব্য সুরসিক।

রত্ন। কেবল ঐ পর্য্যন্ত সুপারিস? আর কি কোন গুণের আমি অধিকারী নহি?

রঙ্গিণী। গুণের কথা আমি কি বুঝিব? আমি স্ত্রীলোক, পুরুষের গুণ-পরীক্ষা করা আমার সাধ্য নহে, তবে তুমি যখন আমাকে অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তুমি একটী প্রেম-রাজ্যের অধিকারী।

রত্ন। (পুলকিত হইয়া) কাহার প্রেম-রাজ্য?

রঙ্গিণী। যাহাদের রাজ্য থাকে, তাহারাই রাজ্যের কথা বলিতে পারে।

রত্ন। তোমার কি প্রেম-রাজ্য নাই?

রঙ্গিণী। থাকিতে পারে, কিন্তু সে রাজ্যের অধিকারী কে, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

রত্ন। কেন?—কুঞ্জবিহারী?

রঙ্গিণী। কুঞ্জবিহারীকে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

এই কথার পর রত্নেশ্বর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নিস্তব্ধ-নয়নে নবরঙ্গিণীর নৃত্যশীল নয়ন দুটী নিরীক্ষণ করিলেন। নবরঙ্গিণীও নীরবে রত্নেশ্বরের

মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপ নির্ব্বাক্-অভিনয়ান্তে কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঞ্জবিহারীর অধিকারে তবে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?"

বিকসিত-নেত্রে চাহিয়া রঙ্গিণী বলিলেন, "তুমি আমার কথার অর্থ বুঝিতে পার নাই। কুঞ্জবিহারীর অধিকার নহে, আমার অধিকার। কুঞ্জবিহারী আমাকে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছে, সেই মর্য্যাদাতেই আমি এখানে আছি; স্বাধীনতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এতদিন কবে শিক্‌লি কাটিয়া উড়িয়া যাইতাম।"

মৃদুহাস্য করিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন, "বাহবা বাহবা! নবরঙ্গিণী বিহঙ্গিনি! সত্যই কি তবে তুমি উড়িয়া যাইতে জান?"

রঙ্গিণী বলিলেন, "কোন্ বিহঙ্গিনী উড়িতে না জানে? আকাশ আমাদের প্রশস্ত ক্ষেত্র, আকাশপথে উড়িতে কেহই বাধা দেয় না, বাধা দিতে পারেও না; ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?"

রত্নেশ্বর বলিলেন, "এইমাত্র তুমি বলিয়াছ, তোমার প্রেমরাজ্য আছে; সংসারে প্রেমরাজ্য বড় ভারী; সে রাজ্য লইয়া একাকিনী কি প্রকারে আকাশ-পথে উড়িবে?"

রঙ্গিণী বলিলেন, "আকাশপথেও দণ্ডধর পাওয়া যায়, সেই দণ্ডধর আমার সহায় হইতে পারিবে।"

অবসর বুঝিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন, "আমি যদি তোমার প্রেমরাজ্য আমার করিয়া লই, তাহা হইলে কি আমাকে সঙ্গে লইয়া তুমি উড়িতে পার?"

রঙ্গিণী চমকিয়া উঠিলেন; বিস্ফারিত-নয়নে রত্নেশ্বরের নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মৌনভাব দর্শন করিয়া রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবাক্ হইয়া রহিলে যে? আমি তোমার প্রেমরাজ্যের বাহন, এ কথা কি তোমার মনঃপূত হইল না?"

চক্ষু নাচাইয়া, স্বর কাঁপাইয়া রঙ্গিণী উত্তর করিলেন, "দুটী ভার বহন করা একজনের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, এমন আমি বুঝি না। তুমি বলিয়াছ, তোমার একটী প্রেমরাজ্য আছে, সে রাজ্যের চালক, পালক, বাহক তুমি। তাহার উপর আর একটা রাজ্য চাপাইয়া দিলে তুমি অশক্ত হইয়া পড়িবে, দুটী রাজ্যই লণ্ডভণ্ড হইবে, তোমার কথা শুনিয়া আমার সেই ভয় হইতেছে।"

গম্ভীরবচনে রত্নেশ্বর কহিলেন, "রঙ্গিণি! আপনার কথায় তুমি আপনিই ধরা পড়িতেছ। একটু পূর্ব্বে আমাকেই তুমি বলিয়াছিলে, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই; আমি এখন তোমাকেও বলিতেছি, তুমি আমার কথা বুঝিতে পার নাই। আমার প্রেমরাজ্য আমার বক্ষোমূলে স্থাপিত, আমিই সে রাজ্যের অধিকারী, আমার রাজ্যের অংশী কেহই নাই। তুমি বলিয়াছ, কুঞ্জবিহারীর অধিকার কিছুই নয়, সমস্তই তোমার নিজের অধিকার; সে অধিকারের আর একটী অধিকারী তুমি কি মনোনীত করিয়া লইতে ইচ্ছা রাখ না?"

তাঁহাদের এই সকল কথা যখন হইতেছিল, কুঞ্জবিহারী তখন গৃহে ছিলেন না, তিনি সেখানকার আদালতের একজন উকীল, আদালতের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার একজন মক্কেলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন; রঙ্গিণীর কাছে মনের কথা প্রকাশ করিবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া রত্নেশ্বর অবাধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সুচতুরা নবরঙ্গিণী আর কিছু শুনিবার জন্য একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "স্পষ্ট করিয়া বল। সকল কথায় হেঁয়ালী রাখিলে মূর্খ স্ত্রীজাতির বুঝিবার বড় কষ্ট হয়।"

সুচতুরা রঙ্গিণী রত্নেশ্বরের কথাগুলি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রত্নেশ্বর তাহা বুঝিয়াও একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "তোমাতে আমাতে কথা, তুমি স্বাধীনা, আমি স্বাধীন, এ ক্ষেত্রে হেঁয়ালী রাখিবার কোন হেতু উপস্থিত নাই; একটী কথাতেও আমি হেঁয়ালী রাখিতেছি না, তোমার প্রেমরাজ্যের অধিকারিণী তুমি, তোমার মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি; তাই বলিতেছি, তুমি যদি আমার প্রেমরাজ্যের ভার লাঘব করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকেই সেই রাজ্যের অধিকারী করিয়া রাখিব, কুঞ্জবিহারীকে তুমি ভালবাস না, তোমার প্রত্যেক কথার ভাবে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সংসারে রমণীজাতি পবিত্র ভালবাসার আধার, সে ভালবাসা যাহারা প্রাপ্ত হয়, তাহারা ধন্য, তাহারা ভাগ্যবান্, সেই কারণে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সমস্তই তোমার নিজের অধিকার; সে অধিকারে আর একটী অধিকারী মনোনীত করিয়া লইতে তুমি কি ইচ্ছা রাখ না?"

কুঞ্জবিহারী একজন উকীল, তাঁহার দশ টাকা রোজগার আছে, তথাপি রঙ্গিণীর গহনাগুলির উপর আক্রমণ করিতেছিলেন। রত্নেশ্বরবাবু কুঞ্জবিহারীর

যশু, রত্নেশ্বরবাবু জমীদার, রত্নেশ্বরবাবু রঙ্গিণীকে প্রেমরাজ্যের ঈশ্বরী করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন, উপরি-উক্ত প্রশ্ন সেই অঙ্গীকারের পোষক, স্পষ্ট ইহা বুঝিতে পারিয়া রঙ্গিণী উত্তর করিলেন, "পাখী উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেহ ধরিলে তাহার আর উড়িয়া যাইবার ক্ষমতা থাকে না। আপনি আমাকে রাজ্যেশ্বরী করিতে চাহিতেছেন, এ রাজ্যেশ্বরী হইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না। স্বাধীনতাই আমার রাজ্য, সেই রাজ্যের আমি রাণী। আপনি যদি আমার সেই রাজ্য হরণ করিতে অভিলাষী না হন, তাহা হইলে——"

রঙ্গিণীকে আর অধিক বলিতে হইল না। আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন, "স্বাধীনতা-হরণে যদি আমার অভিলাষ থাকিবে, তাহা হইলে তোমাকে আমি আমার প্রেমরাজ্যের অধিকারদানে রাজী হইব কেন? আমিই তোমার অধীন হইয়া থাকিব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এখনকার কথা হইতেছে যে, কুঞ্জবিহারীকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি না?"

মৃদু হাসিয়া রঙ্গিণী বলিলেন, "আপনারা জানেন না, কুঞ্জবিহারী আমার বিবাহ করা নায়ক নহে, কুঞ্জবিহারী আমাকে নানা রকম লোভ দেখাইয়া এইখানে আনিয়া রাখিয়াছে। তাহার কথায় আমি ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু সে এখন কথা রাখিতে পারিতেছে না। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ভবিষ্যতের সংস্থান। আমার অলঙ্কারগুলি কুঞ্জবিহারী বাহির করিয়া লইতেছে। অলঙ্কারের মূল্য অনেক। ক্রমে ক্রমে কুঞ্জবিহারী তাহা আধা-আধি করিয়াছে; নিজে ওকালতী করিয়া যাহা পায়, আমি বোধ করি, তাহা আর কোথাও পাঠাইয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় দিন দিন কুঞ্জ আমাকে পথের ভিখারিণী করিবে, সেই লক্ষণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকে——"

সর্ব্বটুকু না শুনিয়াই রত্নেশ্বর বলিলেন, "আর কোথাও পাঠাইয়া দেয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যেখানে তাহার বেশী টান, সেইখানেই সব টাকা যায়। আমি মনে করিতাম, তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছ; এখন জানিলাম, তাহা নহে। এই সহরে কুঞ্জবিহারীর রঙ্গস্থল প্রায় পাঁচ সাতটী; তাহার মধ্যে একটী স্থলেই তাহার প্রাণের অভিনয়। সেইখানেই সব টাকাগুলি যায়। তোমার গহনাগুলিও কুঞ্জবিহারী নষ্ট করে নাই, সেই অভিনয়ের নায়িকাকে সেইগুলি দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে, ইহা আমি বেশ জানি।"

অন্তরে আঘাত লাগিল। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-প্রেম চটিয়া গেল। নবরঙ্গিণী সেই প্রথম ভালবাসা ভুলিল। রত্নেশ্বরের হস্তধারণ করিয়া প্রেমকটাক্ষে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আজিই তবে আপনি আমাকে লইয়া চলুন। কুঞ্জবিহারী নিমন্ত্রণে গিয়াছে, সেটা বোধ হয় ছল। আপনি যাহার কথা বলিলেন, তাহার নিকটেই রাসলীলা করিতেছে, আজ আর এখানে আসিবে না, আজ আপনি আমাকে লইয়া চলুন। যে কয়খানি অলঙ্কার এখনও আমার সম্বল আছে, পলায়ন না করিলে তাহাও আর বেশী দিন থাকিবে না। এ রাত্রি যেন এখানে না পোহায়; এই রাত্রেই আপনি আমাকে লইয়া চলুন।

রত্নেশ্বরের মহা রত্নলাভ হইল। প্রেম-কৌশলে তিনি রঙ্গিণীকে হস্তগত করিলেন। রঙ্গিণী আপনার অবশিষ্ট গহনাগুলি লইয়া রত্নেশ্বরের সহিত উঠিয়া বাহির হইল। বাহিরে আর থাকিল না, এককালীন কলিকাতায়। মফস্বলের জমীদারগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় দুই একখানি বাড়ী রাখেন, রত্নেশ্বরেরও একখানি বাড়ী ছিল। রঙ্গিণীকে লইয়া তিনি সেই বাড়ীতে উঠিলেন। বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বদা চাবী বদ্ধ থাকিত, কিন্তু আসবাবপত্রাদি স্থানান্তর করা হইত না। একজন চাকর মধ্যে মধ্যে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে দিয়া সুব্যবস্থা করিয়া রাখিত। একটু দূরে একখানা খোলার ঘরে একটা উপপত্নী লইয়া সেই চাকর বাস করিত। বাবু এখন বাড়ীতে আসেন নাই, চাকরকে বাড়ীতেই থাকিতে হইল, একজন চাকরাণী প্রয়োজন হইল; চাকরের সেই উপপত্নী আসিয়া চাকরাণী হইল, একজন পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল, দেউড়ীতে দুইজন দরোয়ান বসিল। বিনা প্রয়োজনে অপরলোকের সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশের অধিকার থাকিল না।

নারী-স্বাধীনতার অনেক রকম ফল আছে, তাহার মধ্যে এই একরকম ফল। নারীগণ সৎপথে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বাধীনতা লয় না, স্বাধীনতা চাহেও না, পুরুষেরা প্রশ্রয়দান করিলে স্বাধীনতার সঙ্গে আরও অনেকপ্রকার উপসর্গ আসিয়া একত্র হয়। নারীগণের ব্যভিচার, তাহাও পুরুষের উত্তেজনার ফল। দুশ্চরিত্র পুরুষ মোহনমন্ত্রে ভুলাইয়া না লইলে, পিঞ্জরবাসিনী বঙ্গাঙ্গনা কখনই গৃহত্যাগিনী হয় না, যাঁহাদের বিবেচনা শক্তি আছে, তাঁহারা এই বিষয়

বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই উদাহরণটীও বহু উদাহরণের মধ্যে গ্রথিত করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

নবরঙ্গিণী কলিকাতায় আসিয়া রহিল। কুঞ্জবিহারী একরকমে ভাসিয়া গেল। রত্নেশ্বর আবার পুরাতন হইয়া আসিলেন, নবরঙ্গিণীর প্রেমরত্ন আবার পর্য্যায়ক্রমে অপরাপর রত্নেশ্বরের অধিকারে আসিল। চল্লিশ বৎসর বয়সে নবরঙ্গিণী মরিল। লোকে বলাবলি করিল, রঙ্গিণীবিরহে তিনটী লোক পাগল হইয়া গিয়াছে; আরও অনেকগুলি লোক অর্দ্ধ-উন্মত্ত হইয়া অপরাপর আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছে। যে তিনটী প্রকৃত পাগল, তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখা উচিত। তারাপদ, কুঞ্জবিহারী আর রত্নেশ্বর।

নবম তরঙ্গ।

পঞ্চ-কুলবধূ।

"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এ কথাটা এ দেশে অনেক দিন অবধি প্রচলিত আছে। কথামত কার্য্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমরা অধিক দেখি নাই; দেখিয়াছি বরং বহু ভ্রাতা এক সংসারে বাস করিয়া দিব্য সদ্ভাবে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া, দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। দেশে ইংরেজী সভ্যতা প্রবেশ করাতে সেই পুরাতন কথাটা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। যাহাদের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে, তাহারাই বাঁটোয়ারা বাঁটোয়ারা করিয়া উন্মত্ত। মফস্বল অপেক্ষা কলিকাতা সহরে বাঁটোয়ারা কিছু বেশী ধূম। এক একখানা প্রাচীন বাড়ীতে কত দরজা বসিয়াছে, প্রত্যেক দরজার মাথায় মিউনিসিপালটীর নম্বরের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহারা চাহিয়া দেখেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। দেখিলে কেবল অন্তঃকরণে কষ্টের উদয় হয়।

এক একখানি বাড়ীতে তিন ঘরে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাড়ীতে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা বাঁটোয়ারা করিয়া লন নাই, সদরদরজা একটা মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের রন্ধন-ভোজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। হয় তো পরস্পর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ। বঙ্গদেশে হিন্দু-পরিবারে এমন সংসার যে কত অসুখের, তাহা বলিয়া লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

অনেকেই বলেন, ভাই ভাই পৃথক হওয়া প্রথাটা আজকাল স্ত্রীলোকেরাই জাগাইয়া তুলিয়াছে। ভ্রাতৃগণের যত দিন বিবাহ না হয়, তত দিন মাতা-পিতার অধীনে, মাতা-পিতার বাধ্য হইয়া, তাঁহারা একসঙ্গে সুখে বাস

করেন। একান্নভুক্ত পরিবার দর্শন করিলে আনন্দের উদয় হয়। তবে যেখানে একজন মাত্র অর্জ্জক, অবশিষ্ট দশ জন অলস, স্ত্রীলোকের ন্যায় অবশ্য পোষ্য, সেখানে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই অধিক অধিকার। দশ জনে যদি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া এক সংসারে সদ্ভাব রাখিয়া বাস করিতে পারেন, কেহ কাহারও গলগ্রহ না হন, তাহা হইলেই সংসারগুলি শান্তিময় হয়। এখনকার দিনে ভ্রাতৃগণের বিবাহ হইলে প্রায়ই সে শান্তি আর থাকে না, পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের সংসারে শ্বশ্রূননদিনীর কর্তৃত্ব থাকিত, এখন অনেক সংসারে তাঁহারা যেন দাসী, বধূগণেরই প্রায় একচেটে আধিপত্য। অনেকেই বলেন, "এখনকার বধূরা ঘর ভাঙ্গিবার গুরু; এই কারণে তাঁহাদের উপনাম শয্যা-গুরু।"

কথার কথা বলিতে হয়, সেই জন্যই লোকে বলে, এমন মনে করিতে নাই। কার্য্য যেরূপ হইতেছে, সকলে যেরূপ দেখিতেছেন, তাহাতে ঐ কথার খণ্ডন করা বড়ই কঠিন। এইখানে আমরা একটী গল্প বলিব। বোধ হইবে যেন গল্প, বাস্তবিক কল্পিত অথবা রচিত গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা। ঘর ভাঙ্গিবার গুরু বলিয়া বধূগণকে নিমিত্তের ভাগিনী করা হয়, কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বধূ অপেক্ষা বধূস্বামীগণকেই মূলাধার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই গল্পটী পাঠ করিয়া, পাঠক-মহাশয়েরা এই অনর্থকর বিষয়ের উত্তম তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী চৈতন্যপুর গ্রাম। সেই গ্রামে প্রভুরাম মিত্র নামে একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র। প্রভুরাম বর্ত্তমানে বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কলাপ হইত, সংসারে শান্তি বিরাজ করিত, গ্রামের সমস্ত লোক প্রভুরামের প্রশংসা করিতেন, সকলেই তাহার বাধ্য ছিল। তাঁহার জমীদারীতে বার্ষিক ন্যূনাধিক দশ সহস্র মুদ্রা আয় হইত। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয়ের দশ বৎসর, তৃতীয়ের আট বৎসর, চতুর্থের ছয় বৎসর, পঞ্চমটীর চারি বৎসর মাত্র। সকলগুলিই নাবালক। তাহাদের জননী সেকালের গৃহিণীদের মত কেবল গৃহকার্য্যেই নিপুণা ছিলেন, লোকজনকে ভোজন করাইতে, ব্যবহারমত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে, সংসারের সুব্যবস্থা করিতে

এবং সকলের আবদার সহ্য করিতে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত, কিন্তু তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি তাদৃশী প্রখরা ছিল না। কর্ত্তা তাহা জানিতেন, সেই কারণে মৃত্যুর অগ্রে তিনি একখানি উইল করিয়া যান। সেই উইলে তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা পীতাম্বর মিত্রকে অছি নিযুক্ত করেন। বালকেরা বয়ঃক্রমপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন, এইরূপ লেখা থাকে। পীতাম্বর মিত্র সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। পাঁচ ছয় বৎসর বিষয়-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া তিনি তাঁহার নিজের উদর পূর্ণ করিতে থাকেন। গোপনে গোপনে কোম্পানীর সদর-মাল-গুজারী বাকী ফেলিয়া দুই খানি জমীদারী লাটবন্দীতে নীলাম করাইয়া বেনামীতে খরিদ করিয়া রাখেন। প্রভুরামের জ্যেষ্ঠ সেই সময় বয়ঃপ্রাপ্ত। পাছে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে, সেই আশঙ্কায় পীতাম্বর অছির কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তীর্থবাসী হইয়া যান।

বাড়ীতে আর মফস্বলে যে সকল আমলা ছিল, তাহাদের দ্বারাই বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পুত্রেরা ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। ক্রমে ক্রমে চারি ভ্রাতার বিবাহ হইল, কনিষ্ঠটী অবিবাহিত রহিল।

জ্যেষ্ঠের নাম অখিলনাথ, দ্বিতীয় নিখিলনাথ, তৃতীয় লক্ষ্মীনাথ, চতুর্থ শিখিনাথ, পঞ্চম সখীনাথ।

পীতাম্বরের প্রতারণায় জমীদারী বিকাইয়া গিয়াছিল; যাহা বাকী ছিল, তাহার আয় কম, কাজে কাজে ভাইগুলিকে চাকরী করিতে হইল। জ্যেষ্ঠের লেখাপড়া কিছু বেশী শিক্ষা হইয়াছিল, তাঁহার বেতন হইল তিনশত টাকা, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ভ্রাতা পঞ্চাশ, চল্লিশ এবং ত্রিশ টাকা বেতনে তিনটী সদাগরী হাউসে চাকরী স্বীকার করিলেন; পঞ্চমটী স্কুলে পড়িতে লাগিল।

পিতা বর্ত্তমানে বাড়ীতে ক্রিয়াকলাপ হইত। বড়বাবু মান-সম্ভ্রমের অনুরোধে সেগুলি বজায় রাখিয়াছিলেন। বিষয়ের আয় হইতে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহার কতকাংশ দুর্গোৎসবে প্রদান করিয়া, তিনি তাঁহার নিজের বেতন হইতে পাঁচ ছয় শত টাকা দিয়া সম্ভবমত সমারোহ করিতেন। তিন বৎসর পরে কনিষ্ঠের বিবাহ হইল। সেটীও তখন বিদ্যালয় ত্যাগ

করিয়া মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে কলিকাতার মিউনিসিপাল আপিসে একটী চাকরী লইল।

চাকরীর অনুরোধে সকলকেই কলিকাতায় বাসা করিতে হইয়াছিল। হপ্তায় হপ্তায় বাড়ী যাইতেন, বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন, প্রতিবাসীগণের সহিত আলাপ রাখিতেন। বড়বাবুর গুণে গ্রামের সকলেই সন্তুষ্ট।

পাঁচটী ভ্রাতায় বিলক্ষণ সদ্ভাব। জ্যেষ্ঠ যখন যাহা বলিতেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া চারিটী ভ্রাতা তাহাতেই সম্মতিদান করিতেন। চারিজনেই জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞাবহ ছিলেন। বধূ পাঁচটিও গৃহলক্ষ্মীরূপিণী, তাঁহাদের পাঁচটীতে গলায় গলায় ভাব। বড়বধূর অবাধ্য হইয়া ছোট চারিটী বধূ কোন কার্য্য করিতেন না। পুত্রেরা সকলেই মাতৃবৎসল, বধূগুলিও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবায় সর্ব্বদা যত্নবতী।

সুখের সংসার কিছুদিন পরমসুখে চলিল। অখিলবাবুর তিনটী পুত্র ও দুটী কন্যা জন্মিল. নিখিলনাথ অপুত্রক, লক্ষ্মীনাথের একটীমাত্র কন্যা, শিখিনাথের একটী মাত্র পুত্র, সখানাথের তখনও সন্তান হয় নাই।

গ্রামে অনেকেই দিন দিন পৃথক্ হইতেছিল। আজ অমুক পৃথক্ হইল, আজ অমুকের ভ্রাতার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল, আজ অমুকের জননী বধূগণের উপদ্রবে গৃহত্যাগিনী হইলেন, নিত্য নিত্য এই প্রকার নূতন নূতন অতুষ্টিকর সংবাদ অখিলনাথের পরিবারমধ্যে আলোচিত হইতে লাগিল। পাড়ার-লোকেরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ পরিবারের বধূগণের দোষকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, "কালের বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীকে মানে না, সকল কার্য্যেই আপনারা কর্ত্তৃত্ব করে, স্বামীগণকে পরামর্শ দিয়া ঘর ভাঙে।" নিত্য নিত্য সকল স্থানেই ঐ কথা। একটী বধূরও প্রশংসা কেহ শুনিতে পান না। অখিলবাবুর সংসারের বধূগুলি ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পান। তাঁহাদের সংসার সুখের সংসার, ভাইগুলিতে যেমন ভাব, বধূগুলিতেও সেইরূপ ভাব। গৃহিণী ঠাকুরাণী সর্ব্ববিষয়েই গৃহিণী, তাঁহার উপদেশে—তাঁহার মতেই সংসার চলে। বধূরা কেহই তাঁহার অমতে কোন কার্য্য করেন না। বিপরীত কথা শুনিয়া শুনিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী মনে মনে বড় উদ্বিগ্ন হন, মন্দ দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহার বধূগুলি পাছে মন্দ হইয়া যায়, সর্ব্বদা

তাঁহার মনে এই ভয়। বধূগুলিও পরের বধূর নিন্দা শুনিয়া মনে বড় কষ্ট পান। সকলেই বলেন, "কালের বৌ বড় খারাপ, বৌ হইলেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়।" শয্যা-গুরুর মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া এখনকার বাবুরাও আর এক সংসারে বাস করিতে চাহেন না। একান্নভুক্ত পরিবারের যে কি সুখ, বধূরা তাহা জানে না, সে সুখভোগ করিলেও তুষ্ট থাকে না, স্বামীগণের কাণে কাণে কুমন্ত্রণা দিয়া সংসারগুলি ছারখার করিয়া দেয়।

ক্রমাগত দুই তিন বৎসর সেই গ্রামের মধ্যে ঐ সকল কথার ভূরি ভূরি আন্দোলন হইতে লাগিল। অখিলবাবুর পত্নী একদিন তাঁহার চারিটী দেবর-পত্নীকে একটী গৃহমধ্যে বসাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তোমরা আমার একটী কথা রাখিবে?" তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "আজ তুমি কেন ও কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছ? কোন্ দিন আমরা তোমার কোন্ কথার অবাধ্য হইয়াছি?"

বড় বৌ বলিলেন, "অবাধ্য হও নাই, তাহা আমি জানি। মায়ের পেটের ভগিনীকে যেমন ভালবাসা যায়, তোমাদের চারিটীকে তার চেয়েও আমি বড় বেশী ভালবাসি। তবে কি জান, আজকাল বধূনিন্দা ঘরে ঘরে। আমরাও ত বধূ, আমাদেরও ঠেস দিয়া দিয়া অনেক লোকে অনেক কথা বলে। সেটার একটা ভঞ্জন করা দরকার। তোমরা এক কর্ম্ম কর, শনিবার রবিবার ঠাকুর-পো-গুলি ঘরে আসেন, ঐ দুই রাত্রে তোমরা তাঁদের কাছে অভিমান জানাইয়া বলিও, এ সংসারে আসিয়া আর সুখ নাই। ঐ কথা বলিয়া পৃথক্ হইবার পরামর্শ দিও। হেতু দেখাইও, বড়বাবুর পোষ্য অনেক, ছেলে মেয়ে পাঁচটী, চাকর-দাসী বেশী, বাবুয়ানা বেশী, খরচপত্র বেশী, পূজার সময় তাঁহার বেশী আড়ম্বর, তোমরা কেন তাহার ভাগ দিবে? তোমরা যাহা পাও, আমরা পৃথক্ হইলে তাহাতে আমাদের বেশ চলিবে, আমাদের খরচপত্র কম, আমরা কেন বেশী খরচের অংশ দিয়া ফতুর হইয়া যাইব? নিজের নিজের উপার্জ্জনের টাকা তোমাদের হাতে থাকিলে দশ টাকা জমিতে পারিবে, ভবিষ্যতের সংস্থান হইবে, এই সব কথা বলিও। তাহাতেও যদি ফল না হয়, চক্ষের জল ফেলিও।"

চারিটী বধূ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাহা আমরা পারিব না। তোমাকে

পৃথক্ করিয়া দিয়া এ সংসারে আমরা তিলমাত্র সুখ পাইব না। তোমাকে আমরা মায়ের মত দেখি। তোমাকে পৃথক্ করিয়া দিবার পরামর্শ কখনই আমরা দিতে পারিব না।"

বড়-বৌ বলিলেন, "পৃথক্ করিয়া দেওয়া না দেওয়া আমার হাত। আমাকে ছাড়িয়া তোমরা সুখী হইতে পারিবে না, তাহা আমি বেশ বুঝি, বুঝিয়াও তোমাদিগকে ঐ সব কথা শিখাইয়া দিতেছি, বলিও, বলিও, বলিও। যাহা আমি শিখাইলাম, তাহা ভুলিও না। আমিও বড় কর্ত্তাকে ঐ রকম পরামর্শ দিব। মজা করিব।"

মধ্যম-বধূ একটু হাস্য করিলেন। বড়বধূ কহিলেন, "হাসিও না। আমার কাছে হাসিলে ক্ষতি নাই, যাহাদিগকে পরামর্শ দিবে, তাহাদের কাছে হাসিও না। হাসিলে সকল ফিকির ভাসিয়া যাইবে। লোকের কাছেও ঐ কথা তুলিবার সময় একবারও হাসিও না। তাহার পর যাহা করিতে হয় তাহা আমি করিব।"

দেবর-পত্নীগুলিকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়া, আরও যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিয়া বড়বধূ সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। চারিটী বধূ পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, কেহই যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না, এই ভাব জানাইয়া নীরব হইয়া রহিলেন। মধ্যম-বধূ কহিলেন, "দিদি বলিয়া গেলেন মজা করিবেন, অবশ্যই তাঁহার মনে কোন একটা নূতন খেলা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার কথা আমরা শুনিব, যাহা তিনি বলিলেন, তাহা আমরা করিব। দেখিব, মজাটা কতদূর গড়ায়।"

পরামর্শমতে এক মাস কার্য্য চলিল। রজনীযোগে স্ব স্ব শয়নকক্ষে বাবুরা স্ব স্ব প্রণয়িনীর মুখে ঐ সকল কথা শুনিলেন। ভাই পাঁচটীতে বিশেষ সদ্ভাব, তাঁহারা একসঙ্গে বসিয়া বিষয়-কর্ম্মের কথা কন, একসঙ্গে খোসগল্প করেন, একসঙ্গে তাস খেলেন, কোন নির্দ্দোষ-কার্য্যে কোন প্রকার কুসিদা রাখেন না। রবিবার বৈকালে পাড়ার অনেকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং বয়ঃপ্রবীণ মুরুব্বিলোক তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, পরিবারের মঙ্গল-কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। 'সুখে থাক' বলিয়া পঞ্চভ্রাতার মস্তকে করার্পণ করেন, তোমাদের সুখের সংসার, চিরদিন

তোমরা এই প্রকারে ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিয়া সকলের সন্তোষবিধান কর, পরমপিতার নিকটে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

সকলেই ঐরূপ কথা বলিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সময়ে সময়ে আশামত দক্ষিণা পাইতেন, সুতরাং বড়বাবুর খোষামোদ করিতে তাঁহারা ভুলিতেন না। বড়বাবু খোষামোদ ভালবাসিতেন না, খোষামোদের কথা উঠিলেই, তিনি সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন।

এক রবিবার ঐরূপ হইতেছিল, পাড়ায় যাহারা যাহারা নূতন পৃথক্ হইয়াছে, তাহাদের কথা তুলিয়া মুরুব্বীরা দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন, বড়-বাবু সেই সকল কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের দিকে চাহিলেন। বাড়ীর ভিতর যাহা হইতেছে, পঞ্চভ্রাতা তৎপূর্ব্বে একদিনও পরস্পর সে সকল কথা বলাবলি করেন নাই। বৈকালে মজ্‌লীস বন্ধ হইলে, বড়বাবু আপন ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে বলিলেন, "উহারা যাহা যাহা বলিয়া গেলেন, আমাদের ভাগ্যে পাছে তাই ঘটে, আমার সেই ভয় হইতেছে। বড়-বৌ আমাকে বলিতেছেন, বৌ-মাগুলি পৃথক্ হইবার জন্য ব্যস্ত। বড়-বৌ আমাকেও তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য অনুরোধ করেন, আমি কিছু উত্তর করিতে পারি না। তোমরা কিছু শুনিয়াছ?"

চারি ভ্রাতা একবাক্যে কহিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, অনেক দিন হইতে আমরা তাহা শুনিতেছি, আপনার কাছে বলিতে সাহস করি নাই।" একটু চিন্তা করিয়া বড়বাবু বলিলেন, "কি করা যায়? স্ত্রীলোকের মন অসন্তুষ্ট রাখিলে সংসারে মঙ্গল হয় না, সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।"

ম্লানবদনে চারি ভ্রাতা বলিলেন, "আপনার নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া আমরা সংসারের মঙ্গল করিতে পারিব, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভরসা আমাদের মনে আইসে না, কিন্তু সর্ব্বদা তাহারা উত্তেজনা করে, আমরা সকল কথার উত্তর দিই না। জননী বলেন, সংসারে কলহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ত মঙ্গলের লক্ষণ নহে।"

বড়বাবু বলিলেন, "তোমরা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, আমিও বিবেচনা করিব। এখন হঠাৎ কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিও না।"

সে দিনের এই পর্য্যন্ত কথা। তাহার পরে এক সপ্তাহ নিস্তব্ধ। একদিন বেলা দশটা, বধূগুলি আপন আপন শয়নগৃহে শয়ন করিয়া আছেন, সকল ঘরের

দরজা বন্ধ, সংসারের কাজ-কর্ম্ম কিছুই হয় নাই, গৃহিণী ঠাকুরাণী ব্যস্ত হইয়া সকল ঘরের দরজার কাছে কাছে গিয়া "বৌ-মা বৌ-মা" বলিয়া ডাকিয়া কাজ-কর্ম্মের কথা বলিলেন; কেহ কেহ উত্তর দিলেন, কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিলেন। যাঁহারা উত্তর দিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বলিলেন, "আমাকে কেন ডাক? তোমার ত আরও বৌ আছে, তাদের কেন বল না?" একজন বলিলেন, "আমার মেয়ের গা তপ্ত হইয়াছে, আমি উঠিতে পারিব না।" আর একজন বলিলেন, "আমার ছোট ছেলেটার সর্দ্দি হইয়াছে, সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে, আমি উঠিলেই সে কাঁদিয়া হাট পাকাইবে, আমি উঠিব না।" ছোট-বৌ বলিলেন, "আমার কিসের জ্বালা? ছেলে নেই পুলে নেই, কেহ কাঁদেও না, কেহ কাহারও না, রোজ রোজ আমি কেন সকালবেলা উঠিব? রোজ রোজ আমি কেন সকলের সঙ্গে সমান খাটিব? তোমার বড়-বৌমার বড় সংসার, তাঁকে গিয়ে জানাও, তিনিই তো গিন্নী, আমরা কে?"

গৃহিণী ঠাকুরাণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বৌগুলি কখন তাঁহাকে একদিনও একটী উঁচু কথা বলে নাই, অকস্মাৎ এ কি হইল? তত ভাব, তত মিল, সে সব কোথায় গেল? রেসারিসি ঠেসাঠেসি ইহারা কোথা হইতে শিখিল? গৃহিণী এই সকল ভাবিলেন; তাঁহার চক্ষে জল পড়িল; তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এইবার সংসার ভাঙ্গিল।

ভাবিলে আর কি হইবে? সকলের উপর গৃহিণী তিনি, তাঁহার উপরে এই সংসারের ভার। পাঁচটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, পাঁচটী যেন রত্ন, তাহাদেরই পরিবার, তাহাদেরও সন্তান হইয়াছে, বাছার বাছা তাহারা, সকলকে আহার দিতে হইবে, কাজে কাজে বেলা প্রায় এগারটার সময় তিনি নিজেই রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৌগুলি উঠিল না। বৃদ্ধা শাশুড়ী অতি কষ্টে সকলের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। ক্ষুধা কাহারও মান অভিমান, রাগ হিংসা বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকে না; সকলের জঠরানল জ্বলিয়াছিল, মুখ ভারী করিয়া সকলেই আহার করিল। যিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও বাক্যালাপ হইল না।

সে দিন শনিবার। রাত্রিকালে বাবুরা বাড়ী আসিবেন। আহার করিতে অপরাহ্ণ হইয়াছিল, আহারান্তে বৌগুলি ঘুমাইতে গেলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠিলেন।

সেজো-বৌটী একটী ছেলে কোলে করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, ছেলেটীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "ও মা গো! এটা আবার কে? এটা আমার কোলে কেমন করে এলো?" এই বলিয়াই ধুপ করিয়া ছেলেটীকে নামাইয়া দিলেন।

ঘুমের ঘোরে নিজের মেয়ে মনে করিয়া ন-বৌয়ের ছেলেটীকে সেজো-বৌ কোলে লইয়াছিলেন, সেই জন্যই রাগ করিয়া নামাইয়া দিলেন। একটু দূর হইতে ন-বৌ তাহা দেখিলেন, মনে মনে হাসিলেন; সেজো দিদির মেয়েটীকে টানিয়া আনিয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিলেন। মেয়েটী কাঁদিতে লাগিল। ন-বৌ আপনার ছেলেটীকে কোলে করিয়া লইয়া আপন মনে বকিতে বকিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইবার অগ্রে একমালি-সংসারে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, এক মাস পূর্ব্ব হইতে অখিলবাবুর সংসারে সেইরূপ লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। গৃহিণী নিত্য নিত্য নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন; বাবুরা শনি-রবিবারে শয্যা-গুরুগুলির মন্ত্রণা শুনিতেছিলেন; পাড়ার লোকেরা মুখে মুখে আপশোষ করিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

গ্রামের মধ্যে আট দশ ঘর পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কত লোকের আনন্দ হইয়াছে, এই ঘরটা ভাঙ্গিলে সেই সকল লোকের মহানন্দ হইবে। অখিলবাবু গ্রামের মধ্যে একজন ক্রিয়াবান্ লোক, ভাইগুলি উঁহার একান্ত বাধ্য, বৌ-গুলি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, বড় সুখের সংসার, সেই সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেলে প্রায় সকলেরই এক খুরে মাথা মুড়ান হইবে, অখিলবাবুকে আর বড়বাবু বলিয়া খোষামোদ করিতে হইবে না, ক্রিয়া-কর্ম্ম বন্ধ হইবে, বাবুরাও তাহাদের সঙ্গে গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে যাইবেন, বড়ই মজা হইবে। মুখে অমৃত, অন্তরে হিংসা-বিষ, গ্রামের যে সকল লোক এই দুই উপকরণে শোভা পায়, তাহাদের ঐরূপ কল্পনা। কল্পনা সিদ্ধ হইলেই তাহারা যেন বাঁচে, এইরূপ তাহাদের মনোভাব।

যে শনিবারের কথা বলা হইতেছে, সেই শনিবার সন্ধ্যার পর চারি সহোদর সমভিব্যাহারে অখিলবাবু বাড়ী আসিলেন, জননীর মুখে সকল কথা শুনিলেন। পঞ্চভ্রাতা একঠাঁই বসিয়া সেই সকল কথার আলোচনা করিলেন। একজন

বলিলেন, "যাহা আমাদের বিশ্বাস হইত না, এখন জানিলাম, তাহাই ঠিক। সত্য সত্য মেয়েরাই ঘর ভাঙ্গে। যাহারা বিবাহ করে নাই, তাহারা বরং আছে ভাল।"

অখিলবাবু বলিলেন, "বিবাহের দোষ কি? মেয়েরা ভাল হইলে অবশ্যই সংসার সুখের হয়। আমাদের সংসারে সেই সুখ এত দিন ছিল, নিত্য উৎসবে অমৃতবৃষ্টি হইত, হায় হায়! সেই সংসারে এখন হলাহল উৎপন্ন হইল! কি করা যায়! পৃথক্ হইলে যদি বৌগুলি সন্তুষ্ট হয়, তাহারা যদি তাহাতে শান্তি পায়, তবে তোমরা তাহাতেই রাজী হও। একসঙ্গে থাকিয়া নিত্য অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মনের অসুখ চাপিয়া রাখা ভাল হইবে। কল্য রবিবার আছে, পাড়ার তিনজন মাতব্বর লোককে সালিসী মানিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লওয়া যাইবে।"

ভাইগুলি চুপ করিয়া রহিলেন। রাত্রিকালে আপনাদের শয়নগৃহে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুবৃষ্টি হইল, তাহার পর বাবুরা যখন সুবাতাস দিয়া মেঘ তাড়াইয়া দিলেন, তখন আকাশ নির্ম্মল হইল, বৃষ্টি থামিয়া গেল।

রবিবার। মেজো বাবু প্রভাতে উঠিয়াই সালিসীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, পৃথক্ হইবার জন্য মেজো বৌ-মার বেশী আগ্রহ, সুতরাং মেজো বাবুকেই অগ্রণী হইতে হইল। সালিসীরা সকাল সকাল আহার করিয়া, ভুঁড়ি উঁচু করিয়া, স্কন্ধে গামছা লইয়া, কাণে খড়িকাকাঠি গুঁজিয়া, বাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পূজার দালানে বৈঠক হইল। বাবুরা তিনজন মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন, অনিমন্ত্রিত আরও আট দশ জন মধ্যস্থ আসিয়া জুটিলেন। বাবুরা পঞ্চভ্রাতা তাঁহাদের কাছে মনের কথা খুলিলেন। যাঁহারা সালিসী হন, অবশ্যই তাঁহারা মাতব্বর লোক। ধনসম্পত্তি না থাকিলেও বয়সের খাতিরে, মামলা-মকদ্দমার কূটবুদ্ধির সুপারিসে, গ্রামের মধ্যে তাঁহারা মুরুব্বী। এক একজন মুরুব্বীদের ভুঁড়ির ভিতর সর্পাকারে কূটবুদ্ধি খেলা করে। তাঁহারা থিয়েটারের বিরহী নায়কের ন্যায় চক্ষে জল আনিয়া, প্রথমে ভাই পাঁচটীকে হিতকথা বুঝাইলেন, তাহার পর চক্ষুমার্জ্জন করিয়া উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "বৌমাগুলি যদি তাহাই চান, তবে আর অমত করা সুখের হইবে না।" একজন বলিলেন, "ধরাধরি যাহা হয় হউক, সকল লোকে যেন তাহা জানিতে

না পারে। পাঁচটী রন্ধনগৃহ হইলেই বৌগুলি সন্তুষ্ট থাকিবেন। ভাই ভাই যেমন মিল আছে, তেমনি থাকিবে, বিষয় আশয় এক্ মালীতে থাকিবে, ক্রিয়া-কর্ম্ম একসঙ্গে হইবে, বাবুরা হিস্যাবমত টাকা দিবেন, অপর লোকে কিছুই জানিবে না।"

আর এক জন বলিলেন, "আমাদিগকে যখন মধ্যস্থ মানা হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমরা যথা-কথা কহিব। পৃথক্ হইতে হইলে সকল রকমেই পৃথক্ ভাল। বাটী বাঁটোয়ারা হউক, পাঁচটা দরজা বসুক, বাগান-পুকুর ভাগ হইয়া যাউক, জমীদারী ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরে বাবুদের পাঁচ নামে খারিজ করা হউক, ক্রিয়া-কর্ম্ম চলে চলুক, যাঁহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেইমত অংশ দিবেন, যাঁহার টাকা কম, তিনি দিবেন না কিম্বা যাঁহার ইচ্ছা না হয়, তিনি কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম করিবেন না, যাঁহার ক্ষমতা আছে, যাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনি একাকী সমস্ত ব্যয় দিবেন, এইরূপ হইলেই বিবাদভঞ্জন হইবে।" পঞ্চ ভ্রাতা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বৈকাল আসিল। অন্দরমহলের বারান্দায় জিনিসপত্র ভাগ করিবার সভা সাজান হইল। গ্রামে গ্রামে যেমন জনকতক পুরুষ মুরুব্বী আছে, সেই রকম জনকতক বিধবা স্ত্রীলোক মুরুব্বীও বিদ্যমান। বাবুদের বাড়ী জিনিস ভাগ হইবে, জনরবে সেই কথা শুনিয়া আট দশ জন স্ত্রীলোক সেই সভায় দেখা দিলেন। একজনের মাথায় খাট খাট চুল, ঠোঁটে তামাকের গুল, উপরের পাটীর পাঁচ সাতটা দাঁত খুব উঁচু উঁচু, নাম দিগম্বরী। তিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সকলকে বলিলেন, "তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ, আমি ভাগ করিবার ব্যবস্থা করি। আমি অনেক দেখিয়াছি, অনেক ভাগ করিয়া দিয়াছি, কোন পক্ষে অন্যায় হয় নাই। এ বাড়ীতেও যেন সেইরূপ কোন পক্ষে অন্যায় না হয়, তাই আমি করিব, তোমরা দেখ।"

পঞ্চ ভ্রাতার পাঁচটী শয়নগৃহ সারি সারি। সেই পঞ্চ গৃহের চৌকাঠের উপর অবগুণ্ঠনবতী পাঁচটী বৌ-মা।"

পাঁচ ঘরের জিনিসপত্র বারান্দায় বাহির করা হইয়াছে; দিগম্বরী ভাগ করিতেছেন। দিগম্বরীর সঙ্গে সালিসী ও সালিসীনীরা ভাগ করিতে লাগিলেন। খাট, পালঙ্ক, তক্তপোষ, চৌকী, গদী, লেপ, বালিশ, মশারি, ঘড়া, গাড়ু, থালা,

ঘটী, বাটী, পানের বাট, ডবর ইত্যাদি সমস্তই পাঁচ অংশ হইতে লাগিল। পাড়ার এক একজন গৃহিণী অগ্রগামিনী হইয়া ভাগের জিনিস অন্যভাগে টানিয়া আনিয়া বদল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন বলিলেন, "ছোট-বৌ ছেলেমানুষ; উহার ভাগে ছোট ছোট জিনিস পড়িতেছে, ঠকিয়া যাইতেছে. উহার মুখের দিকে চায়, এমন লোক নাই; উহার ভাগে বড় ঘড়াটা দাও, বড় খাটখানা দাও, দুটী বালিশ কম পড়িতেছে, সমান সমান ভাগ কর।" আর একজন বলিলেন, "মেজো-বৌ-মা ভালমানুষ, কোন কথা বলেন না, উঁহার ভাগে সমস্ত মন্দ জিনিস পড়িতেছে, হের-ফের করিয়া লও।" এই প্রকারে সালিসীরা নানা কথা বলিয়া জিনিসপত্র টানাটানি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ বধূ আপনাদের ঘরের চৌকাঠের উপর ঘোম্‌টা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সালিসীদের পার্শ্বে পঞ্চভ্রাতা বুকে হাত বাঁধিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সজলচক্ষে ভাগবাঁটোয়ারা দর্শন করিতেছেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই। প্রতিমার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি দিবার অগ্রে ভক্তেরা যে ভাবে দাঁড়ান, ঠিক সেই ভাব।

জিনিসপত্র ভাগ হইল, ঘর-দরজা ভাগ হইল, গহনা-পত্র ভাগ হইল; বাকী রহিলেন মা আর শালগ্রামশিলা; ঐ দুটী ভাগ হইতে পারে না, পালার বন্দোবস্ত হইবে।

তাহার পর পূজার দালান। সালিসীদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি প্রস্তাব করিলেন, "পূজার দালান এজমালীতে থাকুক, যাঁহার যেমন ক্ষমতা হইবে, তিনি সেইমত অংশের টাকা দিয়া পূজা-পার্ব্বণ এবং ক্রিয়া-কর্ম্ম সেই দালানে নির্ব্বাহ করিবেন; যাঁহার ক্ষমতা হইবে না, তিনি অংশমত টাকা দিবেন না।"

আর একজন বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না। যখন ভাগ করিতে হইল, তখন দালান অবশ্যই ভাগ হইবে। বাবুরা পাঁচ ভাই, দালানে পাঁচফোঁকর, প্রত্যেক প্রত্যেক ফোঁকরে বেড়া দিয়া রাখুন, যখন ক্রিয়া-কর্ম্ম হইবে, পাঁচ জনে যদি ক্ষমবান্ হন, সেই সময়ে বেড়া খুলিয়া দিবেন, কেহ যদি অক্ষম হন, তাঁহার ফোঁকরে বেড়া দেওয়া থাকিবে।"

সালিসীদের সর্ব্বসম্মতিতে ঐ সব কথাই মঞ্জুর হইল। মনে আনন্দ, মুখে বিষাদ। যাঁহারা সালিসিনী হইয়া আসিয়াছিলেন, কথায় কথায় তাঁহারা সায় দিলেন।

বাগান, পুকুর, গোয়ালবাড়ী, গরু-বাছুর সমস্তই ঐ প্রকার পাঁচ ভাগ হইবার কথা স্থির হইল। চাকরীগুলি ভাগ হইবার নহে, সুতরাং তাহা অখণ্ড রহিল।

ব্যবস্থা শেষ হইয়া গেলে ঘর-দালানের ভাগ-করা জিনিসগুলি ভিন্ন ভিন্ন গৃহে তুলিয়া লইবার অনুমতি দিয়া প্রধান সালিসী বলিলেন, "এখন এই পর্য্যন্ত মীমাংসা, ইহার পর যদি কাহারও অংশে কম-বেশী পড়িয়া থাকে, আমরা পাঁচজনে পুনরায় আসিয়া সামঞ্জস্য করিয়া দিব।"

জিনিসপত্র উঠাইবে কে? যাঁহাদের জিনিস, তাঁহারা কেহ নড়িলেন না, একটী কথাও বলিলেন না। বড়-বৌ-মা পাঁচ ছেলের মা, তিনি আর লজ্জা রাখিতে না পারিয়া, ঘোমটা খুলিয়া করতালি দিয়া বলিলেন, "কোন জিনিস কেহ তুলিতে পারিবেন না; যদি তুলিতে হয়, যাহার ঘরে যে জিনিস ছিল, তাহার ঘরেই সেই জিনিস উঠিবে, সত্য আমরা ভাগ-বাঁটোয়ারা চাহি না। তোমরা সকলেই বল, বৌ আসিয়া ঘর ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই কথাটী সত্য কি না, তাহাই আমরা পরীক্ষা করিলাম।"

আর চারিটী বৌ-মা ঘোমটা খুলিলেন না, কিন্তু আহ্লাদে যেন একটু নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিলেন। সালিসীরা অবাক্, সালিসিনীরাও অবাক, বাবুরাও অবাক্। একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "বৌ-মা, এ তোমাদের কেমন কথা? তোমরাই পৃথক্ হইবার পরামর্শ দিয়াছিলে, এখন তোমরাই বলিতেছ, যেমন আছে তেমনি থাকুক, তোমাদের মনের কথা কি?"

যে স্ত্রীলোক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নাম দিগম্বরী। পাড়ার কাহারও মৃত্যু হইলে, তিনি অগ্রে ছুটিয়া গিয়া চক্ষের জল ফেলেন, কাহারও বাড়ীতে উৎসব হইলে তিনি অগ্রে পরিবেশন করিতে গিয়া আপনার অঞ্চল পূর্ণ করেন, পাড়ার কাহারও পীড়া হইলে দৈগতিক বলিয়া অগ্রে তিনি হায় হায় করেন। মনে মনে ইচ্ছা, যাহার পীড়া হয়, সে যেন বাঁচিয়া না উঠে। বাবুর বাড়ীর বধূগুলি পৃথক্ হইলেন না, দিগম্বরীর প্রাণে ব্যথা লাগিল। বড়-বৌ-মাকে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ তিনি পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বড়-বৌ-মা উত্তর করিলেন, "মেয়েমানুষের জ্ঞান কি? মেয়ে মানুষেরা হনুমানী। সকলেই মেয়েমানুষকে অগ্রাহ্য করে, সকলেই বলে, মেয়েমানুষে

ঘর ভঙ্গে। আচ্ছা, তাহাই যদি ঠিক হয়, হনুমানীদের কথাই যদি ঘর ভাঙ্গিবার কারণ হয়, তাহা হইলে হনুমানীরা দোষী; কিন্তু হনুমানীরা যে সব কথা বলে, হনুমানেরা সে সব কথা শোনে কেন? হনুমানেরা যদি না শোনে, তাহা হইলে একটী ঘরও ভাঙ্গে না। আমরা পৃথক্ হইব না। তোমরা সালিসী হইতে আসিয়াছ, ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া আমোদ করিয়া ঘরে যাইবে, ভাবিয়াছিলে, তাহা ত হইল না; এখন আমাদের কার্য্য আমরা আপনিই করি।”

দিগম্বরীকে এই সকল কথা বলিয়া বড়-বৌ-মা আপনার ঘরে গুটীকতক সামান্য সামান্য জিনিস রাখিয়া সমস্ত ভাল ভাল জিনিস চারি দেবরের ঘরে তুলিয়া দিলেন। সালিসীরা অপ্রস্তুত; কেহ কেহ মাথা হেঁট করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, সালিসিনীরা মুখ-চক্ষু ঘুরাইয়া নানাপ্রকার তর্কবিচার আরম্ভ করিলেন। বাবুরা চমৎকৃত!

বড়-বৌ-মা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, “আপনারা আসিয়াছেন, এখন কেহ যাইতে পাইবেন না, আমার কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে, রাত্রিকালে আমার গৃহে জলযোগ করিতে হইবে, আমি আপনাদিগকে প্রণামী দিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় দিব। আমি একটী দৃষ্টান্ত বলি, আপনারা কর্ণ পাতিয়া শুনুন। হনুমানেরা যদি বুদ্ধিমান্ হয়, সংসারের প্রতি হনুমানগণের যদি যথার্থ মায়া থাকে, মাতা-পিতার প্রতি যদি যথার্থ ভক্তি থাকে, ছোট ছোট ভাই-ভগ্নীগুলির প্রতি যদি যথার্থ স্নেহ থাকে, সহস্র হনুমানী সহস্র প্রকার পরামর্শ দিয়াও কোন ঘরের একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। আমার বাপের বাড়ীর দেশে রঘুনাথ ঘোষ নামে একজন কুলীন কায়স্থ আছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রামজয় ঘোষ। তাঁহাদের মাতা বর্ত্তমান। রঘুনাথের পুত্র-কন্যা জন্মে নাই, কিন্তু কোম্পানীর সরকারে তিনি একটী বড় চাকরী করেন, মাস-মাহিনা ৫০০৲ পাঁচশত টাকা। রামজয়ের পুত্র-কন্যা অনেকগুলি, লেখাপড়া কম জানেন, একজন মহাজনের গদীতে দশটাকা মাহিনায় মুহুরীগিরী তাঁহার চাকরী। রঘুনাথ একাকী সমস্ত সংসারের খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করেন, তাহা ছাড়া বৎসর বৎসর ঘটা করিয়া দুর্গাপূজা করেন, বৎসরের মধ্যে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপও নির্ব্বাহ হয়। রঘুনাথের স্ত্রী এক সহরের দত্তকুলোদ্ভব মৌলিক কায়স্থের কন্যা, অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, হিংসা তাঁহার সহচরী, স্বামীর খরচপত্র, স্বামীর মাতৃভক্তি,

স্বামীর সদ্ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন না। প্রতি রজনীতেই রঘুনাথকে তিনি পরামর্শ দেন, "পৃথক্ হও, পৃথক্ হও, কিসের খরচ? ছেলে নাই, মেয়ে নাই, দুটী প্রাণীমাত্র, অত টাকা তোমার উপার্জ্জন, ভূতভোজন করাইয়া সে সব টাকা কেন তুমি নষ্ট কর? পৃথক্ করিয়া দাও, যে যাহার পন্থা দেখুক। মা আছেন, তোমারও যেমন মা, ছোট ছেলেরও তেমনি মা; তোমার চেয়ে বরং ছোটছেলের উপর বেশী মায়া, বেশী টান। মাকে তুমি একটা মাসহারা করে দাও, ছোটছেলের টাকা কম, ছোটছেলে চার মাসের খোরাকী দিবে; তোমার টাকা বেশী, তুমি না হয় আট মাসের খোরাকী দিবে। পৃথক্ করিয়া দাও, বারভূতে সব খায়, একটী পয়সাও আমার থাকে না। আপদ-বালাই তফাৎ করিয়া দিলে, আমার দশখানা গহনা হইবে, হাতেও দশ টাকা জমিবে, চাই কি, দশবিঘা জমি জেরাত কিনিয়া রাখিতে পারিব। ভাব দেখি, তুমি অবর্ত্তমানে আমার দশা কি হইবে, আমি কি পথের ভিখারিণী হইব? আমি কি বাপের বাড়ী গিয়া দাসী হইয়া থাকিব? ভূত বিদায় কর, ভূত বিদায় কর, অত ভূত থাকিতে সংসারের মঙ্গল নাই; আমার কথা শোনো, যদি ভাল চাও, ভূতের বাসা ভাঙ্গিয়া দাও, সুখী হইতে পারিবে।"

এক বৎসর এই প্রকার পরামর্শ। রঘুনাথ ঘোষ সদাশয় লোক, একান্ত মাতৃভক্ত, ধর্ম্ম-কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, স্ত্রীর কথা তিনি গ্রাহ্যই করেন না; স্ত্রী তাহাতে নিত্য নিত্য অভিমানিনী হন। এক বৎসর পরামর্শ দিয়া যখন দেখিলেন, কোন মতেই স্বামীকে বাগে আনিতে পারিলেন না, তখন কান্না জুড়িয়া দিলেন, সংসারে আগুন দিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব, এই বলিয়া ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও প্রায় ছয় মাস। রঘুনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; শেষকালে একরাত্রে গৃহিণীকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, কল্যই আমি পৃথক্ হইব, তোমাকে বাপের বাড়ী যাইতে হইবে না, এখানে যেমন আছ, সেইরূপ থাকিবে, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।" গৃহিণী চক্ষের জল মুছিয়া তখন শান্ত হইলেন, খুসী হইলেন, আপনাকে স্বামীসোহাগিনী ভাবিয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ ধরিলেন। রজনী প্রভাত হইল। রঘুনাথ ঘোষ ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "বড় বৌকে একটী হাঁড়ি, একটী মালসা, একখানি সরা আর একজনের উপযুক্ত চাল, ডাল, তরকারি দিতে আরম্ভ কর, মাছ কিনিবার

জন্য একটী করিয়া পয়সা দিও।” ভাণ্ডারী তাহাই করিল। রঘুনাথকে স্নানের সময় গৃহিণী বলিলেন, “হাঁড়ি পাইয়াছি, সিধে পাইয়াছি, কয়লা পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে ত দুইজনের চলিবে না, তুমি কোথায় খাইবে?” রঘুনাথ উত্তর করিলেন, আমি ত পৃথক্ হইতে পারিব না। তোমারই পৃথক্ হইবার ইচ্ছা, তুমি পৃথক্ হও। আমি জননী ত্যাগ করিতে পারিব না, অক্ষম সহোদর ভ্রাতাকে ত্যাগ করিতে পারিব না, ছোট বৌমাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না, তাঁহার ছেলে-মেয়েগুলিকেও বিদায় করিতে পারিব না, তাঁহাদিগকে লইয়াই আমি থাকিব। আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি পৃথক্ হইয়া সুখে থাকিবে ভাবিয়াছ, তাহাই থাক।”

বড়-বৌমা এই দৃষ্টান্তটী বলিলেন। রঘুনাথের স্ত্রী আর পৃথক্ হইতে চাহিলেন না, একদিনেই তাহার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল। অখিলবাবুর সংসার ভাঙ্গিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, ভাঙ্গিতে পারিলেন না, রঘুনাথ ঘোষের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই লজ্জা পাইলেন। লোকের ঘর ভাঙ্গিতে যাঁহাদের আনন্দ, তাঁহারা একস্থানে হতাশ হইলে অন্তরানলে দগ্ধ হন, মুখে কিন্তু অন্যভাব প্রকাশ করেন। এখানকার সালিসীমহাশয়েরা সেইরূপে লজ্জা পাইয়া, অন্তরের অনল অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া, অখিলবাবুর খোষামোদ করিতে আরম্ভ করিলেন; বৌমাগুলির প্রশংসা করিলেন না। অখিলবাবুর খোষামোদ করিলেন কেন, তাহার কারণ ছিল। অখিলবাবু দাতা লোক, পরের উপকারে সর্ব্বদাই তাঁহার প্রবৃত্তি। সালিসীদের মধ্যে তিনজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাল নয়, সময়ে সময়ে অখিলবাবু তাঁহাদিগকে প্রচুর সাহায্যদান করিতেন। বিষয়-বিভাগ করিবার সময় সে উপকার তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সঙ্কল্পে নিরাশ হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, তাই তাঁহারা অখিলবাবুর খোষামোদ করিলেন।

রাত্রিকালে লুচিভাজা হইল, বাজার হইতে মিষ্টান্ন আসিল, সকলে পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিধবা, তাঁহারা ছাঁদা বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। সকলে বিদায় হইবার পর, বড়-বৌ-মা ঐ পাঁচটী বাবুকে নিকটে বসাইয়া মনের কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হে, এ কথা পুরাতন; স্ত্রীলোকেরা মন্ত্রণা দিয়া ঘর ভাঙ্গে, আজকাল দেশময় এই

কথা প্রচার, বড়-বৌ-মা সেই কথা খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে দেবরপত্নীগুলিকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঐরূপ কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন। পঞ্চভ্রাতা চিরদিন সদ্ভাবরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, পঞ্চবধূ ভগ্নীভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সত্য সত্য তাঁহারা পৃথক্ হইবেন না, ইহাই মনে ছিল, কেবল বাবুগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এই সময় তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

পঞ্চভ্রাতা সন্তুষ্ট হইলেন, সংসার বজায় রাহিল। গ্রামস্থ লোকেরা অখিল-বাবুর সংসারের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাঁহারাই তাহা জানিলেন; অপরে জানিতে পারিল না।

হিন্দুশাস্ত্রমতে নারী সংসারের লক্ষ্মী, যে সকল নারীতে নারীজাতির সমস্ত সুলক্ষণ বিদ্যমান, সে সকল নারী কদাচ সংসার ভাঙ্গিবার ইচ্ছা করেন না, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা। একান্নভুক্ত পরিবারে কত সুখ, ভারতের হিন্দুরাই তাহা জানেন। আজকাল ইংরাজী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে; ইংরাজেরা ভাই ভাই পৃথক্ হয়, বিবিরাই তাহাদের সর্ব্বস্ব, সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়া শুনিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকেরা তাহার অনুকরণ ভালবাসিতেছেন, সেই কারণেই দেশে এত বাঁটোয়ারার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। কথার পৃষ্ঠে কথা পড়িলে কিছু উচ্চকথা বলিতে হয়। ইংরাজেরা বিবাহের পর বিবিকে লইয়া পৃথক্ হইয়া থাকে, ইহা তাহাদের দেশাচার। কেবল ইহাই নহে, অনেকে মাতা-পিতার সংস্রব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। এখানেও একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। একটী বৃদ্ধ সাহেব একদা বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক রাত্রে এক হোটেলে উপস্থিত হন। সেই হোটেলের কর্ত্তা তাঁহার নিজের ঔরসপুত্র। বৃদ্ধ সেই রাত্রে সেই হোটেলে ভোজন করিয়া সেইখানেই নিশা-যাপন করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি বিদায় হন, তাঁহার সেই হোটেলওয়ালা পুত্র একখানি বিল প্রস্তুত করিয়া পিতার সম্মুখে ধরেন, বিলের অঙ্ক পাঁচ পাউণ্ড। তখনকার হিসাবে এ দেশের পরিমাণে পঞ্চাশটী রৌপ্যমুদ্রা। বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধ পিতা তৎক্ষণাৎ পাঁচটী সুবর্ণ-মুদ্রা বাহির করিয়া দিয়া বিদায়গ্রহণ করেন।

এখন যেরূপ দিনকাল পড়িয়া আসিতেছে, তাহাতে এ দেশেও যে সেইরূপ পিতৃভক্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। ইতিমধ্যেই

কেহ কেহ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী লইয়া পৃথক্ থাকিতে শিখিতেছেন। অন্যদেশে এ প্রথা নিন্দার বিষয় না হইলেও আমাদের দেশে অতিশয় নিন্দার বিষয়।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারতে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভাবের ভূরি ভূরি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি এ দেশের লোকের যখন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তখন এ প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিবার অবসর হইত না। এখন ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থকে কতকগুলি তার্কিক লোকে ঋষিরচিত কল্পিত গল্প বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাহাতেই এই সকল কুলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। রামচন্দ্র তিনটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে যে ভাবে স্নেহ করিতেন, সেই তিনটী ভ্রাতা রামচন্দ্রকে যেরূপ ভক্তি করিতেন, রামায়ণ তাহার প্রমাণ। পঞ্চপাণ্ডব সহোদর ছিলেন না, তিনটী সহোদর, দুটী বৈমাত্রেয়; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রাতৃভাব ও মাতৃভক্তি জগদ্বিখ্যাত; সেরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল আমাদের দেশে সহোদরের মধ্যেও বিরল,—অতি বিরল।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও গৃহবিচ্ছেদ যেন নিত্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি; পুরাণশাস্ত্রের উপদেশ যেন ভাসিয়া যাইতেছে। পঞ্চকুলবধূর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাহা বলা হইল, সকল সংসারে তেমন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান নাই। ব্যাকরণের অপমান করিয়া বিবাহিতা পত্নীগণকে শয্যাগুরু বলা হয়। কথা নিতান্ত অপ্রকৃত নহে, যে সকল স্ত্রীলোক হিংসাপরায়ণা, শয্যাগুরুরূপে স্বামীগণকে কুমন্ত্রণা দিয়া অক্লেশে তাহারা সংসার ভাঙ্গিয়া দেয়। পূর্ব্বে বলা হইল, নারী সংসারের লক্ষ্মী। যাহারা যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপিণী, তাহাদের সংসার সোণার সংসার নামে বিখ্যাত। যাঁহারা এখন বার্ত্তাশাস্ত্রানুসারে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একান্নভুক্ত পরিবারের অনিষ্টকারিতা প্রতিপাদন করিতে চান, তাঁহাদিগকে মূলকথা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা বিফল। তাঁহারা বলেন, বহু পরিবার পোষণ করিতে একজনের যত অর্থ-ব্যয় হয়, স্ত্রীপুত্র লইয়া পৃথক্ থাকিলে তাহার অনেক অল্প ব্যয়ে সুনিয়মে সংসার চলে, দেশে বড়মানুষও অনেক বাড়ে। বহু পরিবার পোষণ করিয়া অনেক ধনবান্ লোক দরিদ্র হইয়া যাইতেছে।

ঐ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিয়া লইতে আমাদের অনেক বিলম্ব হয়, কষ্টও হয়। যাঁহারা যুক্তি দেখান, তাঁহারা বলেন, একজন

পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন করে, পাঁচ জন পুরুষ অলস হইয়া বসিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহাদিগকেও পালন করিতে হয়, ইহা কদাচ ভাল নহে; অলসের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, অথচ অর্জ্জকের ধনক্ষয় হইয়া যায়। এই ত যুক্তি; কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, একান্নভুক্ত সকল পরিবারের কি ঐ দশা? মনে করুন, এক পিতার সাত পুত্র; সেই সাত পুত্রের মধ্যে কেবল একজন পরিশ্রম করিয়া সকলের ভরণ-পোষণ করেন, অবশিষ্ট ছয় ভ্রাতা কেবল বসিয়া বসিয়া খায়, ইহাই কি সত্যকথা? আমরা ত সচরাচর দেখিতে পাই, যেখানে একান্নভুক্ত পরিবার, সেখানে সকল ভ্রাতাই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তবে যোগ্যতা অনুসারে কেহ কিছু বেশী, কেহ কিছু কম উপার্জ্জন করে; তাহাতে সংসারের কিছু বিশেষ কষ্ট থাকে না। দশের লাঠী একের বোঝা, এই যে একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদের সার্থকতা ঐরূপ সংসারে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে। মনেও সুখ থাকে, পরস্পর সদ্ভাবও সুরক্ষিত হয়, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দেখিতে শুনিতেও ভাল মানায়। যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ আসল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হন, তাহা হইলে আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইবে। সংসারে একজন উপার্জ্জন করিতেছে, দশজন নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেবল বসিয়া বসিয়া খাইতেছে, সে সংসারে মঙ্গল হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু তাদৃশ সংসার গণনায় অতি অল্প। সেই দোষের সংশোধন হইলে সকল সংসারেই লক্ষ্মীর কৃপা হয়, ইহা অখণ্ডনীয় সত্য। সেই দোষের সংশোধন-চেষ্টা না করিয়া কেবল ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার পরামর্শ দেওয়া বিষম ভ্রান্তি। কিসে সুখ, কিসে অসুখ, তাহা নিরূপণ করিবার প্রয়াস না পাইয়া ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের অসুখ সংগ্রহ করা বিষম বিড়ম্বনা। যাঁহারা দশ জনে একত্র বাস করিয়া দশজনের উপার্জ্জনে দশজনে একত্র ভোজন করেন এবং যাঁহারা একা একা উপার্জ্জন করিয়া এক একটী পত্নীর সহিত ভোজন করিয়া তুষ্ট থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা যথার্থ সুখী, কাহারা যথার্থ অসুখী, তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই যথার্থ উত্তর পাওয়া যাইবে।

হিংসা, ঈর্ষা এবং স্বার্থপরতা, এই তিন একত্র হইয়া বঙ্গবাসীর সংসার ভাঙ্গিয়া দিতেছে ঘরে ঘরে বাঁটোয়ারা হইতেছে, ঘরে ঘরে রন্ধনগৃহ বাড়িতেছে,

আদালতের উদরপূরণ হইতেছে, মিউনিসিপ্যাল সহরে সহরে, ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা বসাইতেছে, ঘরে ঘরে নম্বর বাড়িতেছে, নম্বরে নম্বরে ভগ্নাংশ বাড়িতেছে; চাহিয়া দেখিলে মনের দুঃখে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। যে দেশ সুখসৌভাগ্যের স্বর্গভূমি ছিল, যে দেশে মাতৃ-পিতৃ-ভক্তির, ভ্রাতৃ-ভগিনীপ্রীতির স্বর্গীয় সুখ বিরাজ করিত, সেই দেশের এখন কিরূপ মলিনভাব, কিরূপ দুর্গতি, কিরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহা একবার চিন্তা করা আবশ্যক। ঘরে ঘরে এখন বিচ্ছেদের আগুন গুমিয়া গুমরিয়া জ্বলিতেছে, পিতা-পুত্রে বাক্যালাপ নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় মুখ-দেখাদেখি নাই, পুরীমধ্যে শান্তির ছায়া নাই, পুরবাসীর নাসিকায় ঘন ঘন নিশ্বাস। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

আর একটী কথা স্মরণ করুন্। পাঁচ ভ্রাতা পরস্পর পৃথক্ হইয়া ভদ্রাসনে পাঁচটী দরজা ফুটাইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাস করিতেছে, পাঁচ জনেরই চাকরী জীবিকা। দৈবাৎ যদি এক ভ্রাতার চাকরী ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবারের দশা কিরূপ দাঁড়ায়? অপর চারি ভ্রাতা এক পয়সাও সাহায করিবে না, বেকার ভ্রাতার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা অন্নবস্ত্রাভাবে লালায়িত হইয় বেড়াইবে, কেহই তাহাদের মুখপানে চাহিবে না। একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে বাস করিলে একজনের চাকরী না থাকিলে তাহার কোন কষ্টই থাকে না, অপর লোকে কিছুই জানিতেও পারে না। ইচ্ছা করিয়া সে সুখ ত্যাগ করা কত দুর নির্ব্বোধের কার্য্য, ইহাও বিবেচনা করা উচিত। চাকরীজীবীর কথা দূরে থাকুক, বাঁটোয়ারার উপদ্রবে বড় বড় জমীদারের বড় বড় জমীদারী খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, বড় বড় ঘর অধঃপাতে যাইতেছে, দেশে দেশে দিন দিন দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িতেছে; ইংরাজীযুক্তিপ্রিয়, ইংরাজী অনুকরণপ্রিয় বঙ্গবাসী হিন্দু-ভ্রাতাগণ ইহাকে কি দেশের মঙ্গল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন?

স্ত্রীলোকের দোষে ঘর ভাঙ্গে, এ কথা যদি সত্য হয়, কথিত পঙ্কুলবধূ যাহা দেখাইলেন, তাহাতে তাহাও খণ্ডন হইয়া গেল। স্ত্রীলোকের দোষে ঘর ভাঙ্গে, এ কথা স্বীকার করিতে হইলেও তাহার প্রতীকার আছে। সকল বাড়ীর কর্ত্তা যদি উল্লিখিত রঘুনাথ ঘোষের তুল্য সংসারধর্ম্মপরায়ণ দৃঢ়ব্রত সুপুরুষ হন, তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোকের সাধ্য নাই যে, ভাই ভাই বিচ্ছেদ ঘটায়। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ এবং গৃহ-বিচ্ছেদ দেশের অমঙ্গলের নিদান; দেশ দরিদ্র হইবার উহাই এক

প্রধান কারণ। দেশে দরিদ্রলোক অধিক হইলে কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, বঙ্গের এক এক বৎসরের ছুর্ভিক্ষেই তাহার ভয়ঙ্কর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহারা একান্নভুক্ত পরিবারের সুখে বঞ্চিত হইয়া সাধ করিয়া দরিদ্র হইতেছে, তাহাদের মনস্তাপ অবর্ণনীয়। অপরের মনস্তাপের কথা অপরে জানিতে পারে না, যাহাদের মনস্তাপ, তাহারাও তাহা নিজ নিজ মুখে প্রকাশ করে না, তুষানলের ন্যায় অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া সারা হয়। কথাগুলি সত্য কি না, রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া সকলে এক একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অখিলবাবুর গুণবতী বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে, সকলে যেন এই দৃষ্টান্তগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করেন।
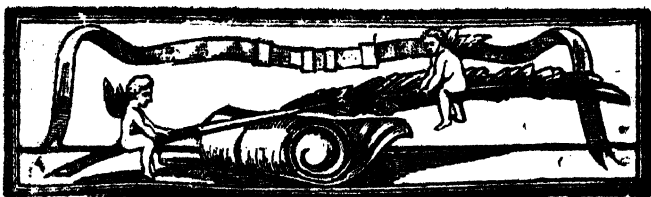
দশম তরঙ্গ।

বেচু বাবু।

মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অঞ্চলে একজন পাট্টাদার ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহার নাম রামসাগর বাঁক। রামসাগরের পিতা পূর্ব্বে ইংরাজের নিমক-পোক্তানের সিকদার ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের বংশের উপাধি হইয়াছিল সিকদার। বাঁকের পরিবর্ত্তে গ্রামের লোকে রামসাগরকে রামসাগর সিকদার বলিয়া ডাকিত। রামসাগর সিকদার কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না, ভূমিসম্পত্তির আয় হইতেই তাঁহার সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা এই তিনটী পর্ব্বে রামসাগর দশজন কুটুম্ব-সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা-কবি দিয়া একপ্রকার সমারোহ করিতেন। জাতিতে ছোট হইলেও গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা ঐ তিন পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিতে কোন প্রকার দ্বিধা রাখিতেন না; গ্রামে রামসাগরের এক প্রকার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। রামসাগর লেখা-পড়া ভাল জানিতেন না, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি বেশ ছিল, চাকরী করিবার আবশ্যকতা থাকিলে জমীদার-সরকারে পাটোয়ারীগিরী চাকরী করিতে তিনি অক্ষম হইতেন না। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রামসাগরের পুত্র জন্মে নাই, উপর্য্যুপরি পাঁচটী কন্যা হইয়াছিল। রামসাগরের স্ত্রী পুত্রকামনায় নানাপ্রকার ব্রত করিতেন, দেবদেবীর পূজা দিতেন, গ্রাম্যদেবতাগণের নিকটে মানতি করিতেন, রামসাগর তাহাতে তুষ্ট হইতেন না; কেন না, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, শক্তিপূজায় অথবা শিবপূজায় তাঁহার ভক্তি ছিল না। তাঁহার স্ত্রী গ্রাম্য-পঞ্চানন্দের পীঠস্থানে ঢিল বাঁধিয়া আসিতেন, পাঁঠা মানসিক করিতেন, রামসাগর রাগিয়া যাইতেন।

একরাত্রে সেই পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে একটা পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়া ক্রোধান্ধ রামসাগর সেই পঞ্চানন্দের ঘরে আগুন দিয়াছিলেন।

পূজা না দিলে, পাঁঠা না দিলে, গ্রাম্য-পঞ্চানন্দেরা রাগ করেন, ছোট ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গেন, গ্রামে গ্রামে এইরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু রামসাগরের স্ত্রীর ভাগ্য ভাল, তাঁহার স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে সেই জলমগ্ন পঞ্চানন্দটী রাগ করিলেন না; দুইমাস পরে সিকদারপত্নী গর্ভবতী হইলেন।

যথাসময়ে রামসাগরের একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। পুত্রটী কিছু অঙ্গহীন হইয়াছিল বলিয়া প্রসূতি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। পুত্রের নাকটী কিছু খাঁদা, কাণ দুটী কিছু ছোট ছোট, মাথাটী বড়, পা-দুখানি সরু সরু, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। সেই পুত্র যখন বড় হইল, তখন তাহার চলনভঙ্গী কিছু বাঁকা বাঁকা হইয়া গেল। অন্নপ্রাশনের সময় সেই শিশুর নাম হইয়াছিল শ্যামসাগর, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে বোঁচা বোঁচা বলিয়া ডাকিত; নাম ছিল শ্যামসাগর, সে নামটা প্রায় চাপা পড়িয়াই গিয়াছিল।

বাল্যকালে বোঁচা অতিশয় দুরন্ত ছিল, পিতামাতার কথা শুনিত না, গ্রামের লোকের কথা শুনিত না, কেহ তাহাকে ভালকথা বলিলে সে রুষ্ট হইয়া তাহাকে কামড়াইতে যাইত, কটুবাক্যে গালাগালি দিত, কখন কখন ঢিল ছুড়িয়া মারিত। গতিক দেখিয়া প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা বলিত, উহার বাপ বাবাঠাকুরকে জলে ডুবাইয়াছে, ঘরে আগুন দিয়াছে, সেই রাগে বাবাঠাকুর "উহার ঘাড়ে চাপিয়া আছেন, জননীর ভক্তি আছে বলিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন না।" সে কথা কেহ গ্রাহ্য করিত না। বোঁচা বাঁকাপায়ে নাচিয়া নাচিয়া সেই কথাটা হাসিয়া উড়াইত। ক্রমশঃ তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৌরাত্ম্যও বাড়িয়া উঠিল। কেবল আহারের সময় বোঁচা একবার বাড়ীতে আসিত, দিনমানের মধ্যে গ্রামের কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত না, রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহরের সময় কোথা হইতে আসিয়া ভোজন করিয়া শুইয়া থাকিত, ভোরে উঠিয়া আবার পলাইত।

দিনমানের মধ্যে বোঁচা তবে করিত কি, থাকিত কোথায়, যাইত কোথায়, অবশ্যই এ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। বোঁচা কেবল বনে বনে বেড়াইত, আটা-কাঠির ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরিত, একজোড়া খাঁচা কিনিয়া বনের ভিতর

রাখিয়াছিল, দুই খাঁচা পাখী পূর্ণ হইলে একগাছা লাঠীর দুইধারে দুইটী খাঁচা ঝুলাইয়া দূরবর্ত্তী অন্য অন্য গ্রামে পাখী বেচিতে যাইত। যে দিন সমস্ত পাখী বিক্রয় হইত, সেদিন সন্ধ্যাকালে তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে, কোন কোন দিন শুঁড়ীর দোকানে সমস্ত পয়সা নষ্ট করিয়া ফেলিত; এক গ্রামে একটা গণিকা ছিল, রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত সেইখানেই তাস খেলিত। যে দিন সকল পাখী বিক্রয় হইত না, যে কটা বাকী থাকিত, পাঁচীর মার বাড়ীতে সেই সকল পাখীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া খাইত। পূর্ব্বোক্ত গণিকার নাম পাঁচীর মা।

এই রকমে বোঁচার দিন যায়। পাখী ধরে, পাখী বেচে, পাখী খায়, রকমারি নেশা করিয়া পয়সা উড়ায়, তাহাতেই তাহার মজা। একদিন পাঁচীর মা তাহাকে বলিল, "যে জিনিস যাহারা বেচে, সে জিনিস যদি তাহারা নিজে খায়, তবে ত কারবার চলে না। তুই ছোঁড়া পাখী খাওয়া ছেড়ে দে।" বোঁচা তখন বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ত্রিভঙ্গঠামে নাচিয়া নাচিয়া বলিল;—

"পায়ের উপর দিয়ে পা,
নাচ রে বোঁচা ধিনিং তা,
আর ত পাখী খাব না,
এবার খাব পাঁচীর মা।"

নাচিয়া নাচিয়া এই গান গাহিতে গাহিতে বোঁচা হাঁ করিয়া পাঁচীর মার দিকে ছুটিল; সত্যই যেন প্রাণের ভয়ে পাঁচীর মা ছুটিয়া পলাইল। বুনো বোঁচা; বুনো পাখী খায়, উহার অসাধ্য কি, সত্যই যদি পাঁচীর মাকে খাইয়া ফেলে, পাঁচ বৎসরের পাঁচী অনাথা হইবে, সেই ভয়। পরদিন হইতে পাঁচীর মা আর বোঁচাকে বাড়ীতে স্থান দিত না। বোঁচা তখন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে অপর একটা স্ত্রীলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই স্ত্রীলোক ধীবরকন্যা, মৎস্য বিক্রয় করা তাহার জীবিকা। তাহার নাম রাসমণি। বোঁচা পাখী ধরে, রাসমণি মাছ ধরে, বোঁচা পাখী বেচে, রাসমণি মাছ বেচে, দুজনেই নেশা করে, দুজনেই একসঙ্গে থাকে। বোঁচার বাড়ী যাওয়া বন্ধ। তাহার পিতা একদিনও তাহার অন্বেষণ করেন না, কিন্তু গর্ভধারিণীর মায়া বড়, তিনি বোঁচার জন্য কাঁদেন, খুঁজিবার জন্য লোক পাঠান, কেহই বোঁচার উদ্দেশ পায় না। বোঁচার বয়স তখন প্রায় ষোল বৎসর

যে গ্রামে বোঁচার জন্ম, সে গ্রামের মূর্খ-লোকেরা বলাবলি করে, "বাপের দোষেই ছেলেটা গেল। বাবাঠাকুর এতদিনের পর তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

যে যাহা বলে বলুক, ভাগ্যলিপি সর্ব্বত্র বলবান্; দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়াও বোঁচা দিন দিন অন্যপ্রকার ভাব ধারণ করিতে লাগিল। রাসমণি তাহাকে যত্ন করে, ভাল ভাল সামগ্রী খাইতে দেয়, ভাল ভাল কাপড় পরায়, নিত্য স্নান করায়। বোঁচার বন্যভাব ক্রমে ক্রমে ঘুচিতে লাগিল, দুই একটা নেশাও ছাড়িল, কিন্তু পাখীবেচা ছাড়িল না। রাসমণি মনে মনে মন্ত্রণা করিল, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, বোঁচাকে সংসারী করিয়া দিতে হইবে। রাসমণির বয়স অধিক নয়, বড় জোর ত্রিশ বৎসর—বাল্যবিধবা। পূর্ব্বে তাহার চরিত্র নষ্ট হয় নাই, বোঁচার প্রতি তাহার মন বসিয়াছিল, চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল, কিন্তু সাবধান হইয়া সামলাইয়া গেল। মূলকথা ধরিতে হইলে উভয়ে একজাতি। গ্রামের মধ্যে সজাতীয়া একটী বালিকার সহিত বোঁচার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া রাসমণি তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিল। বোঁচার পিতা বড়মানুষ, সে গ্রামের লোকেরাও তাহা জানিত; পিতার ঐ একমাত্র পুত্র, স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইলে বোঁচাই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, সেই বিশ্বাসে গ্রামের একজন গৃহস্থ ধীবর বোঁচাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইল।

রাসমণির বাসনা পূর্ণ হইল; একটী ভাল দিন দেখিয়া সেই ধীবর-কন্যার সহিত বোঁচার বিবাহ দিল। বোঁচার মাতাপিতা এ সংবাদ কিছুই পাইলেন না। যে কন্যাটীর সহিত বোঁচার বিবাহ হইল, সেটী সুরূপা, সুলক্ষণা; নাম তরঙ্গিণী। বিবাহের পর রাসমণি সেই তরঙ্গিণীকে আপনার বাড়ীতে আনিয়া রাখিল।

রাসমণির দুইখানি ঘর; মাটীর প্রাচীর দিয়া চারিদিক্ ঘেরা, একখানি ঘরে রাসমণি থাকে, দ্বিতীয় ঘরখানিতে বোঁচা আর তরঙ্গিণী। তরঙ্গিণীর বয়স দশ বৎসর।

পাখী ধরিয়া বিক্রয় করা বোঁচার কার্য্য। ক্রমে ক্রমে সেই ব্যবসায়ে তাহার হস্তে কিছু টাকা জমিল, টাকা হইলেই লোকের কাছে একটু আদর হয়, সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে বোঁচার বোঁচা নাম ঘুচিল, বোঁচা তখন বুঁচু হইল। সকলেই তাহাকে বুঁচু বলে, আদর করিয়া কেহ কেহ বুঁচুরাম বলিয়া মান বাড়ায়। ছোট

ছোট পক্ষী বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হয় না, যাহারা পাখী খায়, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা খরিদ করিতে চায় না. বুঁচু তাহা বুঝিল। মেদিনীপুর অঞ্চলে জঙ্গল অনেক, জঙ্গলে জঙ্গলে ভাল ভাল পাখী ধরিয়া বুঁচু তখন সৌখীন লোকের কাছে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। সে তখন আর নিজে পাখীর ভার স্কন্ধে লইয়া লোকের বাড়ী যাইত না, রাসমণি একজন চাকর রাখিয়া দিয়াছিল, বুঁচুরাম সেই চাকরকে সঙ্গে লইয়া ব্যবসা চালাইত। যে সকল পাখী পুষিয়া পক্ষীপ্রিয় ভদ্রসন্তানেরা আনন্দ অনুভব করেন, বেশী বেশী মূল্য দিয়া তাঁহারা বুঁচুর নিকট হইতে কোকিল, পাপিয়া, টিয়া, ময়না, শ্যামা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পক্ষী কিনিয়া লইতে লাগিলেন। পক্ষিব্যবসায়ে বুঁচুর তখন বেশ লাভ হইতে লাগিল।

এইরূপ তিন বৎসর। বুঁচুর বয়স বিংশতি, তরঙ্গিনী ত্রয়োদশবর্ষীয়া। রাসমণির মাটীর বাড়ী কোটাবাড়ী হইল; বুঁচুরাম কোটাবাড়ীর স্বামী হইলেন। এই সময় রামসাগর সিকদারের মৃত্যু হইল, লোকমুখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাসমণি বুঁচুকে জানাইল;—পরামর্শ দিল, "এ বাড়ীও তোমার, সে বাড়ীও তোমার; তরঙ্গিণীকে লইয়া তুমি সেই বাড়ীতে যাও, পাখী বেচা বন্ধ কর, জমীদারের ছেলে তুমি, তোমার অভাব কি? আমি এখন কিছু দিন এই বাড়ীতে থাকি, মধ্যে মধ্যে গিয়া তোমায় দেখিয়া আসিব, তুমি সুখে থাকিলে আমি সুখী হইব, বাপের বাড়ীতে গিয়া তুমি সুখী হও! তোমার মা তোমার জন্য প্রায় পাগলিনী হইয়াছেন, তোমাকে পাইলে তিনি কতই আহ্লাদ করিবেন, কতই সুখী হইবেন, বধূকে প্রাপ্ত হইয়া আমোদিনী হইবেন, তুমি তাহাই কর।"

প্রথম প্রথম বুঁচুরাম সে সব কথা শুনিলেন না, আর এক বৎসর রাসমণির বাড়ীতেই থাকিলেন, সইখানেই তাঁহার নাম হইল বুঁচুবাবু।

সেই বোঁচা এখন বুঁচুবাবু। ইংরাজের আবির্ভাবে এ দেশে এখন বাবু অনেক রকম। সচরাচর চলিত কথায় যাহারা বাবু, তাহাদের একটু পরিচয় দিতে হয়। বাবু কথাটা পূর্ব্বে এ দেশে চলিত ছিল না, হিন্দুস্থানী মানী-লোকের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা বাবু নামে বাচ্য। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহারা সাহেব-লোকের লাঞ্ছনা সহিতে পটু, মাসিক দশ টাকা বেতনের সরকার হইলেও তাহারা সাহেব-লোকের বাবু। সাহেবেরা তাদৃশ বাবুর দলকে অবজ্ঞা করেন, অবজ্ঞা করিয়াই বাবু বলেন,

ঐ দলের বাবুরা তাহা বুঝিতে পারেন না। সহরের বারাঙ্গনা-মহলে যাঁহাদের গতিবিধি, তাঁহারা বারাঙ্গনা-দলের বাবু। যাঁহাদের বড় বড় বাড়ী আছে, বড় বড় গাড়ী-ঘোড়া আছে, লোকে চিনিবার যোগ্য ক্রিয়া-কর্ম্ম কিছুই নাই; তাঁহারা সহিস-কোচম্যানের বাবু। সত্য যাঁহারা বনিয়াদী বড়মানুষের সন্তান, চিরকালের ব্যবহারে দশজনের কাছে তাঁহারা বাবু। আজকাল ম্যান্‌চেষ্টারের প্রসাদে সাদা সাদা ধুতি-চাদর-পিরাণের খাতিরে, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, এমন কি, মেথরেরা পর্য্যন্ত বাবু। বাবুর ব্যাখ্যা করা এখন আমাদের অসাধ্য।

বুঁচুবাবু সেই প্রকারের বাবু হইলেন কি না, একটু পরেই তাহা আমরা দেখিব। তরঙ্গিণীকে সঙ্গে লইয়া বুঁচুবাবু পিতৃভবনে আসিলেন, জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া, এক বৎসরকাল শিষ্ট-শান্ত হইয়া পিতৃভবনে রহিলেন। বাল্যাবধি পাখী ধরা কার্য্য ছিল, বর্ণপরিচয় পর্য্যন্তও হয় নাই, এই সময়ে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বুঁচুবাবু কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরে কতক কতক মাতৃভাষা শিক্ষা হইল, উড়ে-ভাষা শিক্ষা হইল, কিছু কিছু ইংরাজীও আয়ত্ত হইল; ইংরাজীতে কতকগুলি চলিত কথা বুঝিবার ও বলিবার ক্ষমতা জন্মিল। রামসাগর যে সকল ভূমিসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুনিয়মে তাহা রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা হইয়া উঠিল না। পল্লীগ্রামে তাদৃশ লোক নূতন অভ্যুদয়প্রাপ্ত হইলে কমলাকান্তের কথিত কাঁঠালের দলে গণ্য হইয়া পড়ে। কাঁঠালের উপদ্রব কত, এ দেশের অনেকে তাহা জানেন। কচি কাঁঠাল রৌদ্রের উত্তাপে ঝড়িয়া পড়ে, একটু বড় হইলে গৃহস্থ লোকে পাড়িয়া লইয়া রন্ধন করিয়া খায়, কতকগুলি কাঁঠাল এঁচোড়ে পাকিয়া যায়, তাহাতে কিছুমাত্র আস্বাদন থাকে না, সময়ে পাকিলে শেয়ালে খায়, ঘরে পাড়িয়া রাখিলে চতুর্দ্দিকে মাছি ভন্ ভন্ করে। বুঁচু-কাঁঠাল ভাল করিয়া পাকিতে পারিল না, তথাপি তাহার আশে পাশে মাছি উড়িতে লাগিল; অনেক মাছি আসিয়া জুটিল। সে রকম মাছির নাম অথবা উপাধি ইয়ার মোসাহেব। কিরূপে মোসাহেব পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়, বুঁচুবাবু তাহা জানিতেন না। একখানি বাঙ্গালা নাটকে একবার দেখা হইয়াছিল, একজন বাবু তাঁহার একজন মোসাহেবকে বলিয়াছিলেন, "আমার পুকুরের জল খুব পাত্‌লা, খুব পরিষ্কার, খুব মিষ্ট। মিত্রের পুকুরের জল ভাল বটে, কিন্তু কিছু ভারী।"

মোসাহেব প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিল, "আজ্ঞে হাঁ, মিত্রের পুকুরের জল বড় ভারী; এত ভারী যে, এক ঘটী তোলে, কাহার সাধ্য।" এইরূপ প্রতিধ্বনি করিবার ক্ষমতা যাহাদের থাকে, তাহারাই বাবু লোকের উপযুক্ত মোসাহেব হয়।

বুঁচুবাবুর মোসাহেবদলে সেরূপ মোসাহেব দুটী একটী মিলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন একদিন প্রস্তাব করিল, "বাবুর নামটী ভাল মানাইতেছে না, বুঁচুবাবু বলিলে যেন বিদ্রূপ করা বুঝায়, অতএব ঐ নামটী বদল করিয়া নূতন নাম দেওয়া উক—বেচুবাবু।"

তাহাই হইল। শৈশবের বোঁচা, কৈশোরের বুঁচু, যৌবনকালে মোসাহেবের মুখে বেচু হইলেন। হইলেন বটে, কিন্তু মোসাহেবেরা তাঁহাকে নাম ধরিয়া বাবু বলিত না, গৌরব করিয়া তাহারা বলিত শুধু "বাবু।"

বাবুকে লইয়া মোসাহেবেরা নিত্য নিত্য নব নব রঙ্গে নব নব খেলা করিতে আরম্ভ করিল। বাবুর বাল্যস্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সে পরিবর্ত্তন আবার এক নূতন পরিবর্ত্তনে উল্টাইয়া আসিল। কিছু দিন তিনি শিষ্ট-শান্ত হইয়া ছিলেন, এই সময়ে বাবু উপাধি লাভ করিয়া দুরন্ত হইলেন। শিশুকালে মাতা-পিতার অবাধ্য ছিলেন, বনে বনে বেড়াইতেন, ঘরবাসী হইতেন না, এখন আবার নূতন রোগে ধরিল। মাথার উপর ভয় করিবার কেহ না থাকিলে ভাল শিক্ষার অভাব থাকিলে যৌবনকালে যে রোগটা প্রবল হয়, বেচুবাবুকে সেই রোগটা আক্রমণ করিল। মাতা তাহা জানিতে পারিয়া অনেক বুঝাইতেন, বেচুবাবু তাহাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে গালা-গালি দিতেন, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব বলিয়া ভয় দেখাইতেন। শিশুকালে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, আবার যদি যায়, সেই ভয়ে তাহার মাতা আর কিছু বলিতেন না, নানা দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া মনের দুঃখে চুপ করিয়া থাকিতেন।

কিছু দিন পরে বেচুবাবুর একটী কন্যা হইল। তরঙ্গিণী সেই কন্যাটী লইয়া রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিতেন, ইয়ার-বক্‌সি লইয়া বেচুবাবু অন্য-স্থানে আমোদ করিয়া বেড়াইতেন। কন্যাটী যখন এক বৎসরের, সেই সময়ে বেচুবাবু সংসার পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। বুদ্ধদেব যেরূপে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব যেরূপে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাদৃশ

উচ্চভাব বেচুবাবুর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, পাঠকেরা এমন বুঝিয়া লইবেন না, মোসাহেবের পরামর্শে তাঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছিল; মতিভ্রমেই তিনি সংসার ছাড়িলেন। মোসাহেবেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল, "পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ জঙ্গলপ্রদেশে আমোদের বস্তু পাওয়া যায় না, আমোদ জমে না, সহরে গিয়া পূর্ণমাত্রায় আমোদ করিতে হইবে, আমোদের সাগরে সাঁতার দিতে হইবে, বাবুলোকের সহরে বাস করাই সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।" সেই পরামর্শেই বেচুবাবুর মুণ্ড ঘুরিয়া গেল, সহরবাসী হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। পাঁচ জন ইয়ারের সহিত সহরবাসী হইবার অভিলাষে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। নগদ এক হাজার টাকা তাঁহার সঙ্গে রহিল।

বেচুবাবু কলিকাতায় আসিলেন। জানবাজার অঞ্চলে একখানি বৃহৎ বাড়ীভাড়া লওয়া হইল। সহরের কেতামত বৈঠকখানা সাজাইয়া লওয়া হইল, দেউড়ীতে চারিজন দারোয়ান বসিল, দাস-দাসী পাচক নিযুক্ত হইল, আর যাহা যাহা হইল, যাঁহাদের অনুমানশক্তি আছে, তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন। বাবু হইয়া সহরে থাকিতে হইলে খরচপত্র কত হয়, যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহাদিগকে সেকথা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। হাজার টাকা সঙ্গে ছিল, এক মাসে ফুরাইল, দেশের গোমস্তাদের নিকট পত্র লিখিয়া মাসে মাসে তিনি টাকা আনাইতেন। যত টাকা আনা হইত, তাহার এক পয়সাও গৃহে থাকিতে পাইত না। বাবুর জননীর হস্তে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা শেষ হইয়া আসিল। মাতা, পত্নী আর সেই কন্যাটী বিষম দুঃখের দশায় পড়িল।

বেচুবাবু কলিকাতায় আসিয়া বড় বড় মজলীসে মিশিবার চেষ্টা করিলেন। হীনজাতি, তাহাতে অজ্ঞাত-কুলশীল, তাহাতে আবার শিক্ষা-বিরহে সমাজ-সঙ্গ-বিরহে সহরের সামাজিকতায় অপরিজ্ঞাত, সুতরাং বড়লোকের সঙ্গে মিশিবার আশা শীঘ্র ফলবতী হইল না; চেহারাও ভাল নহে, ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, বড় বড় গাড়ী-জুড়ী চড়িয়া, জাঁকজমক দেখাইলেই সহরের বড়লোকের সঙ্গে যোগ দিবার সুবিধা হয় না। বেচুবাবু মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন। প্রথমে কলিকাতায় আসিলে কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতে হয়, যাহা দেখিতে কেহ নিষেধ করে না, মোসাহেবগণের সঙ্গে বেচুবাবু তাহাই দেখিতে লাগিলেন। জাদুঘর, পশুশালা, গড়ের মাঠ, কেল্লা, হাইকোর্ট, গঙ্গা, হোটেল, থিয়েটার

ইত্যাদি দর্শন করিয়া শেষে তিনি বড় বড় বিলাসিনীর গৃহে গতিবিধি আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও আশা পূর্ণ হইল না, বড়দলে মিশিবার উপায় কি হয়, সেই ভাবনাতেই বচুবাবু সর্ব্বক্ষণ বিষন্ন।

মোসাহেবদলে একটী লোক বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিল। সে বলিল, "উচ্চজাতি না হইলে কলিকাতায় মান পাওয়া যায় না, আপনি একটা উচ্চজাতির উপাধি গ্রহণ করুন। এখনকার অনেক ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতা ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, একটা পৈতা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ সাজুন, কিছুদিন পরে সেই পৈতাটা ফেলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবেন। অনেক বড় বড় ঘরে ব্রহ্মজ্ঞানী পাওয়া যায়, সেই দলে মিশিতে পারিলে আপনার মান বাড়িবার বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।"

বেচুবাবু একটু চিন্তা করিলেন। আর একজন মোসাহেব নূতন যুক্তি বাহির করিয়া গম্ভীর-বদনে বলিল, "ও পরামর্শ ভাল না, ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে বড়লোকেরা আদর করিবেন না, ব্রাহ্মণ হইলে পিতা-পিতামহের বংশের পরিচয় দিতে হয়, সেটা আপনাদের জানা নাই, সে পরিচয় দিতে গেলে ধরা পড়িতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞানীও হওয়া হইবে না, ব্রাহ্মণও হওয়া হইবে না। আপনি এক কর্ম্ম করুন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, একবৎসর ছিলাম, অনেক কথা জানিয়া রাখিয়াছি। কলিকাতার লোকে বলে, জাতি হারাইলেই কায়েত হয়। বিদেশের নীচ-জাতি অনেক আলু-পটলওয়ালা কলিকাতায় আসিয়া কায়েত হইয়া রহিয়াছে। আপনি তাহাই করুন,—আপনি কায়স্থ হউন।"

ভাল ভাল বলিয়া সেই প্রস্তাবে সকলে সায় দিল। বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া যুক্তিদাতা পুনরায় গম্ভীরবদনে সগৌরবে বলিল, "কায়স্থ হইলেও ঘোষ, বসু, মিত্র হইতে পারিবেন না, তাহাতেও বড় গোলমাল। ঐ তিন ঘরের পরিচয়ে অনেক কথা জানিতে হয়, তাহা আপনি জানিবেন না, আমরাও জানাইতে পারিব না। আমি শুনিয়াছি, দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ এই আটঘর কায়স্থের মধ্যে কেহ কুলীন নাই। আপনি এখন আছেন সিক্‌দার, গোড়ার সিটা বজায় রাখিয়া আপনি সিংহ উপাধি ধারণ করুন। আমরা আপনাকে মেদিনীপুরের জমীদার বলিয়া পরিচয় দিব। আপনি হইবেন বেচারাম সিংহ। জমীদারের উপাধিতে সিংহ বলিলে খুব ভাল মানাইবে।"

সেই দিন অবধি বেচুবাবু কলিকাতার মধ্যে বেচারাম সিংহ নামে পরিচিত হইলেন। জাতি কায়স্থ, সম্ভ্রমে জমীদার। এইরূপ লোক কলিকাতার মধ্যে কতগুলি আছেন, তাহার তালিকা আমাদের নিকটে নাই, কিন্তু নগরবাসী ধনবানের নিকটে তাদৃশ লোকের খ্যাতি-প্রতিপত্তি উজ্জ্বল হইয়া থাকে। সেইরূপ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া বাবু বেচারাম সিংহ বড়দলের ব্যবহারের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। গাড়ী-ঘোড়া রাখা, হোটেলের খাতা রাখা, সহরতলীতে বাগান রাখা, রকমারি জায়গায় মেয়েমানুষ রাখা, হপ্তায় হপ্তায় থিয়েটার দেখা এবং হপ্তায় হপ্তায় বন্ধুবান্ধবগণকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করা বড়লোকের কার্য্য। বাবু বেচারাম সিংহ সেই সকল কার্য্য শিখিলেন। সহরে ঢি ঢি হইয়া গেল, মেদিনীপুরের জমীদার বেচারাম সিংহ যথার্থই একজন বড়লোক। যাহারা ভিতরের কিছু কিছু খবর রাখিত, তাহারা বলাবলি করিত—"কাপ্তেন বাবু।"

যথার্থই কাপ্তেন বাবু। বেচারামের পিতামহ রামচরণ সিকদার সত্য সত্য জমীদার ছিলেন না; জমীদারগণের নিকট হইতে মৌরসি পাট্টা লইয়া কয়েক হাজার বিঘা জমীতে প্রজা বসাইয়া চাষ-আবাদ করাইতেন। তাঁহার উপাধি ছিল পাট্টাদার; ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে আমরা বলিব, চক্‌দার।

সে পরিচয় পরে হইবে, এখন কায়স্থ জমীদার সাজিয়া বেচুবাবু কিরূপ খেলা খেলাইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বড় বড় সাহেব-দরজীর দোকান হইতে সাহেবী, নবাবী ও বাবুয়ানার পোষাক আনাইয়া এক একদিন এক এক সাজে তিনি সহরে বাহির হন; সহরে অনেক স্থানে অনেক রকম সভা হয়, সেই সকল সভায় নাম লিখাইয়া পারিষদ্‌বর্গ সহ মেম্বররূপে উপনীত হন। বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা ছিল না, বক্তৃতা করিতে পারেন না, কিন্তু এক একটা প্রস্তাবে সভার লোকের অনুরোধে সেকেণ্ড করিতে হয়। সভার প্রস্তাবে সেকেণ্ড করা কিরূপ, তাহা বেচারামের জানা ছিল না। একদিন একটা ক্রন্দনের সভায় যোগেশ্বর বাবু একটা প্রস্তাব করিবেন, বেচারাম বাবু সেকেণ্ড করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। যোগেশ্বর বাবু প্রস্তাব করিলেন, "একটী পাথরের মূর্ত্তি গড়াইয়া মৃত ব্যক্তির স্মরণ-চিহ্ন রাখিতে হইবে, খরচের জন্য চাঁদা করিতে হইবে, সভার সহানুভূতি জানাইয়া মৃত ব্যক্তির পরিবারগণের নিকটে সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিতে হইবে।"

এইবার বেচারামের সেকেণ্ড করিবার পালা। একটু একটু ইংরাজী শিখিয়া বেচারাম জানিয়াছিলেন, বন্ধুবান্ধবের হাত ধরিয়া নাড়া দিলেই সেকেণ্ড করা হয়; যোগেশ্বরের প্রস্তাব শেষ হইবামাত্র বেচারাম তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়া যোগেশ্বরের যুগল হস্ত ধারণ করিলেন, নৃত্যভঙ্গীতে সর্ব্বশরীর কাঁপাইয়া আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এস, এস ভাই যোগেশ্বর, এস।"

বেচারাম তখন একজন বড়লোক, তাঁহার প্রশংসাকারীরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "যোগেশবাবুর প্রস্তাবে বেচারামবাবু অনুমোদন করিলেন।" বেচারামের বিদ্যা ঢাকিয়া গেল, উপহাসের কার্য্য করিয়াও তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইল না। সভার কার্য্যে বেচারামের ঐরূপ লীলাখেলা অনেক হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্গীত-সভায় অথবা কোন বড়লোকের বাড়ীর সঙ্গীতের মজ্‌লীসে নিমন্ত্রণ হইলে বেচারাম হাজির হইতেন, ওস্তাদেরা ভাবভঙ্গী দেখাইয়া গীত গাহিলে বেচারাম বাহবা দিতেন, রাগ-তাল বেশ হইতেছে বলিয়া করতালি দিতেন। কোথায় বাহবা দিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না; গীতের এক চরণ শেষ হইতে না হইতেই মাঝখানে উচ্চৈঃস্বরে শোভান্তরী বর্ষণ করিয়া গীতের রসভঙ্গ করিয়া দিতেন, ওস্তাদেরা কট্‌মট্ চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিত; তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। জানিবার সম্ভাবনা বা কি? গীতের রাগরাগিণীর কথা;—রাগ, ঝাল, রাগিণী, বাঘিনী কিছুই তাঁহার জানা ছিল না; বাদ্যের তাল:—যিনি কখন তালতলা দিয়াও চলেন নাই, বাদ্যের তাল তিনি কি বুঝিবেন? গীত শুনিলেই বাহবা দিতে হয়, এইটীই তাঁহার জানা ছিল, সুতরাং মাঝখানে উচ্চহাস্যে করতালি দিয়া, গায়ক-বাদকের ক্রোধের ভাজন হইতেন।

বাগানের উৎসবে, হোটেলের খানায়, বেশ্যার রঙ্গভঙ্গে, থিয়েটারের কায়দায় বেচারাম বড় একটা ঠকিতেন না; একদিন ঠকিয়াছিলেন। একটী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শেষ হইলে বাহির হইয়া আসিয়া বেচারাম যখন গাড়ীতে উঠিতে যান, বাহিরে একটী বাবু সেই সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন দেখিলেন?" বেচারাম উত্তর করিলেন, "যাহারা নাচিল, তাহারা খুব ভাল। তাহাদের কাহার কি নাম, কে কোথায় থাকে, আপনি তাহার একটী ফর্দ্দ করিয়া দিতে পারেন?"

সেই বাবুটীর সহিত বেচারামের পূর্ব্বের জানাশুনা ছিল. বেচারামের বিদ্যাও তিনি জানিতেন, অতএব মনের বিস্ময় মনে গোপন করিয়া পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিষয়ের অভিনয় হইল ?"

বেচারাম উত্তর করিলেন, "অত শত আমি বুঝি না, নর্ত্তকীগণের নৃত্য দর্শন করিয়া আমি মোহিত হইয়া আসিয়াছি, সেই জন্যই আমি তাহাদের নাম-ঠিকানা জানিতে চাহিতেছি।"

খানিকক্ষণ বেচারামের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বাবু বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, কল্য আপনার বাটীতে গিয়া ফর্দ্দ করিয়া দিব, যদি ফটো দেখিতে চাহেন, তাহাও সঙ্গে লইয়া যাইব।"

বাবুকে সেকহ্যাণ্ড করিয়া বেচারাম গাড়ীতে উঠিলেন, মনে মনে হাসিতে হাসিতে বাবুটী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাবুগিরীতে বেচারামের রঙ্গভঙ্গ এই প্রকার। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর বেচারাম ঐরূপ খেলা করিলেন, টাকা ফুরাইয়া আসিল। যে সকল জমীদারের জমী তাঁহার পিতামহ দখল করিতেন, সেই সকল জমীদারের খাজানার টাকা কিস্তি কিস্তি প্রদান করিতে হইত। বেচারাম সেই সকল জমীর উত্তরাধিকারী। গৃহত্যাগ করিয়া অবধি বেচারাম গৃহের সংবাদ লইতেন না, মহলেরও খবর রাখিতেন না; টাকা দরকার হইলেই গোমস্তাদের নামে হুকুমনামা পাঠাইতেন, টাকা আসিত। জমীদারের খাজানা দিতে হইবে বলিয়া গোমস্তারা ওজর করিলে বেচারাম তাহা গ্রাহ্য করিতেন না; বরখাস্ত করিয়া নূতন গোমস্তা রাখিব বলিয়া তাগিদ-পত্র লিখিতেন, টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, কাজেই গোমস্তারা জমীদারের খাজানা বাকী রাখিয়া বাবুর মন যোগাইতেন। সেই হেঁকাতে একে একে অনেকগুলি বিষয় বিক্রয় হইয়া গেল, অতি অল্পই বাকী থাকিল। বেচারামের খরচের টাকা আইসে না, সহরের বাবুগিরীতে টাকা না হইলেও চলে না, উপায় কি হয় ?

মোসাহেবগণের সহিত বেচারামের পরামর্শ। মোসাহেবেরা বলিল, "ভয় কি ? কলিকাতা সহর, আপনি একজন জমীদার, সহরের বড় বড় মহাজনেরা আপনাকে টাকা যোগাইবেন; যত টাকা দরকার, হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেই তত টাকা আপনার হাতে আসিবে। তবে কি না, সুদ বেশী দিতে হইবে।"

বুক ঠুকিয়া বেচারাম বলিলেন, "কুচ পরোয়া নেই!" মোসাহেবেরা বলিল, "কুচ পরোয়া নেই!" মোসাহেবের মুখে খবর পাইয়া নিত্য নিত্য দালাল জুটিতে লাগিল, বেধড়ক হ্যাণ্ডনোট আরম্ভ হইল, সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা। বিশেষ বিশেষ দরকার পড়িলে পাঁচ শত টাকা লইয়া হাজার টাকার নোট লিখিয়া দেওয়া চলিতে লাগিল। প্রথমের গতিক দেখিয়া যাহারা বেচারামকে কাপ্তেনবাবু বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহাদের অনুমান সার্থক হইল। সত্য সত্যই বেচারামবাবু একজন কাপ্তেনবাবু হইলেন।

কাপ্তেনী অবস্থায় বেচারাম সিংহ মনের সাধে হলধরের ও মকরধ্বজের পূজা করিলেন। থিয়েটারের অভিনয় দর্শন করা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। রজনী ফাঁক যায় না। অভিনয়াবসানে এক একটী সুন্দরী নায়িকার গৃহে বেচারামের রাসলীলা হয়। এক রজনীতে যোড়শোপচারে বলরামের সেবা করিয়া বেচারাম উপরের সিঁড়ি হইতে নীচে নামিতেছিলেন, হঠাৎ পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যান, মাঝের তিনটী সিঁড়ি গড়াইয়া গড়াইয়া চতুর্থ সিঁড়ির উপরে শুইয়া পড়েন। পা-দুখানি স্বভাবতঃ সরু সরু ছিল, সুতরাং একখানি পা অচল হইল, জানুদেশের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। বিলাসমন্দিরে প্রবেশের সময় মোসাহেব সঙ্গে থাকিত না, ধরে কে? বিলাসিনীর একজন বেহারা তাঁহাকে কোলে করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল, বাসায় পৌঁছিলে সহিস-কোচ্‌মানেরা ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিল। একমাস চিকিৎসা হইল, হাড় যোড়া লাগিল, কিন্তু বেদনা ঘুচিল না, গ্রন্থিস্থান ফুলিয়া রহিল; একগাছি মোটা লাঠীতে তিনি ভর দিয়া অতিকষ্টে উপর হইতে নীচে নামিতেন, নীচে হইতে উপরে উঠিতেন, তথাপি এক-জন লোকের স্কন্ধ অবলম্বন করিতে হইত। এই ভাবে এক বৎসর গেল। কাপ্তেনী চাল বেশী দিন চলে না; একদিন বেচারাম বাবু পাঁচ ইয়ার লইয়া আপন বৈঠকখানায় বলরাম-পূজা করিতেছিলেন, সেই সময় একজন লোক সেই বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার বাবুর দিকে চাহিল, একবার বাহিরের দিকে চাহিল। বেলা তখন পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী; খোঁড়া হইলেও বেচারামের বায়ুসেবন এবং যামিনীযোগে কামিনী-লোভে থিয়েটার দর্শন বন্ধ ছিল না। পোষাক পরিয়া, লাঠী হাতে করিয়া, বাবু যখন বৈঠকখানা হইতে বাহির হইবার উপক্রম করেন, ঠিক তাহার পূর্ব্বক্ষণে সেই নূতন লোকটী শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া

আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার সঙ্গে আর একজন কে ছিল, তাহার কোন পরিচয় ছিল না, কোন প্রকার চিহ্নও ছিল না, সেই লোকের কাণে কাণে কি কথা বলিয়া নূতন লোক একটু তফাতে সরিয়া গেল; যাহার কাণে কাণে কথা, সেই লোক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

দরজার সম্মুখেই বেচারামের গাড়ী প্রস্তুত। বেচারাম গাড়ীতে উঠিতে যান, সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী সেই লোক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অগ্রে সেলাম দিল, তাহার পর বাবুর একখানি হাত ধরিল।

লোকটা ছোট আদালতের পেয়াদা। বাবুর হস্তধারণ করিয়া সে একখানা মোহর-করা কাগজ বাহির করিয়া দেখাইল। কাগজখানা আদালতের ওয়ারীণ, এ পরিচয় বাহুল্য।

বাবু কাঁপিতে লাগিলেন। ওয়ারীণের অঙ্ক এক হাজার সাত শত টাকা। বাবুর তহবিলে তখন একশত টাকাও ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে পেয়াদার সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে যাইতে হইল; সে অবস্থায় যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল, বাবু কয়েদ হইলেন। তখন আর তাঁহার ইয়ার-মোসাহেবেরা কেহই সহায় হইল না, নূতন বন্ধুবান্ধবেরাও দেখা দিলেন না, সম্পূর্ণরূপে নিরুপায়।

কথাটা অপ্রকাশ রহিল না। কাপ্তেন বেচারামের মহাজন অনেক, সকলেই জানিতে পারিলেন, বেচারাম ঋণ-পরিশোধে অক্ষম; একে একে সকলেই নালিস করিলেন, সকল মোকদ্দমাতেই ডিক্রী হইল, কাহারও টাকা আদায় হইবার উপায় হইল না। দেশে বেচারামের পিতামহের আমলের পুরাতন বাড়ী ছিল, বৃহৎ ভদ্রাসন; বাড়ীখানাও ইষ্টক-নির্ম্মিত, সে সন্ধান জানিয়া আদালতের প্রণালী অনুসারে একজন মহাজন সেই বাড়ীখানা ক্রোক করাইলেন। প্রত্যন্ত-পল্লীগ্রামের বাড়ীর দাম যৎসামান্য, ভূমির মূল্যও যৎসামান্য, সে বাড়ী বিক্রয় করিয়া হাজার টাকার অধিক হওয়াই অসম্ভব। যদিও নীলাম হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে দেনার সামান্য ভগ্নাংশও উঠিল না, লাভে হইতে খাতকের মাতাকে ও স্ত্রী-কন্যাকে অপর একজন প্রতিবাসীর বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইল। পাট্টাই, মৌরসি, চাষের জমীগুলির মধ্যে যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহাও নীলাম হইয়া গেল; তাহাতেও কিছুই হইল না। বেচারাম জেলখানায় বাস করিতে লাগিল।

ইংরাজী আইনের মর্ম্ম এইরূপ যে, দেনার দায়ে দেনদার কয়েদ হইলে মহাজনগণকে তাহার খোরাকী যোগাইতে হয়। একটা দেউলে লোককে কয়েদ রাখিয়া বেশী দিন খোরাকী দেওয়া কাহারও ইচ্ছা নহে, তবে আসামীকে জব্দ করিবার মৎলব থাকিলে কেহ কেহ কিছুদিন আইনমত খোরাকী দিয়া থাকেন। বেচারামের সহিত কোন মহাজনের তাদৃশ শক্রতা ছিল না, পক্ষান্তরে টাকা কর্জ্জ দিবার সময় তাহাদের অনেকেই অনেক লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার যাহা ক্ষতি হইল, তাঁহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা অল্প দিন খোরাকী যোগাইয়া হাত গুটাইয়া লইলেন, বেচারাম খালাস পাইলেন। সকলেই জানিল, বেচারাম একটা জুয়াচোর, বহুরূপী, বদ্‌মাস।

বেচারামটা জুয়াচোর, কেবল এই কথা প্রকাশ পাইল, এমন নহে, নাম ভাঁড়াইয়া, জাতি ভাঁড়াইয়া, কলিকাতায় আসিয়া বাবু হইয়াছিল, জমীদার সাজিয়াছিল, সমস্তই ভুয়াকাণ্ড, ইহাও প্রকাশ হইল।

জান্‌বাজারের যে বাড়ীতে বেচারাম বাস করিত, সেই বাড়ীর অধিকারী এক বৎসর ভাড়া পান নাই। বেচারাম কয়েদ হইবার পর বাড়ীওয়ালা সেই বাড়ীর ঘরগুলি অন্বেষণ করিয়া যাহা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে অনেক দেউলে বাবুর কাণ্ডকারখানা মনে পড়ে। বেচারামের বাবুয়ানার আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মোসাহেবেরা এক রাত্রে বাটীর সমস্ত মূল্যবান্ আসবাবপত্র সরাইয়া ফেলিয়াছিল, বাকী ছিল কেবল পাঁচগাছা বেতের ছড়ি, এক জোড়া ছেঁড়া মাদুর, একখানা ছেঁড়া সতরঞ্চি, এক ডজন ছেঁড়া মোজা আর পঞ্চাশটা মদের বোতল। বোতলেরা পূর্ণগর্ভ ছিল না, খালি বোতল, ইহাও সকলে বুঝিয়া লইবেন।

বাড়ীওয়ালা যে দিন বাড়ী তল্লাস করেন, সেই দিন হইতে ক্রমাগত এক পক্ষকাল দলে দলে পাওনাদার আসিয়া জড় হইয়াছিল। পোষাকওয়ালা, দরজী তিন হাজার টাকা, সোণারূপার বাসনওয়ালা, ঘড়ীওয়ালা, চেইনওয়ালা এক হাজার নয়শত টাকা, শালওয়ালা পাঁচ হাজার পঞ্চাশ টাকা, মুদিখানাওয়ালা ছয়শত ষাট টাকা, বেলফুলওয়ালা আশী টাকা, আতর-গোলাপওয়ালা তিনশত পঁচিশ টাকা, গাধার দুধওয়ালা একশত বাইশ টাকা, চীনাবাজারের জুতাওয়ালা দুই শত কুড়ি টাকা, গাভীদুগ্ধওয়ালা গোয়ালা তিনশত বত্রিশ টাকা,

দেশী-বিলাতী-হোটেলওয়ালা দুই হাজার সাতশত টাকা, এই সকল ছাড়া ছোট বড় আরও কত পাওনাদার তাগাদা করিতে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিয়া গেল, তাহার সংখ্যা হইল না। বাড়ীর চাকর, দাসী, দরোয়ান, পাচক এক বৎসরের বেতন পায় নাই, তাহারা নানাপ্রকার অভিসম্পাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। সকল দিকেই ফর্সা!

বেচারাম জেলখানা হইতে খালাস পাইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিল; দেশে গেল না, অন্যস্থানে চাকরী অন্বেষণ করিতে লাগিল। জেলা মেদিনীপুর, গ্রাম বিস্তর। মেদিনীপুর সহরের অদূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে বেচারাম আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মণ বড়মানুষ ছিলেন না, অধিক দাসী-চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না, একজন চাকরের দ্বারা সংসারের কাজ-কর্ম্ম চালাইয়া লইতেন। বেচারাম তাঁহার বাড়ীতে চাকর হইল। বলা আছে, বেচারামের একখানি পদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, লাঠীর উপর ভর দিয়া খানিক খানিক বেড়াইতে পারিত, কিন্তু চাকরী স্বীকার করিয়া তাহাকে অনেক কাজ করিতে হইত। বাজার করা, গো-সেবা করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কার্য্যের ভার তাহার উপর। সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভাগার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। উপায় নাই, পেটের দায়ে অতি কষ্টে যথাসম্ভব সকল কার্য্য করিতেই তাহাকে বাধ্য হইতে হইল।

সিংহ উপাধি আর থাকিল না, ব্রাহ্মণ তাহাকে বেচারামও বলিতেন না, কলিকাতায় বেচারাম কায়স্থ হইয়াছিল, সে জাতিও এখানে বিলুপ্ত, যে দাঁড়কাক সেই দাঁড়কাক। বেচারামের উপাধিযুক্ত নাম হইল, বেচু বাঁক, বোঁচা কিম্বা বুঁচু তাহার নাম ছিল, তাহার মনিব তাহা জানিতেন না।

প্রায় দেড় বৎসরকাল ব্রাহ্মণের বাটীতে বেচু চাকরী করিল, দেশে তাহার মাতা ও স্ত্রী-কন্যা কেমন আছে, সে সংবাদ কেহই তাহাকে দিল না, সে নিজেও তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা করিল না।

ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বেচু একদিন পাট কাটিতেছিল, নিকটে কেহ ছিল না, ব্রাহ্মণও বাটীতে ছিলেন না, বেলা অনুমান এক প্রহর, সেই সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইল। পরিধান গেরুয়া বসন, অঙ্গে গেরুয়া জামা, জামার উপর সাত ছড়া রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে জটার

আকারে দীর্ঘকেশ খোঁপার আকারে বেণীবদ্ধ, তাহার উপর একখানা গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড জড়ানো, দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁপ-দাড়ী, চক্ষের কোণে কোণে গেরীমাটীর রেখা, কপালে গেরীমাটীর দীর্ঘ ফোঁটা।

বেচু তখন পাট কাটিতেছিল, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিল। মৃদু হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপের উপরে গিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে বসিবার আসন ছিল না, বাটীর ভিতর হইতে বেচু একখানা আসন আনিয়া দিল, সন্ন্যাসী বসিল। বক্রভঙ্গীতে বেচুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "এখানে থাকিবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই, আমি তোমার পূর্ব্বের অবস্থা সমস্ত জ্ঞাত আছি। কলিকাতায় গিয়া তুমি বাবু হইয়াছিলে, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছ, অনেক লোককে ঠকাইয়াছ, তোমার অনন্ত অবস্থা হইবে।"

বেচু কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী বলিল, "অগ্রে না কাঁদিয়া শেষে কাঁদিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। অনেক দিন হইতে আমি তোমার অন্বেষণ করিতেছি, যে গ্রামে তোমার জন্ম, অনেকবার আমি তোমার অন্বেষণে সে গ্রামে গিয়াছি, কোথায় তুমি আছ, কোথায় তুমি ছিলে, কেহই সে কথা আমাকে বলিয়া দিতে পারে নাই। অনেক তত্ত্ব করিয়া আজ আমি তোমাকে এইখানে পাইলাম। তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে তোমার প্রিয়জনগণকে দেখাইব, তুমি তোমার ভাগ্যের ফল বুঝিতে পারিবে।"

এই কথাগুলি বলিয়া সন্ন্যাসী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, "তোমার কেহ প্রিয়জন আছে, তাঁহা কি তোমার মনে পড়ে? কোথায় কাহার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ, তাহা কি তোমার মনে আছে? তোমার স্ত্রী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিল, সে কথা কি তোমার স্মরণ হয়?"

বেচুর চক্ষে আবার দর দর বারিধারা। সন্ন্যাসী বলিল, "ক্ষান্ত হও। সমস্তই তুমি হারাইয়াছ, কিন্তু যাহার গর্ভে তুমি জন্মিয়াছ, সে অভাগিনী এখনও বাঁচিয়া আছে, যাহাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ, তাহারও প্রাণ যায় নাই; তুমি যে কন্যাটীর পিতা হইয়াছ, সেই দুঃখিনী বালিকাও বাঁচিয়া আছে। তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমাকে দেখিলে তাহারা সকল দুঃখ ভুলিতে পারিবে।"

বেচুর তখন যেন একটু ধর্ম্মজ্ঞান আসিল। সন্ন্যাসীর সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, "আমার মনিব বাড়ীতে নাই, তাঁহাকে না বলিয়া কেমন করিয়া আমি যাইতে পারি? না বলিয়া গেলে পলায়ন করা হয়; কোন দোষ না করিয়া কেন আমি পলায়ন করিব? আপনি সাধু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি আমাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিবেন না। আমার প্রতি যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, একদিন আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আপনি যাহা ভোজন করেন, জানিতে পারিলে এই ব্রাহ্মণের বাটী হইতে আমি তাহার আয়োজন করিয়া দিতে পারিব। ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন, আজ রাত্রিতে ফিরিয়া আসিবার কথা, তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া, বিদায় লইয়া, আপনার সঙ্গে আমি যাইব।"

সন্ন্যাসীর বদন গম্ভীর হইল। সেই গম্ভীর-বদনে তৎক্ষণাৎ আবার একটু হাসি আসিল। হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "মনিবকে না বলিয়া যাইতে নাই, এত দিনের পর সেই ভাব তোমার আসিয়াছে। কলিকাতায় যাইবার অগ্রে এইরূপ জ্ঞান যদি আসিত, মনিব অপেক্ষাও যিনি গুরুলোক, তিনি তোমার গর্ভধারিণী জননী, তাঁহার অনুমতি না লইয়া যদি তুমি পাপ-সাগরের স্রোতে সাঁতার দিতে না যাইতে, তাহা হইলে তোমার এমন দুর্দ্দশা হইত না। ছয় মাস পূর্ব্বে তোমাদের গ্রামে আমি গিয়াছিলাম, তোমার মাতা এখন যেখানে আছেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি; তাঁহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যে তিনি অধিক দিন বাঁচিবেন, এমন আশা নাই। ছয় মাসের কথা, এতদিনে সেখানে কি কি ঘটিয়াছে, আমি তাহা বলিতে পারি না। আরও একটা ভয়ঙ্কর কথা, দুঃখের দশায় পড়িলে অনেক সতী নারী ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন। তোমার বিবাহিতা স্ত্রী এখনও যুবতী, দেখিতেও পরমা সুন্দরী, ছিন্নবসনা, নিরলঙ্কারা, রুক্ষকেশা হইলেও তাহার রূপ লুকায় না। সেই তরঙ্গিণী—উঃ! সেই পরমা সুন্দরী তরঙ্গিণী; সেই তরঙ্গিণী এখন অহরহঃ ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, ধর্ম্ম তাহার একমাত্র ভরসা। যে পল্লীতে তরঙ্গিণী এখন আছে, সেই পল্লীর অনেক দুষ্টলোক নিত্য নিত্য তাহার সতীত্বধর্ম্ম নাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। দুষ্টলোকের চক্রে অবলা সতী নারী কত দিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়? এই সময়ে তুমি সেখানে উপস্থিত হইলে

ধর্ম্মের কৃপায় মঙ্গল হইতে পারে। তুমি তোমার মনিবের জন্য অপেক্ষা করিতে চাহিতেছ, কর্ত্তব্য হইলেও আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি; অবিলম্বে তুমি আমার সঙ্গে চল। বলিয়াছি তোমাকে, ছয় মাসের কথা। ছয় মাস কাল নানা-স্থানে আমি তোমার অন্বেষণ করিয়াছি, কোথাও পাই নাই। আজ তিনদিন হইল, একটী লোক আমাকে সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, এই গ্রামে তুমি আছ, খুঁজিয়া খুঁজিয়া এইখানে আসিয়া আমি তোমাকে ধরিয়াছি, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করিও না, অবিলম্বে আমার সঙ্গে চল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একদৃষ্টে বেচুর মুখপানে চাহিয়া, সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার বলিল, "যাহার মুখে আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি, পূর্ব্ব হইতে আমি তাহাকে চিনি-তাম। যখন তুমি পতনদশায় দুর্ভাগ্যকে ডাকিবার জন্য সুখস্বপ্ন দেখিতে, দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে যখন তোমার একটু সুখের অবস্থা হইয়াছিল, দেবতা-ব্রাহ্মণের সেই আশীর্ব্বাদ যখন তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে, বুদ্ধির দোষে যখন তুমি ধর্ম্ম-কথায় কর্ণপাত কর নাই, তৎকালে তোমার সঙ্গে জনকতক শনি জুটিয়াছিল। যে লোক আমাকে এখন তোমার ঠিকানা বলিয়াছিল, সেই লোক তোমার সেই শনি-দলের একজন। সুখের সময় যাহারা তোমার বন্ধু হইয়াছিল, তাহারা তোমার পরম শত্রু, তখন তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। কথায় কথায় তাহারা তোমাকে স্বর্গে তুলিত, এখন তাহারা তোমাকে এই নরকবাসে আনিয়া নাচিয়া বেড়াই-তেছে। তোমার কলিকাতার বড় বাসার সর্ব্বস্ব তাহারা লুটিয়া আনিয়াছে। তাহারাও তরঙ্গিণীর সতীত্ব চুরি করিবার মন্ত্রণায় ভিতর আছে। সমস্তই আমি জানিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র তুমি চল। তোমার স্মরণ না হইতে পারে, এক সময়ে আমি তোমার উপকার করিয়াছিলাম; এখনও উপকার করিবার ইচ্ছা আমি পোষণ করি। কেন তোমার হিতাকাঙ্ক্ষা আমার মনে উদয় হয়, অতি শীঘ্রই তাহা তুমি জানিতে পারিবে, আমাকেও হয় তো চিনিতে পারিবে।"

"আমাকেও হয় তো চিনিতে পারিবে।" সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা শুনিয়া বেচু অনেকক্ষণ স্থির-নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কোথায় কবে তাহাকে দেখিয়াছে, কোথায় কবে কিরূপে তাহার দ্বারা কি উপকার পাই-য়াছে, কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার বলিল, "চল আমার সঙ্গে। ছয় মাস পূর্ব্বে তোমার জননীর যে অবস্থা

আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তোমার পত্নীটী যে অবস্থায় আছে, তোমার কন্যাটী যেরূপে লালায়িতা হইয়া বেড়াইতেছে, তাহা মনে করিলে আমার হৃদয়ে বেদনা লাগে; এত দিনে তাহাদের কি দশা হইয়াছে, আমি বলিতে পারি না। মনিবের অপেক্ষা না করিয়া আমার সঙ্গে তুমি চল।"

আবার একটু চিন্তা করিয়া বেচু বলিল, "বেতনের টাকা বাকী আছে, তাহা ফেলিয়া কিরূপে যাই ?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "টাকার মায়া তোমার আছে, আমার কর্ণে এটী নূতন কথা। কত টাকা তোমার ছিল, কিরূপে কত টাকা তুমি উড়াইয়াছ, ভাবিবার যদি অবসর থাকে, একবার ভাবিয়া দেখ। গো-সেবা করিবার চাকর হইয়াছ, যৎসামান্য বেতন, তাহার জন্য কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? আমি সন্ন্যাসী, অর্থে আমার স্পৃহা নাই, কিন্তু আমার অর্থ আছে, আমি তোমাকে তোমার প্রয়োজনমত অর্থ দান করিতে পারিব।"

বিস্ময়ে নেত্র-বিস্ফারণ করিয়া, সন্ন্যাসীর দাড়ী-ঢাকা বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বেচু মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এ কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসী আমায় টাকা দিবে! এমন সন্ন্যাসী তো কোথাও দেখি নাই।"

বেচু যাহা ভাবিল, সন্ন্যাসী তাহা বুঝিল। যেরূপ বিস্ময় স্বভাবতঃই আসিতে পারে, বেচুর মনে সেই প্রকার বিস্ময়। ইহা বুঝিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ বেচারাম? যাহা আমি বলিলাম, তাহা সত্য। আমি তোমাকে টাকা দিব, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

বেচারাম আর মনিবের মুখ চাহিয়া থাকিল না, ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অগ্রে অগ্রে সন্ন্যাসী, পশ্চাতে বেচারাম।

যে গ্রামে বেচারামের জন্ম, সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেচারাম সেই গ্রামে উপস্থিত হইল। শিশুকালে স্বগ্রামে এই বেচারামের নাম ছিল বোঁচা, সহরের বাড়ীতে মাতাল হইয়া সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া বেচারাম খোঁড়া হইয়াছে। খাঁদা, বোঁচা, খোঁড়া। ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই ঘটে। বেচারামকে গ্রামের লোকে বেচারাম বলিয়া জানিত না, তাহার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহাও কেহ জানিত না, কলিকাতা সহরে নূতন নাম লইয়া, নূতন জাতি হইয়া বেচারাম যে সকল লীলাখেলা করিয়া আসিয়াছে, কাপ্তেনবাবু হইয়া যেরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে,

বেচারামের তখনকার মোসাহেবেরা ভিন্ন গ্রামের আর কেহ তাহা জানিত না, বেচারামকে এই সময় তদবস্থ দর্শন করিয়া গ্রামের সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

নিজ গ্রামে বেচারাম উপস্থিত। ভদ্রাসনবাড়ী ইতিপূর্ব্বে দেন-ডিক্রীতে নীলাম হইয়াছিল, অল্পমূল্যে একজন তাহা কিনিয়া রাখিয়াছে। খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বেচারাম সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল; হস্ত-ধারণ করিয়া ফিরাইয়া সন্ন্যাসী কহিল, "কোথায় যাও? এ বাড়ী আর তোমার নহে। আমি যেখানে লইয়া যাই, সেইখানে চল।"

বেচারামের জননী ভদ্রাসন ছাড়িয়া অপর একজনের বাড়ীতে চাকরাণী হইয়াছিল, বেচারামের পত্নী আপন কন্যাটীকে লইয়া স্বজাতীয় একজন গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিতেছিল, বেচারামের হিতাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী ইতিপূর্ব্বে তাহাই জানিয়া গিয়াছিল; এবারে আসিয়া শুনিল, দুটী চক্ষুহারা হইয়া অভাগিনী বৃদ্ধা ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তরঙ্গিণী দুইবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া অপর লোকের যত্নে বিফলমনোরথ হইয়াছে, সেই তরঙ্গিণী এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না; আছে কি নাই, তাহাও অনিশ্চিত। তরঙ্গিণী আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কেন, সন্ন্যাসী দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, কন্যার শোকে।

কেন? তরঙ্গিণীর কন্যা কি মরিয়া গিয়াছে?—না, মরে নাই; মরিলে বরং ভাল হইত; যাহা হইয়াছে, তাহা মরণাধিক।

পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, বেচারামের পত্নীর নাম তরঙ্গিণী। পূর্ব্বেই প্রকাশ আছে, নিকৃষ্টজাতি হইলেও তরঙ্গিণী পরম-রূপবতী; তর-ঙ্গিণীর কন্যাটীও রূপবতী হইয়াছিল, নাম হইয়াছিল যমুনা। সন্ন্যাসী যখন দেখিয়াছিল,—ছয় মাসের কথা, যমুনার বয়স তখন আট বৎসর। এই ছয় মাসের মধ্যে কত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া তাহার কিছু কিছু জানিতে পারিল। যমুনা একদিন একটা পুকুরধারে খেলা করিতেছিল, দুইজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া, একখানা গাড়ীতে তুলিয়া, উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে। কোথায় লইয়া রাখিয়াছে, কেহ কেহ তাহাও জানিতে পারিয়াছে। হতভাগিনী যমুনা। যাহারা তাহাকে চুরি করিয়া

লইয়া গিয়াছিল, একশত পঁচশ টাকা মূল্যে তাহারা তাহাকে বেচিয়া ফেলিয়াছে। কোথায়?—কলিকাতায়।—কাহার নিকটে?—যাহাদের নিকটে গুপ্তভাবে বালিকা-বিক্রয় চলে, তাহাদের একজনের নিকটে। যমুনা এখন সহরের এক বেশ্যালয়ে আশ্রয় পাইয়াছে। মনুষ্য-বিক্রয় আইন-নিষিদ্ধ। মোকদ্দমা করিলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষেই দণ্ডনীয় হইত, কিন্তু যমুনার পক্ষে মোকদ্দমা করিবার লোক ছিল না, যে বাড়ীতে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল, সে বাড়ী হইতে অনেক দূরে সেই ক্রয়কারিণী তাহাকে সরাইয়া ফেলিয়াছিল, তদবধি আর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। কন্যার ঐ গতি শুনিয়া দারুণ শোকে তরঙ্গিণী আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। তরঙ্গিণী বাঁচিয়া আছে। কোথায় আছে, সন্ধান জানিয়া সন্ন্যাসী সেইখানে গিয়া বেচারামকে দেখাইল।

দুঃখের কাহিনী ছোট হইলেও অনেক বড় হয়। বহু দুঃখভোগ করিয়া তরঙ্গিণী বাঁচিয়াছিল, স্বামীকে দেখিয়া অনেকটা কাঁদিল, তাহার পর শান্ত হইল।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেচারাম। যে যেখানে থাকে, কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়। যাহারা কপাল মানে না, তাহারা এ সংসারে অদ্ভুত লোক। কপালের ফল তাহাদেরও ফলে, কিন্তু তাহারা আসল কারণ বুঝিতে পারে না। বেচারামের কপালের ফল ফলিতেছে, বেচারাম তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ছোটবেলা এই বেচারাম আপন গ্রামের লোকের কাছে বোঁচা াম ছিল, তাহার পর পাখীমারা অবস্থায় বুঁচু হইয়াছিল, অবস্থা একটু ভাল হইলে মোসাহেবেরা তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া, বেচারাম সিংহ বলিয়া পরিচয় দিয়া, কলিকাতার কায়স্থসমাজে গণনীয় করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে কাপ্তেনবাবু হইয়া বেচারামের পতন হয়।

পুনর্মূষিক হইয়া বেচারাম যখন খানসামাগিরী চাকরী করে, সেই সময় সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এ সকল কথা পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ আছে। নিজ গ্রামে আসিয়া বেচারাম যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার বক্ষে শেলাঘাত হইল। মহাদুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়া তাহার জননী পরলোকযাত্রা করিয়াছেন, ক্ষুদ্র কন্যাটী বেশ্যাদ্বারে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণী বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া না থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু কপালের ভোগ অবশ্যই ভুগিতে হইবে, সেই কারণে তরঙ্গিণীর প্রাণান্ত হয় নাই। বেচারামের স্ত্রীর নাম তরঙ্গিণী, এ কথা পাঠক-মহাশয় জানেন।

পার্শ্ব ধরা পাখী-মারা অবস্থায় বেচারাম যে বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল, যে বাড়ীতে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, এই অবস্থায় বেচারাম পুনরায় সেই বাড়ীতে উপস্থিত। তরঙ্গিণী সেইখানেই ছিল, জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবরা তরঙ্গিণীর সহিত বেচারামের সাক্ষাৎ হইল; উভয়েই কাঁদিল। কে তরঙ্গিণীকে সেখানে আনিয়া রাখিয়াছিল, একটু পরেই সে কথা প্রকাশ পাইবে।

সেই বাড়ীতে বেচারাম আছে। একটী স্ত্রীলোক আসিয়া সর্ব্বদা তাহাকে সান্ত্বনা করে, উভয়কেই আহার দেয়, দুঃখে পড়িলে লোকের কি গতি হয়, সেই প্রকারের পাঁচ রকম গল্প করে। স্ত্রীলোকটী বেচারামের চেনা, তরঙ্গিণীরও চেনা; বেচারাম কিন্তু তাহার সকল কথায় মন দেয় না; মনও দেয় না, কাণও দেয় না; পাগল যেমন শূন্য-নয়নে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায় বেচারামও সেইরূপে উদাস-নয়নে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করে। সে যখন একাকী থাকে, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া এ ঘর, ও ঘর, এ ধার, ও ধার, বৃক্ষতলা, সরোবরতীর মন্দিরের ধার, নিকটের ছোট ছোট জঙ্গলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়; কাহাকে যেন অন্বেষণ করে। কাহাকেও কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

খোঁড়া বেচারাম। কি প্রকারে খোঁড়া হইয়াছে, পাঠক-মহাশয়েরা কলিকাতার বিলাসগৃহে সে পরিচয় অবগত হইয়াছেন। প্রায় নিত্য নিত্যই বেচারাম ঐরূপে নানাস্থানে যেন কাহারও অন্বেষণ করে। যে স্ত্রীলোক তাহাকে সেখানে আনিয়া সস্ত্রীক আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, সে একদিন সন্ধ্যাকালে জিজ্ঞাসা করিল, "বেচু তুমি কি অন্বেষণ কর? তোমার কি বস্তু হারাইয়াছে?"

বেচু উত্তর করিল, "বস্তু নহে, মনুষ্য।"

স্ত্রীলোক। কোন্ মনুষ্য?

বেচু। একটী সন্ন্যাসী।

স্ত্রীলোক। সন্ন্যাসীকে তুমি কোথায় পাইয়াছিলে?

বেচু। আমি পাই নাই, তিনি দয়া করিয়া নিজেই দেখা দিয়াছিলেন; তিনিই দয়া করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছেন।

স্ত্রীলোক। ওঃ! সেই সন্ন্যাসী? আমি তাহাকে চিনি।

বেচু। চেনো তুমি? বলিতে পার, কোথায় তিনি?

স্ত্রীলোক। বেশ বলিতে পারি।

বেচু। বল দেখি, কোথা তিনি গিয়াছেন?

স্ত্রীলোক। কোথাও জান নাই, এইখানেই আছেন।

বেচু। এইখানে? কোথায় তবে? আমি তবে দেখিতে পাই না কেন?

স্ত্রীলোক। দেখিতে পাও, কিন্তু চিনিতে পার না।

বেচু। আমি চিনিতে পারি না, তুমি চিনিতে পার, এটা তোমার কেমন কথা?

স্ত্রীলোক। কথা বেশ। আমি যদি দেখাই, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে।

বেচু। দেখাও।

স্ত্রীলোক। এই দেখ। আমিই সেই সন্ন্যাসী।

বেচারামের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না, অনেকক্ষণ অনিমেষে সেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ? তুমি স্ত্রীলোক, তিনি জটাধারী সন্ন্যাসী, তোমাকে আমি সন্ন্যাসী বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

স্ত্রীলোক বলিল. বিশ্বাস তোমাকে করিতেই হইবে। তোমার যখন কুবুদ্ধি ধরিয়াছিল, আমি সেই সময় তোমাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া ভাল পথে আনিয়াছিলাম, আমি তোমার বিবাহ দিয়াছিলাম, আমি তোমার জন্য এই বাড়ীখানি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলাম। তোমার বিবাহের পর আমি বলিয়াছিলাম, 'এ বাড়ীও তোমার, সে বাড়ীও তোমার।' সে সব কথা কি তুমি স্মরণ করিতে পার?"

বেচারাম বলিল, "সব কথা আমার মনে আছে। সে সকল কথা কেন তুমি তুলিতেছ? আমি বলিতেছি, সন্ন্যাসী বলিয়া কিরূপে আমি তোমাকে জানিতে পারিব, সেই কথার উত্তর দাও।"

স্ত্রীলোক বলিল, "সেই কথার উত্তর আমার কাছেই আছে। তুমি কলিকাতায় গিয়া বাবু হইয়াছিলে, জনকতক ধূর্ত্তলোক তোমার মোসাহেব হইয়াছিল। তোমার কাপ্তেনী টাকায় তাহারা দেশে আসিয়া বাবু হইয়াছে, তুমি ফকির হইয়াছ। আমি তোমার বিস্তর অন্বেষণ করিয়াছিলাম, সন্ধান পাই নাই। অতি অল্পদিন হইল, তোমার সেই মোসাহেবদলের একজনের সহিত আমার

দেখা হয়, তাহারই মুখে শুনি, তুমি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পা ভাঙ্গিয়া অমুক জায়গায় অমুক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চাকর হইয়া আছ। নিজ বেশে সেখানে গেলে তোমাকে আমি আনিতে পারিব না, তুমিও আমাকে দেখিয়া লজ্জা পাইবে, তাই ভাবিয়া আমি সন্ন্যাসীবেশে সেখানে গিয়াছিলাম।"

পাঠকমহাশয় বুঝিতে পারিলেন, সেই সন্ন্যাসীই এই দয়াবতী ধীবরকন্যা রাসমণি। এই স্ত্রীলোকের সদ্‌ব্যবহারে বেচারামের পূর্ব্বশ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বেচারাম এখন তাহাকে চিনিল, রাসমণিই সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল, ইহা বুঝিল, রাসমণির পায়ে ধরিয়া কাঁদিল।

যাহার সুমতি থাকে, জীবনকালের মধ্যে বিশেষ কারণ ব্যতীত তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে না। রাসমণি মৎস্য বিক্রয় করিয়া বেচারামকে ও তাহার পত্নী তরঙ্গিণীকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। বেচারাম এক এক দিন রাসমণির সঙ্গে হাটে যায়, মৎস্য বিক্রয় করে; এক এক দিন খালে বিলে অল্পস্বল্প মৎস্য ধরিয়া আনে, এই রকমে এক বৎসর গত হয়। দৈবের কর্ম্ম, মৎস্য ধরিতে গিয়া একদিন সর্পাঘাতে রাসমণির মৃত্যু হয়; বেচারাম আবার বেয়াড়া হইয়া উঠে। মজুরী না করিলে তাহার আর দিন চলে না। পূর্ব্বের মোসাহেবগণের মধ্যে দুইজন বেশ বড়মানুষ হইয়াছিল, রাসমণির বাড়ীতে বেচারাম আছে, এই সংবাদ পাইয়া তাহারা নিত্য নিত্য বেচারামকে মজুর ধরিয়া লইয়া যায়। অভাগা বেচারাম খোঁড়া হইয়া অবধি বেশী পরিশ্রমের কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু ছোটলোকে নূতন বড়মানুষ হইলে তাহাদের বড় অহঙ্কার হয়, তাহার উপর বেচারামকে জব্দ করিবার ইচ্ছা; বেচারাম একটু আলস্য করিলে জেলখানার দস্তুরের মত সপাসপ বেত বসায়, রক্তধারা প্রবাহিত হয়; বেচারাম শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। তরঙ্গিণী জার্ণা-শীর্ণা হইয়াছিল, রাসমণির যত্নে তাহার শরীরে আবার লাবণ্য ফুটিয়াছিল, তরঙ্গিণীকে দেখিলে নীচজাতীয় বলিয়া মনে করা কাহারও সাধ্য ছিল না। তরঙ্গিণী পরমা সুন্দরী; একটীমাত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহাতে রূপ নষ্ট হয় নাই; যে দেখিত, সেই ভাবিত, পূর্ণ-যুবতী। যে দুইজন নূতন বড়মানুষের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে একজন বেচারামকে বলিয়াছিল, 'তরঙ্গিণীকে যদি আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিস্, তাহা হইলে তোদের দুজনকে আমি চিরজীবন প্রতিপালন করিব,

সুখে রাখিব, কোন কাজ করিতে হইবে না।" বেচারাম সে কথায় কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কোন উত্তর দেয় নাই। তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়া থাকাই তাহার সম্বল। তাহাতে বেচারামের সম্মতি বুঝিয়া সেই পাপিষ্ঠ লম্পট প্রতিদিন লোক লাগাইয়া তরঙ্গিণীকে রাজি করিবার জন্য, ধরিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা পায়, চেষ্টা বিফল হইলে ধরিয়া আনিবার হুকুম দেয়। প্রহারে প্রহারে স্বামী শয্যাগত, ইতিপূর্ব্বে কন্যাটী চুরি গিয়াছে, মনস্তাপে ইতিপূর্ব্বে তরঙ্গিণী দুইবার আত্ম-ঘাতিনী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, চেষ্টা সিদ্ধ করিতে পারে নাই, এবারে আর সামলাইতে পারিল না। একদিন ঊষাকালে পাড়ার লোকেরা দেখিল, একটা পুকুরধারে তেঁতুলগাছের ডালে অভাগিনী তরঙ্গিণী গলায় দড়ী দিয়া ঝুলিতেছে।

খোঁড়া বেচারাম শয্যাগত হইয়াছিল, অল্প অল্প আরাম হইল; কিন্তু তরঙ্গিণীর অপঘাতমৃত্যুতে সে যেন একরকম পাগল হইল। যাহার ভাগ্যে বারম্বার বেশী বেশী দুর্ঘটনা হয়, তাহার পাগল হইয়া যাওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য কথা নহে। তরঙ্গিণীর মৃত্যুর পর বেচারামকে সে গ্রামের কেহই আর দেখিতে পায় নাই। বাড়ী ছাড়িয়া বেচারাম কোথায় গেল, কি হইল, কেহই কিছুই জানিতে পারিল না। পাঁচমাস পরে জনরবে জনরবে সংবাদ পৌছিল, একটা নদীর চড়ার নিকটে বৃহৎ এক অশ্বত্থবৃক্ষের শিকড়ে বেচারামের মৃতদেহ আট্‌কাইয়া-ছিল, পুলিসের লোকেরা তুলিয়া চালান দিয়াছে। লোকেরা অনুমান করিল, নৌকাতে দাঁড় টানা বেচারামের অভ্যাস ছিল, খোঁড়া মানুষ, দাঁড় টানিতে টানিতে হয় ত তুফানের সময় জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বেচারামের জীবনের এই পর্য্যন্ত উপসংসার। বেচারামের ভাগ্যের ন্যায় অনেক লোকের ভাগ্য ইহসংসারে ঐরূপ ফল দেখায়। হীনবংশে জন্মিয়া কিঞ্চিৎ বিষয়ের অধিকারী হইয়াও কলিকাতায় আসিয়া বদমাসলোকের মন্ত্রণায় কায়স্থ সাজিয়া বোঁচারাম ওরফে বেচারাম বাঁক একজন কাপ্তেন হইয়া পরিশেষে আবার স্বদেশে ফকির হইয়া, জলে ডুবিয়া মরিল, বেচারামের নামটাও ডুবিয়া গেল।

কলিকাতায় কেবল ঐ একটা বেচারাম কাপ্তেন হইয়াছিল, এমন কথা নয়, শত শত বেচারাম নয়নগোচর হয়। কেহ কেহ বলেন, বাহিরের লোকেরাই কলিকাতায় কাপ্তেন সাজিয়া থাকেন, এ কথাও ঠিক নহে। সত্য বটে রাজা

সাজিয়া, জমীদার সাজিয়া, সদাগর সাজিয়া, জহরী সাজিয়া বাহিরের অনেক জুয়াচোর কলিকাতার লোককে ঠকাইয়া যায়, কিন্তু কলিকাতার এক একজন বড়বাবু বড় বড় কাপ্তেন হইয়া অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করেন, আপনারাও পথের ভিখারী হইয়া জীবনলীলায় অবসান করিয়া থাকেন। বেচারামের দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া পাঠকগণ কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে কলিকাতার লোকের অনেকটা উপকার হইতে পারে।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

বঙ্গরহস্য।

[নূতন নক্সা]

বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃতির আলোচনা।

সমালোচক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী ইলেক্ট্রো মেসিন প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১

বঙ্গরহস্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

একাদশ তরঙ্গ।

সমাজ-সংস্কার এবং ভারত-উদ্ধার।

ভবানন্দপুরের ভবরত্ন চৌধুরী একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ। শিশুকালে তাঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইলে ভবরত্নের ভাগ্যফলাফল অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ভবরত্নের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সহোদর-সহোদরা তাঁহার কেহই ছিল না, জননী ছিলেন, ঐ শিশুপুত্রটী লইয়া তিনি কিছুদিন তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া বাস করেন। ভবরত্নের মাতামহ তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, পিত্রালয়ে ভবরত্নের জননীকে অনেক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত। তিনি সতী-সাধ্বী রমণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল যোগমায়া দেবী। তাঁহার পতি নীলরতন চৌধুরী ইংরাজ-সরকারে নিমক-মহলে কর্ম্ম করিয়া অনেক টাকার সম্পত্তি করিয়াছিলেন, দুই তিনখানি জমীদারীও হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সকল বিষয় কি প্রকারে হস্তান্তর হইয়া গিয়াছিল, যোগমায়া দেবী তাহার কিছুই জানিতেন না; সংসারে অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে অগত্যা

তিনি দরিদ্র পিতার ভবনে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিপদ্ যখন উপস্থিত হয়, কুগ্রহ যখন প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে, তখন পদে পদেই অমঙ্গল ঘটে। হঠাৎ একদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যোগমায়া দেবী অদৃশ্য হন, তাঁহার পিতা এবং প্রতিবাসী লোকেরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কোথাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। সকলেরই অনুমান হইয়াছিল, তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেবল অনুমান মাত্র নহে, গ্রামের অনেক লোকের উহাতেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নদীতে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু হইলে কোথাও না কোথাও মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে ; যোগমায়ার মৃতদেহ কোথাও ভাসিয়া উঠিয়াছিল, এমন কথা কিন্তু কেহই শ্রবণ করেন নাই, জনরবের মুখেও কিছু প্রকাশ পায় নাই।

ঐ ঘটনা যখন হয়, তখন ভবরত্নের বয়স পাঁচ বৎসর। জননী ভিন্ন ভবরত্ন ইহসংসারে আপনার বলিয়া আর কাহাকেও চিনিত না, জননী-বিয়োগে তাহার শোকের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাহার বৃদ্ধ মাতামহ আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, মিষ্টকথায় অনেক বুঝাইতেন, বালক কিছুতেই প্রবোধ মানিত না, কিছুতেই জননীকে ভুলিতে পারিত না, সাত আট দিন কেহ তাহাকে অন্ন আহার করাইতে পারে নাই। গঙ্গাজলে জননী ডুবিয়া মরিয়াছেন, লোকের মুখে অজ্ঞান বালক সেই কথা শুনিয়াছিল, সে যেন মনে করিত, গঙ্গাতীরে গেলেই জননীকে দেখিতে পাইবে, জননী জল হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইবেন ; এইরূপ ভাবিয়া বালক নিত্য নিত্য প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী গঙ্গাতীরে চলিয়া যাইত, গঙ্গায় তরঙ্গ হইতেছে, নৌকা ভাসিতেছে, মনুষ্য খেলা করিতেছে, এই সকল চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গের মধ্যে, নৌকার মধ্যে, মানুষের মধ্যে জননীকে খুঁজিত, দেখিতে পাইত না, মা মা বলিয়া ডাকিয়া অশ্রুধারে ভাসিয়া গঙ্গার চড়ার উপর বসিয়া পড়িত। জানা-শুনা লোকেরা তাহাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য বার বার ডাকিত, বালক তাহা শুনিত না, বলপূর্ব্বক হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতে হইত। পথে আসিতে আসিতে মাতৃহারা বালক ক্রমাগত চীৎকার করিয়া কাঁদিত।

প্রায় এক বৎসর এই প্রকার। কেহই ভবরত্নকে শান্ত করিতে পারে না। ভবরত্নের মুখে হাসি নাই, মা মা রব ভিন্ন অন্য কোনও কথা নাই, সমবয়স্ক

বালকগণের সহিত খেলা নাই, আমোদ-কৌতুক কিছুই নাই। ক্ষুধা হইলে ভবরত্ন কাহারও নিকটে খাদ্য চাহিয়া লয় না, পিপাসা হইলে কাহারও নিকট জল চাহে না, নিদ্রা আসিলে ধূলাতেই শয়ন করিয়া পড়ে; সেইটুকু ছেলে সংসারের সকল বিষয়েই যেন উদাসীন।

যোগমায়াদেবীর নিরুদ্দেশের পর তাঁহার পিতাঠাকুর মহাশয়ের একটা শক্ত পীড়া জন্মিয়াছিল, প্রায় দুই বৎসর সেই ব্যাধি যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া তিনি লোকান্তরে গমন করেন। ভবরত্ন তাঁহাকেও কতক কতক চিনিয়াছিল, তিনিও চলিয়া গেলেন, ভবরত্নের চক্ষে সমস্তই অন্ধকার। মাতামহী ছিলেন না, দুটী মাতুল ছিল, তাহারা বিদেশে চাকরী উপলক্ষে পরিবার লইয়া বাস করিত, সংসারে কিছুমাত্র সাহায্য করিত না; অধিক কথা কি, বৃদ্ধ পিতার সংবাদমাত্র লইত না। তাহাদের ভরসা মিথ্যা! তাহারা যে ভগিনীপুত্রকে বাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিবে, সে আশা ছিল না। যোগমায়ার একটী মাসী ছিলেন, তিনিই তখন সেই সংসারের একমাত্র অভিভাবিকা। ভবরত্ন তাঁহাকে মানিত না, তাঁহার কথা শুনিত না, তিনি ডাকিলে নিকটে যাইত না, হাত ধরিয়া আদর করিতে আসিলে বালক অধীর হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইত।

অতি নিকট প্রতিবাসীর মধ্যে একজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুনাথ তর্কবাগীশ। সম্পর্কে তিনি যোগমায়ার মাতুল হইতেন, যোগমায়ার মাসী তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। মাসীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ভবরত্নের অবাধ্যতা শ্রবণ করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় একদিন সর্ব্বমঙ্গলাকে বলিলেন, "দেখ মঙ্গলা! ছেলেটীকে পাঠশালে দাও; সাত বৎসর বয়স হইয়াছে, আর কি! মা বাপ নাই বলিয়া ছেলেকে মূর্খ করিয়া রাখা ভাল কথা নয়। আরও কি জানো, পাঠশালে না দিলে ঐ রকমে বেদাব হইয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবে, কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইবে, কোথায় কবে কি রকমে হয় তো বিখোরে মারা যাইবে, সেটাও তো ভাবিতে হয়। পাঠশালে দাও। সকাল বিকাল দুই বেলা সেখানে আটক থাকিবে, বেশী দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না, অধবাশ অল্প হইলেই ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে।"

সপ্তমবর্ষীয় বালক ভবরত্ন পাঠশালে প্রেরিত হইল। সেই পাঠশালে যিনি শিক্ষা দিতেন, তিনি ভবরত্নের পিতৃকুলের পরিচয় জানিতেন। ভবরত্ন তাঁহার

নিকটে বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু শিক্ষার দিকে মন থাকিল না। গুরুমহাশয় তাহাকে কিছু কিছু শিখাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, আগ্রহ বিফল হয়। সর্ব্বমঙ্গলাদেবী ভবরত্নকে বেশ আদর-যত্ন করেন, সন্ধ্যার পর কাছে বসাইয়া নানাপ্রকার রাজারাণীর গল্প বলেন, লেখাপড়া শিখিলে তুমিও রাজা হইতে পারিবে, এই কথা বলিয়া শিশুকে লেখা-পড়ায় মনোযোগী করিবার চেষ্টা পান। গুরুমহাশয়ের চেষ্টা বিফল হইতেছিল, সর্ব্বমঙ্গলার চেষ্টা বিফল হইল না, ছয়মাস ঐরূপ গল্প শুনিতে শুনিতে, ঐরূপ উপদেশ পাইতে পাইতে বালকের মন অন্যদিকে ফিরিল; লেখাপড়ায় মনোযোগ হইল।

স্বভাবতঃ ভবরত্ন বেশ বুদ্ধিমান্; শৈশবাবধি প্রতিভার বিকাশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। গুরুমহাশয় বুঝিলেন, ভবরত্ন একটী প্রতিভা, ইহার প্রতিভা-শক্তি এক সময়ে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি যত্ন পূর্ব্বক ঐ বালককে পাঠশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য বালক এক বৎসরে যাহা শিক্ষা করে, ভবরত্ন তিনমাসে তাহা আয়ত্ত করিয়া লয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে এখনকার ন্যায় শিক্ষাপ্রণালী ছিল না। কতক কতক নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, কিন্তু গ্রাম্য পাঠশালার পূর্ব্বপ্রণালী সম্পূর্ণ-রূপে সংশোধিত হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের দশবৎসর পূর্ব্বের কথা। তিন বৎসর পাঠশালায় লেখা-পড়া শিখিয়া ভবরত্ন পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিল। যতদূর শিখিল, তাহার অধিক সে পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত না, সীমার বাহির হইলে গুরুমহাশয়কেও হাত গুটাইতে হইত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল; গুরুমহাশয় হাত গুটাইলেন, ভবরত্নের গ্রাম্যবিদ্যা সমাপ্ত।

ভবরত্নকে লইয়াই আমাদের কথা। অপরাপর ছাত্রের কি হইল, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। ভবরত্নের পাঠ সাঙ্গ হইল, ভবরত্ন আর পাঠশালায় আসিবে না, সর্ব্বমঙ্গলার নিকটেই থাকিবে, আমাদের পাঠক-মহাশয়েরা হয় তো ইহাই মনে করিয়া লইতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ ঘটনা হইল না। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু অন্য পাঠের জন্য ভবরত্নকে প্রস্তুত হইতে হইল। সে পাঠ গুরুমহাশয়ও জানিতেন না, ভবরত্নের জানিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সংসারে প্রবেশ করিবার অগ্রে সংসারের এক ভয়ঙ্কর পাঠের অভিনয়ে ঐ দশমবর্ষীয় বালককে মহলা দিতে হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐ পাঠশালার গুরুমহাশয়টী ভবরত্নের পিতৃকুলের পরিচয় জানিতেন। ইতিমধ্যে একদিন ডাকযোগে তিনি একখানি পত্র পান; পত্রখানি দীর্ঘ, পত্রে অনেক কথা লেখা ছিল; গুরুমহাশয় সেই দীর্ঘ পত্র পাঠ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ভবরত্নের দিকে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, এক এক সময় তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। কারণ কি, তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই, গুরুমহাশয়ও কাহাকে কিছু বলেন নাই। সর্ব্বমঙ্গলা যে দিন ভবরত্নের গৃহে যাইবার বিলম্ব দেখিয়া অন্বেষণের নিমিত্ত পাঠশালায় উপস্থিত হন, গুরুমহাশয় সেই দিন তাঁহাকে বলেন, "ভবরত্ন আর তোমার কাছে যাইবে না, উচ্চশিক্ষার জন্য ভবরত্নকে একটী উত্তম স্থানে পাঠাইতে হইবে; ভবরত্নের অতি নিকট আত্মীয় একটী ভদ্রলোক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। যত দিন সেখানে প্রেরণ করিবার সুবন্দোবস্ত না হয়, তত দিন ভবরত্ন আমার কাছে থাকিবে। তুমি গৃহে গমন কর, ভবরত্নের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই; ভবরত্ন সেখানে সর্ব্বপ্রকার সুখে বাস করিবে। উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহে চলিয়া যাও।"

ভবরত্ন সেইখানেই উপস্থিত ছিল, তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে নেত্রজল মার্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী অগত্যা তথা হইতে একাকিনী ফিরিয়া আসিলেন, গুরুমহাশয়ের আশ্রমে ভবরত্ন রহিল।

নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরে ভবানন্দপুর। শান্তিপুরের দক্ষিণাংশে ঐ নামে একখানি গ্রাম ছিল, সে নাম এক্ষণে বদল হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ কয়েক বর্ষব্যাপী মারীভয়ে তথাকার ভদ্র ভদ্র অধিবাসী লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন, গ্রামের অধিকাংশ স্থান এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ভবরত্নের পিত্রালয় ছিল সেই ভবানন্দপুরে, সেই ভবানন্দপুরেই ভবরত্নের জন্ম, এই কারণেই ভবানন্দপুরের ভবরত্ন চৌধুরী পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভবরত্নের মাতামহাশ্রম হুগলী জেলার গঙ্গাতীরে।

ভবরত্ন এখন কোথায়? সর্ব্বমঙ্গলাদেবী গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে গৃহে চলিয়া গেলেন, গুরুর আশ্রমে ভবরত্ন রহিল, এই পর্য্যন্তই বলা হইয়াছে, তাহার পর দশ বৎসর কাল ভবরত্ন কোথায় ছিলেন, সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের দশ বৎসর পূর্ব্বে ভবরত্নের বয়স ছিল দশ বৎসর; ভবরত্ন এখন নিকটে থাকিলে বলা যাইতে পারিত, ভবরত্নের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ। ভবরত্ন বাঁচিয়া আছে কি না, এই দশবৎসর কাল কেহ সে কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। কেই বা জিজ্ঞাসা করিবে? সংসারে যাহার মাতাপিতা নাই, স্নেহাস্পদ সহোদর নাই, শিশুকালে যাহাকে দেশত্যাগী করা হয়, তাহার তত্ত্ব লইবে কে? কেবল এইটুকু মাত্র জানা হইয়াছিল যে, সর্ব্বমঙ্গলার বিদায়ের অষ্টাহ পরে সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় ভবরত্নকে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। কোথায় পাঠাইয়াছেন, কেহই তাহা জানিত না। পাঠশালার গুরুমহাশয় একটী মাতৃপিতৃহীন বালককে কি কারণে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কি স্বার্থ ছিল, তিনিই তাহা জানেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই বালককে স্থানান্তরিত করিয়াছেন কিম্বা অন্য কাহারও উপদেশ ছিল, তাহাও প্রকাশ নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে ভারতরাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাস হয়; তদুপলক্ষে কলিকাতা রাজধানীতে মহারাণীর নূতন ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল; সেই দিনটী মহোৎসবের দিন বলিয়া সমস্ত লোকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরে ঘরে ঘরে নিশাকালে সমুজ্জ্বল দীপমালা শোভিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ গড়ের মাঠে সমারোহের সীমা ছিল না; আলোকমালা এবং আতসবাজী প্রভৃতি দর্শনার্থ নানাস্থানের বহুলোক গড়ের মাঠে জমা হইয়াছিল। সে সময় কলিকাতা সহরে গ্যাস-লাইটের নূতন প্রবর্ত্তন; ইংরাজটোলার দুটী পাঁচটী বড় বড় রাস্তায় এবং দুটী পাঁচটী প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় গ্যাসের আলো জ্বলিয়াছিল; ময়দানের সমুচ্চ মনুমেণ্ট-স্তম্ভ আগা-গোড়া আলোকমণ্ডিত করিবার জন্য তৈলপূর্ণ শিশি ঝুলাইয়া দিয়া সন্ধ্যাকালে জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দর্শক লোকেরা সেই রজনীতে ঐ স্তম্ভটীকে রত্নমণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই রজনীতে অক্টারলোনী মনুমেণ্টটী সত্যই যেন মণিহার অঙ্গে পরিয়াছিল।

বহুলোকের সমাগম। কোন্ দেশ হইতে কত লোক আসিয়াছিল, তামাসা দর্শন করিয়া তাহাদের মধ্যে কে কোথায় গেল, কে কোথায় রহিল, সে কথা

কে বলিবে? একটী লোক শূন্য-হস্তে সমস্ত রাত্রি নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া শেষরাত্রে গঙ্গাতীরের একটী বাঁধাঘাটের চাঁদনীতে শয়ন করিয়া ছিল। দুইজন পাহারাওয়ালা তাহাকে তুলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, বিদেশী নিরাশ্রয় বলিয়া লোকটী পরিচয় দেয়; রাত্রিকালে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তাতেও এক এক জন পুলিস-প্রহরী তাহার পরিচয় চাহিয়াছিল, তাহাদের নিকটেও ঐরূপ পরিচয়। সঙ্গে কোন জিনিসপত্র ছিল না; সেই জন্য আটক করিয়া রাখে নাই; কিন্তু শেষরাত্রে গঙ্গার ঘাটে যাহারা ধরিল, তাহারা তাহাকে থানায় লইয়া যাইতে চাহিল। বিনা অপরাধে পুলিসের থানায় কেন যাইবে, এই ভাবনা করিয়া লোকটী কিছু ম্রিয়মাণ হইল।

লোকটীর চেহারা অতি সুন্দর। দিব্য গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, স্থূলাঙ্গ, দীর্ঘ নাসা, দীর্ঘ নেত্র, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ কেশ, কর্ণমূল হইতে উভয় গণ্ডের উভয় পার্শ্বে মসৃণ চামর সদৃশ সুন্দর গালপাট্টা, দিব্য চোমরা গোঁফ, পরিধান হিন্দুস্থানী ধরণের সবুজবর্ণ চুড়িদার পায়জামা, তাহার উপর দীর্ঘ আলখাল্লার ন্যায় বুকবন্ধ চাপ্‌কান, মস্তকে রক্তবর্ণ পাগ্‌ড়ী। বয়স অনুমান একুশ কি বাইশ বৎসর।

পুলিসের লোকের সঙ্গে ঐ লোকটীর যখন বচসা হয়, রাত্রি তখন অধিক ছিল না; লোকটী বলিতেছিল, "থানায় আমি যাইব না, যাহারা অপরাধ করে, তাহারাই থানায় যায়, আমি কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে তোমরা কেন ধর?" পুলিস বলিতেছে, "আল্‌বোৎ যানে হোগা।" উভয় পক্ষই অতঃপর হিন্দি কথা আরম্ভ করিল। পাহারাওয়ালাদের কথা অপেক্ষা সেই অপরিচিত লোকটীর হিন্দী বিশুদ্ধ। লোকটী যেন দস্তরমত হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছে কিম্বা হিন্দুস্থানে তাহার জন্ম, ভদ্রসমাজের রীতি-নীতিতে সুশিক্ষিত, কথাবার্ত্তা শুনিলে তাহাই প্রতীত হয়।

কথায় কথায় রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, ঊষাকাল উপস্থিত। কার্ত্তিকমাস। এই মাসে নগরের অনেক নরনারী গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন। যে ঘাটে ঐরূপ বচসা হইতেছিল, একটী ভদ্রলোক ঊষাকালে সেই ঘাটে স্নান করিয়া চাঁদনীতে দাঁড়াইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন চাকর ছিল, চাকরের হস্তে একগাছি লাঠী আর বাবুটীর তর্পণের কোশাকুশি সঙ্গে গাড়ী ছিল না, বাবু পদব্রজে আসিয়াছেন, পদব্রজেই গৃহে যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা

ছিল। পুলিসের সঙ্গে একটী বিদেশী লোকের জোর জোর তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, শুনিয়া সেই বাবুটী তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইলেন, কি কারণে বিবাদ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুলিস বলিল পুলিসের কথা, লোকটী বলিল তাহার নিজের কথা। অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রহরীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তী বাবুটী কহিলেন, "কেন তোমরা এই লোকটীকে আটক করিতে চাহিতেছ? চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভদ্রলোকের সন্তান; সঙ্গে এমন কোনও জিনিষ পত্র নাই, যাহা দেখিলে কোনও প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে। বিদেশী লোক, কলিকাতায় উৎসব দেখিতে আসিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া পুলিসে লইয়া যাইবার কোনও আইন নাই। তোমরা অবশ্য ঘাঁটীর প্রহরী, কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভদ্রলোকের স্নানের ঘাটে এতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিয়া, রিপোর্ট করিলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল হইবে না; তবে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছ, কিছু জলপানি লইয়া চলিয়া যাও, নির্দ্দোষ লোকটীকে আমার জিম্মায় ছাড়িয়া দাও।" বাবুর ইঙ্গিতে বাবুর চাকর ঐ দুইজন পাহারাওয়ালাকে দুটী সিকি দিল, তাহারা বক্সিস পাইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বলা উচিত প্রহরীরা ঐ বাবুকে চিনিত।

প্রহরীরা বিদায় হইলে বাবু সেই লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটী বলিল, "আমি তীর্থপর্য্যটক, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামে গিয়াছিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের অভিলাষে তিন বৎসর কাশীতে ছিলাম, সাহেবের সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া সাহেবলোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে, লোকমুখে সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি শুনিলাম, বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভারত-শাশনভার সহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের প্রধান প্রধান নগরে মহোৎসব হইবে; অন্যান্য স্থানাপেক্ষা রাজধানীর মহোৎসবে সমধিক সমারোহ হওয়াই সম্ভব, ইহা ভাবিয়া আজ তিনদিন হইল আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। বাগবাজারের মদনমোহনজীর বাড়ীতে অতিথি হইয়া দুই রাত্রি বাস করিয়াছি। গতরাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে এইঘাটে শয়ন করিয়াছিলাম।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়?" লোকটী উত্তর করিল, "কাশীর অধ্যাপকেরা আমার নাম দিয়াছেন শিবপ্রসাদ পণ্ডিত। পর্য্যটকের নিবাস বলিবার প্রয়োজন নাই, যেখানে যখন উপস্থিত হইয়াছি,

সেই স্থানেই তখন নিবাস হইয়াছে, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া নিবাস বলিতে পারিব না।"

পণ্ডিত শিবপ্রসাদ এইরূপ পরিচয় দিলেন, কোথায় জন্মস্থান, প্রকৃত কি নাম, তাহা কিছু প্রকাশ করিলেন না; জাতির পরিচয়ে কেবল এইটুকু প্রকাশ পাইল যে, তিনি ব্রাহ্মণ।

পরিচয়ের প্রশ্ন আর কিছু না বাড়াইয়া বাবু শেষকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি তোমার পর্য্যটনে যাইবার ইচ্ছা আছে?" শিবপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ এই রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করি; তাহার পর ভগবান্ যেখানে লইয়া যাইবেন, সেইখানেই যাইতে হইবে। কলিকাতায় থাকিব, এইরূপ অভিলাষ, কিন্তু আমার আশ্রয় নাই।"

একটু চিন্তা করিয়া বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব; তুমি আমার সঙ্গে চল। ধর্ম্মশাস্ত্রে তোমার জ্ঞান জন্মিয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কলিকাতায় থাকিয়া তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা কর, তদ্বিষয়ে আমি তোমায় সাহায্য করিব, আমার সঙ্গে তুমি আমার বাড়ীতেই চল।"

এই সময় গঙ্গাস্নানের অনেক যাত্রীতে ঘাট পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবু তাঁহার চাকরকে একখানা ঠিকাগাড়ী ডাকিতে বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিতে শিবপ্রসাদ সম্মত হইলেন, গাড়ী আসিল, শিবপ্রসাদকে লইয়া বাবু আপন বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

সিমুলিয়া পল্লীতে সেই বাবুর বাড়ী। বাড়ীখানি দিব্য বড়মানুষী কেতায় নির্ম্মিত, বাহিরে যোড়া যোড়া গোল থামে সবুজবর্ণ ঝিলিমিলি দেওয়া টানা বারান্দা, সেই বারান্দার নীচে বড় বড় ঘরে দপ্তরখানা। ভিতরদিকে একখানি তিন-ফুকুরে দালান, তিনদিকে চক, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। অন্দরমহল কিরূপ, শিবপ্রসাদ তাহা দেখিলেন না। বাবু তাঁহাকে উপরের বৈঠকখানায় লইয়া বসাইলেন।

বাড়ীর জাঁকজমক যে প্রকার, দপ্তরখানার আড়ম্বর যে প্রকার, তদুপযুক্ত লোকজন দৃষ্ট হইল না। দপ্তরখানায় কেবল তিনটীমাত্র আমলা, তাহাদের মধ্যে দুইজন মুহুরী আর একজন প্রাচীন নায়েব অথবা সর্দার কর্ম্মচারী; দেউড়ীতে

কেবল একজনমাত্র দরোয়ান। যে চাকরটী গঙ্গাস্নানের সময় বাবুর সঙ্গে গিয়াছিল, সকল কার্য্যে শিবপ্রসাদ কেবল তাহাকেই তৎপর দেখিলেন, অন্য কোন চাকরকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবগতিক দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন, বাবু হয় ত কিছু কৃপণ-স্বভাব।

বাবুর নাম ব্রজরত্ন চৌধুরী। তিনি একজন জমীদার, জমীদারী ছাড়া কলিকাতামধ্যে বাহাদুরী কাষ্ঠের কারবার আছে। পাঁচ সাত দিন থাকিতে থাকিতে শিবপ্রসাদ জানিতে পারিলেন, বাবুর বার্ষিক আয় প্রায় একলক্ষ টাকা, খরচপত্র অতি সামান্য। তাঁহার পুত্র-কন্যা কেহই ছিল না, নিজেই তিনি সব। তাঁহার একটী পত্নী আছেন, তাঁহার হাত কিছু দরাজ, সেই কারণে মধ্যে মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে কলহ হয়। বাবু ব্রজরত্ন ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন, বক্তৃতা করিবার শক্তিও জন্মিয়াছে ; ব্রাহ্মণ, পাণ্ডিত উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিচার করা তাঁহার একটী আমোদের কার্য্য। তিনি গঙ্গাস্নান করেন, গঙ্গায় তর্পণ করেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অতি কম। তিনি স্পষ্টই বলেন, "পুরাণাদি শাস্ত্রে পরস্পর মিলন নাই, শাস্ত্রের অনেক কথাই মিথ্যা।" আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এমন উৎকট দিন ছিল না, তথাপি এক একটী ধূমকেতু দেখা দিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট নক্ষত্র উদ্ভাসিত হইত ; সেই সংযোগে জাতীয় ধর্ম্ম-বিপ্লব অল্পে অল্পে সংঘটিত হইয়া পড়িত। ব্রজরত্ন বাবু সেই দরের একটী ধূমকেতু। বয়স কিছু ভারী, কিন্তু আধুনিক নববঙ্গ-যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা সহজ-জ্ঞানের মর্য্যাদা রাখিয়া চলেন, নূতন দন্ত উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা দেশের সমস্ত আচার-ব্যবহারকে উপহাসে উড়াইয়া কথায় কথায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, ব্রজরত্নবাবু সেই দলের সমান মতাবলম্বী ছিলেন, ইহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

পণ্ডিত শিবপ্রসাদ বারাণসীধামে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সুপারিসে তুষ্ট হইয়া বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন। কাশীর চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্য, দর্শন এবং পুরাণশাস্ত্রাদি শিক্ষার অতিরিক্ত বেদ বেদান্তের আলোচনা হইয়া থাকে। ব্রজরত্নবাবু বেদান্তের বিচার করিতেও ভয় করেন না ; ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি ধরিয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরা পরস্পর যেরূপ আমোদ-কৌতুক করিতে ভালবাসেন, বেদান্তের নিগূঢ় সারমর্ম্মের দিকে না

গিয়া তিনি কেবল ভাসা ভাসা কথায় সেইরূপে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের চেষ্টা পান। পণ্ডিত শিবপ্রসাদের সহিত সেই বিষয়ের বিচার হইবে, শিবপ্রসাদকে গৃহে রাখিলে অনেক দিন ধরিয়া বিচারের নাগাড় চলিবে, অপরাপর পণ্ডিত আসিলে শিবপ্রসাদকে সম্মুখে হাজির করিবেন, এই মৎলবেই আদর করিয়া অপরিচিত শিবপ্রসাদকে আনয়ন করা হইয়াছে।

বাবু ব্রজরত্ন কোন সুনিপুণ অধ্যাপকের নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করেন নাই, সামান্য সামান্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রজ্ঞ দুই একজন ভট্টাচার্য্যের মুখে গোটাকতক শ্লোক শ্রবণ করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন, দুই একটী শ্লোক মুখস্থ করিয়াছেন, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, প্রকৃত কি অপ্রকৃত, তাহা তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা অল্প; শ্লোকের উচ্চারণে কোথায় কিরূপ যতি-বিরামাদি রাখিতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা ছিল না, তথাপি শিবপ্রসাদের সহিত বেদান্তের বিচারে তাঁহার সাহস হইয়াছিল। শিবপ্রসাদ সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি অধিক অনুরাগী, বেদান্ত-শিক্ষায় তিনি অধিক যত্ন করিয়াছেন, পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত ব্রজরত্নবাবু একদিনের বিচারেই পরাস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পরাভবকে পরাভব বলিয়া স্বীকার না করিয়া পুনঃ পুনঃ গর্ব্বভরে অভিমানভরে নূতন নূতন বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন; মনে মনে হাস্য করিয়া পণ্ডিত শিবপ্রসাদ আপনার নূতন আশ্রয়দাতার মৌখিক অনুরোধ রক্ষা করিতেন; বিচার তাঁহার পক্ষে একটা কৌতুকের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। বাবু শ্লোক পাঠ করিতেন, শিবপ্রসাদ তাহা শুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন, বাবু মনে মনে চটিতেন, মুখে কিছু প্রকাশ করিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে শিবপ্রসাদের নিকট অনেকটা শিক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে অপমান হইবে, এইটী স্থির ভাবিয়া অহঙ্কারবশে সে চেষ্টা করিতেন না; নিজের জিদ্ বজায় করিবার জন্য তিনি কেবল গলাবাজী করিয়া জয়লাভের চেষ্টা করিতেন।

জিদ্ বজায় কদিন চলে? ক্রমাগত দুইমাসকাল শিবপ্রসাদের সহিত কুতর্ক-বিচারে পরাভূত হইয়া তিনি তখন অন্যদিকে মন ফিরাইলেন। একদিন সন্ধ্যার পর, কেহ যখন নিকটে ছিল না, সেই সময় শিবপ্রসাদকে ডাকিয়া, সুমিষ্ট সম্ভাষণে তিনি কহিলেন, "দেখ শিব! তুমি বালক, শাস্ত্রে তোমার অধিকার জন্মে নাই, ধর্ম্মের বিচার বড় শক্ত কথা, সে বিচারে তুমি এখন আর কাহারও সহিত তর্ক

করিও না। তুমি বুদ্ধিমান্, অনেক পরিচয়ে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাকে আমি রাখিব। প্রথমেই তুমি আমাকে বলিয়াছ, তোমার আশ্রয় নাই, দেখ শিব, সে জন্য তুমি ভাবিও না ; আমি তোমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ-যত্ন করিব। এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শাস্ত্রাভ্যাস ভিন্ন তুমি আমাদের দেশের ব্যাবহার্য্য আর কি কি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ ?"

অনেকক্ষণ বাবুর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া শিবপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "কি কি বিদ্যা আমি অভ্যাস করিয়াছি তাহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। কেন না, বিদ্যার শেষ নাই, সংখ্যা নাই, শিক্ষার সীমাও নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যখন আমি বাঙ্গালাদেশে ছিলাম, তখন চলনসই বাঙ্গালা ভাষা এবং গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি ; তাহার পর, একটী আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অল্প অল্প ইংরাজীও অধ্যয়ন করিয়াছি ; হিন্দুস্থানে পর্য্যটন করিবার সময় কিছু কিছু হিন্দীভাষা শিক্ষা হইয়াছে ; হিন্দুস্থানী লোকের হিন্দীকথা বুঝিতে পারি, হিন্দুস্থানীকে বুঝাইবার মত হিন্দীকথাও বলিতে পারি। সর্ব্বশেষে কাশীধামে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করা হইয়াছে।"

একটু চিন্তা করিয়া বাবু কহিলেন, "অত কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তুমি কেবল বৃথা-পর্য্যটন কর নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বিষয়কার্য্য তোমার জানা আছে কি না ?"

শিবপ্রসাদ বলিলেন, "পুস্তকপাঠে যতদুর জানা যায়, তাহা আমি আয়ত্ত করিয়াছি, কিন্তু হাতেকলমে কোথাও কোন জমীদারীকার্য্য আমি করি নাই।"

বাবু ব্রজরত্নের লম্বা লম্বা দাড়ী ছিল, অর্দ্ধেক চুল পাকা, অর্দ্ধেকগুলি কাঁচা ; অযত্নে বামহস্ত দ্বারা সেই দাড়ীতে ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে গম্ভীরবদনে তিনি বলিলেন, "বেশ বেশ, প্রণালী-শিক্ষা করা থাকিলেই দেখিতে দেখিতে কার্য্য-পটুতা জন্মিয়া থাকে। আমার সেরেস্তায় পাকা পাকা মুহুরী আছে, তাহারা তোমাকে সকল কার্য্য শিখাইয়া দিবে ; দুই একমাস দেখিলেই অতি সহজে তুমি সমস্ত কার্য্য শিখিয়া লইতে পারিবে। সেই কথাই ভাল। তুমি আমার সেরেস্তাতেই কাজকর্ম্ম শিক্ষা কর, পরিপক্কতা জন্মিলে আমি তোমার উপযুক্ত বেতন ধার্য্য করিয়া দিব। তোমার যেরূপ বুদ্ধি-চাতুর্য্য দেখিতেছি, তাহাতে আমার প্রত্যয় জন্মিতেছে, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি আমার সেরেস্তার প্রধান

কর্ম্মচারীর পদ অধিকার করিতে পারিবে। কল্য অবধি সেরেস্তার কার্য্যেই তুমি নিযুক্ত থাকিও।"

শিবপ্রসাদ সম্মত হইলেন। অন্তরে তখন তাঁহার দুটী ভাব। একভাবে বিষয়কার্য্যের উল্লাস, দ্বিতীয়ভাবে অন্তরে অন্তরে বিস্ময়ের উদয়। শেষের ভাবটী কি কারণে, সেটী তাঁহার মনেই রহিল; সময়ে হয় তো প্রকাশ পাইবে।

কার্য্যক্ষেত্রে সেই দুটী ভাব গোপন রাখিয়া, বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শিবপ্রসাদ কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আশ্রয়দাতা পিতৃতুল্য, আপনার চরণে আমি প্রণিপাত করি। আমার মাতা-পিতা ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার মনে পড়ে না; আর কেহ আমার আপনার লোক আছেন কি না, তাহাও আমি জানি না; সংসার-সাগরে আমি ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম; সন্ন্যাসী নহি, তথাপি সর্ব্বদা মনে হইত, আমি যেন উদাসীন। অকূল সাগরে এখন আমি কূলপ্রাপ্ত হইলাম। আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, আপনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেছেন, ইহাতে আমি জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছি।"

বাবু সেই সকল কথা ভাল করিয়া কাণ দিয়া শুনিলেন কি না, তাহা বুঝা গেল না, একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন, "আর দেখ, আমি তোমাকে বিশ্বাসী পাত্র বলিয়া জানিয়াছি, হিসাবপত্র রাখিবার সময় খুব সাবধান থাকিও, জমাখরচে নিত্য নিত্য কৈফিয়ৎ কাটা হয়, যত টাকা তহবিলে মজুত থাকে, তাহার একটা হিসাব তুমি তোমার নিজের কাছে রাখিও, প্রতিদিন রাত্রিকালে সেই হিসাবের একটা নকল আমাকে দিও।"

শিবপ্রসাদ নমস্কার করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বাবু তাঁহাকে আরও অনেক প্রকার উপদেশ দিলেন, সে সকল উপদেশের সহিত বিষয়-কর্ম্মের সম্বন্ধ অল্প, অতএব সেগুলি এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক বোধ হইল।

জমীদারী সেরেস্তায় শিবপ্রসাদ মুহুরী হইলেন। সেরেস্তার মুহুরীরা তাঁহাকে কাজ-কর্ম্ম শিখাইয়া দেয়, বৃদ্ধ নায়েব তাঁহার কাজকর্ম্ম দেখেন, শিবপ্রসাদ দিন দিন সমস্ত কার্য্য মন দিয়া শিখিতে লাগিলেন। দুই বৎসর গত হইল। সেরেস্তার যে সকল কার্য্য অতিশয় কঠিন, শিবপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে সে সকল কার্য্যের অন্ধি-সন্ধি বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি বিলক্ষণ প্রখর ছিল, যেগুলি স্মরণ রাখিতে হয়, বিদ্যালয়ের পাঠের ন্যায় তাহা তিনি মুখস্থ করিয়া রাখেন।

বাবু মধ্যে মধ্যে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, খাতাপত্র না দেখিয়া শিবপ্রসাদ মুখে মুখে ঠিক ঠিক তাহার উত্তর দেন। বাবু বড়ই সন্তুষ্ট হন।

আরও এক বৎসর অতিক্রান্ত। বৃদ্ধ নায়েবের মৃত্যু হইল, শিবপ্রসাদ নায়েব হইলেন।

নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিবপ্রসাদ পণ্ডিত ছয়মাসকাল যেরূপ সুনিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া বাবুর প্রত্যয় জন্মিল, তিনি স্বয়ং এখন অবধি বিষয়-কার্য্য না দেখিলেও কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না; ইহা স্থির জানিয়া বিষয়-কার্য্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন।

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি করিলেন কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি উত্তম; সমাজ-সংস্কারে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া সেই শক্তির চালনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। যে সময়ের কথা, সে সময় কলিকাতায় বক্তার সংখ্যা অধিক ছিল না; এখন যেমন বিদ্যালয় হইতে বাহির হইলেই শিক্ষিত ছাত্রেরা দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার নাই, সেই বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তখনকার দিনে এমন ছিল না। একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন, তিনি মাননীয় রামগোপাল ঘোষ। তিনিও সমাজ-সংস্কারের দিকে ঢলিয়া পড়েন নাই: রাজনীতির আন্দোলনে, জমীদারীর বন্দোবস্তে এবং আইন-আদালতের তর্কে তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইত; সমাজের সম্বন্ধে যাহা যখন তিনি বলিতেন, তাহা প্রাচীন রীতি-নীতির রক্ষণ-বিষয়ে অনুকূল হইত। রাজ-পুরুষেরা যদি এ দেশের ধর্ম্মানুগত সমাজ-প্রচলিত কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন-চেষ্টা পাইতেন, যাহাতে হিন্দু-হৃদয়ে কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে, এমন কোন প্রস্তাব যদি উত্থিত হইত, বাবু রামগোপাল ঘোষ ন্যায়ানুগত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সেই সকল প্রস্তাবের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিতেন; তাহাতে আশামত সুফলও ফলিত। এখনকার মত সমাজ-সংস্কারের তুফানও তখন ছিল না।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি করিলে হিন্দু-সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাই চিন্তা করিয়া তিনি মনঃকল্পিত পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করিতেন, এই এই প্রথা মন্দ, এই এই প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তীব্রতর হেতুবাদ দেখাইয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন। তখন

হিন্দুসন্তানের বিলাত-যাত্রার ধূমধাম ছিল না, কালাপানি পার হইলে হিন্দু-সন্তানের জাতি যায়, ইহাই সকলের ধারণা ছিল। রাজা রামমোহন রায় বিলাতে গিয়াছিলেন, তিনি আর দেশে ফিরিয়া আইসেন নাই; বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনিও হিন্দু সমাজের সংস্কার-বদলের চেষ্টা পান নাই; সে কথাটা এক প্রকার চাপা পড়িয়াই গিয়া ছিল। ব্রজরত্ন বাবু হিন্দুর বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই; তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম ছিল, জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া আর প্রতিমাপূজা রহিত করা। তাঁহার নিজের আচার-ব্যবহার কি প্রকার ছিল, সকলে তাহা জানিতেন না। তবে, কেবল এইটুকু মাত্র প্রকাশ ছিল যে, জাতিভেদ মানিতেন না; সুবিধা ঘটিলে সাহেবের সঙ্গে খানা খাইতেও তিনি আমোদ অনুভব করিতেন। খানা খাইবার সময় সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে হয়, বাবু ব্রজরত্নের ভালরূপ ইংরাজী জানা ছিল না, সেই কারণে বড় একটা তিনি খানার মজলীসে যোগ দিতে যাইতেন না। বক্তৃতা করিবার সময় কিন্তু আহার-বিহারে কোন দোষ নাই বলিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেন। কেবল শিক্ষা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রত্যেক বক্তৃতার বৈঠকে তিনি স্পষ্ট স্পষ্ট বলিতেন, জাতিভেদ উঠাইয়া না দিলে কস্মিন্‌কালেও ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে না। আজকাল যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করেন, তাঁহারা ঐ কথাটার উপরেই বেশী জোর রাখেন; নবীন নবীন বক্তারা উহার উপর আরও দুই তিন মাত্রা চড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বজাতির সহিত আহার-ব্যবহার যেমন প্রয়োজন, সর্ব্বজাতির পুত্র-কন্যার পরস্পর আদান-প্রদানও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার হিন্দুরা ক্রমশ দুর্ব্বল হইতেছে, কোন বলবান্ জাতির সহিত তাহাদের কন্যার বিবাহ চলিলে বলবান্ সন্তান জন্মিবে, ক্রমশ আবার এই হীনবীর্য্য বাঙ্গালীজাতি বীরজাতি হইয়া উঠিবে। একবার একজন ধুরন্ধর বক্তা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিলাতের গোরার সহিত বাঙ্গালী-কন্যার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই সকল কন্যার গর্ভে বীরপুত্র জন্মিবে, সাহেবেরা আদর করিয়া সেই সকল পুত্রকে ইংরাজ-সেনাদলে গ্রহণ করিবেন, বাঙ্গালীর দুর্ব্বল অপবাদ দূর হইয়া যাইবে, পরস্পর সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরীর মস্তকে ততদূর উচ্চভাবের উদয় হয় নাই; তিনি কেবল প্রতিমার উপর আর হিন্দুজাতির উপর দেশের অবনতির

প্রধান হেতু নির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার আর একটী গুণ ছিল, সকল স্থলেই তিনি বলিতেন, হিন্দুরা ধর্ম্মবিশ্বাসে কপটাচারী; প্রতিমা-পূজা, হরিনাম জপ, হরিমৃত্তিকার কৌটা, হরিনামাবলী ইত্যাদি ধর্ম্মভাণে চরিত্র ঢাকিবার ছলে হিন্দুরা অনেক অসৎকার্য্য করিয়া থাকে, সদাচার তাহাদের কাছে লজ্জায় ম্রিয়মাণ। এই ভাণ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু যদি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, অপ্রবঞ্চক, সরল এবং পরোপকারী হয়, তাহা হইলে সভ্যতম ইংরাজজাতি এই হিন্দুকে যথেষ্ট সমাদর করিতে পারেন। বাঙ্গালী-হিন্দুর ঐ সকল গুণ নাই বলিয়া ইংরাজেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। জাতি-পরিচয়ে ইংরাজী ভূগোলে বর্ণিত আছে, "বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্ বটে, কিন্তু ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসাধু।" লর্ড মেকলে বাঙ্গালী-চরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "ব্যাঘ্রের যেমন নখর, মহিষের যেমন বিষাণ, ভীমরুলের যেমন সুতীক্ষ্ণ হুল, বাঙ্গালীর প্রবঞ্চনাও তদ্রূপ।" বড় বড় ইংরাজেরা বাঙ্গালীর প্রতারণা-বুদ্ধিকে অধিক তেজস্বিনী বলিয়া নিন্দা করেন। সেই নিন্দার হেতু যাহাতে দূর হয়, সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করা বাঙ্গালীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রকার নানা প্রসঙ্গ লইয়া, নানা প্রকারে হিন্দুর নিন্দা করিয়া, কল্পিত অপবাদে হিন্দুধর্ম্মকে অসত্য বলিয়া ব্রজরত্নের বক্তৃতার উপসংহার হইত। বাঙ্গালী-চরিত্রে নানা দোষ, বক্তামহাশয়ের মৌখিক ব্যাখ্যা ঐরূপ। তিনিও অবশ্য বাঙ্গালী ছিলেন, বক্তৃতা করিবার সময় হয় তো সেটা তাঁহার মনে থাকিত না কিম্বা হয় তো তিনি আপনাকে সর্ব্বাংশে নিষ্কলঙ্ক মনে করিতেন। কেবল মনে করিয়াই মনের কথা লুকাইয়া রাখিতেন, এমনও নহে, লোকে তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক ভাবুক, এই প্রত্যাশায় মুখের কথায় সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেও তিনি ত্রুটি করিতেন না; লোক ভুলাইবার মৎলবে বাহিরের এক একটা কার্য্যে তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব জানাইবার চেষ্টা পাইতেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি কেবল প্রতিমা-পূজা উঠাইয়া দিবার উপদেশ দিতেন, ব্রহ্ম-মন্দির স্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম-নাম ধারণ করিবার উপদেশ তাঁহার মুখে একদিনও কেহ শ্রবণ করে নাই।

বাঙ্গালী-মণ্ডলী-সম্মুখে ব্রজবাবু অম্লান-বদনে বাঙ্গালীর ধর্ম্মনিন্দা করিতেন, ব্যবহারনিন্দা করিতেন, দেবনিন্দা করিতেন, বাঙ্গালী শ্রোতারা আহ্লাদে কর-তালি দিয়া তাঁহার প্রশংসা করিত। করতালির দ্বারা বাহবা দেওয়া হয়, সেটা কি ভাব, এ দেশের সকলে তাহা বুঝেন না; নিজ নিজ বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণতায় যাঁহারা

তা'হা বুঝেন, তাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া অপরকে বুঝাইয়া বলেন, "সম্মুখে করতালি দেওয়া প্রশংসা, পশ্চাতে করতালি দেওয়া উপহাস।" এই ব্যাখ্যা ইংরাজীমতে সুসঙ্গত, আমাদের মতে সুসঙ্গত কি না, সেটী বুঝিতে কিছু কষ্ট হয়।

ধর্ম্মভাণের আবরণে বাঙ্গালী অনেক অসৎ কার্য্য করে, এইটী ছিল ব্রজরত্ন-বাবুর প্রত্যেক বাক্যের ধুয়া; কিন্তু তিনি স্বয়ং বিনা আবরণে কোন অসৎ-কার্য্য করিতেন কি না, অপরকে তাহা জানিতে দিতেন না; না দিলেও অনেক লোকে তাহা জানিতে পারিত। বক্তৃতা শুনিবার সময় করতালি দিয়া যাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত, তাহারা গুহ্যকথা জানিত না, ইহাই সম্ভব, কিন্তু যাহারা জানিত, তাহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইত না। এখনকার দিনে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানুষেরা মানুষের গাড়ী টানে; অজ্ঞান অশ্বের পরিবর্ত্তে ভক্ত মনুষ্যেরা সজ্ঞান অশ্বের কার্য্য করে, ইহা নূতন প্রথা। বাবু ব্রজরত্নের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

নিজের চরিত্র গোপন করিয়া অপরকে চরিত্রশোধনের উপদেশ দেওয়া হাস্যকর হয়, যত্ন বিফল হইয়া যায়। নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপরকে উপদেশ দিলেই গৌরবরক্ষা হইয়া থাকে। বাবু ব্রজরত্নের চরিত্র কেমন ছিল, তাহা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা সকলেই মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করিতেন।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী একজন জমীদার; আয়বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। উপায়গুলি সৎ কি অসৎ, তাহা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ তিনি অতিশয় ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। সৎকার্য্যে এক পয়সা ব্যয় করিতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইত, কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এখনকার মামলা-মকদ্দমায় সত্যের আদর কতদূর, যাঁহারা সর্ব্বদা মামলা-মকদ্দমা করেন অথবা আইন-আদালতের খবর রাখেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। টাকার জোরে সত্য অসত্য হয়, অসত্য সত্য হয়, প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে প্রতিবাসীর পুকুর চুরি হয়, জবরদস্ত ধনবান্ লোকের জিদ্ বজায় হয়, ইহা প্রায় অনেক লোকেই অবগত আছেন, বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী সেইরূপ কার্য্য বিস্তর করিয়া থাকেন। বাজে আদায়ের জন্য প্রজাপীড়ন করা, প্রজাকে খুন করা, কোন প্রজাকে আপন ইষ্টসিদ্ধির বিঘ্নকর জানিয়া মিথ্যা মকদ্দমার দায়ে তাহাকে উদ্বাস্তু করা তাঁহার অভ্যাস ছিল, এমন কথা বেহদ্দ

বলেন না। পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া আপন অধিকারমধ্যে দাঙ্গা বাধাইয়া দেওয়া, নিরীহ লোকের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া, জাল দলীল প্রস্তুত করাইয়া প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চনা করা তাঁহার নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল না।

এমন যে ব্রজরত্ন চৌধুরী, তিনিই ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দুজাতির সমাজ-সংস্কারক। সময়ের অনুগত হইয়া চলা অনেক লোকের অভ্যাস। এ দেশে সাহেব আসাতে সাহেবী চাল-চলন দেখিয়া কতকগুলি বাঙ্গালীর মন টলিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা যে ভাবে চলে, যে সব কথা বলে, যে প্রকার কাজ করে, যে প্রকারে বিবাহ করে, যে প্রকার ভোজন করে, সেই প্রকারের অনুকরণ করিতে অনেকেরই সাধ। দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সেই সকল লোকের মনের মত কথা বলেন, তাঁহার প্রতিই আন্তরিক ভক্তির উদয় হয়; ব্রজরত্নবাবু সেই শ্রেণীর লোকের সেই প্রকার ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

চিরদিন সমভাবে চলে না। এক সময়ে উত্থান, এক সময়ে পতন, জগতের নিয়মই এই। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া সন্ধ্যাকালে অস্ত যান, কমলিনী দিবাভাগে প্রস্ফুটিত হইয়া সন্ধ্যাকালে মুদিতা হয়, ঋতুবিশেষে দিবা-যামিনীও হ্রস্ব-দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রকৃতির ক্রোড়গত সমস্ত পদার্থেরই এইরূপ ভাব। মানবজাতি এ নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না; মহাপ্রতাপশালী মহাবীর্য্যবান্ পুরুষেরাও যথাসময়ে হীনপ্রতাপ, হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন। এমন কি, ইন্দ্রাদি দেবতারাও এক এক সময়ে অবসন্ন ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। চিরদিন কখনই সমান যায় না; সংসারের কেহই প্রকৃতি-দেবীর এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। বাবু ব্রজরত্নের পতনকাল উপস্থিত।

ইংরাজ-অধিকারে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদরী মহাশয়েরা এবং তাঁহাদিগের অধীনস্থ অনুচরেরা এ দেশের নানা স্থানে, হাটে, মাঠে, বাজারে, মেলাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভু যীশুখৃষ্টের মহিমা-কীর্ত্তন করেন; কীর্ত্তনের সুর ভুলিয়া এতদ্দেশীয় মানবগণের আরাধ্য দেব-দেবীর অযথা নিন্দা আরম্ভ করিয়া দেন। ক্রমাগত হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করিয়া ব্রজরত্নবাবুর সাহস বৃদ্ধি হইল; কেহই বাধা দিল না, কেহই প্রতিবাদ করিল না, কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তর্ক করিল না। তিনি মনে করিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়লাভ হইল, তাঁহার যুক্তির নিকটে পরাভূত হইয়া সকলেই সুপথে আসিল, অচিরাৎ বঙ্গদেশের

প্রতিমাপূজা উঠিয়া গিয়া হিন্দু-সমাজ নির্ম্মল হইবে। মদগর্ব্বভরে এই ধারণাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া পরিশেষে তিনি উল্লিখিত প্রচারকগণের ন্যায় তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিলেন; তাঁহার রসনায় দেবনিন্দা ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন বৈকালে তিনি শ্যামবাজারের খালধারে একটা প্রশস্ত ক্ষেত্রে বক্তৃতা করিতেছিলেন। সে দিনের শ্রোতা সহস্রাধিক। বক্তামহাশয় অভ্যাসানুসরে প্রথমেই আরম্ভ করিলেন জাতিভেদ; তাহার পর ধরিলেন দেবনিন্দা। শ্রোতারা সকলে তাঁহাকে চিনিত না। কলিকাতায় তাঁহার জন্ম নহে, মফস্বল হইতে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, কলিকাতায় কারবার করিতেছেন, অনেকগুলি টাকা করিয়াছেন, ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুই নাই, সুতরাং নামপ্রচার নাই, অনেকেই চিনিত না। তিনি একজন জমীদার; কেমন জমীদার—তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে বড় বড় জমীদার কলিকাতায় অনেক; সাধারণ লোকে কয়জনের খবর রাখে? অনেকের নিকট তিনি অপরিচিত। বক্তৃতার ভাবভক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই মনে করিল, তিনি একজন খৃষ্টান; অনেকেই অন্তরে অন্তরে তাঁহার উপর চটিল। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে দলের মধ্য হইতে একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অগ্রে সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়! আপনাদের দলের অনেকের মুখেই ঐরূপ বক্তৃতা আমরা শ্রবণ করি, তাহাতে আমাদের কি উপকার হয়, তাহা ত বুঝিতে পারি না। লাভের মধ্যে এই হয় যে, অজ্ঞান লোকের, বিশেষতঃ বালকবৃন্দের মন টলিয়া যায়। আপনি বলিলেন, সকল জাতির সহিত একত্রে ভোজন না করিলে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে বিবাহ না চলিলে হিন্দু-সমাজের মঙ্গল হইবে না। এ সকল কথার অর্থ কি, আমরা তাহা বুঝি না। আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজ রাখিয়া কাজ কি? হিন্দু-ধর্ম্মের নামটা বজায় রাখিয়াই বা ফল কি? মনে করুন, ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত সর্ব্বজাতির বিবাহপ্রথা চলিলে দেশময় বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে, কোন্ বংশে কাহার জন্ম, তাহার নির্ণয় থাকিবে না, আচার-ব্যবহারের বিচার থাকিবে না, স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া উঠিবে, সমস্তই একাকার হইয়া যাইবে। একাকার হওয়াই যদি সমাজের মঙ্গলের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে যাহাদের মধ্যে একাকার আছে তাহারা তবে সকলের মস্তকের উপর নৃত্য করিতে পারে না কেন?"

বক্তামহাশয় ঐ সকল কথার উত্তরে আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আপনি এখন চুপ করুন; আমার আরও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। আপনি বলিলেন, শিবের পরিধানবস্ত্র নাই, মাখিবার তৈল নাই, উদরে অন্ন নাই, ভিক্ষা তাঁহার জীবিকা, গাঁজা-সিদ্ধি শিবের মৌতাত, বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশুচর্ম্ম পরিধান করেন, তৈলের অভাবে ভস্ম মাখেন, হাড়ের মালা গলায় দেন, মাথায় সাপ রাখেন; অথচ শিবকে সন্ন্যাসী বলা যায় না, শিব যেন সংসারীর ন্যায় পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছেন; পার্ব্বতী অন্নদান করিলে শিবের উদর পূর্ণ হয়, নতুবা নিত্য উপবাস সার হইয়া থাকে; এমন যে শিব, সে শিব কি কখন জীবের মোক্ষ দান করিতে পারেন? শিবনিন্দার আড়ম্বর করিয়া আপনি এই সকল কথা বলিলেন। সমস্তই পুরাতন কথা। এ সকল উপকরণ আপনি কোথায় পাইলেন? পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রেই ঐরূপ বর্ণনা আছে। যাঁহারা পুরাণ-শাস্ত্রের প্রণয়ন-কর্ত্তা, তাঁহারাই শিবের উপাসক ছিলেন, উপাসক ভক্তেরা নিন্দা করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই কি আপনি বিশ্বাস করেন? দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞস্থলে যেরূপে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সে ভাব কি আপনি কল্পনা করিয়া আনিতে পারেন? কখনই পারেন না। আচ্ছা, নিন্দার কথা নিন্দাতেই থাকুক, আপনাকে আমার গুটীকতক জিজ্ঞাস্য আছে; সদাশিবকে আপনি কি দর্শন করিয়াছেন?—শিব ভিক্ষাজীবী, শিব কি কোন দিন আপনার দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন? শিবের বস্ত্র নাই, শিব কি কখনও আপনার নিকটে বস্ত্র চাহিয়াছিলেন? শিব গাঁজা খান, আপনি কি কোন দিন শিবের সঙ্গে একাসনে বসিয়া গঞ্জিকা-ধূম পান করিয়াছিলেন? অনেক কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কিন্তু মরুভূমে শস্যবীজ নিক্ষেপ করিলে কোন ফল হইবে না, এই কারণে নিরস্ত রহিলাম। সবিনয়ে আপনাকে নিবারণ করি, হিন্দুমণ্ডলীর সম্মুখে আপনি আর ঐ প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিবেন না।"

বক্তা-মহাশয় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, উগ্রস্বরে অধিকতর তেজস্বিতার সহিত দেব-দেবীর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। যাহারা শ্রবণ করিতেছিল, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাহাদের অনেকেই বক্তা-মহাশয়ের প্রতি মর্ম্মান্তিক

রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর বক্তার মুখে আবার অধিকতর ধর্ম্মনিন্দা শুনিয়া তাহারা যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইল; এককালে বহুলোকে সমস্বরে চীৎকার করিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইল, বক্তাকে সেই স্থলে প্রহার করিবে, এই প্রকার উপক্রম।

বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী অচতুর লোক ছিলেন না, লক্ষণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিলেন বেগতিক। বিপক্ষ বহুতর, তিনি একাকী। তাঁহার মতাবলম্বী অথচ প্রশংসাকারী যে কয়েকটী লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প, গণ্ডগোলকারিগণের ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদেরও শঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের মুখ দেখিয়া ব্রজবাবু সেই ভীতিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপায় কি? এরূপ ক্ষেত্রে বলপ্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করা নিষ্ফল; তাহাতে বরং বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। বহুজনতাস্থলে একটু তফাতে তফাতে দুই চারিজন পুলিস-প্রহরী বেড়ায়; সহস্রাধিক লোকের উগ্রমূর্ত্তির সম্মুখে তাহারাই বা কি করিতে পারিবে? এই সকল চিন্তা করিয়া ব্রজরত্নবাবু স্থির করিলেন পলায়ন।

কলিকাতার প্রান্তভাগে ঐরূপ সঙ্ঘটন; কলিকাতার দিকেই অধিক লোক; অতএব দক্ষিণদিকে না আসিয়া নিরাপদের আশায় তিনি তখন উত্তরদিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার অনুগত লোকেরা গণনায় অল্প ছিল, তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন প্রাণ লইয়া যে যে দিকে পাইল, ছড়িভঙ্গ হইয়া সে সেই দিকেই ছুটিয়া পলাইল। মোরিয়া লোকেরা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া, মার্ মার্ শব্দে হো হো করিয়া কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। কর্ত্তা তখন কি করেন, প্রাণপণে ছুটিয়া টালার সেতু পার হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে হাজার লোক।

কর্ত্তা ছুটিতেছেন,—প্রাণভয়ে ছুটিতেছেন,—টালা পার হইয়া বীরপাড়া ও পাইকপাড়ার সোজা রাস্তা ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন; পশ্চাদ্‌গামী লোকেরা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িয়াছে, এমন সময় এক অভাবনীয় মহাবিপদ্।

পৌষমাসের শেষ, বাবুর গায়ে একযোড়া রক্তবর্ণ শাল ছিল, দ্রুতবেগে ধাবিত হইবার সময় সেই শাল-যোড়াটা আলুথালু হইয়া বাবুর বুকের দিকে, পশ্চাদ্দিকে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, দুই দিকের শেষভাগ ভূতলে লুটাইতে-ছিল, দূর হইতে দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর; বোধ হইতেছিল যেন, কি একটা বৃহৎ

রক্তবর্ণ পদার্থ সদর রাস্তা দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ঠিক সেই সময় উত্তরদিক্ হইতে এক পাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিস মন্থরগতিতে দক্ষিণদিকে আসিতেছিল, একজন বালক সেই সকল মহিষের রাখাল; সেই বালকও তখন মহিষপালের অনেক পশ্চাতে। মহিষেরা লাল রং দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠে, ইহা সকলেই জানেন, রক্তবস্ত্রাবৃত বাবুকে দেখিয়া ভয় পাইয়াই হউক অথবা রাগভরেই হউক, সেই সকল মহিষ ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে শৃঙ্গ বক্র করিয়া, গ্রাবাভঙ্গী করিয়া, বাবুর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবু তখন প্রাণভয়ে ব্যাকুল, তিনি তখন সে দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই, আশে পাশে, একটু দূরে দূরে যে দুই পাঁচ জন লোক ছিল, রাস্তার ধারে দোকানে দোকানে যে সকল দোকানী ছিল, "শাল ফেলে দাও, শাল ফেলে দাও" বলিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। বাবু তখন সম্মুখদিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি শাল-যোড়াটা রাস্তার ফেলিয়া দিয়া বক্রপথে তিনি একখানা দোকানের দিকে ছুটিলেন। শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গে জামা-জোড়া ছিল না; ধার্ম্মিক সাজিয়া বক্তৃতা করিতে আসিয়াছিলেন, পায়ে একজোড়া চটিজুতা ছিল; যে দোকানের দিকে তাঁহার লক্ষ্য, সেখানা একজন মুচির দোকান; দোকানের সম্মুখ বড় একটা নর্দ্দমা, সে নর্দ্দমায় তখন অল্প অল্প জল ছিল, এক হাঁটু কাদা; সেই নর্দ্দমা পার হইবার সময় পায়ের চটিজুতা কোথায় উড়িয়া গেল, হুঁস ছিল না। বেলাও তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছিলেন, পৌষমাসের শেষ, বিলক্ষণ শীত, গা আদুড়, অনেক দূর দৌড়িয়া আসিয়াছেন, ভয়ে হৃৎকম্প, তাহার উপর শীতে কম্প, নর্দ্দমা পার হইবার সময় বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে চিৎপাৎ হইয়া সেই কাদার উপর পড়িয়া গেলেন; প্রায় উলঙ্গ। মুচির ছেলেরা খেলা করিবার ছলে সেই নর্দ্দমার জলে বড় বড় খেজুর-বেগলো ফেলিয়া রাখিয়াছিল, বড় বড় কাঁটা; সচরাচর খেজুরকাঁটাকে শালকাঁটা বলে, অনাবৃত অঙ্গে ব্রজবাবু সেই কর্দ্দমপূর্ণ জলে সেই সকল শালকাঁটার উপর পড়িলেন; পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে সেই সুতীক্ষ্ণ শালকাঁটা বিদ্ধ হইল, কর্দ্দমে সর্ব্বশরীর ডুবিয়া গেল।

"হাঁ হাঁ" করিতে করিতে জনকতক লোক সেই স্থলে উপস্থিত হইল। মহিষগুলা তখ ও সেই নর্দ্দমার ধারে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছিল, রাখাল আসিয়া

তাহাদিগকে ছড়ি মারিয়া ফিরাইয়া লইল। লোকেরা অতি সাবধানে নর্দ্দমায় নামিয়া, ধরাধরি করিয়া বাবুকে ডাঙ্গায় তুলিল। বাবু অচেতন। দুঃখের কথা না হইলে বলা যাইতে পারিত, যেন শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব!

সেই শীতে বাবুর সর্ব্বাঙ্গে জল ঢালিয়া উদ্ধারকর্ত্তা লোকেরা তাঁহার অঙ্গের সমস্ত কর্দ্দম ধৌত করিয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গে শালকাঁটা, অঙ্গের অনেকদূর পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছিল, টানিয়া বাহির করিবার উপায় ছিল না। দুই একজন লোক দুই একটা কাঁটা ধরিয়া টান দিয়াছিল, অজ্ঞান থাকিলেও বাবু সেই যাতনায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। শ্যামবাজারের যে সকল লোক তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল, তাহারা পাইকপাড়া পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায় নাই, এখন যেখানে চিৎপুর রেলওয়ের উচ্চসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, টালার ব্রাহ্মণপাড়ার মোড়ে সেই স্থান পর্য্যন্ত গিয়াই তাহারা ফিরিয়াছিল। তাহাদিগকে আর বৈরনির্য্যাতন করিতে হইল না, দৈবে হইতেই প্রতিফল ফলিল।

শ্যামবাজারে বাবুর গাড়ী ছিল, বাবু যখন পলাইলেন, তখন সে গাড়ী সঙ্গে আইসে নাই, জনতার লোকেরা সেখানা রাখিয়াছিল কি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তখন তাহা জানা গেল না। চিৎপুরের থানায় খবর হইল, থানার লোকেরা আসিয়া, খাটিয়ায় তুলিয়া, ব্রজবাবুর অচেতন দেহ থানায় লইয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া গায়ের কাঁটা বাহির করিবার চেষ্টা পাইলেন, কতক উঠিল, কতক উঠিল না। অঙ্গে প্রবেশ করিয়া যে সকল কাঁটার মুখ আধা-আধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা বাহির করা দুঃসাধ্য হইল। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর বাবুর অল্প অল্প জ্ঞান হইল, নিদারুণ বেদনায় তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শাল-যোড়াটী ধূলায় ধূসর হইয়া রাস্তার পড়িয়া ছিল, পুলিসের জিম্মায় তাহা রহিল, পরিহিত বস্ত্রখানি নর্দ্দমার কাদায় সমাধিপ্রাপ্ত হইল। পুলিস একখানি নূতন বস্ত্র দিয়া বাবুর সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ ঢাকিয়া রাখিল। ডাক্তারের পরামর্শে সেই রাত্রেই বাবুকে কালিকাতার হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়; সেখানে যথা-সম্ভব চিকিৎসা হইলে বাবু চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে থাকিতে নারাজ হইলেন, নিজ বাটীর ঠিকানা বলিয়া দিলেন, বাড়ীতেই চিকিৎসা হইবে। হাস-পাতালের ডাক্তারেরা তাহাতেই সম্মত হইলেন, বাবুকে বাড়ীতে প্রেরণ করা হইল; ভাল ভাল ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বশরীরে শেল বিদ্ধ হইলে যেরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা হয়, কল্পনা করিয়া তাহা বলা যাইতে পারে না। বাবু ব্রজরত্ন ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত্রি সেই যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কাঁটা বাহির করিবার সময় ডাক্তারেরা সে জ্ঞানটুকু থাকিতে দেন না, তীব্র ঔষধ-প্রয়োগে খানিকক্ষণ অজ্ঞান করিয়া রাখেন। পাঁচদিন চিকিৎসা হইল, অনেক কাঁটা বাহির হইল, কিন্তু যে সকল কাঁটা বদ্ধমূল হইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়াছিল, অঙ্গে অস্ত্র না করিলে তাহা বাহির হইবে না, সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসকেরা উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় শীতল জল দিয়া দেহ ধৌত করা হয়, সিক্ত বস্ত্র অঙ্গে ঢাকা দিয়া রাখা হয়, যে সময়ের যেমন অবস্থা, তাহা বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধ সেবন করান হয়। জ্বর আইসে নাই। জ্বর আসিলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, ডাক্তারেরা এই কথা বলিলেন, যাহাতে জ্বর না আইসে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন।

দুই দিন পূর্ব্বে মুখ-চোক এত ফুলিয়াছিল যে, কথা কহিবার শক্তি ছিল না, কোন বস্তু ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য ছিল না, নলের দ্বারা অল্প অল্প দুগ্ধপান করাইয়া জীবনরক্ষা করা হইতেছিল; সে ভাবটা কিছু কমিয়া আসিল, মুখের স্ফীত অংশ কিছু কমিল, দুগ্ধ এবং মাংসের সুরুয়া পান করাইবার ব্যবস্থা হইল, অল্প অল্প কথা ফুটিল। সপ্তাহ পরে একজন ডাক্তারের সাক্ষাতে মৃদুস্বরে ব্রজরত্ন বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি, আমি বাঁচিব না; আমার একজন মুহুরীকে আমার কাছে রাখিয়া আপনারা ক্ষণকালের জন্য অন্য গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন, আমার কতক-গুলি কথা আছে, সেইগুলি লিখাইয়া দিব।"

কথাগুলি বলিবার সময় বাবুর দুটী চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িল। রোদন করিতে নিষেধ করিয়া ডাক্তারেরা সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, একজন মুহুরীকে বাবুর কাছে আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইল।

বাবুর পরিবার, দুইজন দাসী, একজন চাকর আর পণ্ডিত শিবপ্রসাদ প্রায় সর্ব্বক্ষণ বাবুর নিকটে থাকেন, ডাক্তারেরা যখন আসেন, গৃহিণী তখন একটু সরিয়া যান।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। সেরেস্তার একজন মুহুরী বাবুর গৃহে প্রবেশ করিল। বাবু তাহাকে কি এক প্রকার ইঙ্গিত করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ

গৃহের জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গৃহের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী টেবিলের উপর দুইখানি কেতাব আর দোয়াত, কলম, কাগজ রক্ষিত ছিল, বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "লিখিবার সরঞ্জামগুলি এইখানে লইয়া আইস, উপরের কেতাবখানি আমার হাতে দাও।"

মুহুরী তাহাই করিল। পার্শ্বে একটী রূপার গেলাসে সুশীতল জল ছিল, এক চুমুক পান করিয়া বাবু পুনরায় ধীরে ধীরে মুহুরীকে বলিলেন, "একখানা কাগজ ধর, যাহা আমি বলি, সাবধান হইয়া লিখিয়া লও।" মুহুরী কাগজ-কলম লইল, বাবু একে একে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, মুহুরী লিখিতে লাগিল।

"আত্মীয়বর শ্রীযুক্ত নরসিংহচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মহাশয়েষু।

সবিনয়-নমস্কারপূর্ব্বক-নিবেদনমিদম্। আপনি জানেন, সংসারে আমার কেহ নাই। আমার প্রাণ যায়, এত দিন যাহা আমি করিয়াছি, সমস্ত কথা আমার মনে পড়িতেছে। এই আসন্নকালে আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, সেই বালকটীকে আপনি যে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তারযোগে শীঘ্র সেই দেশে সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আমার নিকটে এই ঠিকানায় অবিলম্বে—"

বলিতে বলিতে বাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন; মুহুরীও হাত গুটাইল। মুহুরীর মুখপানে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রায় অবরুদ্ধস্বরে বাবু বলিলেন, "রও, আর লিখিও না;—না,—তুমি পারিবে না;—শি—"

আবার হঠাৎ থামিয়া গেল, আবার এক চুমুক জল খাইয়া, অতি কষ্টে এক হস্ত দ্বারা নেত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক কম্পিতকণ্ঠে বাবু বলিলেন, "তুমি যাও, তুমি পারিবে না; শিবপ্রসাদকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

কাগজ-কলম রাখিয়া, একটী দরজা খুলিয়া, মুহুরী চলিয়া গেল, একটু পরে পণ্ডিত শিবপ্রসাদ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাবুর আদেশে শিবপ্রসাদ সেই মুক্তদ্বার পুনরায় বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন। মনে মনে কি চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ-নয়নে শিবপ্রসাদের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনেত্রে গদগদস্বরে বাবু বলিতে লাগিলেন, "শিব! তুমি অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, তুমি আমার সমস্ত বিষয়-কার্য্য বুঝিয়াছ, তোমার প্রতি আমার পূর্ণ-বিশ্বাস। আমি পৃথিবী হইতে বিদায় হইতেছি, আমার

সমস্ত সম্পদ্ পড়িয়া রহিল, আমার উত্তরাধিকারী নাই, আমার পত্নী রহিলেন, তাঁহাকে তুমি মাতৃবৎ ভক্তি কর, তাহা আমি জানি, আমি চলিলাম, তাঁহাকে তুমি সান্ত্বনা করিও; যত্নে প্রতিপালন করিও, বিষয়গুলি রক্ষা করিও।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, চক্ষের জল ফেলিয়া বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া শিবপ্রসাদও উভয় হস্তে আপন উভয় নেত্র-মার্জ্জন করিলেন। সে দিকে না চাহিয়াই নেত্র-নিমীলন পূর্ব্বক বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, “শিব! তুমি একটী কার্য্য কর। একখানি কাগজে আমার গুটীকতক মনের কথা লিখিয়া লও। অনেক দিন অবধি সেই সকল কথা আমি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম, আমার মন-প্রাণ এখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, সে সকল গুহ্যকথা আর এখন কাহার কাছে রাখিয়া যাইব, কাগজেই লেখা থাকুক; কাগজখানি তোমার কাছেই থাকিবে। যদি কেহ কখন এখানে আসিয়া আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, অকপটে নিজের পরিচয় দেয়, যাইবার সময় কি কথা আমি বলিয়া গিয়াছি, তাহা যদি জানিতে চায়, তাহাকে বলিও, আমি অতি হতভাগ্য, আমি মহাপাতকী, বিষয়লোভে ধর্ম্মপথ ভুলিয়া চিরজীবন অধর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করিয়াছি, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।”

এইখানে পুনরায় নেত্রজল ফেলিয়া, অবশ-হস্তে পুনরায় অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় বাবু বলিতে লাগিলেন, “শিব! বুঝিয়াছ আমার কথা? যদি কেহ আসিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারে, ঐ সকল কথা তাহাকে বলিও, যে কাগজ-খানি এখন তুমি লিখিবে, সেখানিও তাহাকে দেখাইও। কাগজ লও,—লেখ।” বাবুর মুখের কথা শুনিয়া শুনিয়া শিবপ্রসাদ লিখিতে লাগিলেন;—

“প্রাণাধিকেষু—

তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমার দেহ থাকিলেও তাহা দেখিয়া, আমার মুখে কোন কথা শুনিয়া, কোন প্রকারে তুমি আমাকে জানিতে পারিতে, কিন্তু আমার দেহ থাকিল না; অচিরেই এই দেহ অন্তিম-শ্মশানে ভস্ম হইয়া যাইবে।

প্রাণাধিক! আমি অতি অধম, আমাকে ঘৃণা করিয়া পরমেশ্বর আমাকে স্ত্রী-পুরুষ্কা প্রদান করেন নাই। বৎস! তুমি আমার একমাত্র বংশধর; বিষয়-

লোভে মত্ত হইয়া আমি তোমার জন্মদাতা পিতাকে গোপনে সংহার করিয়া সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলাম। তুমি তখন অতি শিশু, আমি তোমাকে সূতিকাগারে একবারমাত্র দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই। তোমাকে প্রাণে মারিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ভগবান্ বাধা দিয়াছিলেন; তথাপি তোমাকে চিরবঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে তোমাকে আমি নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম। তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সহিত শিশুকালে মাতামহাশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়াছিলে, তাহাতেও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অন্য লোককে মন্ত্রণা দিয়া, পাঠশালা হইতে তোমাকে চুরি করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সে কথা হয় ত তুমি স্মরণ করিতে পারিবে। মনে করিও, আমিই সেই পাপকার্য্যের মূলাধার। আমার পাপকে ক্ষমা করিবার কর্ত্তা একজন আছেন, তিনি ক্ষমা করিবেন কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু প্রাণাধিক! তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

বৎস! তোমার গর্ভধারিণী জননী জীবিতা আছেন। গঙ্গাস্নানে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, লোকে বলিয়াছিল, জলে ডুবিয়া গিয়াছেন, সে কথা মিথ্যা। আমি তোমার জননীকে অন্য লোকের দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া দামোদর-নদীর তীরে মহেশ্বরপুরের কৃপানন্দ ভট্টাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম; মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়াছি, তিনি বাঁচিয়া আছেন।

বৎস! পূর্ব্ব-পরিচয় এই পর্য্যন্ত এখন আমি বলিলাম, পাপ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল; প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অতি অল্পমাত্র বাকী, পাপের অনলে এখনও আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে, সহস্র সহস্র কালসর্প যেন আমাকে মুহুর্মুহু দংশন করিতেছে! হায় হায়! দেহে জীবন থাকিতে থাকিতে আমি ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি!

মৃত্যুকালে আর একটী আমার মহা চিন্তা। বৎস! ইহ-সংসারে তুমি বাঁচিয়া আছ কি না, সে সমাচার কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। সর্ব্বজীবের জীবনদাতা জগদীশ যদি তোমাকে নিরাপদে বাঁচাইয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন না একদিন স্বদেশ-দর্শনে তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে; আমার একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধির নিকটে এই পত্রখানি রহিল, ইহাও তুমি দেখিতে পাইবে। তোমার মাতা যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন.

তাহাও এই পত্রে লিখিয়া দিলাম, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিও।

বৎস! আমি চলিলাম। সংসারের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না; আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ রহিল না বটে, কিন্তু তোমার সহিত সম্বন্ধ রহিল। তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের একমাত্র পুত্র। আমি তোমার পিতৃব্য, আমি তোমার পিতৃহন্তা! আমি নরাধম, তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

শাস্ত্রকারেরা ভ্রাতৃপুত্রকে আপন পুত্রতুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; তুমি আমার ভ্রাতৃপুত্র, অতএব আমার পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ। সংসারে আমি বহুধনের অধিকারী হইয়াছিলাম, দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে অথবা শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্যে একটী কপর্দ্দকও আমি ব্যয় করি নাই; তাহাতেই আমার এই দুর্গতি হইল। পুত্রের দোষে অনেক অপব্যয়ে নানা নষ্ট করিয়াছি, উদ্বৃত্ত সমস্তই লিখিত আছে, অবশিষ্ট লোহার সিন্দুকের কাগজপত্রে এবং গৃহের মুদ্রাধারে তাহা তুমি দেখিতে পাইবে, তুমিই একাকী নির্ব্বিরোধে আমার সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। আমার বনিতা তোমার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী, তিনি তোমার মাতৃতুল্যা, মাতৃতুল্য ভক্তি-যত্নে তাঁহাকে তুমি সৎপথে রক্ষা করিবে, এই আমার আশা।

বৎস! এইবার আমার শেষকথা। যত কথা আমি বলিলাম, এতৎ-সমস্ত যথার্থ কি না, তাহা বুঝিতে তোমার মনে সন্দেহ জন্মিতে পারিবে। সেই সন্দেহ যাহাতে বিভঞ্জন হয়, এই স্থলে আমি সেই কথা বলিব। আমি তোমার নাম জানি; তোমার নাম শ্রী-ভ-ব-র-ত্ন।"

চক্ষের জলে ভাসিয়া, কাগজ-কলম দূরে নিক্ষেপ করিয়া পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মুমূর্ষু জ্যেষ্ঠতাতের চরণতলে নিপতিত হইলেন, শোকে অধীর হইয়া বাষ্প-নিরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তাত! তাত! আর লিখিতে হইবে না, আর বলিতে হইবে না, আর আমি লিখিতে পারিব না;—আমি সেই অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশী শিবপ্রসাদ নহি, আমিই সেই শৈশব-নির্ব্বাসিত পরিজনবঞ্চিত হতভাগ্য ভবরত্ন।"

রোগীর উত্থানশক্তি ছিল না; ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনে মনেই সে ইচ্ছা বিলীন হইয়া গেল; কেবল নেত্রনীরে গণ্ড

দেশ প্লাবিত করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। একটু পূর্ব্বে শিবপ্রসাদের,—না,—এখন আর তাঁহাকে শিবপ্রসাদ বলিবার প্রয়োজন নাই,—একটু পূর্ব্বে ভবরত্নের চক্ষেও জল আসিয়াছিল, অকস্মাৎ সেই জল বিশুষ্ক হইয়া তাঁহার মুখখানিকে কেমন এক প্রকার বিবর্ণ করিয়া দিল; ভবরত্ন কাঁপিতে লাগিলেন।

বাবু ব্রজরত্ন তত যন্ত্রণার উপরেও কম্পিত-কলেবরে ভবরত্নের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ভয়ে কি বিস্ময়ে কিম্বা জীবনের পূর্ব্বকথা স্মরণে হঠাৎ তাঁহার কম্প উপস্থিত হইল, তাহা কেবল তিনিই জানিতে পারিলেন। ইত্যগ্রে যতগুলি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গেও রসনার কম্পন ছিল; পাঠ করিবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার সেইরূপ কম্পিত বাক্যগুলি আমরা একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি; বস্তুতঃ পত্রের বয়ানগুলি বলিয়া দিবার সময় তিনি বার বার থামিয়াছিলেন, বার বার কাঁপিয়াছিলেন, বার বার নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, বার বার অশ্রুবর্ষণ করিয়া কম্পিত-হস্তে নেত্রমার্জ্জন করিয়াছিলেন, বার বার পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একটু একটু জল পান করিয়াছিলেন, একটানে সকল কথা বলিতে পারেন নাই। ভবরত্নের পরিচয় না জানিয়াও ভবরত্নের উদ্দেশে যতক্ষণ তিনি ভবরত্নের পরিচয় দিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার তপ্তহৃদয়ে বিন্দুমাত্রও শান্তি ছিল না; ভবরত্নের নিজমুখে সত্যপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ শান্তির উদ্রেক হইলেও একেবারে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, নয়ন মুদিত করিয়া নিস্পন্দ গাত্রে তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। অবস্থা দর্শন করিয়া ভবরত্নের ভয় হইল। খানিকক্ষণ সামলাইয়া অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক রোগী পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে স্তম্ভিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ,—সত্য কি তুমি আমার কাছে বসিয়া রহিয়াছ? হাঁ,—সত্যই কি তুমি ভবরত্ন? সত্যই কি তুমি বাঁচিয়া আছ? সত্যই কি তুমি শিবপ্রসাদ নাম লইয়া আমার কাছে আশ্রয় লইয়াছিলে? হাঁ,—সত্যই তুমি ভবরত্ন। তোমার মুখের আকৃতিতে এখন আমি তোমার পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি। হায় হায়! আমি তোমার ধর্ম্মশীল পিতাকে বিনা দোষে বিনাশ করিয়াছি! আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই! সত্যই কি তুমি সেই ভবরত্ন?—হাঁ, সত্যই তুমি ভবরত্ন। ভবরত্ন! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবে? আমার পাপ-

জীবনের লীলা-খেলা ফুরাইল। ভাগ্যে ছিল, মৃত্যুকালে আমি তোমার নিকট বিদায় লইতে পারিলাম। বৎস! তুমি আমাকে বিদায় দাও! সংসারের নিকট বিদায় হইয়া আমি—"

কথা সমাপ্ত হইল না। বাহির হইতে গৃহের দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত। কাহারা জোরে জোরে ডাকিয়া বলিতেছেন, "দ্বার খুলিয়া দাও, দ্বার খুলিয়া দাও! এত বিলম্ব কিসের জন্য? শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও!"

শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া ভবরত্ন দ্বার খুলিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন দুই জন ডাক্তার। দ্বার উন্মুক্ত রহিল। রোগী পুনরায় নির্ব্বাক্,—নিমীলিত-নেত্র। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, চৈতন্য নাই। ভবরত্নকে সম্বোধন করিয়া একজন ডাক্তার বলিলেন, "নায়েব মহাশয়! আপনি এ কি করিয়াছেন?" প্রাণ থাকিতে মারিয়া ফেলিবেন কি? আপনি বিজ্ঞ, এমন সঙ্কটাপন্ন রোগীকে এতক্ষণ বকাইয়া আপনি ভাল কর্ম্ম করেন নাই। এখনও যদি—"

কথা কহিতে কহিতে সম্মুখের নূতন লেখা কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তার-মহাশয় চমকিতস্বরে কহিলেন, "এ কি? এ সকল লেখা কাগজ কিসের? এতক্ষণ কি আপনি এই কাজ করিতেছিলেন? আপনি নিজে উহা লিখিয়াছেন কিম্বা রোগীকে বকাইয়া বকাইয়া লিখিয়া লইয়াছেন, শীঘ্র বলুন, শীঘ্র প্রতীকার না করিলে আমরা আর চিকিৎসার অবসর পাইব না। কেন আপনি এ সকল কাগজ লিখিয়াছেন, এখনি আমরা তাহা জানিতে চাই।"

মুহূর্ত্তকাল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভবরত্ন কহিলেন, "বাধ্য হইয়াছিলাম। কর্ত্তা ঐ সকল কথা লিখিতে বলিলেন, অবাধ্য হওয়া উচিত হয় না, সেই জন্যই লিখিতেছিলাম।"

"ভাল কর্ম্ম হয় নাই" বলিয়া ডাক্তার-মহাশয় পুনর্ব্বার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একমাত্রা তরল ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলেন, কতকাংশ কণ্ঠস্থ হইল, কতকাংশ কস্ বাহিয়া পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার আর এক মাত্রা; দশ মিনিট পরে আর এক মাত্রা। এই তিনবার ঔষধ সেবন করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে রোগী একবার পার্শ্বের দিকে চাহিলেন, কাহাকে দেখিলেন, ঠিক করিতে না পারিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ!—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?—ভবরত্ন! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ?—উঃ! কালান্তক!—আমি তোমার

পিতার পক্ষে কালান্তক হইয়াছিলাম!—আমি তোমার পিতৃহন্তা!—পিতৃহন্তা!—পিতৃহন্তা!—উঃ!—ঐ যে! ঐ যে আমার—ঐ যে আমার প্রাণের ভাই!—ভবরত্ন! ঐ যে তোমার পিতা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিকট-দর্শনে ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতেছে!—নীলরতন! নীলরতন! ভাই, গ্রাস কর! গ্রাস কর! তুমি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেল!—উঃ! অত রক্ত কেন? অত রক্ত তোমার গায়ে কে মাখাইল?—ভাই, ঐ রক্তে আমাকে স্নান করাও! রক্তে স্নান করাইয়া তুমি আমাকে নরকে পাঠাও! আবার ও কি? আবার ও কি?—জবাফুলের মালা! ভাই, ঐ জবার মালা আমার গলে পরাও! না না,—আর আমি তোমার দিকে চাহিব না!—আমার চক্ষু পুড়িয়া যাইতেছে!—ভবরত্ন! রক্ষা কর! রক্ষা কর! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা!—তুমিই আমার সংসারের কর্ত্তা!—তুমিই আমার সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা!—ভোগ কর! ভোগ কর! ভোগ কর!—আমি যাই! চলিলাম! চলিলাম!! চলিলাম!!!"

রোগী নিস্তব্ধ। নয়ন নিমীলিত হইল না, কিন্তু বাক্য হরিয়া গেল। ডাক্তারেরা বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। ভিতরে ভিতরে জ্বর আসিয়াছে,—ভিতরে ভিতরেই বিকারপ্রাপ্ত। এ সমস্ত অবশ্যই বিকারের প্রলাপ! ভবরত্নের মুখের দিকে চাহিয়া একজন ডাক্তার বলিলেন, "কর্ত্তা এখন প্রলাপ বকিতেছেন; সম্মুখে যমদূত দেখিতেছেন, রক্ত দেখিতেছেন;—জবার মালা দেখিতেছেন! ভবরত্ন বলিয়া ডাকিতেছেন, নীলরতনকে ডাকিতেছেন, কে তাহারা?—ভবরত্নের পিতৃহন্তা বলিয়া উনি সম্মুখে বিভীষিকা দেখিতেছেন! নায়েব মহাশয়! ভবরত্ন কে, তাহা কি আপনি জানেন?"

ভবরত্ন উত্তর করিলেন না। এই সময় আর এক বীভৎস দৃশ্য। একজন এলোকেশী রমণী যেন উন্মাদিনীবেশে চঞ্চল-চরণে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বাবুর বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল;—চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি সর্ব্বনাশ! বাবু! বাবু! তুমি কোথায় যাও?—আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় চলিলে?—আমাকে সঙ্গে করিয়া লও!—কিছুই আমি জানিতাম না, এইমাত্র শুনিলাম, এই বিপদ! আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি! বাবু! আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাও! আমার

সঙ্গে একটী কথা কও! একটীবার মুখ ফুটিয়া বল, আমার দশা কি করিয়া যাও! আমি তোমার সেই কাঙ্গা—”

ডাক্তারেরা হতবুদ্ধি হইয়া সেই রমণীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ভাব-ভক্তি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভবরত্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে গা? তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে? তুমি এমন করিয়া কাঁদিতেছ কেন? বাবুকে লক্ষ্য করিয়া ও সব কথা বলিতেছ কেন? স্থির হও, সুস্থ হও, চুপ কর, এ সময় এখানে গোল করিও না, বাবুকে তোমার কি কি কথা বলিবার আছে, স্থির হইয়া আমাদের সাক্ষাতে বল, আমরা তোমার কষ্টের কারণ দূর করিব।”

ডাক্তারেরাও ভবরত্নের ঐ সকল বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। স্ত্রীলোক উঠিয়া বসিল। আর তাহার পূর্ব্বভাব রহিল না। শিথিল অঙ্গবস্ত্র যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, ভবরত্নের মুখপানে চাহিয়া, সে বলিতে লাগিল, “আমার নাম কাদম্বিনী, পাড়াগাঁয়ে আমার বাপের বাড়ী, এই বাবু অনেক লোভ দেখাইয়া, আমাকে আমার বাপের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। আমার স্বামী ছিল, আমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। দশ বৎসরের কথা। এখন আমি বেশ্যা, স্বামী এখনও বাঁচিয়া আছে, কুলে কালি দিয়া এ পথে আমি আসিয়াছি, সে আর আমাকে ঘরে লইবে না, বাপের বাড়ীতেও আমি স্থান পাইব না, গৃহস্থ লোকালয়েও আর মুখ দেখাইতে পারিব না। বাবুর যদি কিছু ভাল-মন্দ ঘটে, তখন আমি কোথায় যাইব, কে আমাকে আশ্রয় দিবে? আপনারা দেখুন, এখন আমার বয়স হইয়াছে, এ পথে অধিক বয়সে কেহ ফিরিয়া চায় না। আমি অনাথা, আমি বেশ্যা, আমি কাঙ্গালিনী, বাবু বিহনে আমার উপায় কি হইবে? যে বাড়ীতে আমি আছি, সে বাড়ীখানা ভাড়া করা। বাবু বলিয়াছিলেন, সেইখানা আমার নামে কিনিয়া দিবেন, সে আশাও ফুরাল। তা ছাড়া মদের দোকানের খাতায় দেনা ২২৫৲ টাকা, স্যাকরার পাওনা ৭৫৫৲ টাকা, রহিম খানসামা নিত্য নিত্য বাবুর জন্য মুরগীর মাংস যোগাইত, তাহার পাওনা ৭৭৲ টাকা, তা ছাড়া আরও আমার অনেক রকম দেনা আছে, সে সকল দেনা আমি কোথা হইতে শোধ দিব? বাবু আদর করিয়া আমার নাম দিয়াছিলেন প্রিয়ম্বদা। সেই প্রিয়ম্বদা এখন পথের ভিখারিণী হয়, উপায় কি?”

এই সকল কথা বলিয়া এক নিশ্বাস ফেলিয়া পিয়ারবাবু নিস্তব্ধ হইল; তাহার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। লজ্জা পাইয়া, ডাক্তারদিগের মুখের দিকে চাহিয়া, পিয়ারবাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভবরত্ন কহিলেন, "দেখ, তুমি এখন ঘরে যাও, দুর্ভাবনা করিও না। ডাক্তারবাবুরা বলিতেছেন, বাবুর প্রাণ-রক্ষা হইবার আশা আছে। ঈশ্বর না করুন, ভাল-মন্দ যদি কিছু ঘটে, তোমার কোন ভয় নাই। বাবু তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে; আমি তোমাকে বাড়ী কিনিয়া দিব; তোমার যত টাকা দেনা আছে, সুদে আসলে সমস্তই আমি শোধ করিব; কোন চিন্তা করিও না। আমার কথা মিথ্যা হইবে না। এই বাড়ীতেই আমি থাকিব, তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই আমার সঙ্গে দেখা করিও, যাহা আমি বলিলাম, তাহাই ঠিক হইবে, এই আমার অঙ্গীকার রহিল। তুমি এখন ঘরে যাও।"

খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, আপন মনে ভাল-মন্দ কত কি ভাবিয়া, পিয়ারবাবু বিদায় হইল। তাহার বিদায়ের পর ভবরত্ন কিয়ৎক্ষণ সেই রুগ্ন-শয্যাশায়ী সমাজ-সংস্কারক উপদেশকের চরিত্র চিন্তা করিলেন, রোগী তখনও নিঃসাড় নিস্তব্ধ। ডাক্তারেরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে যে তিন মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, সে ঔষধ বলকারক, অথচ তাহাতে নিদ্রা হয়। বাবু নিদ্রাগত। ডাক্তারেরা পরস্পর যুক্তি করিয়া ভবরত্নকে বলিলেন, "এখানে এখন যেন কেহ কোন গোলমাল না করে; নিদ্রাভঙ্গের পর যদি জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, নিকটেই আমরা থাকি, জানেন আপনি, তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইবেন, তৎক্ষণাৎ আমরা আসিয়া নূতন ব্যবস্থা করিব।"

ডাক্তারেরা বিদায় হইলেন, দাসীরা প্রবেশ করিল, দাসীগণকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া ভবরত্ন বাহির-মহলে গমন করিলেন। রাত্রিকালে গৃহিণী আসিয়া আবশ্যকমত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। কতক্ষণ পরে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কি না, ভবরত্ন তাহা জানিতে পারিলেন না। গৃহ হইতে যখন তিনি বাহির হইয়া যান, তাঁহার নিজের লেখা ও অর্দ্ধসমাপ্ত মুহুরীর লেখা কাগজগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এইখানে সেই কথাটী বলিয়া রাখা উচিত।

পরদিন প্রাতঃকালে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভবরত্ন দেখিলেন, তিনি

একটু ভাল আছেন। ডাক্তারেরা আসিলেন, তাঁহারও দেখিলেন, পূর্ব্বরজনী অপেক্ষা অবস্থা একটু ভাল। তিনজনেই একটু একটু আশ্বস্ত।

ভবরত্নের মনের ভাব এক প্রকার, ডাক্তারদ্বয়ের মনোভাব অন্য প্রকার। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিয়া বারম্বার রোগীর দেহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভবরত্ন সেরূপ দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কারতে পারিলেন না।

নূতন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা হইল। রোগী যেন একটু সুস্থ বোধ করিয়া ভবরত্নের সহিত দুটী পাঁচটী কথা কহিলেন, ডাক্তারদিগকে বলিলেন, "কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন নূতন প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, অঙ্গসঞ্চালন করিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইতেছে।"

ডাক্তারেরা পুনর্ব্বার পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিয়া, অর অল্পক্ষণ তথায় থাকিয়া, তাঁহারা উভয়েই সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ভবরত্ন একাকী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

সে দিন সে রাত্রি একভাবে গেল। ডাক্তারেরা দুই তিনবার আসিলেন, অঙ্গে এক প্রকার প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন, ঔষধ বদল করিলেন না। সে রাত্রে রোগীর ভালরূপ নিদ্রা হইল না, কি যে নূতন যন্ত্রণা, তাহা তিনি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সেই যে কাদম্বিনী আসিয়াছিল, যাহার ডাকনাম পিয়ারবানু, সেই কাদম্বিনী যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, আচ্ছন্ন অবস্থাতে বাবু হয় তো তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, অস্থিরতা দেখিয়া ভবরত্ন তাহাই অনুমান করিয়া লইলেন।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। তিনবার প্রলেপ দেওয়া হইল. সময়মত ঔষধ-সেবন করান হইল, ভবরত্ন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন। পরিচয় না পাইলে হয় তো তিনি তত কষ্ট স্বীকার করিতেন না, পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়াই রোগীর সঙ্গে যেন রোগী হইয়া নিশা-জাগরণ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ডাক্তারেরা উপস্থিত হইলেন। অন্য কোন প্রকার পরামর্শ করিবার অগ্রেই রাত্রের অবস্থা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পর একজন দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, দাসী আসিল। ডাক্তারের আদেশে সেই দাসী এক হাঁড়ি জল

গরম করিয়া আনিল, পরিষ্কার একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা বাবুর অঙ্গের প্রলেপগুলি ধীরে ধীরে প্রক্ষালন করিয়া দেওয়া হইল, দাসী চলিয়া গেল।

ডাক্তারেরা একটু নিকটে বসিয়া রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনিমেষ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন, কি তাঁহাদের মনে হইল, অগ্রে তাহা কিছু প্রকাশ করিলেন না; তাহার পর ভবরত্নকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনজনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। চিন্তা করিয়া ভবরত্ন বলিলেন, "তাহাতে যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে কার্য্যে আমার অমত নাই।" একজন ডাক্তার বলিলেন, "বিপদের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা আমাদের হাত নয়, না করিলেও কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আছে। আপনি বোধ হয় দেখিয়াছেন, উত্তমরূপ পরিপক্ক; আর বিলম্ব করাও উচিত নহে।"

মনে সন্দেহ থাকিলেও ভবরত্ন আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না, তিনজনে একসঙ্গে গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ আছে, যন্ত্র দ্বারা সে সকল কণ্টক বাহির করিবার উপায় ছিল না, বাবুর দেহের মধ্যে মাংস ভেদ করিয়া সেই সকল কণ্টকের অগ্রভাগ সমভাবে রহিয়া গিয়াছে। শালকাঁটা বিদ্ধ হইলে একস্থানে থাকে না, চলিয়া চলিয়া বেড়ায়, এমন কথাও লোকে বলে, অঙ্গের যে যে স্থান সুপক্ক হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই কাঁটার ফুটিয়া আছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দুইজনের মধ্যে যে ডাক্তারটী অস্ত্রচিকিৎসায় অধিক নিপুণ, তিনি আপন অস্ত্রাধার গোপনভাবে সঙ্গে আনিয়াছিলেন; কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চৈতন্য-স্তম্ভনের ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে তিনি অচেতন করিলেন, তাহার পর একে একে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত্র বসাইয়া, অপরবিধ যন্ত্রসাহায্যে গুটীকতক কাঁটা বাহির করিলেন। ঔষধের পরাক্রম থাকিলেও সেই প্রক্রিয়ার সময় রোগী কয়েকবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; প্রক্রিয়া বন্ধ হইল। অস্ত্রব্যবহারের পর যাহা যাহা করিতে হয়, ডাক্তারেরা তাহার সুব্যবস্থা করিলেন, অল্পে অল্পে রোগীর চৈতন্যোদয় হইল, তিনি যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। কথা কহিতে নিষেধ করিয়া ডাক্তারেরা একখানা মোটা কাপড়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া রাখিলেন, পার্শ্বে বসিয়া ভবরত্ন নিঃশব্দে সেই আবৃত গাত্রে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা পরে আবার আসিব বলিয়া ডাক্তারেরা তখন বিদায় হইলেন।

বাবুর মুখে ভবরত্নের পরিচয় প্রকাশ হইয়াছিল, গৃহিণী তাহা শ্রবণ করেন নাই, ভবরত্ন নিকটে থাকিলে গৃহিণী সেখানে আইসেন না, একজন দাসী আসিয়া ভবরত্নকে বলিল, "ঠাকুরাণী আসিতেছেন।"

ভবরত্ন উঠিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, গৃহিণী প্রবেশ করিলেন।

দুই ঘণ্টা অতীত। যিনি অস্ত্র করিয়াছিলেন, সেই ডাক্তার সংরবাড়ীতে দর্শন দিলেন। ভবরত্নের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনকার অবস্থা কিরূপ?"—ভবরত্ন কহিলেন, "দুই ঘণ্টার সংবাদ আমি জানিতে পারি নাই। কর্ত্তৃঠাকুরাণী সেখানে আছেন, এই দুই ঘণ্টা আমি সে ঘরে প্রবেশ করি নাই।" ডাক্তার পুনরায় বলিলেন, "এখন একবার আমি দেখিব, সংবাদ দিতে বলুন।"

সংবাদ প্রেরণ করা হইল। গৃহিণী সরিয়া গেলেন, ভবরত্নের সহিত ডাক্তার-মহাশয় রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। দুইজন দাসী সেখানে ছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার গিয়া শয্যার উপর বসিলেন, পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভবরত্ন রোগীর গাত্রাবরণ মোচন করিয়া দিলেন, ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রোগীর মুখের ভাব দেখিয়া তিনি যেন একটু শিহরিলেন, আর একটু নিকটে গিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বক্ষে ললাটে করস্পর্শ করিলেন, বদন গম্ভীর হইল, পুনর্ব্বার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; ভবরত্নের মুখের দিকে চাহিলেন, একটীও কথা কহিলেন না; অন্যমনে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হস্তসঙ্কেতে ভবরত্নকে ডাকিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, পূর্ব্ববৎ রোগীর অঙ্গ আবৃত করিয়া, সেইদিকে চাহিতে চাহিতে ভবরত্ন সন্দিগ্ধচিত্তে ডাক্তারের অনুগমন করিলেন।

সংরবাটীর একটী নির্জ্জন গৃহে উপবিষ্ট হইয়া বিমর্ষ-বদনে ডাক্তার-মহাশয় ভবরত্নকে কহিলেন, "পূর্ব্বে আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই যথার্থ। ভিতরে ভিতরে জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বর এখন প্রকাশ পাইয়াছে। ঔষধ দিতে হয়, লিখিয়া দিতেছি, অবিলম্বে আনাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন করাইবেন, কিন্তু জীবনের আশা অতি অল্প। এখন আমি চলিলাম, অবস্থা দেখিয়া প্রয়োজন হইলে সংবাদ দিবেন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন, দশ মিনিটের মধ্যে ঔষধ আনাইয়া ভবরত্ন স্বয়ং

সেই ঔষধের শিশি হস্তে রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলেন, ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিন ঘণ্টায় তিনবার ঔষধ সেবন করিয়া বাবু ব্রজরত্ন একবার যেন আপনার অবস্থা বিস্মৃত হইয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভবরত্ন অতি সাবধানে তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া দিলেন, বাবু একবার হাঁ করিলেন। ভবরত্ন বুঝিলেন, পিপাসা। নিকটেই জল ছিল, রূপার চামচে করিয়া তিনি একটু একটু জল তাঁহার মুখে দিলেন, তিনি একটী নিশ্বাস ফেলিয়া, অতি কষ্টে ললাটে হস্তার্পণ করিয়া উচ্চারণ করিলেন "আঃ!"

পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ; উভয়েই নিস্তব্ধ; পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাসীরাও নিস্তব্ধ। বাবুর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ভবরত্ন বুঝিলেন, জ্বর অত্যন্ত প্রবল, গাত্রে যেন অগ্নির উত্তাপ; চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ। অত্যন্ত উদ্বেগবৃদ্ধি হইল। ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইবার জন্য তিনি একজন দাসীকে বলিলেন, "সেরেস্তায় একজন মুহুরীকে গিয়া বল, ডাক্তারবাবুকে শীঘ্র সংবাদ দেয়।"

দাসী যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কষ্টে ভবরত্নের দিকে মুখ ফিরাইয়া, দাসীদের দিকে হস্তসঞ্চালন করিয়া নয়নভঙ্গীতে বাবু এক প্রকার ইঙ্গিত করিলেন। ভবরত্ন বুঝিলেন, দাসীদের উভয়কেই তাড়াইবার ইঙ্গিত। কি কারণে উহাদিগকে তাড়াইবারে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা না বুঝিয়াও দাসী দুটীকে তিনি বলিলেন, "যাও, সেরেস্তায় খবর দিয়া তোমরা উভয়েই এখন ঠাকুরাণীর নিকটে ফিরিয়া যাও; এখানে আর এখন তোমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে দাসীরা বাহির হইল। বাবু আবার দরজার দিকে হস্তসঙ্কেত করিয়া ভবরত্নের মুখপানে চাহিলেন, ভবরত্ন উঠিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, না জানি আজ আবার কি কাণ্ড হয়। বদন বিকৃত করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া, বাবু অতিক্ষীণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! কি যন্ত্রণা! প্রাণ যায়!" এইটুকু বলিয়াই অল্পক্ষণ থামিয়া পুনর্ব্বার হাঁ করিলেন, ভবরত্ন এবার জল না দিয়া একমাত্রা ঔষধ তাঁহার মুখবিবরে ঢালিয়া দিলেন; মুখ বিকট করিয়া, কষ্টে চক্ষু ঘুরাইয়া, ভবরত্নকে দেখিয়া দারুণ বেদনাব্যঞ্জক স্বরে কর্ত্তা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলেন, "যন্ত্রণা!—যন্ত্রণা

নিদারুণ যন্ত্রণা!—উঃ!—ভ-ব-র-ত-ন! তুমি আছ?—হাঁ,—সেই কথা।—ভ-ব র-ত-ন! সেই—কাগজ তোমার সঙ্গে আছে?”

ভবরত্ন বুঝিলেন, কোন্ কাগজের কথা। বাবুর কথা শুনিয়া শুনিয়া সে রাত্রে যে কাগজ তিনি লিখিয়াছিলেন, সেই কাগজ তদবধি তাঁহার সঙ্গেই ছিল, প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, “আজ্ঞা হাঁ, সে কাগজ কোথাও আমি রাখি নাই, কাহাকেও দেখাই নাই, জামার পকেটেই রাখিয়া দিয়াছি, সঙ্গেই আছে।”

যন্ত্রণায় একটা হাই তুলিয়া, যন্ত্রণাব্যঞ্জক ভগ্নকণ্ঠে বাবু কহিলেন, “বা—হি—র—কর; আমি—আমি—আমি—হাঁ,—আমি—লি—খি—ব।”

প্রলাপ কি প্রকৃত, বুঝিবার সন্দেহ থাকিলেও ভবরত্ন আপন পকেট হইতে সেই কাগজগুলি বাহির করিলেন। বক্রনয়নে বাবু তাহা দেখিলেন; পূর্ব্বরূপ ভগ্নস্বরে কহিলেন, “বা—হি—র—কর;—যেখানে আমার কথা শেষ, যে পর্য্যন্ত লিখিয়া তুমি কলম ফেলিয়া দিয়াছিলে, সেই স্থানটা বাহির কর;—দোয়াত-কলম দাও;—কলমটা আমার হাতে দাও;—জায়গাটা দেখাইয়া দাও;—আমি লি—খি।”

ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়াও ভবরত্ন আদেশপালন করিলেন; দোয়াত-কলম সম্মুখে রাখিয়া সেই কাগজখানি বাবুর হস্তের নিকটে ধরিলেন; যেখানে লেখা ছিল, “আমি তোমার নাম জানি;—তোমার নাম ভ—ব—র—ত—ন—” সেই স্থানটী অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া দিলেন; কম্পিত-হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া বাবু সেইখানে আপন নামটী দস্তখৎ করিলেন। অক্ষরগুলি কিছু বাঁকা বাঁকা হইলেও লিখিতে কিছু ভুল হইল না। পঞ্জিকা দর্শন করিয়া সেইখানে সন-তারিখ লিখিয়া দেওয়া হইল।

আর কোন কথা নাই। দ্বারের বাহিরে ডাক্তার-মহাশয় ডাকিলেন, ভবরত্ন দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভবরত্নের দিকে চাহিয়া ডাক্তার-মহাশয় বলিলেন, “আবার আপনি তাহাই করিতেছেন? এখন কি আর বিষয়-কর্ম্মের কাগজ-পত্র লেখাপড়া করিবার সময়? ও সকল কিসের কাগজ?”

কাগজগুলি গুটাইয়া আপনার পকেটে রাখিয়া ভবরত্ন উত্তর করিলেন, “আর এক সময় আপনাকে দেখাইব। আজ আর লেখাপড়া কিছুই হয় নাই, কর্ত্তা একটু ভাল আছেন।”

ডাক্তার-মহাশয় বসিলেন। রোগীর বামপার্শ্বে ভবরত্ন খানিকক্ষণ ভবরত্নের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, চকিত-নেত্রে ডাক্তার-মহাশয় রোগীর মুখের দিকে চাহিলেন। রোগীর চক্ষু মুদিত, মুদ্রিত চক্ষের ক্রোড়ে অশ্রুধারা। দুই তিনবার মস্তকসঞ্চালন করিয়া ডাক্তার একবার সন্দেহে সন্দেহে রোগীর উভয় হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, আরও দুইবার মস্তকসঞ্চালন করিলেন; মুখে কিছু বলিলেন না, অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া ভবরত্নকে কহিলেন, "আর একটা নূতন ঔষধ আবশ্যক হইতেছে; সেই ঔষধে যদি বিশেষ কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে আর একবার আমাকে সংবাদ দিবেন।" এই বলিয়া তিনি এক টুকরা কাগজে তিনটী ঔষধের নাম লিখিয়া দিলেন, ঔষধ আসিবার অপেক্ষা করিলেন না, শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া গেলেন।

ঔষধ আসিল, কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে তাহা সেবন করাইবার অবসর হইল না। তিনি চক্ষু বুঝিয়া ছিলেন, শরীর অস্পন্দ হইয়াছিল, ভবরত্ন তিন চারিবার ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না; মনে করিলেন, হয় তো নিদ্রিত; মুখের দিকে চাহিয়া আধঘণ্টা বসিয়া রহিলেন, স্পন্দনলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেন না। হঠাৎ একবার রোগীর চক্ষুদুটী উন্মীলিত হইল; ভবরত্ন চমকিয়া উঠিলেন। চক্ষুর তারকা যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছিল, এক একবার অদৃশ্য হইতেছিল। অদ্ভুত বিঘূর্ণন। চক্ষু দেখিলে ভয় হয়। তিনি জাগিয়াছেন, মনে করিয়া, ভবরত্ন একমাত্রা ঔষধ ঢালিয়া তাঁহার মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, চেষ্টা বিফল হইল; মুখে হাত দিয়া দেখিলেন, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে, শুনিলেন, কড়মড় করিয়া শব্দ হইতেছে। তাঁহার ভয় হইল, ডাক্তারকে সংবাদ দিবেন, একবার এইরূপ ভাবিলেন, কিন্তু নূতন ঔষধ-সেবনের কার্য্য দেখিয়া সংবাদ দিবার কথা, সেই কথা স্মরণ হওয়াতে সে কল্পনা তখন পরিত্যাগ করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে আপনা হইতেই দাঁতকপাটী ছাড়িল, মাথা ঘুরাইয়া কর্ত্তা একবার হাঁ করিলেন; জলপিপাসায় মুখব্যাদান, ইহা বুঝিয়াও পানীয় জল প্রদান না করিয়া, ভবরত্ন সেই অবসরে পূর্ব্বকথিত ঔষধের মাত্রাটী তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলেন, আধঘণ্টা পরে আর একবার, পুনরায় আধঘণ্টা পরে তৃতীয়বার। রোগীর চক্ষের দিকেই ভবরত্নের নির্নিমেষ দৃষ্টি। আরও আধঘণ্টা পরে চক্ষের পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল, ঘূর্ণন থামিল; পুত্তলিকা বিবর্ণ হইয়াছিল, স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ

করিল। ভবরত্ন তখন ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বুঝিলেন, উত্তাপটা অনেক কমিয়াছে।

কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া ভবরত্ন তখন ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইলেন, ডাক্তার আসিলেন, পরীক্ষা করিলেন, সঙ্কেতে ভবরত্নকে ডাকিয়া বারন্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রোগীকে একাকী রাখিয়া ভবরত্নও ডাক্তারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তার-মহাশয় বলিলেন, "আর কেন বৃথা চেষ্টা। আর আশা নাই। শরীরের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই জ্বরের উত্তাপ অল্প হইয়া আসিয়াছে, ভিতরে পচন ধরিয়াছে, ক্ষতস্থানের উপরিভাগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শুষ্ক বোধ হয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পচিতেছে। কাঁটা বাহির করিবার জন্য অস্ত্র করা হইয়াছিল, তাহাতে আশামত ফল হইল না। যতদূর পারেন, সাবধানে রাখিবেন, গরমজলে ক্ষতস্থান সর্ব্বদা প্রক্ষালন করিয়া দিতে বলিবেন। যে ঔষধ এইবার দেওয়া হইয়াছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহাই সেবন করাইবেন, জ্বরত্যাগ হইবে; জ্বর আসিবার মূলকারণ যাহা, তাহা দমন করিবার উপায় আর নাই, সমস্তই শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা যাহা আমি বলিলাম, রোগী যেন তাহা শুনিতে না পান, গৃহিণী যেন এই নিরাশার সংবাদটী এখন জানিতে না পারেন।"

ডাক্তার আর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন না, বারান্দা হইতেই সিঁড়ির দরজা পার হইয়া নামিয়া গেলেন, ভবরত্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আরও দুই দিন গেল। ক্রমে ক্রমে শরীরের প্রায় অর্দ্ধাংশ পচিয়া উঠিল। গাত্রের দুর্গন্ধে নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারে না। অষ্টপ্রহর ধুনা গুগ্‌গুলের ধূমে গৃহটী প্রায় অন্ধকার করিয়া রাখা হয়, তথাপি সে দুর্গন্ধ যায় না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ চিকিৎসা, বিশেষতঃ বড়লোক, এই কারণে ডাক্তারেরা নামমাত্র ঔষধ দেন, সে সকল ঔষধে আর কোন ফল হয় না। মুখে বাক্য নাই, হস্তপদে সাড় নাই, নেত্র-কর্ণও বিকল; কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য নাই; কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বন্ধ। অন্তরের যাতনা কত, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেছিলেন কি না, তাহাও জানা গেল না। ইহজন্মে ইহশরীরে ঐরূপ অবস্থায় পাপের ফল কিরূপ বোধ হয়, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, তিনিই তাহা জানিতে পারেন।

ঐরূপ অবস্থায় পাঁচ দিন গেল, জীবন আছে, কেবল নাসিকার নিশ্বাসে আর হৃদয়ের অল্প অল্প স্পন্দনে তাহা অনুভূত হয়। পাপীলোকের মৃত্যুযন্ত্রণা যে কত অধিক, ভুক্তভোগীরাই তাহা বুঝিতে পারে। প্রাণ গেলেই শান্তি হয়, পাপীর প্রাণ কিন্তু শীঘ্র বাহির হয় না ;—যায় যায় যায় না। অবর্ণনীয় অনুভবনীয় অসহনীয় যন্ত্রণা। বাড়ীর সকলেই মহা উদ্বিগ্ন, মহা বিষণ্ণ, সমভাবে নিস্তব্ধ। সে সময় যদি সেই বাড়ীর মধ্যে কোন নূতন লোক প্রবেশ করিত, বাড়ীতে মানুষ আছে, তেমন লক্ষণ কেহই কিছুই বুঝিতে পারিত না।

ডাক্তার-বিদায়ের পর ষষ্ঠ রজনীর শেষভাগে বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরীর বহু-পাপ-দগ্ধ বহুতাপতপ্ত প্রাণপক্ষী উড়িয়া গেল। শরীরের সমস্তই প্রায় গলিত হইয়াছিল, কেবল অবশিষ্ট দুর্গন্ধময় খণ্ড খণ্ড গলিত মাংসপিণ্ড ভীষণ শ্মশানপ্রান্তে দগ্ধ করা হইল। স্ত্রীলোকেরা দুই চারি দিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া রোদন করিলেন, ক্রমে ক্রমে শোকের অবসান। ত্রয়োদশ দিবসে সমস্তই ফুরাইল ; রহিল কেবল নাম আর মহা মহা পাপের নিদর্শন। জগতের রীতিই এই। পাপ-পুণ্যের পরিণাম এই প্রকারেই হইয়া থাকে ; প্রভেদ কেবল পুণ্যবানের পুণ্যকীর্ত্তির ঘোষণা, পুণ্যাত্মার বিমল শান্তি আর পাপীলোকের পাপকোলাহলময় নরকধামের চির-অশান্তি।

বাবু ব্রজরত্নের ভবলীলা ফুরাইল। বাবু ভবরত্ন চৌধুরী তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলেন। ব্রজরত্নের পত্নী শেষকালে স্বামীর রুগ্নশয্যায় মুমূর্ষু স্বামীর মুখে এক রাত্রে ভবরত্নের পরিচয় শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইল না, ভবরত্নকে তিনি পরমাদরে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতে লাগিলেন ; ভবরত্নও আপন জ্যেষ্ঠতাতপত্নীকে মাতৃতুল্য সেবা-ভক্তি করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর দাসী-চাকরেরা ভবরত্নের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই বাড়ীর কর্ত্তা বলিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভবরত্ন ইতিপূর্ব্বে একজন ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন, সময়ে একদিন আপনি সকল কথা জানিতে পারিবেন ;—সকল কথা জানাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, যাঁহারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইল, প্রতিবাসী ভদ্র ভদ্র লোকেরাও আহূত হইলেন, প্রশস্ত দপ্তরখানায় মজলীস্ বসিল ; সেরেস্তার আমলারা সকলেই সেই

মজ্‌লীসে উপস্থিত থাকিল। ভবরত্ন তখন আর ব্রজবাবুর সেরেস্তার নায়েব-মহাশয় নহেন, সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি একখানি শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌বর্গ পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন; প্রকৃতই যেন রাজসভার ন্যায় শোভা হইল। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া বাবু ব্রজরত্ন চৌধুরী ভবরত্নের দ্বারা যে দলীলখানি লিখাইয়াছিলেন, ভবরত্নের আদেশে সেরেস্তার একজন আমলা দিব্য পরিস্কার উচ্চারণে উচ্চকণ্ঠে সেইখানি পাঠ করিলেন। সকলে তাহা শ্রবণ করিয়া অভাবনীয় বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইলেন। মৃত ভূম্যধিকারী ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া অকিঞ্চিৎকর ধনলোভে আপন কনিষ্ঠ সহোদরকে (ভবরত্নের জন্মদাতা পিতাকে) খুন করিয়াছিলেন, ঐ দলীলের মধ্যে সেই অংশ শ্রবণ করিতে করিতে সকলেরই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। পাপীর নিজমুখে পাপকর্ম্মস্বীকার একটী অনুতাপ, ইহা সত্য, কিন্তু সেই অনুতাপে ব্রজরত্নের তত বড় পাপের মোচন হওয়া সম্ভাবিত নহে, নরকবাস অনিবার্য্য, সকলের মুখে সেই কথা বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

একজন ভদ্রলোক বাবু ভবরত্নের সহিষ্ণুতা ও মহানুভাবতার উচ্চ-প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "পত্র লিখিবার সময় দুরাচার জ্যেষ্ঠতাতের মুখে আপন পিতৃহত্যার পরিচয় শুনিয়া, তাহার পরেও যে ইনি সেই পাপাত্মা জ্যেষ্ঠতাতের ব্যাধিশয্যায় বসিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কাছ-ছাড়া হন নাই, নরপিশাচের গলিত দেহের পৈশাচিক দুর্গন্ধেও কিছুমাত্র ঘৃণা করেন নাই, তাহাতে ইহাঁকে মানবরূপী দেবতা বলিয়া পূজা করিতে হয়।"

সমবেত সর্ব্বলোকেই সাধু সাধু বলিয়া ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। প্রথমে যিনি ঐ প্রশংসাবাদ ব্যক্ত করিলেন, করযোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, অবশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা নমস্য, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া, অপরাপর ব্যক্তিগণের নিকটে নম্রতা প্রকাশ করিয়া, ভবরত্ন আপন স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারের পরিচয় দিলেন। সেই দিন রজনীযোগে সেই বাড়ীতে সমাগত সমস্ত লোকের মহাভোজ এবং নৃত্য গীতাদি মহোৎসব হইল। নিদ্রাগত হইবার অগ্রে ভবরত্নের মনে একটী কথা উদয় হইল। মূলদলীলের সঙ্গে যে একখানি স্বতন্ত্র কাগজ ছিল, সেখানি কি? সেরেস্তার মুহুরী সেখানি লিখিতে লিখিতে অর্দ্ধ-

সদ্যাপ্ত রাখিয়াছিল, সেখানি তাহাই। সে পত্র কাহাকে লেখা হইতেছিল, চিন্তা করিয়া ভবরত্ন তাহা তখন স্থির করিলেন। যাঁহার পাঠশালা হইতে ভবরত্নকে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাঁহারই নামে ব্রজরত্ন অগ্রে উহা লিখাইতেছিলেন; লিখাইতে লিখাইতে কি ভাবিয়া মুহুরীকে তিনি বিদায় করিয়া দেন। তাহার পরেই ভবরত্নের লিখিত মূলদলীলের জন্ম।

সকলের নিকটে আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া, ভবরত্ন একদিন একজন ভৃত্য সমভিব্যহারে বর্দ্ধমান জেলার দামোদরতীরবর্ত্তী মহেশ্বরপুর গ্রামের কৃপানন্দ ভট্টাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া আপন জননীর চরণবন্দনা করেন, পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, স্নেহময়ী জননী স্নেহাশ্রুবর্ষণে পুত্রের মস্তক অভিষিক্ত করিয়া আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হন। বহুদিনের পর মাতা-পুত্রের পুনর্মিলনে সেখানে যে কতদূর আনন্দলহরী ছুটিয়াছিল, লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত করা দুর্ঘট। যাঁহাদের অনুভবশক্তি আছে, তাঁহারা অনুভবেই সে আনন্দ বুঝিয়া লইবেন; যাঁহাদের ভাগ্যে সেরূপ আনন্দলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া আপন আপন অবস্থার সহিত সেই আনন্দ মিলাইবেন। কৃপানন্দেরও পরমানন্দ, তাঁহার পরিবারবর্গেরও অতুল আনন্দ। কৃপানন্দের অনুরোধে তিন দিন তথায় অবস্থান করিয়া ভবরত্ন আপন জননীকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কলিকাতার সেই নিকেতন তখন ভবরত্নের আনন্দনিকেতন হইল।

একমাস অতীত। প্রতিবাসী ভদ্রলোকেরা নিত্য নিত্য সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া নবীন অধিকারীর সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করেন, ভবরত্নের অমায়িক ব্যবহারে পরম পরিতৃপ্ত হন, নানা প্রসঙ্গে নানাপ্রকার গল্প হয়, সকলেই আমোদিত। কথায় কথায় একজন একদিন বলিলেন, "আপনার পিতৃব্যকে আমরা বেশ চিনিয়াছিলাম। প্রথমবয়সে নিজ বাসগ্রামে কি কি কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা ছিল না, এখানে আসিয়া দিনে দিনে সকলের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিতে লাগিলেন, বড় বড় সভায় সমাজসংস্কারের কথা তুলিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন, দেখিয়া শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। সমাজসংস্কারের কথাটা কলিকাতায় তখন পথে ঘাটে আন্দোলিত হইত না, ব্রহ্মসভার দুই একজন লোক আপনাদের সভামন্দিরে আমাদের সমাজ-সম্বন্ধে কিরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেন, সকলে তাহা

শুনিতে পাইত না, শুনিবার জন্য ব্রহ্মসভাতে যাইত না। আপনার পিতৃব্য আমাদের কর্ণে নিত্য নিত্য নূতন কথা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি একজন বড়লোক, তাঁহার টাকা অনেক ছিল, অনেক লোক তাঁহার অনুগত হইল। লোকে যেমন তামাসা দেখিবার জন্য রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রার মেলাস্থলে গমন করে, আমোদের জন্য যেমন যাত্রা, কবি, পাঁচালী ইত্যাদি শুনিতে যায়, আমরাও সেইরূপে ব্রজবাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। এক একটা কথা শুনিয়া রাগ হইত, এক একটা কথা শুনিয়া হাসি পাইত, এক একটা কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল মনে করিতাম, কিন্তু মনের সকল প্রকার ভাব চাপিয়া চাপিয়া রাখিতাম। দশের কাছে যিনি ধর্ম্মজ্ঞানী বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলিয়া কোন ফল হইবে না, ইহা ভাবিয়াই আমরা নিস্তব্ধ থাকিতাম। তিনি ধর্ম্মজ্ঞানী, তাহার নিদর্শন ছিল গঙ্গাস্নান আর নিত্য তর্পণ। টাকার মানুষ, কিন্তু বাড়ীতে কোন পূজা-পার্ব্বণ অথবা অন্যপ্রকার ক্রিয়া-কর্ম্ম হইত না, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি সামাজিক অনুষ্ঠানেও তিনি বিরত ছিলেন; অধিক কথা কি, ভিখারীরাও তাঁহার দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা পাইত না। সাহেবলোকের সহিত মিশিবার সাধটাও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল, ইংরাজী কথা ভাল বুঝিতেন না বলিয়া বড় বড় সাহেবের মজ্‌লীসে যাইতে তাঁহার বড় একটা সাহস হইত না। সাহেবেরা ভাল বলিবে, দাতা বলিবে, হিতৈষী বলিবে, তেমন কোন কার্য্য করিবার সুবিধা পাইলে তিনি সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য এক একটা হুজুগে কিছু কিছু দান করিতেন। বিলাতে একবার কে একজন সাহেব মরিয়াছিল, তাহার একটা পাথরের মুরদ গড়াইয়া দিবার জন্য কলিকাতায় চাঁদা হয়, ব্রজবাবু সেই চাঁদার খাতায় ৫০৲ টাকা দান দস্তখৎ করিয়াছিলেন। খবরের কাগজে সেই দানের কথাটা ছাপা হইয়াছিল। ছাপার কাগজে আপনার নাম উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি বড় খুসী হইয়াছিলেন। দেশের লোকের উপকারের নিমিত্ত তিনি কখনও একটী পয়সাও দান করেন নাই।”

যে দুটী ডাক্তারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও সেই দিনের মজলীসে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের কথা সমাপ্ত হইলে সেই দুই জন ডাক্তারের মধ্যে একজন সম্মুখস্থকে একটু সুস্থির বলিয়া অত্যল্প ভূমিকায় গল্প সুরু করে

কহিলেন, "সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতায় ব্রজবাবুর খুব ঝোঁক ছিল, কিন্তু নিজের সংস্কারের দিকে আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাঁহার গুপ্তচরিত্রে অনেক গোলমাল ছিল। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি,' এই যে একটা কথা আছে, চতুর ব্রজরত্ন বাবু সেই কথার মর্য্যাদা বুঝিয়া চলিতেন, সকল কার্য্যেই তাঁহার লুকাচুরি ছিল। ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিলে গায়ে জল লাগে না, ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিলে জল ছুঁইতে হয় না, ইহা তিনি বুঝিতেন। যত কিছু পাপকার্য্য তিনি করিয়াছেন, তৎসমস্তই কৌশলক্রমে অপরের দ্বারা সাধন করা হইয়াছে; স্বহস্তে তিনি কোন প্রকার দুষ্কার্য্য করেন নাই, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পরের মন্দ করিবার হুকুম দেন নাই, লোকে তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানুক, ইহাই তাঁহার অভিসন্ধি ছিল।"

ভবরত্ন কহিলেন, "আপনারা আর আমাকে সে সকল কথা শুনাইবেন না। লোকের অসাক্ষাতে নিন্দা করা যেমন দোষ, মরা মানুষের নিন্দা করা তদপেক্ষা অধিক দোষ; মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না। তিনি নিজ মুখে আমার সাক্ষাতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, স্বহস্তে যাহা আমি লিখিয়া লইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; তাহাতেই আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি, তাঁহার গুপ্তচরিত্রের অধিক ব্যাখ্যা আর আমাকে শুনিতে হইবে না।"

যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ভবরত্নকে সাধুবাদ দিলেন। সে দিনের মত মজলীস্ ভঙ্গ হইল। সপ্তাহ পরে ভবরত্ন একটী নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, পার্শ্বে মুরুব্বীয়ানা ধরণের একটী লোক গম্ভীরবদনে বসিয়া আছেন, একজন স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই কাদম্বিনী। দেখিবামাত্র ভবরত্ন তাহাকে চিনিলেন। পার্শ্বের লোকটীর প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া কাদম্বিনীকে তিনি বলিলেন, "তোমার দেনার একখানা ফর্দ্দ আমাকে দিও, আমি সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিব; কর্ত্তা ইহসংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এখন তুমি ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পার; তিনি জীবিত থাকিলে আমি তোমাকে একখানা বাড়ী কিনিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আর তাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি না। যে দিন তুমি দেনার ফর্দ্দ আনিবে, সেই দিন সেই দণ্ডে আমি হিসাব পরিষ্কার করিব।"

অঞ্চল হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কাদম্বিনী বলিল, "ফর্দ্দ আমি

আসিয়াছি, এই দেখুন সেই ফর্দ।” কাদম্বিনীর হস্ত হইতে ফর্দখানা গ্রহণ করিয়া ভবরঙ্গ আগাগোড়া অঙ্কগুলি অবলোকনপূর্ব্বক একজন চাকরকে ডাকিলেন, চাকর আসিলে তাহার হস্তে একখণ্ড চিরকুট লিখিয়া দিয়া দপ্তরখানায় পাঠাইলেন। চাকর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে খানকতক ব্যাঙ্কনোট প্রদান করিল, গণনা করিয়া তিনি সেইগুলি কাদম্বিনীকে দিলেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, পার্শ্বস্থ লোকটীর দিকে কটাক্ষসন্ধান করিতে করিতে কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

পার্শ্বস্থ লোকটীর নাম রামতনু ঘোষাল। কাদম্বিনীকে তিনি চিনিলেন। ব্রজরঙ্গের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে কাদম্বিনীর বাড়ীতে যাইতেন, এক এক রাত্রে একাকীও দর্শন দিতেন; কাদম্বিনীর সঙ্গে তাঁহার গুপ্তপ্রেম ছিল; সে সকল কথা গোপন করিয়া কাদম্বিনী বিদায় হইবার পর ভবরঙ্গকে তিনি কহিলেন, “ঐ স্ত্রীলোককে আমি চিনি, আপনি যাহা করিলেন, তাহাও বুঝিলাম; আপনার জোঠা মহাশয় একজন তুখোড় লোক ছিলেন; যে সূত্রে কাদম্বিনীর সহিত তাঁহার আলাপ, সে সূত্র বাজারের সাধারণ প্রণয়ালাপের সূত্র নহে, কাদম্বিনী পূর্ব্বে কুলকন্যা ছিল, আপনার জ্যেষ্ঠতাত উহাকে কুলের বাহির করেন। আমি একবার—”

মনে মনে বিরক্ত হইয়া, বেশী কথা না শুনিয়াই ভবরঙ্গ কহিলেন, “সে পরিচয় আমার শুনিবার আবশ্যক নাই। আপনি উহাকে চিনিয়াছেন, ইহা আমি জানিলাম, ঐ পর্য্যন্তই ভাল।”

রামতনু ঘোষাল অপ্রতিভ হইলেন না, তাঁহার লম্বা লম্বা দাড়ী ছিল, মুখ ভারী করিয়া সেই দাড়ীতে পাক দিতে দিতে গম্ভীরস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, “আপনি শুনিতে চান না, কিন্তু আমার প্রাণে বড় লাগে। আমার ভাগিনেয়ের সঙ্গেই কাদম্বিনীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই ভাগিনেয় আজিও বাঁচিয়া আছে, এই সহরের ষ্ট্যাম্প-আফিসে চাকরী করে, কাদম্বিনীকে হারাইয়া সেই অবধি সে আর বিবাহ করে নাই। বিবাহের সময় হইতে কুলের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কাদম্বিনী আমাকে দেখে নাই, আমিও কাদম্বিনীকে দেখি নাই। ব্রজবাবুর সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, একরাত্রে তাঁহার সঙ্গে গিয়া কাদম্বিনীকে আমি দেখি; সেই আমার প্রথম দেখা। আমি তাহার মামাশ্বশুর, সে তাহা জানিত না; খোসমুখে আমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, বাবুর সঙ্গে মদ খাইয়াছিল,

নাচিয়া নাচিয়া গীত গাহিয়াছিল, কাদম্বিনীর রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছিলাম। অন্য কোন সূত্রে কাদম্বিনীর সত্যপরিচয় আমি জানিতে পারি। যে বড় লজ্জা হয় ও দুঃখও হয়, ব্রজবাবু যাহাতে কাদম্বিনীকে ত্যাগ করেন, চুপি চুপি কাদম্বিনীকে ঘরে লইয়া গিয়া যাহাতে আমি তাহাকে জাতিতে তুলিতে পারি, সেই চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। এক জনের প্রতি ব্রজরত্নের বদ্ধ অনুরাগ ছিল না, কাদম্বিনী ছাড়া সৌদামিনী, নিতম্বিনী, নিস্তারিণী, ভবতারিণী, বিন্দুবাসিনী, মুক্তকেশী ও পায়রাপুতী প্রভৃতি তাঁহার আরও অষ্টাদশ নায়িকা ছিল, ঈর্ষা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে সেই সকল কথা আমি কাদম্বিনীর কাণে তুলিয়াছিলাম। কাদম্বিনীর অন্ধ অনুরাগ, আমার কথায় তাহার বিশ্বাস হয় নাই, ব্রজরত্নকে ছাড়ে নাই। এক রাত্রে আমি—"

রামতনুর অন্তরের ভাব ভবরত্ন বুঝিলেন, আরও অধিক বিরক্ত হইয়া একটু উগ্রস্বরে বলিলেন, "কেন আপনি বার বার ঐ সব কথা তুলিতেছেন? আমি আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, ঐ সকল কথা তোলাপাড়া করিতে আপনি যদি ভালবাসেন, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি আর এ বাড়ীতে আসিবেন না।" সক্রোধে এই সকল কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তিনি ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, একটু পরে বিমর্ষবদনে রামতনুও বাহির হইলেন। প্রকাশ থাকুক, রামতনুও একজন সমাজ-সংস্কারক।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী অতঃপর জমীদারী-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি প্রবলা হইয়া উঠিল, মাতৃসেবায় তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল; জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং মাতা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর অভিমতানুসারে তিনি সমস্ত সংসারিক কার্য্য অতি সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইলেন। সেরেস্তার আমলারা এবং বাটীর দাসী-চাকরেরা তাঁহার সদ্ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্যকার্য্য মনোযোগ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

সাংসারী কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া বাবু ভবরত্ন বিষয়কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়াছিলেন; ভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমলাদের মুখে শুনা হইয়াছিল, বিষয়ের বার্ষিক আয় ৮০ হাজার টাকা। নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিক বার্ষিক আয় ২০০০০০ লক্ষ টাকার

অধিক, নিয়মিত খরচ-পত্রের সুব্যবস্থা করিয়া বিবিধ সদুপায়ে সেই আয় তিনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আমলে বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম কিছুই হইত না, ভ রত্ন নিজে কর্ত্তা হইয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া দশের নিকটে যশের ভাজন হইলেন। দুই বৎসর পরে চাঁপাতলার একজন সম্ভ্রান্ত ধনবানের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বঙ্গাব্দ ১২৭০।

গঙ্গার ঘাটে উদাসীন-সন্ন্যাসীর ন্যায় এক রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া ছিলেন, ব্রজরত্ন চৌধুরী সেই অবস্থায় তাঁহাকে বাটীতে আনয়ন করিয়া আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন, কলিকাতা সহর কিরূপ, কলিকাতার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ, তাহা তিনি ভাল করিয়া দর্শন করেন নাই, নগরবাসী হইয়া সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর কলিকাতার মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল; বাহিরে যাহা যাহা দেখিবার, একে একে তাহা দর্শন করিয়া বিদ্যালয়াদি-পরিদর্শন করিতে তিনি অভিলাষী হইলেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা অধিক হয়, বালকেরা মাতৃভাষা-শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হয় না, ইহা দর্শনে তাঁহার মনে আক্ষেপের উদয় হইল। কেবল মাতৃভাষা-শিক্ষার অপ্রচুরতা তাঁহার আক্ষেপের কারণ নহে, কোন বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না, হিন্দু-সন্তানেরা স্বধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে চাহে না, ভক্তি-শিক্ষার সুযোগও প্রাপ্ত হয় না, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকের ব্যবহার ও বক্তৃতাই তাহাদিগের বিশ্বাস টলাইয়া দেয়, তাহারা নিজে নিজেও সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমোদিত হইতে ইচ্ছা করে, ইহাই সমধিক আক্ষেপের বিষয়। স্বদেশে যাঁহারা শিক্ষিত এবং উন্নতিশীল বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা সমাজসংস্কারক হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাঁহারাও স্বধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে উদাসীন, স্বজাতীয় আচার-ব্যবহারের নিন্দাবাদ করাই যেন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য, বক্তৃতা-শ্রবণে কেবল তাহাই বুঝা যায়। আমাদের দেশাচার ভাল নহে, আমরা কুসংস্কারের দাস, সাহেবের দেশাচার ভাল, সামাজিক বক্তৃতায় সামাজিক বক্তারা এই সকল কথাই বেশী বলেন। কেবল মুখের কথাও নহে, ব্যবহারেও অনেকটা সেইরূপ আদর্শ দেখান। হিন্দুসমাজের সংস্কার আবশ্যক, সেই আবশ্যকতা যাঁহারা বুঝাইতে চাহেন, অবশ্যই তাঁহারা হিন্দু; কিন্তু নিজে তাঁহারা যেরূপ দেখান, তাহাতে তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া বুঝিয়া

লইতে অনেক বিলম্ব হয়। তাঁহারা সাহেবী পোষাক পরিতে ভালবাসেন, সাহেবী খাদ্য-পানীয় ভালবাসেন, সাহেবী ভাষায় লেক্‌চার দিতে ভালবাসেন, সাহেবী ধরণের চুল কাটিতে ভালবাসেন, সাহেবী ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে ভালবাসেন; নাম মাত্র বঙ্গবাসী, কার্য্যের অনুকরণে তাঁহারা যেন বিদেশবাসী বলিয়া লোকের চক্ষে প্রতীয়মান হন। এমন অবস্থায় তাঁহাদিগকে হিন্দুর সমাজ-সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করিতে কি জন্য সন্দেহ উপস্থিত হইবে না, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার লোক নাই। আমাদের সমাজঃ ভাল নয়, ইংলণ্ডের সমাজ আমাদের দেশে আনয়ন কর, বক্তারা স্পষ্ট করিয়া এইটুকু বলেন না, কিন্তু বক্তৃতাসমুদ্র মন্থন করিয়া যাঁহারা সার উত্তোলন করেন, তাঁহারা কি পান, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে যেরূপ উত্তর পাওয়া সম্ভব, তাহাতে মহা গোলমাল। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে কমলা উঠিয়াছিলেন, চন্দ্র উঠিয়াছিলেন, অমৃত উঠিয়াছিল, শেষকালে হলাহলও উঠিয়াছিল; হিন্দু বক্তার বক্তৃতা-সাগর-মন্থনে অমৃত কিম্বা বিষ পাওয়া যায়, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সেই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করেন, তাঁহারা কিরূপ উপদেশ অথবা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হন, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। শ্রোতাদলে অধিকাংশ বালক থাকে, বালকেরা বড় হইলে তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে সমাজমঙ্গলের আশা করা যায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ প্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহাদের মন কোন্ প্রকার মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইবে, যাঁহারা ভবিষ্যৎ ভাবনা করেন,তাঁহারা মনে মনে তাহা বুঝিয়া, ঘরে বসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। কতিপয় বালক আপনাদের ছুটীর পর একটী তর্কসভায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিয়া, মীমাংসা আনিয়াছিল, হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের তিনটী অঙ্গ:—হিন্দুর জাতিভেদ পরিত্যাগ করা, সকল জাতির সহিত সকল জাতির একত্র ভোজন করা এবং সকল জাতির সহিত সকল জাতির পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া। এই তিনটী অঙ্গ পরিপুষ্ট হইলেই হিন্দুসমাজ নির্ম্মল হইয়া উঠিবে; যদি কিছু ময়লা থাকে, বিধবা-বিবাহ চালাইয়া দিলেই সে ময়লাটুকু বিধৌত হইয়া যাইবে।

সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা এই প্রকার। বাবু ভবরত্ন কয়েকটী স্থানে এই প্রকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্বদেশের অবস্থা এক প্রকার বুঝিয়া লইলেন; আর

কোথায় কি প্রকার কার্য্য আছে, তাহা দর্শন করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। আর এক দল সমাজবন্ধু তিনি দেখিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দেন। যাঁহাদের নিজ মুখে ঐ প্রকার পরিচয়, তাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটী ব্রহ্মসভায় সমবেত হইয়া নয়ন মুদিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন, পরব্রহ্ম যদি প্রাচীন বেদশাস্ত্রের ভাষা বুঝিতে অক্ষম হন, এই চিন্তা করিয়া কোন কোন স্থলে ইংরাজী ভাষাতেও উপাসনা করা হয়; বক্তৃতাও অধিকাংশ ইংরাজী। ইংরাজের রাজত্বে ইংরাজী ভাষাতেই ব্রহ্মোপাসনা হওয়া উচিত, ইহাই কতকগুলি লোকের সংস্কার। ব্রহ্মজ্ঞানীরাও সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করেন। যাঁহারা হিন্দু-সমাজের কোন ধার ধারেন না কিম্বা হিন্দুর সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাহেন না, অধিক কথা কি, আপনাদিগকে হিন্দু-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজ সংস্কার করিতে অগ্রসর, ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সকল ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রহ্মজ্ঞানীর খাতায় নাম লিখাইতে আগ্রহবান্, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গলদেশের যজ্ঞসূত্র দূরে ফেলিয়া দেন। কি কি লক্ষণে মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ব্রাহ্ম বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, ব্রাহ্মেরা সেই সকল লক্ষণ অবধারণ করিয়াছেন। প্রকাশ্য লক্ষণে দাড়ী আর চস্‌মা। বিদ্যালয়ের কতকগুলি বালক সমাজের আচার-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মনাম ধারণ করিতে যত্নবান্; বয়স অল্প, দাড়ী উঠিবার সময় হয় নাই, সুতরাং তাহাদের মনস্তাপ মনে মনেই থাকে; একটী অঙ্গ অতি সুলভ, দশম, একাদশ অথবা দ্বাদশবর্ষীয় বালকেরাও চস্‌মা চক্ষে দিয়া ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি করে; পথে চলিবার সময়েও চসমাশূন্য হইয়া চলে না, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, অদূরদৃষ্টি; ইংরাজী কথায় সর্ট-সাইট। বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে এত সর্ট-সাইট কোথায় ছিল, অনুমান করিয়া স্থির করা যায় না। মিথ্যাকথা আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে; সর্ট-সাইটেরা যখন কোন পুস্তক অথবা পত্র পাঠ করে, তখন চস্‌মাগুলি নাসাগ্র হইতে সরাইয়া কপালের উপর তুলিয়া রাখিতে হয়। তাহাতেই বুঝা যায়, চস্‌মা অবশ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী অলঙ্কার। এমনও শুনা যায় যে, চস্‌মা পরিয়া এক একটী বালকের এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, চস্‌মা চক্ষে না থাকিলে রাত্রিকালে তাহাদের নিদ্রা হয় না। পরমপিতা পরমেশ্বরের এমন বিড়ম্বনা ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই!

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী আমাদের আর্য্যধর্ম্মের ঐ প্রকার বৈলক্ষণ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা অবশ্যই পরম ধর্ম্ম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা সে ধর্ম্মের মহিমা কতদূর বুঝিতে পারে, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে অসমর্থ; তবে কেন তাহারা ব্রাহ্ম হয়? বাবু ভবরত্ন আপন মনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মনে মনে মীমাংসা করিলেন, কথিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচার চলে, দেবদেবীর পূজা করিতে হয় না, সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণপুত্রকে জলগ্রহণ করিতে নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে বাধা থাকে না, হিন্দুধর্ম্মের কোন প্রকার পবিত্রাচার মান্য করিতে হয় না, যাহার মনে যাহা আইসে, স্বচ্ছন্দে সে তাহা করিতে পারে, কেহই তাহাদের স্বাধীন কার্য্যের উপর কথা কহিতে পারেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণে এতগুলি সুবিধা, এই কারণেই পরিণতবয়স্ক জ্ঞানী লোক অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে বালকের সংখ্যা অধিক।

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ভবরত্নের ভক্তি রহিল, কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মনামধারী বালক ও যুবকগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি কমিল; সমাজ-সংস্কারের দিকে তাঁহার মন টলিল না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যতগুলি অশাস্ত্রীয় কুব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলির সংশোধন আবশ্যক, ইহা তিনি স্বীকার করিলেন, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া সেগুলি বাহির করে কে, উপযুক্ত সংশোধনের ব্যবস্থা করে কে, তাদৃশ বিজ্ঞলোক দুটী চারিটী ভিন্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল না। বাজারের একঘেয়ে বক্তৃতার দ্বারা হিন্দু-সমাজের সংস্কার হইবে, এমন আশা নাই। যদবধি এদেশে বক্তৃতার স্রোত প্রবল হইয়াছে, তদবধি লোকের মুখে বাঙ্গালীর উপাধি হইয়াছে,—বক্তৃতাবাগীশ বাক্যবীর।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, বাবু ভবরত্নের দুটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ১২৭৫ সালে প্রথম পুত্রের জন্ম। ভবরত্ন তখন ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িলেন। প্রথম-জীবনে তিনি দায়ে পড়িয়া দেশপর্য্যটক হইয়াছিলেন, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তীর্থধামে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দেশভ্রমণে তাঁহার আনন্দ বাড়িয়াছিল, সংসারী হইয়াও তীর্থ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। জননীকে, জ্যেষ্ঠতাতপত্নীকে এবং সহধর্ম্মিণীকে যাহা কিছু বলিবার, তাহা বলিয়া কহিয়া একদিন তিনি সেরেস্তায় গিয়া বসিলেন।

সেরেস্তার সদর আমলা দ্বাদশ জন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি অতি বিচক্ষণ লোক; তাঁহার নাম সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমীদারী কাজকর্ম্মের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন; উপদেশ দিবার সময় ভবরত্ন তাঁহাকে কহিলেন, কিছু দিনের জন্য আমি তীর্থ-দর্শনে যাইব, ফিরিয়া আসিতে কিছু অধিক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, ইতমধ্যে আমার সন্তানেরা বিদ্যাশিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইবে; কন্যাটী এখন ছোট, লেখাপড়া শিখাইবার সময় হইলে তাহাকে কোন প্রকার পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন না, তাহার গর্ভধারিণী বিদ্যা-বতী; বালিকার যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, ঘরে বসিয়াই সে তাহা শিখিতে পারিবে। আমি দেখিলাম, মিশনরী দলের বিবিরা হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যাগণকে এবং বধূগণকে লেখা-পড়া শিখায়, কার্পেট বুনিতে শিখায়, কাপড়ের উপর কাজ করিতে শিখায়, আমার অন্তঃপুরে যেন তাদৃশী বিবিরা প্রবেশ করিতে না পায়। তাহাদিগের শিক্ষাদানের পদ্ধতি আমি ভাল-বাসি না; না বাসিবার প্রধাণ কারণ এই যে, তাহারা আমাদের কুলকন্যাগণের ধর্ম্মবিশ্বাস টলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; সে বিষয়ে আপনি সাবধান থাকিবেন। আর একটী কথা। কলিকাতা ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহের অনেক বালক সঙ্গদোষে চরিত্রভ্রষ্ট হয়, অল্পবয়সে নেশা করিতে শিক্ষা করে; অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, আমার ছেলে দুটীকে কোন স্কুলে না পাঠাইয়া গৃহে শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করিবেন। সুশিক্ষিত গৃহশিক্ষক দুর্লভ নহে, যাঁহারা তদ্বিষয়ে উপযুক্ত এবং ব্যবহারে যাঁহারা সচ্চরিত্র, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনকে আপনি নির্ব্বাচন করিয়া নিযুক্ত করিবেন; একজন সাহিত্যশিক্ষা দিবেন, এক-জন পণ্ডিত রাখিবেন, বালক দুটীকে তিনি সংস্কৃত পড়াইবেন; কাব্য, সাহিত্য ও ব্যাকরণ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মের সুশিক্ষা হয়, পণ্ডিতমহাশয়কে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন; আর আপনি নিজেও সর্ব্বদা বালকদিগের চরিত্রচর্য্যার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বিষয়-কার্য্যের সমস্ত ভার আপনার উপর; বার্ষিক ক্রিয়া-কর্ম্ম যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ চলিবে; আমার অনুপস্থিতিকালে আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত যাঁহারা যাঁহারা এ বাটীতে উপস্থিত হইবেন, কোন প্রকারে তাঁহাদের কাহারও যেন অমর্য্যাদা না হয়। আর আমার কিছু বলি-

দ্বার নাই, আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে, তাহাই আপনি করিবেন।”

নমস্কার করিয়া নায়েব-মহাশয় সম্মত হইলেন। সপ্তাহ পরে একটী শুভদিন দেখিয়া, অতি অল্পমাত্র পারিষদ্ ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাবু ভবরত্ন চৌধুরী তীর্থযাত্রা করিলেন। কলিকাতার বাতাস, কলিকাতার ব্যবহার এবং কলিকাতার আমোদ তাঁহার পক্ষে সর্ব্বক্ষণ তৃপ্তিকর বোধ হইত না, গঙ্গাপথে হইয়া কলিকাতার বাহিরের গণনীয় প্রদেশগুলি একে একে তিনি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া তিনি ভাবিতেন, কলিকাতার আচার-ব্যবহার আর মফস্বলের আচার-ব্যবহার বিভিন্নপ্রকার হওয়াই সম্ভব; বাস্তবিক অনেক স্থলে তাহাই তিনি দেখিলেন; যে সকল স্থান কলিকাতার কিছু নিকটবর্ত্তী, সেই সকল স্থলে কলিকাতার হাওয়া ছুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া মনে মনে তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। প্রদেশ দর্শন করিতে করিতে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, পুষ্কর এবং আর কয়েকটী দর্শনীয় স্থানে প্রায় আট বৎসর বাস করিয়া একবার তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। যখন গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কন্যাটীর বয়ঃক্রম ছিল তিন বৎসর; সেই কন্যা একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, অতএব সম্বন্ধ স্থির করিয়া দুই মাসের মধ্যে কন্যার শুভবিবাহ সম্পাদন করিলেন। পুত্রেরা তখন উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিতেছে, তদ্দর্শনে তাঁহার পরম সন্তোষ জন্মিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম তখন সপ্তদশ বর্ষ; তত অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ না করিয়াই, ছয় মাস পরে তিনি পুনরায় হরিদ্বারাদি তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন; সেইবার তাঁহার জননী ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী সঙ্গে রহিলেন। বঙ্গাব্দ ১২৯২।

দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যায়, কাহারও সময় অসময় প্রতীক্ষা করে না, দিনে দিনে সংসারের কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, চন্দ্র-সূর্য্য তাহা দেখিয়া দেখিয়া যান, কিন্তু হিসাব রাখিয়া যান না; মানুষের কাছেই হিসাব থাকে অল্পদিন ভ্রমণ করিয়াই ফিরিয়া আসিবেন, ভবরত্নের মনে এইরূপ কল্পনা ছিল; কিন্তু কার্য্যগতিকে ছ বৎসর বিলম্ব হইল। উত্তর-

ভারতের দর্শনীয় সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বঙ্গের চট্টগ্রাম জেলায় চন্দ্রনাথপর্ব্বতস্থ চন্দ্রনাথ-মহাদেব দর্শন করিয়া ১২৯৮ সালের শ্রাবণমাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ভবরত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শিবরত্ন। ১২৯৮ সালে শিবরত্নের বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বৎসর। জননী ও পত্নীর অনুরোধে বাবু ভবরত্ন সেই সময় শিবরত্নের বিবাহ দিবার নিমিত্ত দুই তিনজন ঘটক নিযুক্ত করিলেন। সে সময় কলিকাতা সহরে ঘট্‌কীর আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু ভবরত্ন তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সত্যই তাহারা ঘৃণার পাত্রী, এ বিবাহের সম্বন্ধে তাহারা মুখ পাইল না। কলিকাতা সহরের মধ্যেই পুত্রের বিবাহ দেওয়া ভবরত্নের ইচ্ছা; একান্তপক্ষে সহরের সীমার মধ্যে যদি যোগ্য-পাত্রী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণে ভবানীপুর এবং উত্তরে বরাহ-নগর পর্য্যন্ত মনোনীত করিতে পারেন, ঘটকদিগের নিকটে তিনি এইরূপ অভাব দিলেন। ঘটকেরা স্থানে স্থানে গৃহে গৃহে পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

ভবরত্নের জননী ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা দর্শন করেন নাই, কলিকাতার ব্যবহারেও তিনি বিদেশিনী ছিলেন, সুতরাং পাত্রী-নির্ব্বাচনে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না; জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যদিও অধিক বয়সে কলিকাতায় আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামের কন্যা; কলিকাতার গৃহস্থ লোকের বাটীতেও তাঁহার গতিবিধি ছিল না; সহরের কন্যারা অধুনা কিরূপ উপকরণে সজ্জিতা হইয়া কি ভাবে দাঁড়াইতেছে, তাহা তিনি জানিতেন না; সুতরাং তিনিও ঐ বিবাহের সম্বন্ধে পাত্রীনির্ব্বাচনে কোন কথাই বলিলেন না; শিবরত্নের জননী সহরের কন্যা, সহরে পুত্রের বিবাহ দিতে তিনি আপত্তি করিলেন।

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর বাবু ভবরত্ন বিষয়াধিকারী হইয়া নগরবাসী ভদ্রলোকদিগের বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন, অনেক বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল; নগরের বালক-বালিকারা এখন কিরূপ প্রণালীতে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হয়, তাহা তিনি অনেক দূর জানিয়াছিলেন; সহধর্ম্মিণীর আপত্তি-শ্রবণের অগ্রে সেই প্রণালী তিনি

স্মরণ করিতে পারেন নাই; আপত্তিগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার চক্ষু ফুটিল। সহরের বালকেরা ইংরাজী স্কুলে লেখা-পড়া শিক্ষা করে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামী শিক্ষা করে, ইংরাজী স্কুলের পদ্ধতিমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বড় বড় পণ্ডিতের সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতে যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্ক করে, গুরুজনের মান রাখিতে চাহে না, শিষ্টাচার ভুলিয়া যায়, এই তাহাদের রোগ। তাহাদের মধ্যে যাহারা চরিত্র ভাল রাখিতে যত্ন করে, তাহাদের সে যত্নও বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। জ্যাঠামীটা সংক্রামক, অবিচ্ছেদে তাহা ত থাকেই, তাহার উপর কিছু নূতন নূতন ব্যবহারের যোগ হয়। বিলাতী সাহেবের মতে তামাক খাওয়া বড় দোষ; তামাক খাইলে শিরোরোগ জন্মে, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, বিজ্ঞান-বিশারদ সাহেব লোকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, সেই সকল যুক্তির উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া কলিকাতার কতকগুলি যুবক অতি অল্পবয়স হইতেই নস্যগ্রহণ অভ্যাস করে; দণ্ডে দণ্ডে নস্যগ্রহণ করাতে কাহারও কাহারও উচ্চারণ অনুনাসিক হইয়া যায়। অল্প দিন হইল, বাড্‌সাই নামক এক প্রকার নূতন বস্তু কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে, পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত সেই বস্তুর বিষাক্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া আমোদ অনুভব করে, চরিত্রশোধনের ভাব জানায়, নস্য এবং বাড্‌সাই অতি পবিত্র পদার্থ, উহা তামাক নহে, তামাকের সম্পর্ক-পরিশূন্য, ইহাই তাহারা মনে করে। যাহা তামাক নহে, তাহা সেবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় না, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। সাহেবেরা যাহা বলেন, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণও তাহারা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করে না। আশ্চর্য্য! যাঁহারা দিবা-রজনী অমিশ্র তামাকের চুরুট মুখে করিয়া শয়ন, উপবেশন ও ভ্রমণ করেন, তাঁহারা তামাকনিষেধের ব্যবস্থা দেন, ইহা কৌতুকাবহ বটে। তামাকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া যাহারা নস্যভক্ত ও বাড্‌সাইভক্ত হয়, তাহাদের অপরাপর গুণাবলীও সেই প্রকারে গণনা করিয়া লওয়া যায়।

বালকের পক্ষে এইরূপ। ওদিকে বালিকারাও কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখিয়া এ দেশে যেন আর এক প্রকার নূতন জীব হইয়া উঠিতেছে। কোন কোন বালিকার মুখে বাড্‌সাইধূম দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্কুলে

তাহারা বর্ণপরিচয় ও পুস্তকপাঠ শিক্ষা করে, কার্পেটের ব্যাগ এবং কার্পেটের জুতা বুনিতে শিক্ষা করে, বাঙ্গালী সংসারের অবশ্যকর্ত্তব্য গৃহকার্য্য কিছুই শিক্ষা করে না, বিবাহের পর বিবিয়ানা ধরণে পোষাক পরিয়া, মোজা ও জুতা পায়ে দিয়া, চেয়ারে বসিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে, বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, দুইবেলা গরম গরম চা না খাইলে তাহাদের ভুক্তবস্তু পরিপাক হয় না, গা মাটী মাটী করে, মৌতাতী গুলীখোরের মৌতাতের সময় অতীত হইলে যেমন যেমন হয়, চা প্রস্তুত হইবার বিলম্ব হইলে সেই সকল বাঙ্গালীকন্যারও সেইরূপে ঘন ঘন হাই উঠিয়া থাকে। আরও অনেক উপসর্গ আছে। কলিকাতার গৃহস্থের অন্তঃপুরের সমাচার যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা আরও অনেক কথা বলিতে পারেন। সমাজসংস্কারের বক্তৃতায় গলাবাজী করিতে যাঁহারা পটু, তাঁহারা এ সকল উপসর্গ দেখিতে পান না, যাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলে প্রকৃতপক্ষে সমাজের সংশোধন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া, যাহাতে অনিষ্ট আছে, তাহাতেই ফুৎকার প্রদান করা কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়াছে। স্ত্রীলোকরা সংসারের লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীরা লক্ষ্মীর গুণ ভুলিয়া অন্য পথে বিচরণ করিতে ধাবিত হইতেছে, সমাজসংস্কারকরা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন না, সে চেষ্টা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়া পুরুষগণকে দাসের ন্যায় করিয়া রাখে, সেই বিষয়েই উৎসাহদান করা তাঁহাদের কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নারীগণের ঐ প্রকার স্বাধীনপ্রবৃত্তি দেশব্যাপিনী হইয়া উঠিলে দেশের যে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেন দৈববাণীর ন্যায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সেই দৈববাণীর কয়েকটী পদ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"দেশের মেয়ে ঘরের কাজে আর কি এমন রত রবে।
এরা এ-বি পড়ে বিবি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে॥
আর কি এরা এমন করে সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত নেবে।
আর কি এরা আদর করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥"

এই দৈববাণী ফলিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। টাঁই টাঁই ফলিতেছে; ইহা বলিলেও ভুল বলা হইবে না। ভবরত্নের স্ত্রী কলিকাতা সহরে পুত্রের বিবাহ দিতে অমত করিয়া যে যে আপত্তি করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ভবরত্নের মন টলিল। তিনি পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। শিবপুরের একটী রূপবতী কন্যার সহিত শিবরত্নের বিবাহ হইল। শিবপুর যদিও কলিকাতার অতি নিকট, তথাপি কলিকাতার ঐ সকল বিকার শিবপুরে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পায় নাই। স্রোত যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে কেবল শিবপুর কেন, বঙ্গের সমস্ত স্থানেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সে আগুন নির্ব্বাণ করিবার লোক কোথায় পাওয়া যাইবে, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। এখন যাঁহারা সমাজ-সংস্কার সমাজ-সংস্কার বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা বরং জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতেছেন। এ দেশের বিবাহের বাজারে আগুন লাগিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিবাহের সময় কন্যা-বিক্রয় করিলে কন্যার পিতাকে পতিত হইতে হইত, সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিত। বিক্রীতা কন্যার পিতাই কেবল পতিত হইয়া থাকিত, তাহাই নহে; শাস্ত্রবাক্য আছে, "যে দেশে শুক্র-বিক্রয় হয়, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হইয়া থাকে।" এ দেশের লোক এখনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলেন, কিন্তু কার্য্যে কিরূপ হইতেছে, তাহা কেহই দেখেন না। বিবাহ-বাজারে ভদ্র ভদ্র সমাজে আজকাল নীলামডাকের ন্যায় উচ্চমূল্যে পুত্র-বিক্রয় হইতেছে। এক একটী পুত্রের মূল্য আট হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিলাভের সংখ্যা অনুসারে বরের মূল্য অবধারিত হইয়া থাকে, অথচ সমাজ-সংস্কারের চিন্তায় সংস্কারকদিগের রাত্রে ঘুম হয় না। বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া হুতোম্‌দাস বলিয়া গিয়াছেন, ঘুম না হইবার প্রধান কারণ মশারির অভাব।

এই বাজারে বাবু ভবরত্ন চৌধুরী আপন পুত্রের বিবাহ দিলেন। তিনি জমীদার, পুত্রটীও রূপবান্ গুণবান্; যাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ হইল, তিনিও সম্পত্তিশালী; তথাপি সদাশয় ভবরত্নবাবু সেই বৈবাহিকের নিকটে নিয়মমত দানশয্যা ও দক্ষিণা ব্যতীত আর একটী পয়সাও গ্রহণ করিলেন না। তিনি আদর্শস্থলে দাঁড়াইবার যোগ্য, কিন্তু পুত্র বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইবার আশা যাহাদের অত্যন্ত বলবতী, তাহারা ভবরত্নবাবুকে আদর্শস্থলে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত সমস্ত.

হইবে না ; বাবার খারাপ করিয়া দিল, এই বলিয়া বরং ঐ সাধু ব্যক্তির নিন্দাবাদ করিতে সহস্র রসনা ধারণ করিবে। সমাজসংস্কার করাও বাবু ভবরত্নকে সৎকার্য্যের দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যাইবেন। বাজেকথা লইয়া আন্দোলন করা যাঁহাদের আমোদ, চীৎকার করিয়া বাহাদুরী লওয়া যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা, সাধুকার্য্যের নিদর্শন অন্বেষণ তাঁহাদের নিকটে উপেক্ষণীয়, লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা নিজেই হত ত উহা স্বীকার করিবেন ; মুখে যদিও স্বীকার না করেন, তাঁহাদের কার্য্য স্বতই উজ্জ্বল হইয়া তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

সমাজ-সংস্কার ব্যতীত উচ্চ আশা যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারা আর একটা উচ্চকার্য্যে বক্তৃতা ছড়াইয়া থাকেন। সে কার্য্যের নাম ভারত-উদ্ধার। ভগবান্ নারায়ণ মৎস্য-অবতারে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন, বরাহ অবতারে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, বঙ্গের নবীন বক্তারা কি প্রকারে ভারত উদ্ধার করিবেন, বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বাবু ভবরত্ন চৌধুরী দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতার পক্ষপাতী ছিলেন না, সকল বক্তৃতাই প্রায় শূন্য-গর্ভ, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল, তথাপি ভারত-উদ্ধারের বক্তৃতাগুলি কেমন হয়, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক একটী সভায় তিনি উপস্থিত হইতেন। তাঁহার পিতৃহন্তা জ্যেষ্ঠতাত ব্রজরত্ন চৌধুরী অনেক প্রকার বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন, ভারত-উদ্ধারের বক্তৃতা তাঁহার জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিত কি না, ভবরত্ন তাহা শ্রবণ করেন নাই ; ব্রজরত্নের মৃত্যুর পর সেই অঙ্গের বক্তৃতা তাঁহার কর্ণে মধু বৃষ্টি করিত ; সেই মধুর আস্বাদন বাস্তবিক মধুর কিম্বা তিক্ত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি বরং এক একদিন নির্জ্জনে একাকী বসিয়া ভাবিতেন, ভারতের হইয়াছে কি? ভারত কি জলে ডুবিয়া গিয়াছে? উদ্ধার করিতে হইবে। কোথা হইতে উদ্ধার? ভারতের একদিকে পর্ব্বত, তিনদিকে জলরাশি; ভারত যদি সেই জলরাশিতে নিমগ্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলে বরং এক প্রকার মঙ্গল হইত, উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কাহাকেও আর বক্তৃতা করিতে হইত না ; নিজেরা ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া সকলকেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইত ; সমস্তই ফুরাইয়া যাইত। যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের ভুল। আমাদের ভারত জলসাগরে নিমজ্জিত হয় নাই, পাপসাগরে ডুবিয়াছে ; সেই সাগর হইতে ভারতকে উদ্ধার করিতে হইলে অনেক তপস্যার প্রয়োজন ; তাহার

তপস্বী এখন কোথায়? এখন যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহারা তপস্বী নহেন; তবে তাঁহারা কি?

বাবু ভবরত্ন এই প্রকার অনেক ভাবিতেন, মীমাংসা আসিত না। একদিন তিনি এক স্থানের একটা বিরাট্ সভায় ভারত-উদ্ধারের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, পর্য্যায়ক্রমে দশজন বক্তা সুললিতকণ্ঠে বড় বড় বক্তৃতা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দেশ কাঁপাইয়া বর্ত্তমান রাজনীতির আন্দোলন কর, দেশের লোকে যাহাতে রাজ-সরকারে বড় বড় চাকরী পায়, তাহার জন্ত বিলাতের পার্লেমেণ্ট-সভায় দরখাস্ত কর, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল বলিয়া রাজভরকে যুদ্ধের চাকরী পায় না, সেই অপবাদ দূর করিবার নিমিত্ত রাজদরবারে দাঁড়াও, তোমরা আমাদের যুদ্ধের চাকরী দাও, এই বলিয়া করযোড়ে প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই অচিরাৎ ভারত-উদ্ধার হইবে।

বাবু ভবরত্ন এইরূপ বক্তৃতা শুনিলেন; শুনিয়া তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, বলিতে পারা যায় না, কিন্তু সেইরূপ ভারত-উদ্ধারে কিরূপ মঙ্গললাভ হইবে, তাহা চিন্তা করা উচিত। দীনবন্ধু মিত্রের একখানি নাটকের একজন নট একটী বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিল, ভাই সকল, তোমরা মাতৃভাষায় চাষ দাও; প্রচুর ফল ফলিবে, রাস্তাঘাটে ময়লা থাকিবে না, গাভীগণ অগণন দুগ্ধ দান করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দেশের লোকে রাজ-সরকারে বড় বড় চাকরী পাইলে, ভারতের সেনাদলে ভর্ত্তি হইলে, মানুষ হইয়া মানুষ মারিতে শিখিলে ভারত-উদ্ধার হইবে। সে উদ্ধারেও পূর্ব্বোক্ত নাটকের নটোক্ত উপকারলাভ হইতে পারিবে, অনুমানে এইরূপ আশা করা যায়।

যাহা যখন হইবার, বিধাতার বিধানে তাহাই তখন হয়; যাহা হইবার নহে, তাহা কখনও হয় না। এ দেশের বক্তারা ভারতের অধঃপতনের প্রকৃত হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া কেবল চাকরী অন্বেষণ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের গৌরবের কথা বটে। দেশে যেরূপ পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কলিকালের মাহাত্ম্য বলিয়া লোকে যেরূপ আমোদ করিয়া সেই পাপের স্রোতে গা-ভাসান দিতেছে, কিছু দিন সেইরূপ চলিলে ভারত-উদ্ধারের আর বিলম্ব থাকিবে না। ইংরাজ-পুরুষেরা ভারতের মঙ্গলার্থ ভারত অধিকার করিয়াছেন, ভারতের মঙ্গলার্থ ভারত শাসন করিতেছেন, তাঁহাদের নিজের উক্তি এই যে, "ভারতের মঙ্গলার্থই জগদীশ্বর

তাঁহাদিগকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন।” এই কথাই ঠিক। সর্বাপর ইংরে-জেরা কৃপা করিলেই ভারত-উদ্ধার হইবে, ইহাই জগদীশ্বরের ইচ্ছা।

কলিকাতার ভাব-ভক্তি দর্শন করিয়া বাবু ভবরত্ন চৌধুরী মনে মনে স্থির করিলেন, কলিকাতা তাঁহার বাসের উপযুক্ত স্থান নহে। যেখানে রাজধানী, সেই-খানেই পাপ। সপরিবারে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষা কলিকাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাওয়া হয়, এই চিন্তা দ্বিতীয়। ভবানন্দপুর তাঁহার জন্মস্থান, ভবানন্দপুর এখন অরণ্যময়; ভবানন্দপুর বাসযোগ্য করিয়া সেই স্থানেই বসতি করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল। জঙ্গল কাটাইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরিবারবর্গকে লইয়া বাবু ভবরত্ন সেই স্থানেই গিয়া বাস করি-লেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেক লোক তথায় বসতি করিল। ভবা-নন্দপুরের ভবরত্ন ভবানন্দপুর উজ্জ্বল করিলেন। কলিকাতার বাড়ী কলিকাতা-তেই রহিল।

পল্লীগ্রাম এখনও একটু একটু ভাল আছে, তথাপি হাওয়া ফিরিতেছে। বাবু ভবরত্ন পল্লীগ্রামে বাস করিলেন; তাঁহার বাসগ্রামের নিকটে নিকটে যে কয়েকটী গণ্ডগ্রাম, তিনি সেই সেই গ্রামে গ্রামবাসীগণের সহিত আলাপ করিবার অভি-প্রায়ে দিনকত গতিবিধি করিয়া জানিতে পারিলেন, পূর্ব্বের সুখের অবস্থা দিন দিন বদল হইতেছে। বদল হইবার কারণ এই যে, গ্রামের লোক গ্রামে থাকে না; তাহাদের সকলকেই প্রায় প্রতিদিন কলিকাতায় আসিতে হয়; কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকে, সপ্তাহ অন্তর বাড়ী যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক পল্লীগ্রামে সুখের অবস্থা ছিল, অনেকেই চাষবাস করিত অথবা জমীদার-সরকারে চাকরী করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; জিনিসপত্র সস্তা ছিল; যাহাদের কিঞ্চিৎ বেশী আয় হইত, সংসারনির্ব্বাহ করিয়া তাঁহারা দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্মও করিতে পারিতেন। এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন প্রায় সকল গ্রামের গৃহস্থ-সন্তানেরা কিছু কিছু ইংরাজী শিখিয়া জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত কলিকাতায় কেরাণীগিরী করিতে আইসে, কলিকাতার চাল-চলন দেখিয়া অনেকেই শীঘ্র শীঘ্র বাবু হইয়া পড়ে, অল্পমূল্যের পরিচ্ছদ, অল্পমূল্যের পাদুকা আর তাহাদের ভাল লাগে না; পল্লীগ্রামের আচারাদিতেও তাহারা অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করে; মেজাজ গরম হইয়া উঠে। কলিকাতার ফ্যাসন্ অনেকেই

আপনাদের গ্রামে লইয়া যাইতে যায়। এক একখানি গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, সমাজ-সংস্কারিণী সভা হইয়াছে, বক্তৃতার তুফান উঠিতেছে, সকল রকমেই সহরের অনুকরণে অনেকে ব্যস্ত। সভ্যতা শিক্ষা করিয়া কতকগুলি মফস্বলের কেরাণী নেশা করিতে শিখিয়াছে। সেই সভ্যতা এতদূর উচ্চে উঠিয়াছে যে, শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইবার সময় কতকগুলি কেরাণী কার্পেটের অথবা ক্যাম্বিসের ব্যাগে করিয়া দুই এক বোতল বীর-সরাপ্ কিম্বা পোর্ট সরাপ্ লুকাইয়া লইয়া যায়; গৃহের বধূগণকে তাহা পান করাইতে শিখায়; বধূরাও নূতন নূতন নভেল পাঠ করিয়া বাবুদের ইচ্ছামত বিবি সাজিয়া সুখাসনে বসিয়া থাকে, গৃহকর্ম্ম ভুলিয়া যায়। সহরের অনেক রোগ মফস্বলে প্রবেশ করিতেছে। মফস্বলের প্রাচীন রোগ হিংসা, দলাদলি, মকর্দ্দমা কলহ; সেই রোগগুলির চিকিৎসার জন্য চেষ্টা নাই, বরং তাহার উপর নূতন নূতন উপসর্গ যোগ করিয়া সভ্যতার মানবৃদ্ধি করা হইতেছে।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী এই সকল পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেন। অল্পবয়সে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া প্রবাসে যাইতে হইয়াছিল, দেশের এ সকল অবস্থা পূর্ব্বে তিনি কিছুই জানিতেন না, স্বদেশে আসিয়া অবধি যাহা যাহা তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, ভুগিতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিতেছে। দুই বৎসর তিনি পল্লীগ্রামে বাস করিলেন, বঙ্গের ১৩০০ সাল পূর্ণ হইল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর। সাহেবের চাকুরী করিলে এই বয়সে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইত, সাহেবেরা তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য অথবা কর্ম্মের অযোগ্য বিবেচনা করিতেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন, তাঁহার জীবনে ও সকল উৎপাত ছিল না, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন। যে সকল স্থলে পুরাণাদি পাঠ হয়, যে সকল স্থলে ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, যে সকল স্থলে সাধুলোকের সমাগম হয়, তত্ত্ব জানিয়া জানিয়া সেই সকল স্থলেই ভবরত্নবাবু উপস্থিত হন, অবকাশকালে গৃহে বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, এই প্রকারে তাঁহার দিন যায়। সমাজ-সংস্কার এবং ভারত-উদ্ধারের গণ্ডগোলে আর তাঁহাকে মিশিতে হয় না।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

অবতার।

দেশের লোকে বিদ্যাবুদ্ধিতে যতই অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মন যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সেরূপ শুভদিন সমাগত হইতেছে না। শতাধিক বৎসরাবধি এক বিলাতী সভ্যতা এ দেশে প্রবেশ করাতে আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত ভাবের বিমিশ্রণে এক প্রকার খিচুড়ি প্রস্তুত হইয়েছে। যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কার করিতে চাহেন, ইংরাজী সভ্যতার দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাছু হাটিয়া হাটিয়া অন্ধকারকূপে টলিয়া পড়েন। একদিকে সংসারের মায়ার আকর্ষণ, অন্যদিকে পরমাত্মভাবের সূত্র-ধারণের অভিলাষ; কোন্ দিকে অধিক নির্ভর করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যে সকল উপদেশ, সেই সকল উপদেশপূর্ণ যে সকল গ্রন্থ, তাহা তাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু যেখানে যেখানে শাস্ত্রের কূটার্থ বাহির হয়, সেই সকল স্থলে তাঁহারা মহা সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়েন; ছাঁটিয়া কাটিয়া মনের মত বাক্যগুলি গ্রহণ করিতে এবং দুর্বোধ পাঠগুলি পরি-ত্যাগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হন। যাঁহারা পণ্ডিত নামে বাচ্য, তাঁহারা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কোন কোন অংশ বর্জ্জন করিয়া সেই সকল স্থলে নূতন নূতন পাঠ লিখিয়া দেন। পণ্ডিতগণের এইরূপ অভ্যাস হওয়াতে আমাদের বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে বিস্তর অলীক পাঠ সংযোজিত হইয়াছে, মূলপাঠগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ত গেল পণ্ডিতের কথা, ভুয়াভ্রান্ত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজমধ্যে যাঁহারা অগ্রগণ্য হইতে অভিলাষী, যাঁহাদিগকে পণ্ডিতাভিমানী বলা যায়, তাঁহারা শাস্ত্র মানেন

করেন না, মানুষের মস্তিষ্কজাত মানুষের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া যাহা স্থির হয়, তাহাই তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। জগতের উপকারার্থ পুরাকালীন ঋষিগণ রত্নাকর সদৃশ যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আত্মবিশ্বাসী ধার্ম্মিকাভিমানী উপাধ্যায়গণ সেই সকল গ্রন্থকে ভ্রমপূর্ণ যুক্তিশূন্য স্বার্থদূষিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অত্যধিক সাহস অবলম্বন করিয়া ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগুলির সম্পূর্ণ অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। অতি চমৎকার বিচার। আপনাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াই ঐরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাই আমরা মনে করিতে পারি। বোধ করুন, একজন পণ্ডিত শতপৃষ্ঠা-পরিমিত একখানি পুস্তকের আদর্শ প্রস্তুত করিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই পুস্তক মুদ্রিত করিতে কত ব্যয় হইবে, কত টাকার কাগজ লাগিবে, বাঁধাই-খরচা কত পড়িবে, বাজারে সে পুস্তক কত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে, বিক্রয় করিয়া কত টাকা লাভ থাকিবে, গ্রন্থকার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে সেই গণনাই করিয়া থাকেন, লাভের আশা না থাকিলে মুদ্রাঙ্কনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা হয়। প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ সমুদ্রতুল্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া কি এখনকার ব্যবসায়ী গ্রন্থকারগণের ন্যায় লাভের হিসাব করিতেন? অকিঞ্চিৎকর অর্থলাভে কি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল? তাঁহাদের গ্রন্থ স্বার্থদূষিত, ভ্রমপূর্ণ, অলীক, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমন কথা মুখে আনিতে পারেন? যোগাসনে বসিয়া পরমেশ্বরে যাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাশি রাশি মিথ্যাকথা লিখিয়া সংসারের মানবগণকে বিড়ম্বিত করিয়া গিয়াছেন, এখনকার তর্কবাগীশেরা সেই সকল ঋষিবাক্যের ভুল ধরিতেছেন, অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ঋষিগণকে স্বার্থপর বলিতেছেন, এ সকল কথা কর্ণে স্থান দিলেও পাপ হয়। শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা স্বেচ্ছাচারের আদর করেন, তাঁহারাই এখনকার পণ্ডিত। সেই সকল পণ্ডিতের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেও ভয় করেন না।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী কলিকাতার বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গতিবিধি বন্ধ করেন নাই। ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয়শ্রেণীর লোক কলিকাতায় পাওয়া যায়, ধার্ম্মিকলোকের সহিত সদালাপ করা তাঁহার

নিতান্ত স্পৃহনীয় হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে যাঁহারা ধর্ম্মাপ্পাদনে তৎপর, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি যতদূর তৃপ্তিলাভ করিলেন, সহরে তদপেক্ষা সমধিক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন কি না, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার কলিকাতায় গতিবিধি। ধর্ম্ম একটীমাত্র সূক্ষ্মপদার্থ, এতদ্দেশে সেই ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা লোকে নানা প্রকার নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নানাধর্ম্মাক্রান্ত লোকের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি বহুদিবসাবধি এ দেশে প্রচলিত আছে; এখন আবার কতকগুলি লোক নূতন নূতন নাম দিয়া নূতন নূতন উপাসনার প্রবর্ত্তন করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যেই অবতারের আবির্ভাব।

শাস্ত্রে ভগবানের দশ অবতারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে নয়টী অবতার হইয়া গিয়াছে, একটী এখনও বাকী। আধুনিক বৈষ্ণবেরা নদীয়ার চৈতন্য-দেবকে পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দশাবতারের মধ্যে চৈতন্য-দেবের নাম পাওয়া যায় না; না পাওয়া গেলেও মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব অবতারের মহিমা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, ইহা স্বীকার করিলে ধর্ম্মের মহিমাই বর্দ্ধন করা হয়। আজকাল যাঁহারা ধর্ম্মের কথা লইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে পটু, লোকে বলুক না বলুক, তাঁহারা আপনারাই আপনাদের মধ্যে অবতার হইয়া দাঁড়ান, তাঁহাদের চেলারাও অবতার বলিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদের পূজা করে। দেশের অবস্থা এখন এইরূপ। অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গদেশে কতকগুলি অবতার হইয়া গিয়াছে, কোথায় কতকগুলি অবতার এখনও বাঁচিয়া আছে, ঠিক ঠিক তাহা নির্ণয় করা যায় না। বাবু ভবরত্ন একদিন বৈকালে কলিকাতার সদররাস্তার ধারে একটী অবতার দেখিয়াছিলেন। সেই অবতারটী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে বংশী ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া মুদিত-নেত্রে সমাধিস্থ ছিলেন। সে সময় হয় ত অবতারের বাহ্যজ্ঞান ছিল না, কিন্তু বুদ্ধি ছিল। গাড়ী-ঘোড়ার ধাক্কা এবং পুলিসের রুলাঘাতের ভয়ে সাবধান হইয়া তিনি একটী ফুটপাথের এককোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনেক কৌতুকীলোক সেই রূপ দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে বাবু ভবরত্ন সেইখানে উপস্থিত হন, দর্শকলোকের জনতা ভেদ করিয়া তিনি সেই অবতারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান। কতক্ষণ সমাধিভঙ্গ হয়, কৌতূহল

বশে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অবতারের সমাধিভঙ্গ হয়; তখন তিনি চাহিয়া দেখেন, চারিদিকে অনেক লোক। লোকেরা সকলেই নিস্তব্ধ। ভবরত্ন ইতিপূর্ব্বে একজনের মুখে শুনিয়াছিলেন, লোকটী শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সেই কথা স্মরণ করিয়া লোকটীকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! আপনি কে? লোকেরা বলিতেছিল, আপনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সত্যই কি আপনি তাই?"

ত্রিভঙ্গভঙ্গী সংবরণ করিয়া অবতার তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ ছিল, কৃষ্ণ সাজিবার সময় সেই কেশগুলি কপালের উপর চূড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছিল, অভাব ছিল ময়ূরপুচ্ছের; ভঙ্গী ঘুচিল, চূড়াটী রহিল। তীব্রদৃষ্টিতে ভবরত্নের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চূড়াধারী উত্তর করিলেন, "লোকে আমাকে অবতার বলে, আমি নিজে বলি না। আমি জানি, আমি একজন ভক্ত।"

ভবরত্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৈতন্যপ্রভু যেমন হরিভক্ত ছিলেন, আপনিও কি সেইরূপ?" চূড়াধারী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি উত্তর দিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে মনে হয় ত ধারণা ছিল, চৈতন্য অপেক্ষা তিনি বড়। কেন না, তাঁহার নিজমুখের উত্তরেই তাহার আভাব প্রকাশ পাইল। মৌনভঙ্গ করিয়া পরক্ষণেই তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, আমি সে প্রকার ভক্ত নহি। নবদ্বীপের চৈতন্য এ দেশের কোন উপকার করেন নাই, বরং অপকার করিয়া গিয়াছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোককে কৌপীন-ধারী করিয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা তাঁহার কার্য্য ছিল। যাহারা চৈতন্যের উপদেশে কৌপীন পরিধান করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়াছিল, তাহাদের বংশাবলী সেইরূপে কাজের বাহির হইয়া রহিয়াছে। নিমাই সন্ন্যাসীর উপাখ্যান যাঁহারা জানেন, দেশের মঙ্গলামঙ্গল যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই কথা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন। আমি সে প্রকার সন্ন্যাসী নহি, আমি পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী। ধর্ম্মে মতি রাখিয়া দেশের লোকে যাহাতে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হয় ধর্ম্মে মতি রাখিয়া আমি দেশস্থ লোকদিগকে সেইরূপ উপদেশ দিয়া বেড়াই।"

অবতারের গলদেশে যজ্ঞসূত্র ছিল না, পরিধান ছিন্ন গৈরিক বসন, পৃষ্ঠদেশে

বহির্ব্বাস, চরণ পাদুকাশূন্য; চেহারায় বিলক্ষণ সুপুরুষ। মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া গম্ভীরবদনে ভবরত্ন কহিলেন, "আপনার আকৃতি কেশ বলিয়া দিতেছে, আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান, বয়সে তরুণ যুবা, অথচ আপনার গলদেশে উপবীত নাই, এই লক্ষণে আমি বুঝিতেছি, আপনি জাতিভেদ মানেন না, জাতীয় লক্ষণ অথবা জাতীয় চিহ্ন আপনি রাখিতে চান না; অথচ আপনি জাতীয় লোকের শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি চান। শিল্পবাণিজ্য এ দেশে ছিল না, ইহা আপনি বলিতে পারিবেন না। আপনি পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী, অবশ্যই আপনি ইংরাজী পড়িয়াছেন, এ দেশের শিল্পবাণিজ্য এখন প্রায় সর্ব্বতোভাবে ইংরাজবণিক্‌দিগের একচেটে, তাহাদের সহিত এ দেশের লোকে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, তাহাও বোধ হয় আপনি জানেন, শীঘ্র যাহা হইতে পারিবে না, সেই উপদেশ দিবার জন্য আপনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, ইহা বড় চমৎকার কথা। সন্ন্যাসধর্ম্ম আপনার অবলম্বন নহে, অথচ আপনি সন্ন্যাসী; হিতোপদেশের বিড়াল যেমন সন্ন্যাসী হইয়াছিল, পঙ্কনিমগ্ন ব্যাঘ্র যেমন সন্ন্যাসী হইয়াছিল, আপনি হয় তো সেইরূপ সন্ন্যাসী হইবেন, আপনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং আপনার মধুর মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া লোকের মনে সেইরূপ সন্দেহের উদয় হওয়া বিচিত্র বোধ হয় না। পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশে আপনি নারায়ণের অবতার বলিয়া ঘোষিত হন, ইহা কদাচ মঙ্গলের নিমিত্ত হইবে না, আপনি সাবধান হইয়া কাজ করিবেন।"

সন্ন্যাসী চটিয়া উঠিলেন। যে ব্যক্তি অবতার সাজিয়া মানুষ ভুলাইবার বাসনা রাখে, সে ব্যক্তি কতদূর ক্রোধের বশবর্ত্তী, তাহা দর্শন করিয়া ভবরত্ন হাস্য করিলেন, পরক্ষণেই গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া মিষ্টবচনে কহিলেন, "আপনি শান্ত হউন, সন্ন্যাসধর্ম্মে ক্রোধ বর্জ্জন করিতে হয়, আপনি কি প্রকার সন্ন্যাসী, অগ্রে তাহা বুঝিতে না পারিয়াই কয়েকটী কথা আমি আপনাকে বলিয়াছি, আশ্রমে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন কিম্বা সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন প্রকার পুস্তক যদি আপনার নিকটে থাকে, সেই পুস্তকের উপদেশগুলি পাঠ করিবেন। আরও এক কথা। সন্ন্যাসী হইলেই ভগবানের অবতার হওয়া যায়, এরূপ ধারণা যদি আপনার জন্মিয়া থাকে, সে ধারণা আপনি পরিত্যাগ করিবেন।"

সন্ন্যাসী গৌরবর্ণ, ভবরত্নের বাক্যে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস

পড়িতে লাগিল, উভয় হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সক্রোধগর্জ্জনে তিনি উচ্চকণ্ঠে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন, পাতক বুঝিয়া ভবরত্ন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। অবতারের রঙ্গ দেখিবার কৌতুকে যাহারা সেই স্থলে জড় হইয়াছিল, অবতারের মুখের কাছে করতালি দিয়া তাহারা হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। তত লোকের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করা বিফল হইবে, ইহা স্থির জানিয়া সন্ন্যাসী তখন আপন মনে বকিতে বকিতে দ্রুতপদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। হট্টলোকেরাও পশ্চাতে করতালি দিতে দিতে খানিক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সন্ন্যাসী একটা গলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকায়িত হইলেন।

এইরূপ সন্ন্যাসী আজকাল অনেক জায়গায় অনেক দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সন্ন্যাসী ছিল, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও আমরা সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু এখন যেমন হইয়াছে, কলিকাতায় এমন সন্ন্যাসীর আমদানী তখন ছিল না। সময়ে সময়ে দুই একজন সন্ন্যাসী দেখা দিত, তাহারা গৃহস্থ-বাটীতে ভিক্ষার ছলে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে নানাপ্রকার ঔষধ দিত, ভোজবাজী দেখাইত, ভাগ্যফল বলিয়া দিত, তাম্র পিত্তলাদি ধাতুকে স্বর্ণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইত, বন্ধ্যানারীর সন্তান-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিত, শেষকালে জুয়াচুরী করিয়া পলাইত। যথার্থ সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বদা সাধারণের চক্ষে পড়ে না, তাদৃশ সন্ন্যাসী কলিকাতায় আসিতেন কি না, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। বৎসর বৎসর পৌষমাসের শেষে গঙ্গাসাগরে যাইবার নাম করিয়া ঝাঁক ঝাঁক সন্ন্যাসী এ অঞ্চলে উপস্থিত হইত, তাহারা জটাধারী কৌপীনধারী ছাইমাখা সন্ন্যাসী; তাহারা কেহই ঠাকুরের অবতার সাজিয়া কোন প্রকার উৎপাত করিত না। পুলিশের লোকেরা কিন্তু তাহাদের উপর সর্ব্বক্ষণ নজর রাখিত। সন্ন্যাসীর দলে চোর থাকে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতেন, বস্তুতঃ এখনকার সন্ন্যাসী অপেক্ষা তখনকার সন্ন্যাসীরা কতক পরিমাণে ভালমানুষ ছিল। তখনকার সন্ন্যাসীরা সকলেই হিন্দীভাষায় কথা কহিত, তাহাতেই বুঝা যাইত, সকলেই হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী; সজ্জায় এবং বাহ্য লক্ষণে সকলেই শিবের উপাসক। আধুনিক ব্রহ্মসমাজের কতকগুলি যুবকের যেমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, দাড়ী না রাখিলে এবং চস্‌মা না পরিলে ব্রাহ্ম হওয়া যায় না, সন্ন্যাসীদেরও সেইরূপ বিশ্বাস ছিল যে,

ছাই না মাখিলে এবং গাঁজা না খাইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এখনও সে প্রকার সন্ন্যাসী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অৰ্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করে, মুখে চক্ষে রং মাখে, মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ জটা রাখে, সর্ব্বক্ষণ গাঁজা খাইয়া দুইচক্ষু রক্তবর্ণ করে। সন্ন্যাসীর দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক আইসে, তাহারা ছোক্‌রা সন্ন্যাসী। যাত্রার দলে ছোট ছোট ছোক্‌রার যেমন খড়ি-মাটী মাখিয়া, বাঘছাল পরিয়া শিব সাজে, ছোক্‌রা-সন্ন্যাসীরাও দেখিতে অনেকাংশে তদ্রূপ। কোন কোন আমোদপ্রিয় লোক এবং নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোক সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী লইয়া কত প্রকার কৌতুক করেন। ছোক্‌রা সন্ন্যাসীরাও বিলক্ষণ গাঁজা খায়। যখন খায়, তখন তাহাদের চক্ষু দেখিলে ভয় হয়।

এখন এ দেশে নূতন সভ্যতার যুগ। এখন এমন অনেকগুলি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা ছাই মাখেন না, জটা রাখেন না, গাঁজা খান না, হিন্দী ভাষায় কথাও কহেন না। লক্ষণের মধ্যে তাঁহারা কেবল গেরুয়া-বসন পরেন, কাছা দেন না, বাঙ্গালা কথা কহেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সন্ন্যাসী; তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শীতকালে গেরুয়া জামা, গেরুয়া শাল, গেরুয়া টুপী গেরুয়া মোজা এবং গেরুয়া জুতা ব্যবহার করেন। গেরুয়ার সঙ্গে সন্ন্যাসধর্ম্মের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। সমস্তই বুঝা যায়, কিন্তু এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান কিরূপ, কেবল সেইটী বুঝা যায় না।

এখনকার সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবভঙ্গীতে জানান, তাঁহারাও এক একটী অবতার। পূর্ব্ববর্ণিত অবতারের মুখে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনি একজন পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসী, বাস্তবিক পলিটিক্যাল্ সন্ন্যাসীর সংখ্যাও এখন নিতান্ত অল্প নয়। তাঁহারা পলিটিক্যাল্ ধর্ম্মের উপাসক, পলিটিক্যাল্ খাদ্য তাঁহারা আহার করেন, পলিটিক্যাল্ পানীয় তাঁহারা পান করেন, পলিটিক্যাল্ পরিচ্ছদ তাঁহারা ধারণ করেন, পলিটিক্যাল্ তত্ত্বের লেক্‌চার দেন, পলিটিক্যাল্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে দীক্ষিত হন, পলিটিক্যাল্ ব্যবহারে সন্তান উৎপাদন করেন; পলিটিক্যাল্ ব্যবস্থানুসারে পরমহংস সাজেন। ইতিপূর্ব্বে একটী পরমহংস দর্শনের নিমিত্ত লোকে লালায়িত হইতেন, পরমহংসকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন, কি কি গুণে কি কি লক্ষণে পরমহংস ভূষিত, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করা হইত, পরমহংস দুর্লভ, ইহাই সকলে জানিতেন,

আজকাল স্থানে স্থানে পরমহংসের ছড়াছড়ি, ইহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আলস্য ঘুচাইয়া যিনি একবার মুখে উচ্চারণ করেন, "আমি পরমহংস" তিনিই পরমহংস হন। পরমহংসের আহার-বিহার বাক্যালাপ সমস্তই এখন নূতন। একটু পরে গুটীকত পরমহংসের পরিচয় দেওয়া যাইবে। এখন সাধারণ সন্ন্যাসী-প্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়িল। উপকথার ন্যায় গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা। পাঠক-মহাশয় এইখানে সেই গল্পটী পাঠ করুন।

এই বঙ্গদেশে একখানি গ্রামে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস, তাঁহার নাম পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার একটীমাত্র পুত্র। পুত্রের নাম পঙ্কজকুমার। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সেই পঙ্কজকুমার নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। লোকে তাহাকে পঙ্কু পঙ্কু বলিয়া ডাকিত। পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী নানাস্থানে অন্বেষণ করিলেন, কোথাও কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বাদশ বৎসরবয়সে নিরুদ্দেশ, তাহার পর আর দ্বাদশ বৎসর অন্বেষণ, থানায় থানায় সংবাদঘোষণা, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, বিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবগণের নিকটে পত্র-লিখন, সমস্তই নিষ্ফল, কোথাও পঙ্কু নাই। গ্রামের কেহ কেহ অনুমান করিল, পঙ্কু মরিয়াছে; কেহ কেহ বলিল, সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর গত হইল। পঙ্কু থাকিলে তাহার বয়স হইত চব্বিশ বৎসর। পঙ্কুর মাতা-পিতা নিরাশ হইলেন, গ্রামবাসী লোকেরাও পঙ্কুর পুনর্দর্শনের আশা ছাড়িয়া দিল, প্রায় সকলেই পঙ্কুর কথা ভুলিয়া গেল। এই সময় সেই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিল। নারীমহলে বুজরুকী দেখাইয়া, কামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে হোম যজ্ঞ করিয়া, সেই সন্ন্যাসী অনেকের নিকটেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিল, শীঘ্র তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইল না, তরুতলাও আশ্রয় করিতে হইল না, লোকের মনে ভক্তির সঞ্চার হওয়াতে গৃহস্থেরা তাহাকে আশ্রয় দিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী একপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে রহিল।

একদিন পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়। পরেশ-নাথের স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বার বৎসর হইল, আমার পুত্র পঙ্কজকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোথায় আছে, ঘরে ফিরিয়া আসিবে কি না, যদি আসে, কবে আসিবে, তুমি কি তাহা বলিয়া দিতে পার?"

প্রশ্ন করিয়াই তিনি সতৃষ্ণনয়নে অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া

রহিলেন। সন্ন্যাসীও অনেকক্ষণ উজ্জ্বলনেত্রে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ঝুলী হইতে এক খণ্ড খড়ি বাহির করিয়া, ভূমিতে কয়েকবার কয়েকটা অঙ্কপাত করিল, বিড় বিড় করিয়া কি বকিল, গৃহিণীকে একটা ফুলের নাম করিতে বলিল। গৃহিণী বলিলেন, "পদ্মফুল।"—সন্ন্যাসী আবার গোটাকতক অঙ্কপাত করিল, গৃহিণীর ললাট নিরীক্ষণ করিয়া অস্পষ্ট অস্পষ্ট গোটাকতক মন্ত্র পড়িল, তাহার পর বলিল, "আজ হইল না। তোমার পুত্র অনেক দূরদেশে গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে, সে দেশে যাইতে অনেক নদী পার হইতে হয়, জলপথের গণনায় অনেকটা সময় লাগে, সাতদিন গণনা করিতে হইবে, একটা হোম করিতে হইবে, কল্য আবার আমি আসিব।"

সন্ন্যাসী দাঁড়াইল। গৃহিণী তাহাকে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন, সে তাহা লইল না, গাঁজা খাইবার দুটী পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। পুত্র বাঁচিয়া আছে শুনিয়া জয়াবতী আশ্বাসপ্রাপ্ত হইলেন, ঠাকুরদেবতার কাছে পূজা মানতি করিলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি, সন্ন্যাসীর গণনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল। পরেশনাথের পত্নীর নাম জয়াবতী।

অঙ্গীকারমত সন্ন্যাসী পরদিন আসিল, তৎপরদিন আবার; তৎপরদিন আবার; এইরূপে সাতদিন। আজ হইল না, আজ হইল না, ক্রমাগত সাতদিনই এক কথা। অষ্টমদিবসে হোম হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত। সন্ন্যাসী যতক্ষণ থাকে, যতক্ষণ গণনা করে, জয়াবতী ততক্ষণ একদৃষ্টে তাহার ভস্মাবৃত মুখপানে চাহিয়া থাকেন। সপ্তমরজনীতে তাঁহার মনে কি এক প্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল;. সে রাত্রে স্বামীর নিকটে সে ভাব তিনি ব্যক্ত করিলেন না, মনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন, তিনি যেন ভাবিলেন, হঠাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

রজনীপ্রভাতে জয়াবতী প্রাতঃস্নান করিয়া হোমের আয়োজন করিলেন। পরেশনাথের বাড়ীতে সন্ন্যাসী হোম করিবে, প্রতিবাসী লোকেরা তাহা শুনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে পরস্পর নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল; আটদশটী প্রতিবাসী কামিনী হোম দেখিতে আসিলেন। বেলা প্রায় দুই দণ্ডের সময় সন্ন্যাসী আসিল, হোম হইল, হোমের সময় পরেশনাথ স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত থাকিলেন,. সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গী ভাল করিয়া দেখিলেন, মনে যেন কি উদয় হইল, পত্নীর দিকে চাহিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইলেন।

হোমকার্য্য অবসানে সকলের ললাটে তিলকদান করিয়া, সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে জয়াবতীকে বলিল, "মা! আজও হইল না, প্রত্যাদেশ আইসে আইসে আইসে না; আগামী পৌর্ণমাসী-যামিনীতে আমি আর একটী কার্য্য করিব; সেই রজনীতেই শেষফল বলিয়া দিব, আজ আমি বিদায় হইলাম।"

সন্ন্যাসী বিদায় হইতে উদ্যত, বাধা দিয়া জয়াবতী কহিলেন, "না বাছা, আমি তোমাকে বিদায় হইতে দিব না; পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তুমি আমাদের এই আশ্রমেই থাক; তোমার প্রতি আমার দিন দিন নূতন স্নেহ জন্মিতেছে, তোমার গণনার শেষফল প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত এই আশ্রমে তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর বদন হইতে নয়ন ফিরাইয়া, জয়াবতী আপন পতির বদন অবলোকন করিলেন, প্রতিবাসী কামিনীরা চমকিত-নয়নে সেই ভাব দেখিলেন। পরেশনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া পত্নীর বাক্যেই সায় দিলেন। সন্ন্যাসীর বিদায় হওয়া হইল না, প্রতিবাসিনীরা বিদায় হইলেন। সদরবাড়ীর একটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহে সন্ন্যাসীর বাসা হইল।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, সন্ধ্যার পর সন্ন্যাসীর উপভোগের সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া, জয়াবতী গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া, রাত্রিকালে নির্জ্জনে পতিকে গুটীকত কথা বলিলেন। পরেশনাথ সন্দিগ্ধমনে তিনবার মস্তক-সঞ্চালন পূর্ব্বক উদাসভাবে কহিলেন, "হুঁ।"

সে রজনীতে জয়াবতীর নিদ্রা হইল না। পতি নিদ্রিত হইল তিনি উঠিয়া চুপি চুপি সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী তখন সম্মুখে ধুনী জ্বালাইয়া চর্ম্মাসনে বসিয়া গাঁজা খাইতেছিল, জয়াবতী কিঞ্চিৎ অদূরে বসিয়া, সস্নেহবচনে তাহাকে বলিলেন, "বাছা! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; তুমিই আমার পঙ্কজকুমার। কেন বাছা আর সন্ন্যাসীর বেশ, কেন বাছা আর আমাকে ছলনা কর, সত্যপরিচয় দিয়া আমার এই অন্ধকার ঘর আলো কর। তুমি আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ, সেই সময় আহ্লাদে আমার বুক কাঁপিয়াছে, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি তুমিই আমার সেই হারানিধি পঙ্কজকুমার।"

হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তুমি পাগল! আমি কেন তোমার পঙ্কজকুমার হইব? আমার জন্ম এ দেশে নয়, আমার নামও পঙ্কজকুমার

নয়, আমি তোমাদের কখনও চিনিও না। অনেক দিন অবধি আমি উদাসীন, বহুস্থান, বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি আমি এই বঙ্গদেশে আসিয়াছি; পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আমার নিবাস ছিল বটে, কিন্তু তোমাদের গ্রামে আমি কখনও আসি নাই।"

জয়াবতী কহিলেন, "আচ্ছা, কল্য আমি তোমাকে স্বীকার করাইব। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিতে পারিবে না। থাকো, কল্য আমি দশজনের সম্মুখে তোমার পরিচয় লইব। আমি যেমন চিনিয়াছি, তোমার জন্মদাতাও সেইরূপে চিনিবেন, গ্রামের লোকেও চিনিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসীকে আর কিছু না বলিয়া, সদরদরজার চাবী লাগাইয়া, মনে নানা প্রকার তর্ক আনিতে আনিতে জয়াবতী অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি তখন অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট ছিল, অল্পক্ষণ পরেই ঊষা আসিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, প্রভাত হইল। পরেশনাথ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে পর জয়াবতী তাঁহাকে রজনীর দৌত্যকার্য্যের ফলাফল শুনাইলেন, পরেশনাথ কহিলেন, "হুঁ।"

সূর্য্যোদয় হইল। সদরদরজায় চাবী বন্ধ, অপর কেহই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাটীর পরিবারের মধ্যে কর্ত্তাগৃহিণী ব্যতীত কর্ত্তার এক বিধবা ভগিনী, একটী ভাগিনেয়ী, একটী পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র আর একজন দাসী। রাত্রের ঘটনা তাহারা কেহই কিছু জানিল না। জয়াবতী প্রফুল্লমনে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিয়া পরেশনাথ তাহাকে কহিলেন, "বৎস! তোমার হোম-যজ্ঞ সফল হইয়াছে। তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। আমিও এখন চিনিতেছি, তুমিই অনুদ্দিষ্ট কুমার পঙ্কজকুমার। আজ আমার পরমাহ্লাদের দিন।"

সন্ন্যাসী রাত্রিকালে জয়াবতীর কথায় যেরূপ উত্তর দিয়াছিল, পরেশনাথের বাক্যেও সেইরূপ উত্তরদান করিল। পরে পরেশনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহারা স্বীয় পরিচয় দিতে চাহে না; এই নবীন সন্ন্যাসীও সেইরূপে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পাঁচ জনের সম্মুখে পরীক্ষা করিলে অধিকক্ষণ আর চাতুরী খাটাইতে পারিবে না।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য। সন্ন্যাসীর নিকট হইতে উঠিয়া, পরেশনাথ সদর-দরজার নিকটে আসিলেন, দেখিলেন, দরজার চাবী বন্ধ। হাস্যের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, গৃহিণী ঐন্দ্রী বেশ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। ধরা পড়িবার ভয়ে সন্ন্যাসী পাছে পলায়ন করে, তাহাই ভাবিয়া তিনি সাবধান হইয়াছেন। ভালই হইয়াছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, গৃহিণীর নিকট হইতে চাবী চাহিয়া লইয়া, পরেশনাথ দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, নিকটে নিকটে যাঁহাদের বাস, সেই সকল প্রতিবাসীকে ডাকিলেন, পাঁচ জন পুরুষ আর আটজন স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন। জয়াবতী সংবাদ পাইলেন, তিনিও উল্লাসে উল্লাসে সন্ন্যাসীর গৃহমধ্যে দর্শন দিলেন, বাটীর পরিবারবর্গও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল; কি বুঝি তামাসা হইতেছে, এইরূপ অনুমান করিয়া বাড়ীর দাসীও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

বাতাস কথা কয়। দুই এক জনের মুখে মুখে প্রচার হইল, বাতাস সেই বার্ত্তা লইয়া গ্রামের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে পরেশনাথের সদরবাড়ীতে লোকারণ্য।

অনেকগুলি পুরুষ, অনেকগুলি স্ত্রীলোক। কি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে, সমাগত লোকেরা অগ্রে তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না। পরেশনাথ যখন আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, সন্ন্যাসী যখন বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল, সকলে তখন আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া অনিমেষ-নয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একজনের স্কন্ধের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া আর একজন, তাহার মস্তকের উপর দিয়া আর একজন, পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া আরও পাঁচজন, অনত্য ঠেলাঠেলি করিয়া আরও কতজন সকৌতুকে সন্ন্যাসী-দর্শনে কৌতূহলী হইল; কেহ কেহ কাণাকাণি করিল, এই বটে সেই; কেহ কেহ মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে আর একজনের কর্ণে কহিল, "আমার বোধ হয় ভুল; সন্ন্যাসীর কথাই ঠিক। আকারে কতকটা মিল আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ঠিক নয়। ইহাদের পঙ্কজকুমার বেঁটে ছিল, এই সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার; ইহাদের পঙ্কজকুমার রোগা ছিল, এই সন্ন্যাসী দিব্য মোটা-সোটা, ইহাদের পঙ্কজকুমারের নাকটা একটু চেপ্টা ছিল,

এ সন্ন্যাসীর নাক যেন সরল বাঁশী।” চক্ষু ফিরাইয়া আর একটী স্ত্রীলোক বলিল, “ঠিক ঠিক ঠিক! এ সন্ন্যাসী সে নয়। ইহাদের পঙ্কজকুমারের একটা চক্ষু একটু ছোট ছিল, চাউনিও একটু টেরা, এ সন্ন্যাসীর দুটী চক্ষুই সমান টানা, এ কখনই পঙ্কজকুমার নয়।”

দশজনের মুখে দশরকম কথা। যাহারা পরেশনাথের অনুকূল পক্ষ, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, “হাঁ হাঁ হাঁ,” সন্ন্যাসী ক্রমাগতই বলিতে লাগিল “না না না”; সন্ন্যাসীর পক্ষ লোকেরাও প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল, “না না না।”

পরেশনাথের পক্ষ হইল বেশী লোক, সন্ন্যাসীর পক্ষ হইল অল্প। ইংরাজী কথা আছে, Mejority must be granted,” যে পক্ষে অধিক লোক, সেই পক্ষই Mejority। শেষকালে বহুলোকের মতেই সাব্যস্ত হইল, এই সন্ন্যাসীই পরেশনাথের অনুদ্দিষ্ট পুত্র পঙ্কজকুমার।

তখনও বাদানুবাদ থামিল না। চূড়ান্ত মীমাংসা কি প্রকারে হয়, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গ্রামের একজন প্রধান লোক মধ্যবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, “তোমরা এক কাজ কর। ছাইমাখা সন্ন্যাসী, ঠিক চিনতে ভুল হয়, ইহাকে স্নান করাইয়া দাও, ছাই-মাটী ধুইয়া যাউক, শরীরের বর্ণ প্রকাশ হউক, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে।”

তাহাই হইল। জয়াবতী স্বয়ং কলসী কলসী জল ঢালিয়া সন্ন্যাসীকে স্নান করাইলেন। স্বাভাবিক বর্ণ প্রকাশ পাইল, মুখখানি পরিষ্কার হইল, সকলে তাহা দেখিলেন। দ্বাদশ বৎসরের কথা,—পঙ্কজকুমারের বর্ণ কিরূপ ছিল, দ্বাদশ বৎসর-বয়ঃক্রমে মুখের আকৃতি কিরূপ ছিল, যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে ঠিক তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু জননী বলিলেন, “ঠিক এই, অঙ্গের দাগটী—তিলটী পর্য্যন্ত ঠিক আছে।”

আর কাহারও কোন কথা থাকিল না, যাঁহারা সন্দেহ করিতেছিলেন, তাঁহারাও নিস্তব্ধ হইলেন, সন্ন্যাসীরও আর প্রতিবাদ চলিল না। যদিও দুই একবার মাথানাড়া রহিল, ‘না না’ শব্দ মুখে উচ্চারিত হইল, কিন্তু কেহই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, কেহই আর তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। সেই স্থানেই নাপিত ডাকাইয়া সন্ন্যাসীর জটা মুড়াইয়া দেওয়া হইল, গোঁফ-দাড়ী

মুড়াইয়া দেওয়া হইল, নূতন বস্ত্র পরিধান করান হইল, অপরিচিত সন্ন্যাসীর নাম হইল পঙ্কজকুমার।

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, নানা কথা বলাবলি করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, তাহার পর একটী শুভদিন দেখিয়া শাস্ত্রের বিধানানুসারে যজ্ঞ করিয়া উপবীতত্যাগী পঙ্কজকুমারের গলদেশে নূতন যজ্ঞসূত্র পরাইয়া দেওয়া হইল, পঙ্কজকুমার সংসারে প্রবেশ করিলেন। নিত্য নিত্য উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ, উত্তম শয্যায় শয়ন, নূতন নূতন পুস্তক অধ্যয়ন ইত্যাদি বিলাসে ও আমোদে পঙ্কজকুমারের চিত্ত আর এক প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইল।

দুই বৎসর গত হইল। জয়াবতী একদিন স্বামীকে কহিলেন, "সংসারের সাধ-আহ্লাদ আমার অনেক বাকী আছে, মা দুর্গার কৃপায় হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, একটী ভাল ঘর দেখিয়া, একটী সুন্দরী কন্যা দেখিয়া, পঙ্কুর বিবাহ দাও।"

কর্ত্তার মত হইল। অনেক সন্ধান করিয়া গ্রামের দশক্রোশান্তরবর্ত্তী একখানি গণ্ডগ্রামে একজন লাহিড়া ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পঙ্কুর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল।

পঙ্কুর বিবাহ। প্রতিবাসিনী কন্যারা উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন, কয়েকদিন ব্যাপিয়া উৎসব হইল, অনেক স্ত্রী-পুরুষ ভোজন করিল, শুভদিনে শুভক্ষণে পঙ্কজকুমারের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর আর এক বৎসর অতিক্রান্ত। রূপান্তরিত—নামান্তরিত সন্ন্যাসীর পরিণীত জীবনে এক বৎসর ভোগ। নূতন বৈশাখমাস আগত। একদিন অপরাহ্নে পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী সদরের বারান্দায় বসিয়া গ্রামের তিনজন ভট্টাচার্য্যের সহিত পাশা খেলিতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে একটী যুবাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ। পরেশনাথের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ ঐ যুবাকে দেখাইয়া দিলেন, যুবা তৎক্ষণাৎ পরেশনাথের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরেশনাথ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন। যে ব্রাহ্মণটী ঐ যুবার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, পরেশনাথকে তিনি কহিলেন, "ভাল করিয়া দেখ দেখি, ইহাকে চিনিতে পার কি না?"

ভাল করিয়া দেখিয়া পরেশনাথ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। খেলা বন্ধ হইয়া গেল। শশব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া পরেশনাথ মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "তাই ত, এই ত আমার সেই পঙ্কজকুমার!"

যাঁহারা খেলিতেছিলেন, দর্শন করিয়া তাঁহারাও সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যই ত, সত্যই ত! এই ত সেই পঙ্কজকুমার।"

"পঙ্কু আসিয়াছে, পঙ্কু আসিয়াছে!" সদরবাড়ীতে এইরূপ একটা গোলমাল উঠিল। জয়াবতী ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। পুত্রকে চিনিতে জননীর অধিকক্ষণ বিলম্ব হয় না, নবাগত পঙ্কুকে দেখিয়া সস্নেহে তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক স্নেহবতী জননী অজস্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হওয়াতে মুখে কথা ফুটিল না। যে পঙ্কু তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল, গোলমাল শুনিয়া ভিতর হইতে সেই পঙ্কুও বাহির হইয়া আসিল; নূতন লোকের পরিচয় শুনিয়া, জোরে জোরে মাথা ঘুরাইয়া সে পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমিই ত পঙ্কু, এ আবার কে? এ আবার কোথাকার পঙ্কু? এ লোক্‌টা জুয়াচোর!"

কে যেন কোথা হইতে জয়াবতীর কর্ণে কি কথা বলিয়া দিল, অকস্মাৎ কি যেন তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি তখন উভয় পঙ্কুর কর্ণের উপরিভাগের চুলগুলি সরাইয়া কি পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার বদন গম্ভীর হইল, বক্ষঃস্থল গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিল, সজল-বিস্ফারিত-নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। যে পঙ্কুটী নূতন আসিয়াছে, তাহার বামকর্ণের ঊর্দ্ধভাগে অর্দ্ধ-ডিম্বাকার একটী রক্তবর্ণ জড়ুল-চিহ্ন। সেই চিহ্ন দর্শন করিয়াই জননী গদ্গদস্বরে বলিলেন, "এইটীই আমার পঙ্কজকুমার। এই চিহ্ন আমার ঠিক মনে আছে।"

যে তিনজন ভট্টাচার্য্য ইতাগ্রে পাশা খেলিতেছিলেন, কটিদেশে নামাবলী জড়াইয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন এক প্রকার অদ্ভুত চীৎকার করিতে করিতে লম্ফে লম্ফে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণমধ্যে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক পরেশনাথের বারান্দায় আসিয়া জমা হইল। আসল পঙ্কু আর জাল পঙ্কুর মহা কৌতুক। চিহ্ন দর্শনে জননী আপন পুত্র চিনিয়াছেন, আর কোন বিরোধ রহিল না, তথাপি জাল পঙ্কু আস্ফালন করিয়া বিরোধ বাধাইতে ছাড়িল না।

পূর্ব্বের সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যাহারা পূর্ব্বে বলিয়াছিল, পঙ্কু খর্ব্বাকার, সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার, তাহারা এই সময় বিরোধ মিটাইবার উত্তম অবসর পাইল; উভয় পঙ্কুকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া সকলকে দেখাইল, আসল পঙ্কু অপেক্ষা নকল পঙ্কু মাথায় প্রায় এক হস্ত উচ্চ। নকল পঙ্কু পরাস্ত হইয়া অধোবদনে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দলের মধ্য হইতে একজন বলবান্ ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া জাল পঙ্কুর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিস্? কি কারণে সন্ন্যাসী হইয়াছিলি? কি কারণে গৃহস্থের গৃহে রাজভোগ সেবা করিতেছিস্? সত্যকথা বল্, মিথ্যা বলিলে এখনি তোকে আমরা পুলিশে চালান করিয়া দিব। জালীয়াতীর উত্তম পুরস্কার লাভ হইবে। জুয়াচোর, বদ্‌মাস্, ভণ্ডধিটেল, বহুরূপি! সত্য বল্, কে তুই?"

জাল পঙ্কুর চক্ষে জল আসিল না, গাত্র কম্পিত হইল না, একটুও ভয় পাইল না; মাথা তুলিয়া, সতেজ-নয়নে চাহিয়া, চোট্‌পাট্ জবাব করিল, "কেন? আমি ত প্রথমেই সত্যকথা বলিয়াছিলাম, ইহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে নাই। আমি বলিয়াছিলাম, এ দেশে আমার বাস নয়, আমি তোমাদের পুত্র নই, আমার নামও পঙ্কু নয়, বহুদিন হইতে আমি উদাসীন। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এ সব কথা সত্য কি না? আমার কোন কথা না শুনিয়া ইহারা জোর করিয়া আমাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সন্ন্যাস নষ্ট করিয়া জোর করিয়া আমাকে গৃহে রাখিয়াছে। আমাকে তোমরা এখন যদি পুলিশে দিতে চাও, স্বচ্ছন্দে দাও, পুলিশে আমি সকল কথাই প্রকাশ করিব, হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব। আমি কোন্ জাতি, তাহাও ইহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আপনাদের ইচ্ছাতেই আমার পৈতা।"

যিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, ম্রিয়মাণ হইয়া, হস্ত ছাড়িয়া দিয়া, একটু নরম হইয়া তিনি তখন বলিলেন, "চুপ্, চুপ্, চুপ্! ও সব কথা আর তুলিও না, যাও বাপু, তোমার যদি কোথাও যাইবার স্থান থাকে, সেই স্থানে চলিয়া যাও; আবার যদি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা হয়, সন্ন্যাসী হও;

যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, এ দেশে আর থাকিও না; যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এ সব কথা আর কাহারও নিকটে গল্প করিও না; গল্প করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। যাও,—চলিয়া যাও।"

লোকটীকে এই সকল কথা বলিয়া বক্তা কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুল-চিত্তে নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর জয়াবতী দেবীকে বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া, পরেশনাথকে লইয়া, পাঁচজন ভদ্রলোকের সহিত একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই তিনি বলিলেন, "বিষম সমস্যা। লোকটাকে যদি চটাইয়া দেওয়া যায়, জাতি লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিবে। নিজেই বলিতেছে, কোন্ জাতি, তাহা ঠিক নাই। এরূপ অবস্থায় উহাকে কিছু টাকা দিয়া ভাল কথা বলিয়া বিদায় করাই সুপরামর্শ। পরেশনাথ যদি জাতি হারাইয়া থাকেন, আমরাও হারাইয়াছি। কেবল তাহাই নহে, ঐ লোকের বিবাহ দিয়া যে ভদ্রলোকের কন্যাকে ঘরে আনা হইয়াছে, সেই ভদ্রলোকটীরও জাতি নষ্ট হইয়াছে। গোলমাল করা ভাল নয়, অদ্যই ইহার একটা বিহিত করা কর্ত্তব্য।"

লোকটাকে টাকা দিয়া বিদায় করিবার পরামর্শে পরেশনাথ সম্মত হইলেন। যুক্তি স্থির হইলে পরামর্শ-কর্ত্তারা বাহিরে আসিলেন। যিনি প্রথমে পুলিশের কথা তুলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, তিনি মনে মনে আর একটা যুক্তি স্থির করিলেন। যখন পুলিশের কথা হয়, জাল পঙ্কু তখন মুখের কথায় কোন ভয়ের লক্ষণ দেখায় নাই সত্য, কিন্তু তাহার মুখের ভাব কিছু বিকৃত হইয়াছিল; ইহাতেই বোধ হয়, মনে ভয়, মুখে সাহস। কথার কৌশলে তাহাকে তাহার যথার্থ ভয়ের কারণ বুঝাইয়া দিতে পারিলে কাজ হইতে পারে। ইহা স্থির করিয়া লোকটীকে নিকটে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "যাও বাপু, যথা ইচ্ছা তথায় তুমি চলিয়া যাও, আমরা তোমাকে পঞ্চাশ টাকা সম্বল দিতেছি, গোলমাল না করিয়া অদ্যই তুমি চলিয়া যাও, এ অঞ্চলে আর বিলম্ব করিও না। কেন জান? এ অঞ্চলে থাকিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে। তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলে, কি প্রকার সন্ন্যাস, তাহা তুমিই জান। এ দেশে এখন অনেক লোক অনেক কারণে সন্ন্যাসী হয়। সামান্য সামান্য কারণের কথা আমি বলিতেছি না, সত্য

বৈরাগ্যের কথাও আমি তুলিতেছি না, ইহার ভিতর ভয়ঙ্কর কারণ আছে। খুন করা, জাল করা, ডাকাতী করা, গৃহ দাহ করা, স্ত্রী বাহির করা ইত্যাদি অনেক অপরাধে পুলিশে গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে অনেক লোক সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকে। তুমি যে সেই রকমের কোন গুরু অপরাধে পুলিশকে ফাঁকি দিবার মৎলবে সন্ন্যাসী হও নাই, পুলিশ হয় ত এমন বিশ্বাস করিতে নারাজ হইবে। অধিকন্তু আমার স্মরণ হইতেছে, আমি একবার কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়াণা দেখিয়াছিলাম; একজন পলাতক খুনী আসামীর অনুসন্ধানের ইস্তাহার। বড় বড় অপরাধে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে সকল ইস্তাহার প্রচার হয়, তাহাতে আসামীর হুলিয়া লেখা থাকে, তাহা হয় ত তুমি জান; চেহারাকে পুলিশের ভাষার আর আদালতের ভাষায় হুলিয়া বলে, তাহাও হয় ত তুমি শুনিয়াছ। যে ইস্তাহারের কথা আমি বলিতেছি, সেই ইস্তাহারে আসামীর যেরূপ হুলিয়ার বর্ণনা আমি পাঠ করিয়াছিলাম, যখন তোমার জটা-দাড়ী ছিল, তখন মনে হয় নাই, কিন্তু তোমার এখনকার চেহারার সহিত সেই হুলিয়ার অনেকটা মিলন বুঝিতেছি। তুমি আর এ অঞ্চলে থাকিও না; চেহারা গোপন করিয়া যত শীঘ্র দূরদেশে পলায়ন করিতে পার, ততই মঙ্গল।"

কি কারণে বলা যায় না, এইবার লোকটার মনে যেন কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। সে বলিল, "সংসারে থাকিতে আমার বাসনা ছিল না, ইহারাই জোর করিয়া আমাকে বাধ্য করিয়াছিল। আচ্ছা, টাকা দিতে চাহিতেছ, দাও, কিন্তু আমার আর একটী কথা আছে। আমি বিবাহ করিয়াছি, আমার স্ত্রী এখানে থাকিবে, আমি চলিয়া যাইব, এমন হইতে পারে না; আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে দাও।"

লোকেরা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন; হাস্যধ্বনি নিবৃত্ত হইবার পর একজন গম্ভীরবদনে বলিলেন, 'তুমি ত দেখিতেছি খুব চমৎকার সন্ন্যাসী! একবার সন্ন্যাসী হইয়াছিলে, এখন গৃহী হইয়াছ, পুলিশের ভয়ে আবার সন্ন্যাসী হইবে, সংসারের লোভে পড়িয়া এ অবস্থাতেও মেয়েমানুষ সঙ্গে লইতে তোমার অভিলাষ! চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, স্ত্রী পাইবে না, টাকা লইয়া চলিয়া যাও। স্ত্রী?—স্ত্রী কাহার? স্ত্রী তোমার নয়।—তোমার সহিত তাহার বিবাহ হয়

নাই। পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতা-পিতামহের নামোচ্চারণে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র পঙ্কজকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত শিশিরকুমারীর বিবাহ হইয়াছে; তুমি পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নও, তুমি পঙ্কজকুমার চক্রবর্ত্তী নও, স্ত্রী তুমি পাইবে না। যদি হাঙ্গামা বাধাইতে চাও, আইনানুসারে ফৌজদারী আদালতের সাহায্য চাহিতে হইবে, তাহা হইলেই আগা-গোড়া টান পড়িবে, গ্রামের লোকেরাও তোমাকে অমে ছাড়িবে না। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়া অমে অমে বিদায় পাও; ও সব কথা আর মুখেও আনিও না।"

জাল পঙ্কু আর আপত্তি করিতে পারিল না, পঞ্চাশটী টাকা লইয়া সেই দিন সন্ধ্যার সময় অপ্রকাশ্য পথ ধরিয়া গ্রামের বাহির হইয়া গেল; পূর্ব্বের সন্ন্যাসীবেশের কৌপীন বহির্বাস নষ্ট করে নাই, সেগুলিও সঙ্গে লইল।

জাল পঙ্কু দূর হইয়া গেল, আসল পঙ্কু ঘরে রহিল। জাল পঙ্কুকে তাড়াইবার পূর্ব্বে আপনাদের জাতির কথা তুলিয়া যাঁহারা বলিয়াছিলেন, বিষম সমস্যা, তাঁহাদের তখন ভুল হইয়াছিল। সেটা বাস্তবিক বিষম সমস্যা ছিল না, এইবারই বিষম সমস্যা। শিশিরকুমারী কাহার হইবে?

পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর বংশের নাম-গোত্রাদি উল্লেখে পঙ্কজকুমারের সহিত বিবাহ হইতেছে, ইহাই নিশ্চয় জানিয়া শ্রীপুরগ্রামের রমানাথ লাহিড়ী একজন অজ্ঞাত পুরুষের হস্তে আপন কুমারী শিশিরকুমারীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাত পুরুষ জাল সাব্যস্ত হইয়া দূরীভূত হইল, পরেশনাথের প্রকৃত পুত্র প্রকৃত পঙ্কজকুমার চক্রবর্ত্তী সেই শিশিরকুমারীর বিধিসঙ্গত স্বামী হইতে পারিবে কি না, শিশিরকুমারী দেবী ঐ পঙ্কজকুমারকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিলে অধর্ম্মভাগিনী হইবে কি না, গ্রামের মধ্যে এই তর্ক উঠিল।

শাস্ত্রীয় সমস্যা। গ্রামে যাঁহারা দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইল। কেহ বলিলেন, হইতে পারে, কেহ বলিলেন, পারে না। তাদৃশ গুরুতর বিষয়ে কেবল মুখের কথায় কাজ হয় না, ব্যবস্থাপত্র লিখাইয়া লইতে হয়, গ্রাম্য ভট্টাচার্য্যেরা পয়সা-প্রত্যাশী হইলেও তাদৃশ ব্যবস্থাপত্রে কেহ স্বাক্ষর করিতে সাহস করিলেন না। বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে যাঁহারা রীতিমত স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, স্মৃতিরত্ন, স্মৃতি-

ভূষণ, স্মার্ত্তবাগীশ ও স্মার্ত্তশিরোমণি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ উপাধি-ভূষিত, তাঁহাদের নিকটেও ব্যবস্থার কথা উত্থাপন করা হইয়াছিল, সকলে একবাক্যে ব্যবস্থা দিতে পারেন নাই। যদিও আজকাল অর্থলোভী ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে অনেকে আশামত অর্থ পাইলে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা রচনা করিয়া দিতে পারেন, কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ তাহা দিয়াও থাকেন, কিন্তু পরেশনাথ তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। যাঁহারা বলিয়াছিলেন, হইতে পারে না, তাঁহাদের মতেই পরেশনাথকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। আসল পঙ্কজকুমার শ্রীমতী শিশিরকুমারী দেবীকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী একটী কুলকন্যার জীবন চিরদিনের মত বিফল করিয়া দিয়াছিল। পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী অপর স্থানে সম্বন্ধ করিয়া একটী অপরা কন্যার সহিত নিজপুত্র পঙ্কজকুমারের বিবাহ দিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারীর কি হইল? জাল পঙ্কুর পলায়নের পর তিন চারি বৎসর শিশিরকুমারী পরেশনাথের বাড়ীতেই ছিল, পিত্রালয়েও যায় নাই, পরেশনাথের গৃহেও বধূরূপে পরিগৃহীতা হয় নাই, যৌবন-প্রাপ্ত হইয়া শিশিরকুমারী একরাত্রে কোথায় পলায়ন করিয়াছিল, কেহই তাহার সন্ধান পান নাই। অভাগিনী মনের দুঃখে আত্মঘাতিনী হইয়াছে, এই কথাই গ্রামের কতকগুলি লোকের মুখে রাষ্ট্র হইয়াছিল।

দেশে দেশে পথে পথে অধুনা যত সন্ন্যাসী বেড়ায়, তাহাদের দলে অধিকাংশই ভণ্ড সন্ন্যাসী, এ কথার উপর বিসংবাদ নাই। সত্য-সন্ন্যাসী ক-জন পাওয়া যায়, তাঁহারা কেহ লোকালয়ে প্রবেশ করেন কি না, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যদিও কখন কখন দুই একজন প্রকৃত সাধু কোন লোকালয়ে দর্শন দেন, লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতেই পারে না। সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কলঙ্ক, ভণ্ড সন্ন্যাসীই অধিক। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আপনাদিগকে পরমহংস বলিয়া পরিচয় দেয়, প্রকৃত পরমহংসের নিন্দাবাদ করে। কি কি লক্ষণে পরমহংস চিনিতে পারা যায়, আশ্রমধর্ম্মে তাহার সবিশেষ বর্ণন আছে।

বাবু ভবরত্ন চৌধুরী সন্ন্যাসধর্ম্মের আলোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন, সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন করিলে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, ভণ্ড সন্ন্যাসীর উৎপাত দর্শন

করিয়া অন্তরে তিনি অতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন। পরেশনাথ চক্রবর্ত্তীর গল্পটী তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। যখন শ্রবণ করেন, তখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতায় আজকাল ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাব, তথাপি ধার্ম্মিক লোকের বিদ্যমানতা আছে। ইতিহাসে শ্রবণ করা যায়, ভণ্ডামীর পরিচয় পাওয়া যায়, এই কারণেই মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতায় অবস্থিতি-সময়ে কলিকাতার অনেক বড়লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। সত্য বড়লোক কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন। বড়লোক ব্যতীত আরও ভিন্ন ভিন্ন অনেক সম্প্রদায়ের অনেক লোকের সহিত তাঁহার জানা-শুনা ও আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। এক বৎসর ফাল্গুনমাসের শেষে একবার তিনি কলিকাতায় আইসেন, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীর একটী মহল তাঁহার নিজের খাসে ছিল; যখন তিনি থাকিতেন না, তখন সে মহলে চাবী দেওয়া থাকিত, যখন আসিতেন, তখন সেই মহলেই অবস্থান করিয়া সমাগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিবিধ প্রসঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন। এবারেও সেইরূপ হইতেছিল। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, নগরবাসী ও প্রদেশবাসী আট দশজন ভদ্রলোক নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছেন, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের কথা উঠিল। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গই ভবরত্নের প্রাণের সঙ্গে মিলিত; প্রাচীন উপকথার মধ্যেও তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বের সার সংগ্রহ করিতেন। একটী প্রসঙ্গের সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথা পড়িল, পরমহংসের কথা উঠিল, অবতারের কথা পড়িল। যাঁহার যে প্রকার মনোভাব, যাঁহার যে প্রকার অভিপ্রায়, সঙ্ক্ষেপে সঙ্ক্ষেপে তিনি সেই প্রকার মন্তব্য দিলেন; সকল প্রকার মন্তব্য ভবরত্নের মনে ধরিল না, তিনি নিরুত্তর হইয়া আপন মনে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিল। বিদায় লইয়া, নমস্কার করিয়া সমাগত লোকেরা সকলেই উঠিয়া গেলেন, কেবল একটী লোক রহিলেন। বাবু ভবরত্ন অপেক্ষা সেই লোকটীর বয়স অল্প; আকার-অবয়বে বোধ হয় প্রায় দশ বৎসরের ছোট বড়। লোকটীর নাম অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি; স্বধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ; তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া ভবরত্ন বাবু সর্ব্বদাই

প্রীতি অনুভব করেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা হইতেছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া ভবরত্ন কহিলেন, "লোকে বলে, সর্ব্বপ্রকারে এ দেশের উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে। আমি দেখিতেছি, এখানকার ধর্ম্মভাব ক্রমশই বিকার-প্রাপ্ত। অনেক লোক সন্ন্যাসী সাজিয়া পথে পথে বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার পরমহংস বলিয়া পরিচয় দেয়; মুখে বলে, ধর্ম্মমন্দিরের সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে; কেহ কেহ বলে, ধর্ম্ম-শৈলের শিখরদেশ স্পর্শ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা যে কি প্রকার ধর্ম্ম-সঞ্চয় করে, তাহাদের ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে কিরূপ, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। কতকগুলি লোকের মুখে শুনা যায়, ধর্ম্মের ভাণও ভাল, সেটা সে কি কথা, তাহার অর্থ তাহারা বুঝাইয়া দিতে পারে না। যাহারা ভাণ করে, তাহারা ভণ্ড, শব্দের অর্থ-বোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন। এখন বিবেচনা কর, ভণ্ডামী যদি ধর্ম্মের একটী উত্তমাঙ্গ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের অধোগতির লক্ষণ কিরূপ হইবে? আচারত্যাগ করি-লেই সন্ন্যাসী হয়, বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরমহংস হয়, ইহা সামান্ত বিড়ম্বনা নহে। তুমি ত সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা কর, যথাশক্তি ধর্ম্ম-পন্থায় বিচরণ কর, বল দেখি, এখনকার সন্ন্যাসী ও পরমহংসেরা চায় কি?"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া অযোধ্যানাথ কহিলেন, "তাহারা চায় লোকের মুখে খোসনাম; তাহারা চায় ক্রিয়া-কর্ম্ম-বিবর্জ্জন, তাহারা চায় লোকের কাছে ভক্তি; তাহারা চায় লোকে তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করুক, তাহারা নিজে যাহা যাহা করে, তৎপ্রতি কেহ দৃষ্টি না রাখুক। ঐ দলের আর একটা অনর্থকর সংস্কার আছে, গেরুয়া পরিয়া গাঁজা খাওয়া অভ্যাস না করিলে ধর্ম্মের সেবক হওয়া যায় না; এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহাদের অনেকেই দম্-দম্ গাঁজা খায়, গাঁজার নেশায় চক্ষু আরক্ত করিয়া বাহ্য-চৈতন্য হারায়, তাহা-তেই তাহাদের মুক্তি-পথ পরিষ্কৃত হয়। তাহারা মনে করে, সন্ন্যাসধর্ম্ম গাছের ফল, পরমহংসভাব গাছের ফল, কানন ভ্রমণ করিয়া পাড়িয়া লইলেই সর্ব্ব-সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।"

অল্প হাস্য করিয়া ভবরত্ন বলিলেন, "ঠিক কথা। যাহারা আপনাদিগকে পরমহংস বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি দেখিয়াছি, কথা

কহিয়াও প্রকৃতি বুঝিয়াছি, প্রায় সকলেই ষড়্‌রিপুর দাস ; আত্মমতের বিরুদ্ধ কথা শুনিলেই তাহারা মহা ক্রোধে জলিয়া উঠে, কামরিপুর সেবা করিতেও লজ্জা বোধ করে না ; লোভের নিকটে ফাঁদ পাতিলে তাহাদিগকে অক্লেশে ধরা যায় ; মোহ তাহাদের পদে পদে ; মদমাৎসর্য্য মুখে মুখে।”

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, তৎক্ষণাৎ আবার ভবরত্নের মুখের দিকে চাহিয়া তর্কালঙ্কার বলিলেন, “আপনার সম্মুখে সকল কথা প্রকাশ করিতে আমার লজ্জা আইসে, আমি একটা দৃষ্টান্ত জানি;—অত্যন্ত লজ্জাকর দৃষ্টান্ত!”

গম্ভীরবদনে ভবরত্ন কহিলেন, “ধর্ম্মের কথা পড়িয়াছে, এ প্রসঙ্গে জানা-শুনা সত্যকথনে লজ্জাকে একটু অন্তরে রাখা দোষাবহ হইবে না ; আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, যাহা তুমি জান, লজ্জাত্যাগ করিয়া অকপটে তাহা প্রকাশ কর।”

মাথা হেঁট করিয়া অযোধ্যানাথ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, “আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তৎসমস্তই সত্য ; ভণ্ডদল নিশ্চয়ই ষড়্‌রিপুর দাস। তাহারা প্রায় সকল প্রকার কার্য্যই করে ; তবে কি না, কতকগুলি প্রকাশ্য, কতকগুলি গোপন। যে দৃষ্টান্তের কথা আমি বলিতেছি, তাহা একটা গুপ্ত-ক্রিয়ার অন্তর্গত। এই কলিকাতা-নগরীমধ্যেই তাহা ঘটিয়াছিল। অধিক দিনের কথা নহে, প্রায় ছয় সাত মাস হইল, আমার একজন জ্ঞাতির মাতৃশ্রাদ্ধের কীর্ত্তনের বায়না করিবার নিমিত্ত একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি চোরবাগানে গিয়াছিলাম। এক বাড়ীতে একটী কীর্ত্তনী ছিল, একজন দালাল সেই বাড়ী আমাকে দেখাইয়া দেয়, আমি প্রবেশ করি। কীর্ত্তনীটী নূতন ; নিজে তখন বাড়ী করিতে পারে নাই, যে বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আরও পাঁচ জন বিলাসিনী থাকিত। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, কীর্ত্তনী তখন ঘরে ছিল না, রামকৃষ্ণপুরে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিবার কথা, একটী পরিচারিকার মুখে এই সংবাদ আমি পাইলাম। সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল। রাত্রি আটটা বাজিল, কীর্ত্তনী আসিল না। আরও এক ঘণ্টা। পাশের অন্যান্য ঘরে তবলা-বেহালার সঙ্গে গীত উঠিতেছে, ঘন ঘন করতালি বাজিতেছে, সঙ্গীতের ধ্বনি ছাপাইয়া হাস্য-রোলের সহিত হল্লা চীৎকারধ্বনি ছাদের উপর

চড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে বিরাম পড়িতেছে। আমি উঠিয়া আসিতে পারিলে বাঁচি, ঘৃণা বিরক্তির সহিত ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ মনে করিতেছি; গুড়ুম করিয়া কেল্লার তোপ পড়িয়া গেল; রাত্রি সাড়ে নয়টা। কীর্ত্তনী আসিল।”

হাস্য করিয়া ভবরত্ন কহিলেন, “কুৎসিত নিকেতনের কুৎসিত চীৎকারে তুমি বিরক্ত হইতেছিলে, তোমার আড়ম্বর শুনিয়া আমারও বিরক্তি আসিতেছে। ঐ সকল কুৎসিত কাণ্ডের মধ্যে পরমহংসের দৃষ্টান্ত কোথায়?”

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া তর্কালঙ্কার কহিলেন, “পরমহংস না আসিলে পরমহংসের দৃষ্টান্ত কিরূপে আসিবে? এইবার সময় হইয়াছে। কীর্ত্তনীর সহিত আমি কথা কহিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে মানুষের পদশব্দ হইল। সিঁড়ির ঠিক পার্শ্বেই ঐ কীর্ত্তনীর ঘর, ঘরের সম্মুখেই দুই হাত চওড়া বারান্দা। যে ঘরে আমি বসিয়াছিলাম, সেই ঘরে একটী দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, বারান্দা অন্ধকার। বারান্দায় একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল, অর্দ্ধ-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, ‘শিবানি!’—অপরদিকের একটী গৃহ হইতে প্রশ্ন আসিল, ‘কে’?—যে লোক শিবানী বলিয়া ডাকিয়াছিল, সেই লোক আহ্লাদে উচ্চস্বরে উত্তর করিল, ‘পরমহংস।’

মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিদ্রপথে হুঙ্কার করিলে মন্দিরমধ্যে যেমন গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি হয়, সেই ‘পরমহংস’ শব্দ সেইরূপে পার্শ্বস্থ গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল; উত্তরদাতার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়াছিল, সুতরাং প্রতিধ্বনিও কাঁপিল।

ইতিপূর্ব্বে যে ঘরে বহুলোকের হাস্য-কোলাহলের সহিত গীত-বাদ্য চলিতেছিল, তখন আমি বুঝিলাম, সেই ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম শিবানী। শিবানী যাহা, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার ঘর হইতে একদল লোক হল্লা করিয়া বাহির হইয়া, একজোড়া খোল বাজাইতে বাজাইতে রামায়ণ-গানের সুরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘রাম এলো, রাম এলো, পোড়ে গেল সাড়া, দামা গুড়াগুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া।’ বারান্দায় একটা আলোক দীপ্তি পাইল, লোকেরা সময়োচিত অভ্যর্থনা করিয়া আগত লোকটীকে আপনাদের ঘরের মধ্যে

লইয়া গেল, পুনর্ব্বার সেই ঘরে পূর্ব্বরূপ মজ্‌লীস বসিল, সকলের মুখেই 'পরমহংস' 'পরমহংস' রব।

কীর্ত্তনীর সঙ্গে আমার যে কথা হইতেছিল, তাহা বন্ধ রাখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমহংস কে? এ জায়গায় পরমহংস আসিয়া কি করে? বারাঙ্গনাগৃহে পরমহংসের এত সমাদর কি জন্য?'

কীর্ত্তনী উত্তর করিল, 'একটা নয়, পরমহংসের পাল। আর একটু বসুন, দেখিবেন, পালে পালে পরমহংস আসিয়া জুটিবে; উত্তম সমাদর পাইবে। পরমহংস কি, আমি তাহা বুঝি না, দেখিতে পাই, পরমহংসেরা মনুষ্য, সন্ন্যাসীর মত জটা রাখে, ভস্ম মাখে, গেরুয়া পরে, গাঁজা খায়, মদ খায়, খিচুড়ি খায়, নাচে, গায়, লাফায়, আরও কত কি করে, যদি দেখিতে চান, দেখিবেন।'

আমি অবাক্ হইলাম। শিবানীর গৃহে নৃত্যগীত চলিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে পরমহংসের নামে শোভাস্তরী পড়িল, ঘন ঘন স্ফটিকপাত্রের ঠনাঠন্ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, গঞ্জিকার ধূমরাশিতে সম্মুখের বারান্দা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আটজন বালক আসিল। তাহারা বারান্দার ধূমরাশি ভেদ করিয়া, তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের চেহারা ভালরূপ দেখা গেল না, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মাথা নেড়া, কেবল ঐ পর্য্যন্ত আমি বুঝিতে পারিলাম।

বালকেরা শিবানীর গৃহে প্রবেশ করিল, নূতন প্রকার আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল, একটু পরেই নূপুর ও ঘুঙ্গুরধ্বনি সহকারে নৃত্য আরম্ভ হইল। আমি অনুমান করিয়া লইলাম, ঐ বালকেরাই নৃত্য করিতেছে। অনুমান আর অধিকক্ষণ রাখিতে হইল না, বালকের মিশ্রকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি বাতাসের সঙ্গে উড়িল; করতালি ও শোভাস্তরী ধ্বনিবার একসঙ্গে বিমিশ্রিত।

কিছু আমি জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপ মনে করিতেছিলাম, জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, অযাচিত হইয়াই কীর্ত্তনী কহিল, 'উহারা পরমহংসের চেলা।—না-না, উহারা পরমহংসের বাচ্চা; শিশুগণের পাঠ্যপুস্তকে হংসশাবক;—উহাদের মাথাগুলি ফেরীওয়ালার মাথার হংসডিম্ব। যে মজ্‌লীসে উহারা আসিয়াছে, সে মজ্‌লীসের লোকেরা ঐগুলিকে ক্ষুদ্র হংস বলিয়া আদর করে, ওগুলিকেও

গাঁজা দেয়, মদ দেয়, খিচুড়ি দেয়, রাত্রিকালে শয়নের জন্য উত্তম উত্তম শয্যাও দেয়। বড়হংস ছোট হংস সকলেই সমস্ত রজনী এইখানে থাকে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যায়। হংসেরা সাঁতার দিতে ভালবাসে। ঐ হংসেরা যতক্ষণ শয়ন না করে, ততক্ষণ প্রেম-সরোবরে সাঁতার খেলে; এখানে প্রেম-সরোবর কোথায় পায়, আপনি হয় তো এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।'

কীর্ত্তনী যাহা বলিতে পারিল না, আমি তাহা বুঝিলাম। প্রকৃত পরমহংসেরা জগদ্দুর্ল্লভ বিমল প্রেম-সরোবরে সাঁতার দেন, এ সকল পরমহংস (ওরফে পাতিহংস) দুর্গন্ধময় ডোবাকেই প্রেম-সরোবর মনে করে, সুতরাং সেই ঘোলা জলে ভাসিয়া ভাসিয়া কর্দ্দমাক্ত হয়।

কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া আর একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, ঠিক আমার মনের কথা চুমিয়া লইয়া কীর্ত্তনী বলিল, 'সর্ব্বদা উহাদের হংসবেশ থাকে না। কখন ঐরূপ গেরুয়া বসন, কখন দিব্য চওড়া চওড়া কালাপেড়ে ধোপদাস্ত মিহি মিহি ধুতী, কখন বা যাত্রার জুড়ী কিম্বা আদালতের উকীলের মত চোগা-চাপ্‌কান, কখন বা কেহ কেহ সাহেবী ধরণে হ্যাট-কোট পেণ্টুলন পরিধান করে। কখন্ যে উহাদের কিরূপ ভঙ্গী, কখন্ যে কিরূপ বেশ, কি যে উহাদের মৎলব, আমি স্ত্রীলোক, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।'

কীর্ত্তনীর কথাগুলি আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনিলাম। কলিকাতা সহরে যে কয়েকটী পরমহংস আমি দেখিয়াছি, তাহাদের সকলগুলি না হউক, কতকগুলি ঐরূপ প্রেম-সরোবরে সাঁতার দেয়, এক এক লক্ষণে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কীর্ত্তনীর কথার সঙ্গে আমার মনের ভাবগুলি ঠিক মিলিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অযোধ্যানাথ নিস্তব্ধ হইলেন। বাবু ভবরত্ন চৌধুরী এতক্ষণ একটীও কথা কহেন নাই, মনস্থির করিয়া পরমহংসকাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, তর্কালঙ্কারের কথা সমাপ্ত হইবার পর একটী নিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া তিনি কহিলেন, "আমিও ঐরূপ মনে করি। বড় উঠিলে সাগরে যেমন তরঙ্গ হয়, বিনা ঝড়ে আজকাল বঙ্গের মানবসাগরে

সেইরূপ এক একটা তরঙ্গ উঠিতেছে। সন্ন্যাসী হওয়া, স্বামী হওয়া, পরমহংস হওয়া এক এক বিভীষণ তরঙ্গ। কে যে কি কারণে সন্ন্যাসী হয়, কে যে কোন্ সন্ন্যাসীকে স্বামী উপাধি দেন, কে যে কি লক্ষণে কোন্ জ্ঞানে পরমহংস উপাধি গ্রহণ করেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কেহই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী লোক, বারাণসীধামে তাঁহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি, যাঁহারা প্রাণ-বায়ুকে সহস্রদলপদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরমহংস হইবার অধিকারী। শ্বাস-প্রশ্বাস মানবের জীবন। যাহা উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করা হয়, তাহার নাম হং, যাহা নিম্নদিকে নির্গত করা হয়, তাহার নাম স, এই 'হংস' যাঁহাদের মস্তকে বিচরণ করে অর্থাৎ নিম্নদিকে অতি অল্পই অনুভূত হয়, তাঁহারাই মহাযোগী। শ্বাসপ্রশ্বাসের ঐরূপ গতিক্রিয়াকে তন্ত্রমতে পরমহংসী এবং ভাগবতমতে পরমহংস বলা যায়। যাঁহারা প্রকৃত পরমহংস, তাঁহারা নির্ব্বিকার; সংসারের কোন বস্তুর সহিত যাঁহাদের কোন বন্ধন নাই, কোন বস্তুতে যাঁহাদের স্পৃহা নাই, তাঁহারা জীবন্মুক্ত; প্রকৃত পরমহংসেরা জীবন্মুক্ত হইয়া সহস্রারে নিত্যানন্দের সহিত নিত্যানন্দে বিহার করেন। সকল কথা ঠিক আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না, কিন্তু সাধুপুরুষের মুখে ঐ ভাবের অনেক কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যেরূপ বেশ্যার গৃহে পরমহংসের দুর্দ্দশার কথা কীর্ত্তন করিলে, তাদৃশ পরমহংসও যে দুই একটা আমার চক্ষে পড়ে নাই, তাহা তুমি মনে করিও না; দেখিয়াছি, কিন্তু এখন আর দেখিতে বাসনা নাই; এখন তাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; স্থানত্যাগের সুবিধা না থাকিলে কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিবার ইচ্ছা হয়।"

তর্কালঙ্কার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। পরমহংস দুর্লভ; সহজে যথায় তথায় পরমহংস-দর্শন হয় না। বঙ্গদেশে পরমহংস ছিলেন, পূর্ব্বে এমন কথা আমি শুনি নাই, একবার একটা পরমহংসের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অতি অদ্ভুত; তাঁহার কার্য্যও অদ্ভুত। কাশীধামের স্বর্গীয় তৈলঙ্গস্বামীর সহিত তাঁহার কার্য্যাবলীর অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। বাস্তবিক পরমহংসেরা মহাপুরুষ, তাঁহারা লোকাতীত ক্ষমতা-সম্পন্ন; পরমাত্মার সহিত

তাঁহাদের আত্মার নিত্য-সংযোগ। স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া তাঁহারা হংসত্বের পরিচয় দেন না। এখন কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রপাঠ করিয়া পরমহংস হইতে হয়, এমন কোন প্রমাণ নাই; আপনা হইতেই পরং জ্ঞান জন্মে, আপনা হইতেই যোগসিদ্ধি লাভ হয়। অনেকাংশে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আদৌ শাস্ত্রজ্ঞানে প্রয়োজন নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানোদয় হইলে ধর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে; সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এখন যাঁহারা পরমহংস সাজেন, তাঁহাদের অনেকেই আশানুরূপ শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য। পরমহংসের বক্তৃতা, এ কথা শুনিলেই ত মনোমধ্যে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। একবার বর্দ্ধমানের এক দেবালয়ে আমি একজন পরমহংসের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম; অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিল। পরমহংস বলিতেছিলেন, 'বেদব্যাসরচিত রঘুবংশে কংসধ্বংসের বর্ণনা আছে, কুবলয় হস্তীর দন্তযুগল সুবর্ণময়, সেই দন্ত হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া কংসকে নিপাত করিয়াছিল। এই প্রমাণে সিদ্ধ হয়, সজীব নির্জীব উভয় পদার্থে কৃষ্ণ বাস করেন।'—সেই বক্তার পৌরাণিকজ্ঞান কতদূর, ঐ বক্তৃতাতেই তাহা প্রকাশ পাইল। রঘুবংশ-কাব্য বেদব্যাস-প্রণীত এবং গজদন্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি, ইহাই পরমহংসের বক্তৃতার সার। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন পরমহংস অধুনা অনেক দৃষ্ট হয়।"

হাস্যকর প্রসঙ্গ হইলেও হাস্য না করিয়া গম্ভীরবদনে ভবরঞ্জ কহিলেন, "নানাপ্রকার উপধর্ম্মের সৃষ্টি হওয়াতেই এই সকল জঞ্জাল সমুৎপন্ন হইতেছে। আমাদের দেশে এখন স্বধর্ম্মের রক্ষক নাই, পালক নাই, চালক নাই, সেই কারণেই দিন দিন ধর্ম্মের গৌরব কমিয়া আসিতেছে; যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাকেই আপন আবিষ্কৃত ধর্ম্ম বলিয়া, স্বেচ্ছাচার চালাইবার চেষ্টা পাইতেছে; মূলবস্তুতে ভেদজ্ঞান জন্মিতেছে; স্বেচ্ছাচারের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ও পরমহংসের সংখ্যা বাড়িতেছে। বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা উপলক্ষ্য করিয়া হুতোম-পেঁচা বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গভাষা এখন বেওয়ারিস লুচির ময়দা; বালকেরা সেই ময়দা লইয়া ইচ্ছামত পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছে।'—এখনকার ধর্ম্মের নামেও ঐ কথাটী ঠিক খাটে। বঙ্গের সন্তানেরা ধর্ম্মকে লইয়া নানা রঙ্গে খেলা করিতেছেন। সেই সকল রঙ্গ হইতে এক এক অবতারের

আবির্ভাব; অবতারেরাও সনাতন নিত্য ধর্ম্মকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নানাপ্রকার মতভেদ বাড়াইয়া ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইতেছেন।”

কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া, তর্কালঙ্কার কহিলেন, “আজ্ঞে হাঁ, এখন যাঁহারা অবতার হন, তাঁহারাই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মতভেদ বৃদ্ধি করিবার গুরু। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন এক অবতার হইয়াছিলেন, তাঁহার চেলারা তাঁহার পূজা করিত, আরতি করিত, ভোগ দিত, পদধূলি লেহন করিত, দেবতাকে যেমন করিয়া ভক্তি করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ ভক্তি দেখাইত। কেশবচন্দ্রের যখন ঐরূপ প্রাদুর্ভাব, সেই সময় বেদ-বেদান্তপরায়ণ দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসিয়া বরাহনগরস্থ এক উদ্যানে কিছুদিন বাস করেন; তিনজন শিষ্য সমভিব্যাহারে বাবু কেশবচন্দ্র একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; ব্রহ্মানন্দ উপাধি ধারণ করিয়া অবধি কেশবচন্দ্র এ দেশের ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতেন না, কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতীকে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন। বিশেষ কোন কথা উত্থাপিত হইবার অগ্রে কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সরস্বতী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কোন্ ধর্ম্মের প্রতি আপনার বিশ্বাস?’—দয়ানন্দ সরস্বতী সেই প্রশ্নে কিছুমাত্র উত্তরদান করেন না। দুই তিনবার পুনঃ পুনঃ সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, কোন উত্তর না পাইয়া, শেষকালে কেশববাবু বলেন, ‘কেন প্রভু! আপনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আমার প্রশ্নে আপনি নিরুত্তর থাকিতেছেন কেন?’ সেইবার দয়ানন্দ উত্তর করেন, ‘তোমার প্রশ্ন ঠিক হয় নাই; প্রশ্ন না হইলে কি উত্তর দিব?’ যেন কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কেশববাবু বলেন, ‘প্রশ্ন ঠিক হয় নাই কেন? প্রশ্নে আমার কি দোষ হইয়াছে? আপনি ধার্ম্মিক, আপনাকে আমি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহা অঠিক হইবার কারণ কি?’—দয়ানন্দ বলেন, ‘ধর্ম্মের বহুবচন নাই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোন্ ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস? বহু না থাকিলে, এটা ওটা, সেটা, কিরূপে স্থির করা যায়? আমি এই আম্রকাননে বাস করিতেছি, তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে, এই কাননের বৃক্ষরাজির মধ্যে কোন্ বৃক্ষের আম্র মিষ্ট, তাহা হইলে আমি উত্তর দিতে পারিতাম; কিন্তু ধর্ম্ম বহু নাই, ধর্ম্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্।’—এত পরিষ্কার বাক্যেও কেশববাবুর স্পৃহা নিবৃত্ত হইল না, তিনি পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আপনার কিরূপ বিশ্বাস? প্রতিপ্রশ্ন করিয়া দয়ানন্দ বলিলেন, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে?' কেশববাবু উত্তর করিলেন, 'যে ধর্ম্মে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়।'—দয়ানন্দ প্রশ্ন করিলেন, 'ব্রহ্ম কে'?—কেশববাবু বলিলেন, 'যিনি জগতের পিতা, জগতের কর্ত্তা, জগদীশ্বর, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।' -দয়ানন্দ কহিলেন, 'তুমি ত তাঁহার অনেকগুলি নাম জান, তোমার অপেক্ষা আরও অনেক বেশী নাম আমি জানি; তবে তাঁহাকে কেবল এক ব্রহ্মনামে কি বলিয়া পরিচয় দিতে পারি? তাঁহার উপাসনাকে কেবল ব্রহ্মধর্ম্মই বা কেমন করিয়া বলি? তাঁহার নাম নাই। তুমি যাঁহাকে ব্রহ্ম বল, আর কেহ তাঁহাকে শিব বলে, কেহ বা বিষ্ণু বলে, কেহ বা আরও অন্য অন্য নাম বলে। তোমার মতে যাহার নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপরের মতে তাহার নাম শৈব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইত্যাদি কেন হইতে পারে না? ব্রহ্ম মঙ্গলময়, শিব মঙ্গলময়, বিষ্ণুও মঙ্গলময়, ঈশ্বরের অপরাপর কল্পিত নামগুলিও মঙ্গলময়। তবে এক মঙ্গলময়ের উপাসনাপদ্ধতিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত হয় কিসে? ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম, উপাসকের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ, মতভেদের কারণ, হিংসা-দ্বেষাদির কারণ, ভেদাভেদের কারণ, ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার নাম কি বাপু?'

কেশবচন্দ্র তখন উত্তর করিলেন, 'শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।'—সবিস্ময়ে কেশববাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সরস্বতী কহিলেন, 'ওঃ! তোমার নাম কেশবচন্দ্র সেন? তোমার নাম আমি শুনিয়াছি; মনে মনে ভাবিতাম, প্রবীণ ব্যক্তি তাহা তুমি নও, তুমি বালক; ধর্ম্মতত্ত্বের সার বুঝিতে তোমার এখনও অনেক বিলম্ব; যাও বাপু, বিদ্যা লয়ে যাও, আর কিছুদিন অধ্যয়ন কর।'

অপ্রতিভ হইয়া সশিষ্য কেশববাবু আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করাইয়া অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার পুনর্ব্বার জয়বল্লভবাবুকে কহিলেন, "দয়ানন্দ সরস্বতীর বাক্যগুলি শ্রবণ করিলে আমাদের দেশের ধর্ম্মভাব পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মের উপাসনা অবশ্যই মূলধর্ম্ম, তৎপক্ষে দ্বৈধমত নাই; কিন্তু সেই ধর্ম্মের একটী বিশেষ নাম দিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রশ্রয়দান করিতে গেলেই উপধর্ম্মের গন্ধ আসিয়া পড়ে। ইংরাজী

প্রণালীতে সপ্তাহে একদিন কয়েক ঘণ্টা কাল সভা করিয়া নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিলে কিম্বা উপাসনা করিলে কিম্বা বক্তৃতা করিলে ধর্ম্মপালন করা হয় না, ইহা যাঁহারা বুঝিতে না পারেন, ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার করা নিষ্ফল। অগ্রে সাকার উপাসনা করিয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মফলের ভাগী হইতে পারেন না, কূট-তর্ক তুলিয়া যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহাদের মতের সহিত অনেক বিজ্ঞলোকের মতের বিরোধ হয়। শ্যামসুন্দর দুর্গাপূজা করেন, ব্রহ্মসুন্দর নিরাকারের উপাসনা করেন, এই কারণে উভয়ের ঐক্য থাকিবে না, একসঙ্গে আহার-ব্যবহার চলিবে না, আচার-ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে, ইহা বড় দোষের কথা। এইরূপ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন মতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মস্তক উত্তোলন করে, তাহার ফলে সমাজের বল-ক্ষয় হইয়া যায়। বঙ্গদেশে যতগুলি উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এই বাক্য সপ্রমাণ হইবে। চৈতন্য-দেব হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশে যাঁহারা হরিপরায়ণ হইয়া উঠেন, প্রথমে তাঁহারা দলাদলির পক্ষপাতী হন নাই; তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেই পবিত্র ধর্ম্ম বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এখন যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের ব্যবহার দর্শনে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারা যায় না। নিমাই অল্পবয়সে সংসারী হইয়া অল্পবয়সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সকলেই সন্ন্যাসী হও, শিষ্যগণকে তিনি এমন উপদেশ দেন নাই; তথাপি অনেকে আপন আপন ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল। সেই দৃষ্টান্ত উপলক্ষ্য করিয়া এখনকার ইংরাজী-শিক্ষিত, পণ্ডিতাভিমানী দুই একজন বঙ্গীয় যুবক মুখ বক্র করিয়া কহেন, 'নবদ্বীপের চৈতন্য বঙ্গদেশ নষ্ট করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার উপদেশে বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোক ডোর-কৌপীন ধারণ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।'

চৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হন না।

এখনকার বৈষ্ণবেরা এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। অধি-কাংশ বৈষ্ণব যেরূপ আচরণ করে, তাহা দর্শন করিলে তাহাদের পূর্ব্ব-

পুরুষগণকে চৈতন্যদেবের শিষ্য বলিয়া সম্মান দিতে কেহই কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু বর্ত্তমান বংশধরগণকে সে বংশের অঙ্গার বলিতেও অনেকে ইচ্ছা করেন। আজকাল শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব একটা প্রবাদবাক্যের মধ্যেই হইয়া উঠিয়াছে; পাঁচালীওয়ালা দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীর খণ্ডে খণ্ডে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব রচনা করিয়া লোক হাসাইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা শাক্ত, যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা বৈষ্ণব। শক্তি ছাড়া বিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু ছাড়া শক্তি নহেন; এই যে সার তত্ত্ব, এখনকার বৈষ্ণব তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।"

এই শেষ কথা বলিয়া অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার ঈষৎ হাস্য করিয়া ভবরত্ন-বাবুকে কহিলেন, "এখনকার শাক্ত-বৈষ্ণবে কেমন ভাব, একটী গল্প বলিয়া আপনাকে তাহা বুঝাইব। এক বৎসর এক বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইতেছিল, একজন তিলকধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব দুর্গাপ্রতিমা-দর্শনার্থ পূজার দালানে উঠিয়া, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দুই তিনবার বামে দক্ষিণে মস্তকসঞ্চালন করিল; প্রতিমাকে প্রণাম না করিয়া সহাস্য-বদনে মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'বাঃ! বৌ-ঠাক্রুন্ বেশ সাজিয়াছে!'—বাড়ীর কর্ত্তা অতি নিকটেই ছিলেন, বৈষ্ণবের ঐ বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বৈষ্ণব যখন চলিয়া যাইবার জন্য দালানের সিঁড়িতে নামিল, ভৃত্য দ্বারা কর্ত্তা তাহাকে ডাকাইলেন; বৈষ্ণব নিকটস্থ হইলে সগৌরবে তাহাকে বলিলেন, 'বাবাজী! আপনি যান্ কোথা? পূজা-বাড়ীতে পূজা দেখিতে আসিলে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ না করিয়া যাইতে নাই। আপনি বসুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে হইবে।'—বাবাজী বলিল, 'এ স্থানে প্রসাদভক্ষণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।'—কর্ত্তা কহিলেন, 'যাহা নিষিদ্ধ, তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার প্রসাদ আছে; আপনি বসুন।'

বাবাজীর পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জল প্রদান করা হইল, দরদালানে বৃহৎ একখানি আসন পাতিয়া দেওয়া হইল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পদপ্রক্ষালনান্তে বাবাজী সেই আসনে বসিল। কর্ত্তা একবার বাড়ীর ভিতর গেলেন, তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন। পরক্ষণে এক প্রশস্ত রজতপাত্রে বিবিধ মিষ্টান্ন আনীত হইয়া বাবাজীর আসনসমক্ষে রক্ষিত হইল; বামদিকে সুবাসিত বারিপূর্ণ রজতপাত্র; জলপাত্রের নিকটে কয়েক খণ্ড শ্বেতবর্ণ পদার্থ-

পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র রজতপাত্র। কর্ত্তা তখন বাবাজীকে কহিলেন, 'বামদিকের ঐ ক্ষুদ্র পাত্রে যাহা আছে, অগ্রে তাহা ভক্ষণ করুন্।'—বাবাজী জিজ্ঞাসা করিল, 'উহা কি ?'—কর্ত্তা কহিলেন, 'মানকচু'।—বিস্ময়ান্বিত হইয়া বাবাজী বলিল, 'কাঁচা মানকচু কি মানুষে খায় ?'—কর্ত্তা বলিলেন, সেকল মানুষে খায় না, কিন্তু আপনাকে খাইতে হইবে। আপনি ইতিপূর্ব্বে প্রতিমা দর্শন করিয়া বলিতেছিলেন, বৌ-ঠাকুরুন্ বেশ সাজিয়াছে। দুর্গা আপনার বৌ-ঠাকুরুন্ কি সম্পর্কে ?' বাবাজী উত্তর করিল, 'মহাদেব বৈষ্ণব, আমিও বৈষ্ণব; মহাদেব জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ; সেই সম্পর্কে মহাদেবের পরিবার আমার বৌ-ঠাকুরুন্।'—কর্ত্তা বলিলেন 'হাঁ, বুঝিলাম। সেইজন্যই বলিতেছি, ঐ ক্ষুদ্র পাত্রের শ্বেত খণ্ডগুলি অগ্রে আপনাকে ভক্ষণ করিতে হইবে।'—বাবাজী কিছুতেই রাজী হইল না, কর্ত্তা তখন ঘোড়ার চাবুক আনাইলেন, বাবাজীর মাথার উপর সেই চাবুক নাচাইয়া নাচাইয়া সক্রোধে কহিলেন, 'খা শালা, খা, ঐ মানকচু তোকে খেতেই হবে। শিব তোমার দাদা, দুর্গা তোমার বৌ-ঠাকুরুন্! সমুদ্রমন্থনে শিব কালকূট-বিষ-ভক্ষণে নীলকণ্ঠ হইয়া আছেন, তুমি শালা তাঁর ভাই, তুমি খানকতক মানকচু খাইতে পারিবে না ? খা শালা, খা, না খেলে এই চাবুক তোমার বৈষ্ণবগিরী বাহির করিবে।'—চাবুকের ভয়ে বাবাজী তখন কর্ত্তার কাছে ক্ষমা চাহিল, কর্ত্তার আদেশে ভগবতীকে প্রণাম করিল, মানকচু খাইতে হইল না, মিষ্টান্নভক্ষণ, শেষকালে ভগবতীর ভোগের পর ছাগমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল।"

ভবরঞ্জ হাস্য করিলেন। তর্কালঙ্কার কহিলেন, "কেবল শাক্ত-বৈষ্ণবের কথা বলিয়া নহে, ধর্ম্মের নামে দিন দিন এ দেশে যতই দলবৃদ্ধি হইতেছে, ততই পরস্পর ভেদাভেদ, হিংসা-দ্বেষ, অহঙ্কার ও দলাদলি বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। যে দেশে ঐক্য নাই, ধর্ম্মকে খেলিবার সামগ্রী মনে করিয়া সে দেশে ভিন্ন ভিন্ন দলে আরও অনৈক্যের বৃদ্ধি করা, কদাচ মঙ্গলের নিদর্শন নয়। শৃগালের ঐক্য আছে, বায়সের ঐক্য আছে, বানরের ঐক্য আছে, মেষপালের ঐক্য আছে, বাঙ্গালী মনুষ্যের ঐক্য নাই, ইহা কত দূর লজ্জা ও অবনতির হেতুভূত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। সমাজসংস্কারক আওয়াজী পাণ্ডারা এই মূলবিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যাহাতে

স্বদেশের মঙ্গল হইবে না, সেই সকল বিষয়ের প্রচলনের নিমিত্ত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিতেছেন, ইহাই অসামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়। বিলাতী অনুকরণে বঙ্গসমাজের গঠন যাঁহাদের বাঞ্ছনীয়, তাঁহারা সমাজের অধঃপতন আহ্বান করিতেছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।"

অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, ভবরত্ন কহিলেন, "বিধির বিপাকে জীবনের প্রথমকালে আমাকে বিদেশে বিদেশে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল, বঙ্গ-সমাজের তদানীন্তন অবস্থা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; এখন যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার বাক্যগুলি যে অখণ্ডনীয় সত্য, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। নব নব বেশ পরিগ্রহ করিয়া, নব নব বাক্যের তরঙ্গ ছুটাইয়া, যাঁহারা বঙ্গ-সংসারসাগরে কর্ণধার হইবার আড়ম্বর দেখাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছানুসারে এক এক অবতার হইয়া উঠিতেছেন। মানুষের অবতার যে কি তামাসা, তাহার মর্ম্মভেদ করিতে আমি অক্ষম।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রে যে দশাবতারের কথার উল্লেখ আছে, সেগুলি ভগবানের অবতার; ভগবান্ সকল অবতারে নরদেহ পরিগ্রহ করেন নাই, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ এই চারিটী প্রথম অবতার; এখনকার অবতাররূপী মানুষেরা যদি আপনাদিগকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, তাহা হইলে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি রূপ ধারণ করিতে না পারেন কেন, এই একটী জিজ্ঞাস্যের বিষয় আছে। জিজ্ঞাসার অগ্রে একটী রহস্য স্মরণ হইল। মনুষ্য অবতারেরা ভগবানের অন্যান্য অবতারের অনুকরণ অপেক্ষা কৃষ্ণাবতারের অনুকরণ করিতেই বড় ব্যগ্র, কৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা ভালবাসেন। আমি শুনিয়াছি, কলিকাতার এক বাবুর বাড়ীর একটী গুরু আপনাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া পরিচয় দিতেন, শিষ্যের অন্তঃপুরে রাসবিহার, যমুনাবিহার, কুঞ্জবিহার, কদম্ববিহার ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লীলা খেলা করিতেন। বাবু অগ্রে তাহা জানিতে পারেন নাই, শেষকালে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের

লীলা দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। ঠাকুর একদিন অপরাহ্ণে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া, সদরফটক পার হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছিলেন, বাবু সেই সময় বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফটকের মুখে তাঁহাকে দেখিলেন; দেখিয়াই হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, লীলা দর্শনে আমার বড় সাধ, অন্তঃপুরে ছোট ছোট লীলা-খেলা হয়, আমি দুই একটী বড় লীলা দেখিতে ইচ্ছা করি। সব যদি হয়, তবে কালিয়দমন আর গোবর্দ্ধনধারণটা বাকী থাকে কেন?' ঠাকুরকে এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারপালগণকে আজ্ঞা দিলেন, 'ঠাকুরকে গোবর্দ্ধন ধারণ করাও।'—ফটকের ধারে বৃহৎ একখণ্ড পাষাণ পতিত ছিল, ঠাকুরকে ভূতলে শয়ন করাইয়া দ্বারপালেরা সেই পাষাণখণ্ড তাঁহার বক্ষে চাপাইবার উপক্রম করিল। ঠাকুর তখন প্রাণভয়ে করযোড়ে বাবুর নিকটে অপরাধস্বীকার করিয়া অব্যাহতিলাভ করিলেন। বাবু কহিলেন, 'আজ অবধি এখানে তোমার লীলা-খেলা সমাপ্ত, আর তুমি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিও না।'—অবতারের অবতারত্ব ঘুচিল, কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণ লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এ দৃষ্টান্তটী অতি সুন্দর। এখনকার অবতারেরা শ্রীকৃষ্ণের ছোট ছোট লীলা করিতে পটু আছেন কি না, জানা যায় না, কিন্তু বড় বড় লীলা করিতে এককালেই অসমর্থ। এ কথা যদি ঠিক হইল, তবে এখনকার মনুষ্যরূপী অবতারেরা কোন্ কোন্ গুণে কোন্ কোন্ লীলা-খেলা করিয়া অবতার নামে পরিচয় দেন? কেহ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া অবতার হন, কেহ ছাই-মাটী মাখিয়া অবতার হন, কেহ বা সাকার-নিরাকারকে সূর্য্যকিরণে ও বহ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া অবতার হন, কেহ বা প্রকাণ্ড রাজবর্ম্মের পার্শ্বে ধড়া-চূড়া পরিয়া বংশীধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ সাজিয়া মুদিতনেত্রে অবতার হন, উঁহাই তাঁহাদের লীলা-খেলা। ঐ সকল অবতারকে গোবর্দ্ধনধারণ করাইতে পারিলে কিম্বা কালিদহে ঝাঁপ দেওয়াইয়া কালিয়-নাগের মস্তকে নাচাইতে পারিলে যথার্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, অবতারের আবার পুরস্কার কি?—এ কথার উত্তর—অবতারের পুরস্কারের নাম ষোড়শোপচারে পূজা।"

দেশের জন্য আক্ষেপ করিয়া ঐ দুই জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ শেষ-কালে অবতারের পুরস্কারপ্রসঙ্গে মর্ম্মভেদী হাস্য করিলেন। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়াছিল, অযোধ্যানাথ স্বগৃহে গমন করিলেন, বাবু ভবরত্ন আপন শয়নগৃহে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

ভবরত্নের সহিত অযোধ্যানাথের কথোপকথনে বঙ্গ-সমাজের অনেকটা নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইল। ধর্ম্মের ভেদাভেদ, ধর্ম্মের দলাদলি এবং ধর্ম্মের নামে হিংসাবিদ্বেষ দর্শন করিয়া পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী পরমানন্দ ঠাকুর স্বপ্রণীত আনন্দলহর নামক সঙ্গীতগ্রন্থে একটী সুন্দর গীত উপহার দিয়াছেন। সেই তত্ত্বগীতটী এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। গীতটী এইঃ—

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম সবাই করে,
বলি ধর্ম্মের ধার ক-জন ধারে।
ধারে যারা তাদের আবার ক-জন সে মুক্তি তরে,
মান অভিমান তুচ্ছ করি সকলি সয় অকাতরে,
ক-জন বা সে স্বার্থ ছেড়ে জগজ্জনার উপকারে,
বিলায় জ্ঞান-ভক্তি প্রেম থাকি সদা সদাচারে॥
ক-জন বা আর শাস্ত্র বুঝে চূর্ণ করি সংস্কারে,
সবাই সম দেখ্‌তে শিখে দেখায়ও তা ব্যবহারে।
দেখি যে সব ধর্ম্মের ঢেউ উঠ্‌ছে ভবে ঘরে ঘরে,
সে নয় ধর্ম্ম উপধর্ম্মে দিচ্ছে ধর্ম্ম ছারেখারে।
কেউ বা ছেড়ে বন্ধুস্বজন ধর্ম্ম আশে বনে চরে,
কেউ বা ছেড়ে সত্য দয়া ধর্ম্ম দেখে গাছ-পাথরে।
কেউ বা মেতে ধনে মানে ফুলে উঠে অহঙ্কারে,
কেউ ভাবি তা সংসারেতে ঢুকে রে ঘোর কারাগারে।
কেউ দেখি বা কঠোরতায় উপবাসে সময় হরে,
কেউ বা দেখি তীর্থে তীর্থে মিথ্যাচারে ঘুরে মরে।

কেউ বা গাঁজা সিদ্ধি খেয়ে বেড়ায় সদা ভূতাকারে,
কেউ বা দেখি বাক্যনবীশ হাঁটু জল ত হরে দরে।
এ ধর্ম্ম না ওটী ধর্ম্ম এ ধর্ম্মভূত গছে যারে,
সবার যে এক আত্মধর্ম্ম কভু না সে বুঝতে পারে।
ধর্ম্ম নহে নানাবিধ নানা হয় বা অবিচারে,
সে অবিচার ঘটায় ভবে লোভে প'ড়ে স্বার্থপরে।
ধর্ম্মটা হয় সহজ ধন সবার আছে মূলাধারে,
সে মূলাধারে দৃষ্টি পলে ধর্ম্ম নিজের মাথায় ধরে।
ধরম কথায় ধর হাম্ দিচ্চে বলে যারে তারে,
মাছ ধরে যে না ছোঁয় পানি সে আনন্দে তাহে তরে।

আধুনিক অবতার-সম্বন্ধেও ঐ ব্রহ্মচারী ঠাকুর একটী চমৎকার গীত রচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহলপরিতৃপ্তির উদ্দেশে সেটীও এই স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

শ্যামা এ কি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার।
দেখি কলিকালে পাসে পালে হাজার হাজার অবতার।
যত ভণ্ড নেড়া-নেড়ীর দল, অকাল কুষ্মাণ্ড সকল,
করে বকাণ্ড প্রকাণ্ড আশা পেতে ধর্ম্ম ছল;
শেষে এম্‌নি কাণ্ড বাধায় খণ্ড লণ্ড-ভণ্ড দেশাচার।
কারো থাকে না কুল, হয় প্রেমাকুল, পেয়ে গোকুল একাকার।
কারও বিত্তের এত চোট, কথা বল্‌তে কাঁপে ঠোঁট,
তবু সংটী সাজি হন স্বামীজী বলেন দে গো ভোট;
কভু উচ্চ করি পুচ্ছ ধরি তুচ্ছ করে জাত-বিচার।
সার্ ফাদার্ মাদার চায় সে সবার পূজ্য বলে নমস্কার।
কেউ বা এম্‌নি গুণধাম, ডুবায় রামকৃষ্ণ নাম,
ধরে জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ কত নাম বেনাম;
কেউ বা কৃপা-সিন্ধু জগবন্ধু রাধাকৃষ্ণ একাকার।
কেউ হয়ে হংস দেয় গো হংস কংস-বংশ ছারেখার॥

কারো প্রেমের এম্‌নি ঢেউ, কোথা বাদ পড়ে না কেউ,
ভেসে এমন পাছে লাগে যেমন বাঘের পাছে ফেউ ;
কেহ তন্ত্র পড়ে মন্ত্র ঝেড়ে যন্ত্র নেড়ে পগার পার।
কেউ বা তাগে বাগে ভোগে রাগে হয় গুরুজী কর্ম্মকার ॥
ভূমিশূন্য সবাই ভূপ হলে আমি বাদ পড়ি কি বলে ;
দেগে দে মা নামি শ্যামা জয়ধ্বজা তুলে ;
আর কয় আনন্দ এও না মন্দ যুটলে সদা প্রেমাচার।
আর কয় আনন্দ এও আনন্দ হই যদি মা লেক্‌চারার,
তবে দেশ-বিদেশে নানা ভাষে কর্‌বো ভারত-সমুদ্ধার ॥
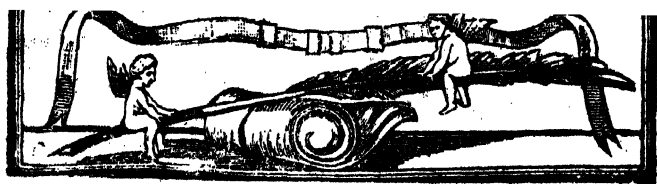
ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

নারী-সংসার।

নারীগণ সংসারের লক্ষ্মী, সর্ব্বশাস্ত্রে এই বাক্য স্বীকৃত হয়। ভারতকামিনী-গণ স্মরণাতীত কালাবধি সংসারের সকল মঙ্গলকর বিষয়ে আপনাদের মহিমা দেখাইয়া আসিতেছেন। বঙ্গ-কামিনীগণ সংসারের সকল বিষয়ের কর্ত্রী, এই কারণে তাঁহাদের নাম গৃহিণী। বিদেশে যে সকল লোক আমাদের সংসারের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত, তাঁহারা বলেন, বঙ্গবাসী হিন্দুগণ আপনাদের নারীগণকে সংসারের দাসী করিয়া রাখেন, বিস্তর লাঞ্ছনা করেন, সংসারের কোন কার্য্যে স্বাধীনতা দেন না, এই সকল কারণে বঙ্গ-সংসারের উন্নতি হইতে পায় না।

ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। গৃহসংসারে নারীগণ যাহা করেন, তাহাই হয়। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনা, গৃহের কর্ত্তারা গৃহিণীগণের কোন প্রকার অবিবেচনার কার্য্য না দেখিলে তাঁহাদের কৃত কার্য্যের উপর কোন কথাই কহেন না। কি ধর্ম্মসম্বন্ধে, কি নিত্যকার্য্য-সম্বন্ধে, কি নৈমিত্তিক লোক-লৌকিকতা-সম্বন্ধে গৃহিণীরা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, অবস্থা বুঝিয়া সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা না থাকিলে কখনই সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক হিন্দু-সংসার চলিত না। তবে হাঁ, ভদ্র ভদ্র হিন্দু-পরিবারের রমণীগণ প্রকাশ্যরূপে হাটে বাজারে গতিবিধি করেন না, অবাধে পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করেন না, স্বেচ্ছাচারের দাসী হইয়া সংসারের অকুশল উৎপাদন করেন না,

এইগুলিতে তাঁহাদিগকে পুরুষের অধীন হইয়া চলিতে হয়। হিন্দু-সংসার ইহাকে মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করেন। এইটুকু আছে বলিয়াই বর্ত্তমান বিপ্লবসময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম এখনও হিন্দু-অন্তঃপুরে অনেক পরিমাণে অটলভাবে রহিয়াছে। আজকাল যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অন্তঃপুরের সে শান্তি আর অধিক দিন অব্যাহত থাকিবে না। বৈদেশিক রাজার অধিকারে রাজধানীমধ্যে বৈদেশিক লোকের আধিক্য হইতেছে, তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে এ দেশের অদূরদর্শী পুরুষেরা পদে পদে বিভ্রান্ত হইতেছেন। বিলাতের বিবিরা সকল বিষয়ে স্বাধীনতা লয়, পুরুষের উপর প্রভুত্ব করে, একাকিনী ঘোড়া চড়িয়া বেড়ায়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপনাদের নারীগণকে সেইরূপ ব্যবহারে শিক্ষিতা করা অনেক পুরুষের সাধ। তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ হইলে পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে, নূতন উল্লাসের কুজ্ঝটিকা-ঘোরে তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

ইংরাজ আমাদের মঙ্গল করিতেছেন, দিন দিন আরও অধিক মঙ্গল সাধিত হয়, ইহাই তাঁহাদের কামনা। ইংরাজী বিদ্যালয়ে এ দেশের পুরুষেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, ইংরাজী সমাজের আচার-ব্যবহার-বিজ্ঞাপক পুস্তকাদি পাঠে নূতন প্রকার জ্ঞানলাভ করিতেছেন, ইংরাজী পাদরী সাহেবের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন, সাহেব-লোকের সহিত বিবি-লোকের কি প্রকার সম্বন্ধ, কি প্রকার ব্যবহার, তাহাও দর্শন করিতেছেন, মনের ভিতর যুদ্ধ হইতেছে। আমাদের এটা ভাল কিম্বা সাহেবের ওটা ভাল, এই বিচার লইয়াই তর্ক-যুদ্ধ। বাহ্য দর্শনে ও বাহ্য শোভায় ইংরাজী দৃষ্টান্ত সুন্দর, অতএব সৌন্দর্য্যের দিকেই চিত্ত ধাবিত হওয়া সম্ভব। ইংরাজী ধর্ম্মের সহিত আমাদের ধর্ম্মের মিলন নাই, ধর্ম্মভাব বিচলিত হইবার ইহা একটী প্রধান হেতু। পাদ্‌রী সাহেবেরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ংবদ "ক্যাটাকিষ্ট" অনুচরেরা যথায় তথায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তরলমতি হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মবিশ্বাস টলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চেষ্টা কোন কোন স্থলে সফল হইতেছে, শ্রোতাদলে যাহাদের দৃঢ়তা অল্প, তাহাদের ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া আসিতেছে; দুর্জ্জয় ঝটিকাঘাতেও হিন্দুধর্ম্ম কাঁপে না, তথাপি যেন ঐ সকল বক্তৃতার বাতাসে হিন্দুধর্ম্ম কাঁপিতেছে। অনেক পুরুষের মন সন্দেহ-

দোলায় দোদুল্যমান ; ধর্ম্মভাব অটল রাখিতেছিল হিন্দু-অন্তঃপুরের কামিনীরা, তাহাতেও আঘাত লাগিতেছে।

সমস্ত পৃথিবীকে খৃষ্টান করা খৃষ্টান-জাতির সঙ্কল্প; ধর্ম্মবর্জ্জিত দেশে তাঁহাদের সে সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব বোধ হইবে না, কিন্তু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে সাধারণতঃ খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচার বড় শক্ত কথা ; সাহেব তাহা বুঝিতে-ছেন ; কতকগুলি পুরুষের মন টলাইয়া তাঁহারা দেখিলেন, ইচ্ছামত ফল ফলিল না, স্ত্রীলোকেরা অকপটে ধর্ম্মপালন করে ; স্ত্রীলোকের মন টলা-ইতে না পারিলে, তাহাদের অকপট বিশ্বাসে আঘাত করিতে না পারিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, খৃষ্ট-সেবকেরা তাহা বুঝিলেন ; বিদ্যাশিক্ষা দিবার অছিলা করিয়া স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, অশিক্ষিতা হিন্দুবালিকার বিদ্যাশিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। মিশনারী বিদ্যালয় ;— শিক্ষয়িত্রী মিশনরী বিবি, সেই বিবির সঙ্গিনী কৃষ্ণবর্ণা খৃষ্টপরায়ণা এতদ্দেশীয়া ইতর-কামিনীগণ। হিন্দু-বালিকারা মিশনরী বিদ্যালয়সমূহে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে লাগিল, মথিলিখিত সুসমাচার, লুক্-লিখিত সুসমাচার এবং যোহন-লিখিত সুসমাচার ইত্যাদি মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল, প্রভু যিশুর মহিমা-বিঘোষক গীত গাহিতে শিখিল, বঙ্গের নারীসংসার নষ্ট হইবার সূত্রপাত হইল।

মিশনরী সাহেবেরা দেখিলেন, সে উপায়েও সম্পূর্ণরূপে অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া উঠিল না, অথচ খৃষ্ট ধর্ম্মের দিকে হিন্দু-নারীগণের মতি ফিরা-ইতে না পারিলে আশা পূর্ণ হয় না, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা এক নূতন উপায়ের আবিষ্কার করিলেন। সে উপায়ের নাম "জানানা মিশন"। সুবুদ্ধি-প্রসূত আশ্চর্য্য আবিক্রিয়া। জানানা মিশনের কুমারী বিবিরা ভাল ভাল হিন্দু-গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যুবতী কুলবধূ ও কুলকন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কেবল পুস্তকপাঠ করাইয়া আশা মিটিল না, মৌখিক উপদেশে খৃষ্ট-মহিমা বুঝাইয়া দেওয়া, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের নিন্দা করা এবং গৃহস্থের মনোরঞ্জনার্থ ছাত্রীগণকে কিছু কিছু সূচিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কার্য্য হইল। জানানা-কামিনীগণের পরমানন্দ ;—জানানামধ্যে বিবিগণের ও সহচরী-গণের মহা সমাদর। কার্য্য চলিতে লাগিল। দেখাদেখি কার্য্য করা অনেক

লোকের স্বভাব। অমুক অমুক বাড়ীতে বিবি আসিয়া যুবতী পড়াইতেছে, আমাদের বাড়ীতে কেন আসিবে না, এই তর্কে মীমাংসা করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকেই আপন আপন অন্তঃপুরে মিশনরী কামিনীগণকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন, জানানা মিশন গুলজার হইয়া উঠিল। আজকাল সহরের প্রায় ঘরে ঘরে জানানা মিশনের কুমারীগণের অবাধ প্রবেশাধিকার। ফল কিরূপ হইতেছে, বাহির হইতে সকলে তাহা দেখিতেছেন না, ভিতরে ভিতরে সুকোমল কমলদলে কীট প্রবেশ করিতেছে। গৃহস্থের কুলবধূরা প্রমোদিনী হইয়া উঠিতেছেন। বিবি কখন্ আসিবেন, গুরু-মা কখন্ আসিবেন, অনেকগুলি প্রমোদিনী কামিনী আপন আপন কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া চঞ্চল-নয়নে সেই পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বিবি আসিলে প্রথমে পুস্তক-পাঠ, তাহার পর কার্পেট্-বয়ন, তাহার পর উপদেশশ্রবণ, তাহার পর হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে রহস্যালাপ। তাহার পর হারমোনিয়ম্ পড়ে, সুন্দর সুন্দর অধরে বংশীধ্বনি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর কণ্ঠস্বরে যিশু-মহিমা গীত হইতে থাকে। অন্তঃপুরে ঘরে ঘরে এই প্রকার শিক্ষা। যাঁহারা এই শিক্ষা পান, গৃহকর্ম্মে তাঁহাদের আর মন থাকে না, রামায়ণ-মহাভারত ভাল লাগে না, গুরুজনের প্রতি মর্য্যাদা দেখাইতে তাঁহারা ভুলিয়া যান। যাঁহারা নিত্য শিবপূজা করিতেন, ব্রত লইতেন, পর্ব্বোৎসবে লক্ষ্মীপূজা, মনসা-পূজা, ষষ্ঠী-পূজা প্রভৃতিতে আনন্দ অনুভব করিতেন, নারায়ণের গৃহমার্জ্জনা করিয়া, ভক্তিভাবে পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন, তুলসীবৃক্ষে জল দিতেন, তাঁহারা এখন ক্রমে ক্রমে সে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন; কেবল পরিত্যাগ করিয়াই চুপ করিয়া থাকিতেছেন না, ঠাকুর-দেবতার নামে ঘৃণা করিয়া মুখ বাঁকাইতে শিখিতেছেন। প্রতিমা-পূজার নামে একটী হিন্দুকুল-মহিলা তাঁহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিলেন, "প্রতিমা-পূজায় কি ফল? উহা কেবল পুতুলমাত্র। যে পুতুল আমরা আপনারা গড়িয়া আপনারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, সে পুতুল কি আমাদিগকে মুক্তিদান করিতে পারে?"

জানানা মিশনের এই প্রকার ফল। বিবির মুখে শুনিয়া হিন্দুকুলকন্যারা ঐরূপ পবিত্র জ্ঞানলাভ করিতেছে। জানানা মিশনের শিক্ষায় এই প্রকার ফল। ইহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ফল একটু পরেই আমরা দেখাইব।

এই কলিকাতা সহরের উত্তরবিভাগের একটী পল্লীতে সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের বাস। সুধারামের পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, তিন জামাই, তিন বধূ। পুত্রগণ সকলেই ইংরাজীতে পণ্ডিত, হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী, কেবল কনিষ্ঠ পুত্রটী স্বধর্ম্মে ভক্তিমান্। বৃদ্ধ সুধারাম স্বয়ং স্বধর্ম্মপরায়ণ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল, বধূ তিনটী যুবতী, জ্যেষ্ঠা বধূটী পুত্রবতী। সুধারামের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম সয়ারাম, মধ্যম নরহরি, তৃতীয় বামদেব। তাঁহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া মাতা-পিতার অমতে জানানা মিশনের একটী বিবি আনিয়া বধূ তিনটীকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুধারামের তিনটী কন্যার মধ্যে একটী কন্যা তখন পিত্রালয়ে ছিল, সেটীও ভ্রাতৃবধূগণের সহিত মিলিত হইয়া বিবির নিকটে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল।

বিবির কর্ত্তব্যকার্য্য বিবি করেন, কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত বড়বাবু মধ্যে মধ্যে শিক্ষাস্থলে যান, বিবির সহিত তাঁহার অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়, ইংরাজী ভাষায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিহাসও চলে, বিবি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হন না। একদিন বড়বাবু যে সময় উপস্থিত হইলেন, সে সময় যন্ত্রযোগে গান হইতেছিল। প্রথম গানটী বড়বাবুকে বড় ভাল লাগিল না। গান সমাপ্ত হইলে বিবিকে তিনি কহিলেন, "ঐ প্রকারের গীত শিক্ষা করিয়া আমাদের স্ত্রীলোকের কোন উপকার হইবে না; যাহাতে উপকার হয় অথচ উপদেশ থাকে, সেইরূপ গীত আপনি শিখাইবেন।"

বিবি কহিলেন, "যে সুরে যে ভাবে গীত বাঁধা আছে, তাহাই আমি শিখাই; উপদেশের গীত আমার পুস্তকে লেখা নাই। আপনারা যাহাকে ভজন বলেন, আমাদের গীতগুলি সেই ভাবে বিরচিত।"

বাবু কহিলেন, "আমাদের ভজনের গীত আমাদের কর্ণে যেরূপ মিষ্ট লাগে, আপনাদের ভজন সেরূপ মিষ্ট হয় না। কোন দেবতার নামে আমার বিশ্বাস কি অবিশ্বাস, ভক্তি কি অভক্তি, আমার মন্তব্যের সেরূপ অর্থ আপনি বুঝিয়া লইবেন না। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা আপনাদের গীত বাঁধিয়া দেন, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার আছে, গীত শুনিয়া তাহা আমার বোধ হয় না;

বিশেষতঃ ধর্ম্মের ভাবে তাঁহাদের উদারতা অতি অল্পই প্রকাশ পায়; গীতের পদে পদে আত্মবিশ্বাসের অনুরূপ একই কথাই বারংবার; ঐরূপ উড়ন, পাড়ন, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, বোধ করি, কাহারও কর্ণে তৃপ্তিকর বোধ হয় না। যদি আপনি বলেন, তাহা হইলে আমি দুটী চারিটী গীত লিখিয়া দিই, তাহাই আপনি যন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া কামিনীগণকে শিক্ষা দিবেন। আমার বিরচিত সঙ্গীতে প্রভু যিশুর মহিমাও থাকিবে, অথচ রাগ-রাগিণীও অঙ্গহীন হইবে না।"

বাবুর ঐ কথায় বিবির প্রাণে কোনরূপ আঘাত লাগিল কি না, তাহা বুঝা গেল না, কিন্তু কথার সূত্র ছাড়িয়া দিয়া বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু যিশু-খৃষ্টের নামে আপনার কি আন্তরিক বিশ্বাস আছে?" বাবু উত্তর করিলেন, "সাধুপুরুষের নামে বিশ্বাস না রাখা মূর্খের কার্য্য।"

বাবুতে বিবিতে যতক্ষণ কথা হইল, তিনটী বধূ আর বাবুর ভগ্নীটী ততক্ষণ বাবুর মুখপানে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন, বিবির মুখের দিকে চাহিলেন না। এইখানে আমাদের সামাজিক ব্যবহারের একটী ক্ষুদ্র তর্ক। হিন্দু-ব্যবহারানুসারে শ্বশুর, ভাসুর, মামা-শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে আমাদের কুলবধূরা অনাবৃত-বদনে থাকেন না, যে তিনটী বধূ সেখানে উপস্থিত, তন্মধ্যে বড়বধূ ভিন্ন অপর দুটী বধূর ভাসুর ঐ বড়বাবু; ভাসুরের সম্মুখে ঐ দুটী বধূ গীত গাহিলেন, সপ্রতিভ-নয়নে ভাসুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন, অবগুণ্ঠনের মান রাখিলেন না, ইহা বড় চমৎকার। নূতন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে, সহরের অনেক গৃহেই এইরূপ দেখা যায়। এই একটী নূতন পরিবর্ত্তন। আর একটী পরিবর্ত্তন কিঞ্চিৎ মৃদুগতিতে হিন্দু-পরিবারমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হিন্দু-রমণী গুরুজনের নাম ধরেন না, বঙ্গসমাজে বহুদিবসাবধি এই ব্যবহার প্রচলিত; অধুনা সেই ব্যবহার অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে। শ্বশুর, ভাসুর, মামাশ্বশুর প্রভৃতি নামের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু আজকাল অনেক যুবতী কামিনী স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকে, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়, "সাহেব-বিবির ব্যবহারে ঐরূপ চলে, আমাদের বেলায় কি দোষ? পতির নাম ধরিয়া ডাকিলে স্নেহ প্রগাঢ় হয়, প্রীতিভাব উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়; এই জন্যই সভ্যসমাজে

পতির নাম ধরিয়া ডাকিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদের দেশ হইতে পূর্ব্বের সেই অসভ্য রীতিটা উঠিয়া যাওয়াই ভাল।”

উত্তরও চমৎকার, ব্যবহারও চমৎকার! দুলাল দুলালীকে আদর করিবার সময়, সোহাগ করিবার সময়—কচি কচি নাম ধরিয়া ডাকা বড় সুখকর; সেই দৃষ্টান্তে স্বামীকে নাম ধরিয়া আদর করা ও সোহাগ করা অনেক অন্তঃপুরে আরম্ভ হইয়াছে। যে সমাজে এখন কেহ কাহারও কথার বাধ্য হইতে চাহে না, হিতকথা বুঝে না, ভাল কথা বলিলে বিপরীত ভাবিয়া লয়, সে সমাজের অধঃপতন আসন্ন। সাহেবেরা দয়া করিয়া, আমাদের নারীগণকে শিক্ষাদান করিয়া সভ্যশ্রেণীতে তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন, নারীগণ সেই উপকার স্মরণ করিয়া সাংসারিক পুরাতন ব্যবহার পরিবর্জ্জন করিতেছে। যাঁহারা ইহাকে মঙ্গল ভাবিতে চাহেন, ভাবুন, আমরা দেখিতেছি ভয়ঙ্কর অমঙ্গল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের নারী-সংসার বিনষ্ট হইয়া যাইবে, নারীগণ আর বশীভূত থাকিতে চাহিবে না, সংসারের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইবে। আমাদের ভবিষ্যপুরাণে অনেক কথা আছে, পুরাণের কথা পুরাণেই থাকুক, এখনকার নবীন ব্যবহারশাস্ত্রে যাহা দর্শন করা যাইতেছে, তাহাতে আর ভবিষ্যৎগণনার বড় একটা অবসর থাকিতেছে না। বর্ত্তমানেই নারী-সংসারে অনেক বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা এই বিপর্য্যয়ের উৎসাহদাতা, পরিণামে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, ইহা আমরা এখন হইতেই বলিয়া রাখিতেছি।

সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় আপন অন্তঃপুরের নারীবৈঠকে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, অন্তঃপুরচারিণীগণকে শিখাইবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং যিশুভক্তির গীত রচনা করিয়া দিবেন; ধর্ম্মাত্মা মহানুভব প্রভু যিশু আমাদের মাথায় থাকুন, তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি থাকুক, তাঁহাকে লইয়া কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে হিন্দু-অন্তঃপুরের ব্যবহার লইয়া। হিন্দু-সংসারের একজন অভিভাবক যিশু-গীত রচনা করিয়া বিবির হস্তে দিবেন, বিবি সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না, বাবু হয় ত প্রাণে ব্যথা পাইলেন, যে উদ্দেশে জানানা-মিশনের বিবিরা হিন্দু-জানানায় সুকৌশলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান, সয়ারামের অঙ্গীকারে সে উদ্দেশ্য পাছে বিফল হইয়া যায়, এই ভাবিয়াই

ঐ মিশনরী কুমারী চুপ করিয়া রহিলেন, সে দিনের সঙ্গীত ভঙ্গ হইল, বিবি চলিয়া গেলেন, সয়ারাম দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুধারামের কনিষ্ঠা কন্যার নাম উমাকালী। সয়ারামের মুখপানে চাহিয়া উমাকালী বলিল, "দাদা! আমাদের এই বিবিটী বড় ভাল। উনি আমাদের সকলকে স্বর্গে লইয়া যাইবার আশা দেন। ইনি বলেন, যিশু-খৃষ্টের হস্তে স্বর্গের দ্বারের চাবী আছে, যিশুতে বিশ্বাস রাখিলে যিশু আমাদের অন্তকালে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গদ্বারের চাবী খুলিয়া দিবেন, আমরা স্বর্গধামে প্রবেশ করিব, স্বর্গীয় পিতার স্বর্গীয় সিংহাসনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইব, পিতার নিকটে যিশু আমাদের পরিচয় দিয়া দিবেন, আমরা মুক্তি পাইব! দাদা! এ সব কথা কি সত্য?"

দাদা উত্তর করিলেন, "পাঠ কর, পাঠ কর! ধর্ম্মকথা বুঝিতে অনেক সময় লাগে। বিবি যাহা বলেন, শুনিয়া শুনিয়া যাও, কোন কথার উত্তর দিও না। বিবি যদি তোমাকে—"

বড়বাবুর শেষ কথার ঐখানে বাধা দিয়া বড়বধূ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বিবিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। পুস্তকে দেখিয়াছি, যিশু-খৃষ্ট আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসর পূর্ণ হইত না, পৃথিবীর বয়ঃক্রম অনেক, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গের দ্বারের চাবী কাহার হস্তে ছিল? আমার মনে হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্বর্গের দ্বারে চাবী দেওয়া থাকিত না, দ্বার অবারিত, অনাবৃত থাকিত, যাহার ইচ্ছা হইত, সেই তখন স্বর্গে গিয়া স্বর্গীয় পিতার দর্শনলাভ করিতে পারিত। যিশুর জন্মের পর অথবা যিশুর মৃত্যুর পর অবধি ঐরূপ বাঁধাবাঁধি হইয়াছে, স্বর্গের দ্বারে চাবী পড়িয়াছে।"

অন্তরে হাস্য আনয়ন করিয়া, বাহিরে সকোপ ভ্রূভঙ্গী দেখাইয়া, অল্প তর্জ্জনস্বরে সয়ারাম বলিলেন, "জ্যাঠামী পরিত্যাগ কর, জ্যাঠামী রাখিয়া দাও, ধর্ম্মের নামে জ্যাঠামী শোভা পায় না। দিনবন্ধু মিত্র বলিয়া গিয়াছেন, 'পুরুষ জ্যাঠা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাঠা বড় বালাই।' লেখাপড়া শিখিতেছ, শিখিয়া লও, বিবি যাহা বলেন, শুনিয়া যাও, জ্যাঠামী দেখাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিও না। বিবি তোমাকে—"

হঠাৎ সেই ঘরে পূর্ব্বদিকের দ্বারের পার্শ্বে খুট্ খুট্ করিয়া কি শব্দ হইল, কথা বলিতে বলিতে দয়ারাম থামিয়া গেলেন। কে সেখানে কি শব্দ করিল, দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেই দিকে গিয়া তিনি দেখিলেন, ফর্সা কাপড়-পরা কে একজন শীঘ্র শীঘ্র ছুটিয়া পলাইতেছে। ঘরের পার্শ্বে একটা ঘর, সেই ঘরের পরেই একটা বারান্দা, যে লোক পলাইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সেই লোক বারান্দার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। দয়ারাম তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। সুধারামের চতুর্থ পুত্রের নাম নিধিরাম, বয়স ঊনবিংশতি বর্ষ; পঞ্চম পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয়, বয়স সপ্তদশ বর্ষ; এই দুইটী বালকের বিবাহ হয় নাই। তাহারা উভয়েই এক স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে, সুধারামের কনিষ্ঠ পুত্রটী হিন্দু-অন্তঃপুরে মিশনরী বিবির প্রবেশের রীতির উপর বড় চটা, নিজ বাড়ীতে সেইরূপ বিবি আসিয়া যুবতী কামিনীগণকে পড়ায়, গান শিখায়, যিশু-খৃষ্ট ভজায়, বয়স অল্প হইলেও মৃত্যুঞ্জয় সেটা সহ্য করিতে পারিত না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা যাহাতে উৎসাহ দেন, প্রকাশ্যরূপে তাহার উপর কথা কহিতে মৃত্যুঞ্জয়ের সাহস হইত না, কিন্তু মনে মনে গুমরিয়া গুমরিয়া পিতার নিকটে সে এক একবার মনের কথা প্রকাশ করিত। সুধারাম চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধলোক, কনিষ্ঠ পুত্রের কথায় তিনি কেবল নিশ্বাস ফেলিতেন, প্রতীকার করিতে পারিতেন না। কালের ছেলে, মাতা পিতার বাধ্য নয়, বিশেষতঃ আপনাদের পত্নীগণকে ইংরাজীতে পণ্ডিতা করিবার জন্য যাহারা বিবির নিকটে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত সন্তান, নিষেধ করিলে তাহারা শুনিবে না, লাভে হইতে বৃদ্ধবয়সে পুত্রের নিকটে অপমানিত হইতে হইবে, এই জন্য তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন, অসহ্য হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। শিক্ষাগৃহের দ্বারের পার্শ্বে খুট খুট শব্দ শুনিয়া দয়ারাম যখন দেখিতে যান, চিনিতে না পারিলেও যাহাকে অল্প অল্প দেখিতে পান; সে অপর আর কেহই নহে, তাঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয় কখন্ আসিয়া গুপ্তভাবে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের লোকেরা তাহা জানিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বিবিটী যখন প্রবেশ করেন, তাঁহার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুঞ্জয় অন্যদিক্ দিয়া আসিয়া ঐ গুপ্ত স্থানে

আশ্রয় লইয়াছিল। বিবি যাহা যাহা পড়াইলেন, যাহা যাহা উপদেশ দিলেন, যেরূপ সঙ্গীত হইল, দাদা আসিয়া যাহা যাহা বলিলেন, গোপনে থাকিয়া মৃত্যুঞ্জয় তৎসমস্তই শুনিয়াছিল। বিবি চলিয়া যাইবার পর উমাকালী দাদাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিল, বড়বধূ যে যে কথা তুলিলেন, দাদা যে কথার উত্তর দিতেছিলেন, একমনে কাণ পাতিয়া মৃত্যুঞ্জয় তাহাও শুনিতেছিল; আর শুনিতে না পারিয়া যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করে, সেই সময় কপাটের গায়ে করস্পর্শ হওয়াতে খুট খুট শব্দ হয়; দাদা আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবেন, সেই ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া যাইতেছিল, গৃহটা প্রায় পার হইয়াই গিয়াছিল, সেই কারণেই সয়ারাম তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

যে ঘরে মৃত্যুঞ্জয় প্রচ্ছন্ন ছিল, সে ঘরের দ্বার-গবাক্ষ বন্ধ, তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ বনাতের পর্দ্দা ফেলা, দিবাভাগেও অন্ধকার; সহোদর ভ্রাতাকে চিনিতে না পারিবার উহাও এক প্রধান কারণ; কেবল কাপড় পড়া একটী নরকলেবরের ছায়ামাত্র সয়ারামের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। স্পষ্ট চিনিতে না পারিলেও সয়ারাম অনুমানে বুঝিয়াছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। কেন না, ঐরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাগ; কিরূপ শিক্ষা হয়, কিরূপ কথা হয়, কিরূপ গীত হয়, গোপনে দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করা সে বাড়ীর মধ্যে কেবল মৃত্যুঞ্জয়েই সম্ভবে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াও সয়ারামের নিশ্চিত বিশ্বাস দাঁড়াইল মৃত্যুঞ্জয়। সেই তুচ্ছ কারণে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি সয়ারামের কোপ। জ্যেষ্ঠ সহোদরের কোপে পড়িতে হয়, মৃত্যুঞ্জয় তেমন কুকার্য্য কিছুই করে নাই, তথাপি সয়ারামের কোপ। সেই দিন রাত্রিকালে মৃত্যুঞ্জয়কে নির্জ্জনে ডাকিয়া সয়ারাম সগর্জ্জনে বলিলেন, "তুই ছোঁড়া তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে কি শুনছিলি? মেয়েমানুষের কাছে মেয়েমানুষেরা লেখা-পড়া শিক্ষা করে, সেখানে লুকাচুরি কি আছে? কর্ত্তা বুঝি তোকে ঐ রকম লুকাচুরি শিক্ষা দিয়াছেন, তাই বুঝি তুই কর্ত্তার মনোরঞ্জনের জন্য ঐ কাজ করেছিস্? কর্ত্তা আর কতদিন? দিনকতক পরে তোকে আমার খর্পরে পড়্‌তে হবে, তা তুই জানিস্? খবরদার! ফের্ যদি সেই জায়গায় তোকে আমি দেখি, নিস্তার থাক্‌বে না। তোরও থাক্‌বে না, কর্ত্তারও থাক্‌বে না।"

"কর্ত্তা কিছুই জানেন না, গান শুনিতে আমি ভালবাসি, সেইজন্য—"। অতি মৃদুস্বরে এই কটী কথা বলিতে বলিতে মাথা হেঁট করিয়া মৃত্যুঞ্জয় সে স্থল হইতে সরিয়া গেল, কিন্তু দয়ারামের রাগ পড়িল না। রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছেন, "কর্ত্তারও নিস্তার থাকবে না।"—রাগের মাথায় কেন, সহজ মাথাতেও কেহ কেহ আজকাল ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে। অনেক পরিবারের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পিতা যদি চাকরী করেন কিম্বা পেন্‌শন্ পান, তাহা হইলে পুত্র বরং ইচ্ছা করে, পিতা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকুন; পিতার যদি জমীদারী কিম্বা প্রচুর নগদ টাকা থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত পুত্র শীঘ্র শীঘ্র পিতার মৃত্যুকামনা করেন। পিতা মরিলেই পুত্র জমীদার হইবেন, নগদ টাকার অধিকারী হইবেন, এইরূপ আশা পুত্রের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। দয়ারামের হৃদয়েও সেই আশা জাগিত। তাঁহার পিতা একজন জমীদার; জমীদারী ছাড়া তাঁহার ৫০।৬০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে। পিতার মৃত্যু হইলেই সেই-গুলি তাঁহাদের হস্তে আসিবে, আপন অংশ বণ্টন করিয়া লইয়া দয়ারাম ইচ্ছা-মত ব্যবহার করিতে পারিবেন, এই জন্যই শীঘ্র শীঘ্র পিতাকে লোকান্তরে পাঠাইতে তিনি ইচ্ছা করেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে পিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল-বাসেন, সে কারণেও তাঁহার ঈর্ষা। এ সকল কথা এখানকার নয়, সময়ান্তরে প্রকাশ পাইবে।

সাতমাস কাল বিবি আসিয়া বধূতিনটীকে আর কন্যাটীকে শিক্ষা দিলেন; ছাত্রীরা যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তদনুরূপ শিক্ষা করিল। একদিন বৈকালে একটীর বদলে দুটী বিবি উপস্থিত। যিনি প্রথমাবধি আসিতেছিলেন, তাঁহার নাম মিস্ লভিং, যিনি নূতন আসিলেন, তাঁহার নাম মিস্ ডার্লিং। নূতন বিবিটী পুরাতন বিবি অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট। তাঁহারা উভয়েই ছাত্রী-দিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষাদান চলিতেছে, এমন সময় বড়বাবু আসিলেন। ইতস্ততঃ চাহিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, দুটী বিবি। তিনি বড়বিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটী কে?" বিবি উত্তর করিলেন, "সম্পর্কে এটী আমার ভগ্নী হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় আমার অপেক্ষা ইহার পটুতা অধিক, তন্নিমিত্তই ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। হিন্দুস্বরে গীত গাওয়া

ইহার অভ্যাস। আপনি গীত রচনা করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহাই দিবেন, ইহার দ্বারা সেই সকল গীতের উত্তমরূপ আলাপ হইতে পারিবে।"

ছোট বিবির মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া সুধারাম সম্মতি জানাইলেন, সেই রাত্রেই তিনি পাঁচটী গীত রচনা করিয়া রাখিলেন, পরদিন মিস্ ডার্লিঙের হস্তে সেইগুলি প্রদান করিলেন; ডার্লিং কেমন গাহিতে পারেন, কেমন শিখাইতে পারেন, মহলা লইলেন; মহলা লইয়া খুসী হইলেন। তদবধি দস্তুরমত কার্য্য চলিতে লাগিল। আর পাঁচমাসে অতিক্রান্ত, বৎসর পূর্ণ।

বড়বধূর নাম পদ্মাবতী, দ্বিতীয়া ক্ষীরোদকুমারী, তৃতীয়া নরেশনন্দিনী। তিনটী বধূই সুন্দরী; তন্মধ্যে নরেশনন্দিনী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী;—স্বর্ণহারে হীরকের ধুকধুকি। উমাকালীও সুন্দরী বটে, কিন্তু তাঁহার মুখখানি সর্ব্বক্ষণ ম্লান। সুধারাম চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ; তিনটী কন্যাকেই তিনি কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় জামাতা কিছু কিছু লেখা-পড়া জানে, ২০।২৫ টাকা বেতনে কলিকাতার সদাগরী আফিসে চাকুরী করে, তাহারা পরিবার লইয়া পল্লীগ্রামের বাটীতে রাখিয়াছে, বৎসরে একবার করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। কনিষ্ঠ জামাতা মূর্খ, দেশে তাহার তাদৃশ সম্পত্তিও নাই, সুতরাং পরিবার লইয়া যাইতে পারে না, দুই একবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া, দুই একদিন থাকিয়া, দুটী একটী টাকা লইয়া বিদায় হয়; শ্বশুর-শাশুড়ী ও শ্যালকেরা তাহাকে দেখিতে পারেন না, যত্নও করেন না; সেই কারণে উমাকালী মনে মনে বড় কষ্ট পায়; সেই কারণেই পিত্রালয়-বাসিনী, সেই কারণেই সর্ব্বদা ম্লানমুখী।

অন্তঃপুর-শিক্ষার যেরূপ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে যেরূপ ফল হয়, সেই পদ্ধতির শিক্ষায় সুধারামের অন্তঃপুরে সেইরূপ ফল ফলিতে লাগিল। শিক্ষা আরম্ভ হইবার অগ্রে বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিত, গৃহকার্য্য করিত, স্বামীগণের বশীভূত হইয়া থাকিত, বিবির কাছে একবৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল;—সমস্তই উলটাইয়া গেল। নরেশনন্দিনী ছোট বিবিটীর প্রতি অতিশয় অনুরক্তা;—নরেশনন্দিনী গান ভালবাসে, ছোট বিবিটীও বেশ গায়, কেবল সেইজন্যই অনুরক্তি, এমন বিবেচনা করিতে হইবে না;—তাদৃশ অনুরাগের আর একটী গুহ্য কারণ আছে। যতক্ষণ ফল প্রসূত না হয়,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্পের আদর; পুষ্প দেখিয়াই লোকে আনন্দ অনুভব করে, আঘ্রাণ গ্রহণ করে, নির্গন্ধ কুৎসিত পুষ্প হইলে ঘৃণা করিয়া থাকে। নরেশ-নন্দিনীর অনুরাগ-পুষ্পে কিরূপ ফল ফলে, তাহা দর্শনের প্রতীক্ষা করা উচিত। উমাকালীও মিস্ ডার্লিঙের প্রতি মনে মনে অনুরাগিণী। স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগের অর্থ স্বতন্ত্র, ভাবও স্বতন্ত্র, অতএব উমাকালীর ভ্রাতৃ-জায়ারা সে অনুরাগ লক্ষণে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব মনে আনয়ন করেন না; করেন না বটে, কিন্তু নরেশনন্দিনীর ভাবভঙ্গী যেন একটু কেমন কেমন বোধ হয়।

যাহার যেরূপ ভাগ্য-লিপি, তাহার ভাগ্যে সেইরূপ ফল ফলে, ভাগ্যবাদীরা চিরদিন এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। সুধারাম চট্টোপাধ্যায় ভাগ্য-বান্ পুরুষ, বিষয়-সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি তিনি কখনও অসৌভাগ্যের কবলে পতিত হন নাই, পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা অবশ্য সৌভাগের ফল, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনটী পুত্র তাঁহার মতের বিরোধী হইয়াছে, কথার অবাধ্য হইয়াছে,কার্য্যে স্বেচ্ছাচার দেখাইতেছে, বৃদ্ধ সুধারাম তজ্জন্য মন-স্তাপে দগ্ধ হন। নিত্য মনস্তাপ বিষম রোগ; সংসারের শান্তিভঙ্গ হওয়াতে নিত্য মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া, বৃদ্ধ সুধারাম দারুণ গুল্ম-রোগে শয্যাগত হইলেন; চিকিৎসা অনেক প্রকার হইল, কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। যে তিনটী পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, তাঁহারা পিতার রুগ্ন-শয্যার নিকটে একদিন এক মুহূর্ত্তও উপস্থিত হইলেন না, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত কোন চেষ্টাও করিলেন না; একমাস শয্যাগত থাকিয়া পঞ্চ পুত্রের নিদারুণ যন্ত্রণায় অরক্ষিতের ন্যায় নিজ শয়ন-গৃহেই প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রমতে উপরতের শ্রাদ্ধশান্তি করিতে হয়, একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ হইল, কিন্তু সুধারাম যেরূপ বিত্তশালী ও সম্ভ্রমশালী মহৎলোক, শ্রাদ্ধে তদনু-রূপ কোন সমারোহ হইল না। তাঁহার কার্য্য ফুরাইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দয়া-রাম,—দয়ারাম মনে করিলেন, সংসারের একটা কণ্টক ঘুচিল। পিতার মৃত্যুর পর অবধি মাতার প্রতি এবং কনিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি তাঁহার অযত্ন বাড়িতে লাগিল।

দয়ারাম এখন সংসারের কর্ত্তা; সংসারের সকল বিষয়েই তিনি ব্যয়সঙ্কোপ করিয়া দিলেন। নিধিরাম ও মৃত্যুঞ্জয় কলেজে পড়িতেছিল, জ্যেষ্ঠের ব্যয়সঙ্কোচের খাতিরে তাহাদের পড়া বন্ধ হইল।

ছেলেদের পড়া বন্ধ হইল, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষায় সয়ারামের উৎসাহ বাড়িল। নানা প্রকার পুস্তক এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। সপ্তাহে একদিন করিয়া শিক্ষয়িত্রী বিবি দুটীকে নিশা-ভোজের নিমন্ত্রণ করা হয়, ইংরাজী হোটেলের খাদ্যসামগ্রীর সহিত ভাইনম্ রুব্রম্, ভাইনম্ জেলিকম্ এবং সুমিষ্ট ক্লারেট্ প্রভৃতি গুপ্তভাবে আইসে। স্বেচ্ছাচার-বিরোধী বৃদ্ধ কর্ত্তা সংসার হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে, তবে আর কাহার ভয়ে গুপ্তভাব, তাহা জানা যায় না; ভয়েই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, ঐ সকল জিনিস প্রকাশ্যরূপে আসিত না। বিবিদের নাম করিয়া যাহা যাহা আসিত, তিনটী বাবু আর তিনটী বধূ তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতেন। মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না বলিয়া উমাকালী সে সকল জিনিস স্পর্শ করিত না। যে যে রাত্রে ভোজ হইত, সেই সেই রাত্রে সর্ব্বকণ্ঠমিলিত সঙ্গীতধ্বনি সমবেত বাদ্যযন্ত্রধ্বনিকে ছাপাইয়া উঠিত; আধখানা বাড়ী পর্য্যন্ত কাঁপিত।

মহাগুরুনিপাতের পূর্ণ বর্ষকাল ব্যাপিয়া স্ত্রী-পুত্রের কালাশৌচ থাকে; অর্দ্ধবর্ষ পূর্ণ হইবার পর একদিন প্রকাশ পাইল, তিনটী বধূ আর উমাকালী একদিন উষাকালে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ জনে একসঙ্গে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, এমন কখনও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং অন্বেষণ করা হইল, সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সে অন্বেষণে কোন ফল হইল না। সন্ধ্যার পর তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত দিন তাহারা কোথায় ছিল? যাহারা অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহারা নিজে নিজে প্রকাশ না করিলে সে গূঢ় প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? গঙ্গার প্রতি যাহাদের ভক্তি ছিল না, তাহারা গঙ্গা-স্নানে কেন গিয়াছিল? পুরুষ হইলে হয় ত উত্তর পাওয়া যাইত, স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে; হিন্দু স্ত্রীলোকের মুখে সে উত্তর শোভা পায় না; সুতরাং প্রশ্ন কেবল প্রশ্নেই পর্য্যবসিত। অষ্টাহকাল ঐ রহস্য অপ্রকাশিত ছিল, তাহার পর সেই সঙ্গিনী দাসীর মুখে সয়ারাম একটা নিগূঢ় কথা শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদ জন্মিল না, দোষভাবও মনে আসিল না, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। যাহা তিনি শুনিলেন, মনে মনে চাপিয়া রাখিলেন, কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না; প্রকাশ করিতে দাসীকেও নিষেধ করিয়া দিলেন।

আরও তিন মাস। বিবিরা নিত্য নিত্য আইসেন, নিত্য নিত্য নূতন নূতন পাঠের আলোচনা হয়, নূতন নূতন গাত হয়, নূতন নূতন কার্পেটের পুতুল প্রস্তুত হয়, নূতন নূতন খানা হয়; সূক্ষ্মকথা ধরিয়া বিচার করিতে হইলে বলা যাইতে পারে, শিক্ষার অংশ অপেক্ষা আমোদের অংশই অধিক।

তিনটী বধূ আপনাদের পাঠ-গৃহে এক একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া বসিয়া আছেন, উমাকালী হারমোনিয়ম বাজাইতেছেন, বিবিরা সেখানে উপস্থিত নাই। সহাস্য-বদনে সয়ারাম আসিয়া দর্শন দিলেন। হারমোনিয়ম থামিল, যাঁহাদের হস্তে পুস্তক ছিল, পুস্তক মুড়িয়া রাখিয়া তাঁহারা পলকশূন্য-নয়নে বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। কি তাঁহাদের মনে আছে, কি যেন তাঁহারা বলিবেন, অনুমানে এইরূপ বুঝিয়া, নিকটস্থ একখানি আসনে বড়বাবু বসিলেন। তাঁহা-রও চক্ষু বধূগুলির চক্ষের দিকে স্থির।

দুটী বধূর মুখপানে এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, বড়বাবুর মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া, বড়বধূ কহিলেন, "তুমি যদি রাগ না কর, তাহা হইলে আজ আমি তোমাকে একটী কথা বলি।"—কৌতুকে উৎফুল্ল হইয়া, সকলের দিকে চাহিয়া, সকৌতুকে বড়বাবু কহিলেন, "বুঝিতেছি, যেন তোমার নিজের কথা নহে, যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের উকীল হইয়া কোন কথা তুমি বলিতে চাও। তোমার কথাগুলি আমাকে বড় মিষ্ট লাগে, মিষ্টকথায় কেহ কখনও রাগ করে না, আমি রাগ করিব না, যাহা বলিতে তোমার ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল।"

হাস্য করিয়া পদ্মাবতী বলিলেন, "ওকালতী আমি শিক্ষা করি নাই, উকীল হইয়া কাহারও কথা আমি বলিব না, আমার নিজের কথাও বলিব না, গুটীকতক ধর্ম্মকথা বলিব। বিবি বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মে ঐহিক সুখ নাই, পারত্রিক মঙ্গলের কামনাতেই তাঁহারা প্রভু যিশু-খৃষ্টের আরাধনা করেন। যিশু-খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া স্বয়ং ঐহিক সুখাভিলাষে সংসারের কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই; কেবল ভক্তমণ্ডলীর উপকারের নিমিত্ত পবিত্র উপদেশ-দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন; পাপীলোকের পরিত্রাণের জন্য তিনি আপনার রক্ত দান করিয়াছেন। তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা ইহসংসারে অতি বিরল। তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা তাঁহার হস্তে স্বর্গের

চাবী রাখিয়া দিয়াছেন; তাঁহার তুল্য তাঁহার পিতার বিশ্বাসভাজন আর কেহই নাই। আমরা যদি প্রভু যিশুর আরাধনা করিতে—"

সুধাবৃষ্টি হইতে হইতে কি বৃষ্টি হইবে, ভাব বুঝিতে পারিয়া বড়বাবু কহিলেন, "আর বলিতে হইবে না, তোমার বক্তব্যের মর্ম্ম আমি বুঝিয়াছি। তোমাদের বিবি তোমাকে সকল কথা ঠিক করিয়া বলেন নাই। যিশু-খৃষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন, জগৎ ইহা অস্বীকার করেন না, কিন্তু যাঁহারা যিশুখৃষ্ট-ভক্ত, তাঁহারা ঐহিক সুখের অভিলাষী নহেন, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল যে সকল ইংরাজ আমাদের দেশে শুভাগমন করিয়াছেন, সচরাচর দেখা যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐশ্বর্য্য-ভোগে একান্ত আসক্ত। প্রভু যিশু যাহা করিতেন, যেরূপ উপদেশ দিতেন, এখনকার ভক্তমণ্ডলী সেরূপ কার্য্য করেন না, করিতে পারেন না, উপদেশমতে চলিতেও তাঁহাদের সাধ্য নাই। অপরকে এক কথা বলিয়া নিজে তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিলে শুষ্ক উপদেশে কোন ফল হয় না। বিবি তোমাকে 'হ—য—ব—র—ল' বুঝাইয়াছেন।"

ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উমাকালী বড়-দাদার ঐ সকল কথা শুনিতেছিল, বড়বা একটু থামিবামাত্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "হ—য—ব—র—ল কি দাদা?"

গম্ভীরবদনে বড়বাবু বলিলেন, "বঙ্গীয় বর্ণমালার পঞ্চবর্গ সমাপ্ত হইলে, য র ল ব শ ষ স হ, এই আট অন্ত্যবর্ণ লিখিবার রীতি আছে; সেই রীতিই বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত; সেইরূপ না লিখিয়া কতক উলট-পালট করাবু কতক পরিত্যাগ করা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা বিধিলঙ্ঘন করে; বিধি-লঙ্ঘনের ফলকেই 'হ-য-ব-র-ল' বলে।"

উমাকালী বলিল, "বুঝিতে পারিলাম না।"—বড়বাবু বুঝাইয়া দিলেন,—"অন্তঃস্থ য হইতে হ পর্য্যন্ত আটটী অক্ষর; হ-য-ব-র-ল তে পাঁচটী অক্ষর আছে, তাহাও উলট-পালট। অগ্রে হ, তাহার পর য, তাহার পর ব, তাহার পর ঠিক ঠিক র, আর ল;—শ ষ স, এই তিনটী বর্ণ ইহার মধ্যে বিলুপ্ত। বুঝিবার অত্যন্ত গোলমাল। কেহ কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, হ-য-ব-র-ল। তোমাদের বিবি তোমার বৌদিদিকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহাও ঐরূপ হ-য-ব-র-ল।"

একটু মুখ ভারী করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, "আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহার উত্তর হইল কৈ? বিবি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, সেইজন্য বিবির নিন্দা করা তোমার উচিত হইতে পারে, আমার উচিত হয় না। আমার আসল কথার উত্তর কর। আমরা যদি প্রভু যিশুর আরাধনা করিতে—"

পুনরায় বাধা দিয়া বড়বাবু কহিলেন, "হাঁ হাঁ, সে কথা আমার মনে আছে। আরাধনা করা ভাল, কিন্তু ইহলোকের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল পরলোকের সুখের মুখ চাহিয়া থাকা এ দেশের সন্ন্যাসিগণেরই শোভা পায়, খৃষ্ট-ধর্ম্মে আধুনিক খৃষ্টানগণের সেটা কেবল মুখের কথা মাত্র। যিশু-খৃষ্ট সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া সংসারভোগের কোন বিষয়েই লিপ্ত হইতে—"

সয়ারামের কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই বিবি দুটী দর্শন দিলেন। গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে বাহির হইতে তাঁহারা যিশুখৃষ্টের নাম শুনিয়াছিলেন; প্রবেশ করিয়াই বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বড় বিবি কহিলেন, "প্রভু-সম্বন্ধে আপনাদের কি কথা হইতেছিল?"

পূর্ব্বাঙ্গ গোপন রাখিয়া বড়বাবু ত্বরিত-স্বরে উত্তর করিলেন, "প্রভুর বৈরাগ্য-যোগের কথা। মনুষ্যকে বৈরাগ্যযোগ শিক্ষা দিবার প্রয়াসে প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, মনুষ্য তাহা পালন করিতে পারিতেছে না, সেই কথাই আমি বুঝাইতেছিলাম।"

মিস্ লভিং ঐ উত্তরটী ভাল করিয়া বুঝিলেন কি না বুঝিলেন, তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁহার মুখখানি কিছু গম্ভীর হইল; কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "বিশ্বাসী মনুষ্যেরা প্রভুর উপদেশ পালন করিতে পারিতেছে না, কি লক্ষণে আপনি তাহা বুঝিয়াছেন?"

সয়ারামের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল; তৎক্ষণাৎ সে ভয়টুকু অন্তরে রাখিয়া নির্ভয়ে তিনি উত্তর করিলেন, "লক্ষণ অনেক আছে, তন্মধ্যে একটী লক্ষণ আমি বুঝাইব। প্রভু যিশু আপন শিষ্যগণকে সমদর্শিতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, ইদানীং আমরা এখানে এমন অনেকগুলি ভক্ত দেখিতে পাই, তাঁহারা এ দেশের লোককে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করেন, বিনা উত্তেজনায় এ দেশের লোককে তাঁহারা নির্ঘাত প্রহার করেন।"

বিবি একটু শুষ্ক হাস্য করিলেন। সে প্রসঙ্গে আর কোন কথা উঠিল না। কি যেন চিন্তা করিতে করিতে সয়ারাম একটু পরে সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, বিবিরা কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোযোগ দিলেন।

এই ঘটনার পর একমাস অতীত হইল। পূর্ব্বে যেমন একবার গঙ্গাস্নানের অছিলায় বিবির ছাত্রীরা নিশাশেষে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ ঘটনা। সেবারে আর দাসী সঙ্গে রহিল না, কেবল সেই চারিটী কুলবালা। দিনমান গেল, রাত্রি আসিল, কুলবালারা ফিরিল না; রাত্রি গেল, পুনরায় প্রভাত হইল, কুলবালারা ঘরে আসিল না; অপরাহ্ণ আসিল, বিবিদের আসিবার সময় হইল, বিবিরা আসিলেন না। সয়ারাম উদ্বিগ্ন হইলেন। মিস্ লভিং যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাড়ীখানি সয়ারামের জানা ছিল; সেইদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একাকী সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অভাবনীয় দৃশ্য! বিবির বাড়ীতে গিয়া সয়ারাম যাহা দেখিলেন, নিম্নভাগে তাহা বিবৃত হইতেছে।

বিবির বসিবার ঘরখানি নিতান্ত অপ্রশস্ত ছিল না, সচরাচর মিশবিবিদের ঘরগুলি যে ভাবে সজ্জিত থাকে, ঐ ঘরখানিও কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষে সেই ভাবে সুসজ্জিত। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সয়ারাম দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীর তিনটী কুলবধূ আর তাঁহার ভগ্নীটী চারিখানি বেত্রাসনে বসিয়া রহিয়াছে, গুটীকতক বিবি আর তিনটী সাহেব মণ্ডলাকারে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন; হাস্য-কৌতুকে বাক্যালাপ চলিতেছে।

দৃশ্যদর্শনে সয়ারামের নয়ন নিমেষশূন্য, চরণ গতিশূন্য, অঙ্গ স্পন্দনশূন্য এবং রসনা বাক্যশূন্য। নারীমণ্ডলীর মধ্যে যে তিনটী সাহেব ছিলেন, তাঁহাদের একজনের মস্তকে পক্ক কেশ, একজন প্রায় পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়, তৃতীয়জন বালক, তাহার বয়ঃক্রম যোড়শ কিম্বা সপ্তদশ বর্ষের অধিক বোধ হইল না; মুখখানি কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোকের ন্যায় পূর্ণায়ত, দিব্য লাবণ্যযুক্ত, ওষ্ঠোপরি গোঁফের রেখা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। সেই বালক অন্যদিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু স্বরে হাসিতেছিল। সেই বালকের অনতিদূরেই নরেশনন্দিনী,—নরেশনন্দিনীর বামপার্শ্বে উমাকালী।

সয়ারামকে দর্শন করিয়া সকলেই এককালে নির্ব্বাক্ তাঁহার মুখপানে চাহিলেন, সকলের চক্ষুই সয়ারামের চক্ষে সমসূত্রে নিক্ষিপ্ত। যাঁহার মস্তকে পক্ক

কেশ, ক্ষণেক পরে মৌনভঙ্গ করিয়া, সেই সাহেবটী ইংরাজী ভাষায় সয়ারামকে বসিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে পার্শ্বের একখানি শূন্য আসনে সয়ারাম উপবেশন করিলেন। উপবেশনের অগ্রে মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া, ললাটে করস্পর্শ করিতে ভুলিলেন না, সেই প্রক্রিয়াতেই সাহেব-বিবিগণকে সেলাম করা হইল।

আসনে উপবিষ্ট হইয়া সয়ারাম একে একে সমবেত মণ্ডলার সুন্দর সুন্দর বদনগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেন, সকল মুখ চিনিতে পারিলেন না, আপনার পরিবারের চারিখানি মুখ অবশ্যই চিনিলেন, যে দুটী বিবি তাঁহার বাড়ীতে পড়াইতে যাইতেন, তাঁহাদের একজনের—মিস্ লভিঙের মুখখানিও চিনিলেন, ছোট বিবিটীকে দেখিতে পাইলেন না। মুখে কথা নাই, অনিমেষে চাহিয়া প্রায় দশ মিনিট কাল তিনি চুপ্ টী করিয়া বসিয়া আছেন, পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ সাহেবটী ধীর, বিনম্র, মিষ্ট বচনে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সঙ্ক্ষেপে তদ্রূপ বিনম্রবচনে সয়ারাম সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রশ্নোত্তর উভয়েরই ইংরাজী ভাষায় নিষ্পন্ন হইল, ইহা বলা বাহুল্য।

সাহেব কহিলেন, "যাঁহাদের অন্বেষণে আপনি আসিয়াছেন, তাঁহারা এইখানেই উপস্থিত, তাঁহাদিগকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কি অভিপ্রায়ে তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন; আপনার সঙ্গে ইহাঁরা যদি যাইতে চাহেন, লইয়া যাইতে পারেন।"

সাহেবের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক আসনখানি সম্মুখদিকে একটু সরাইয়া লইয়া, পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া সয়ারাম কহিলেন, "গৃহত্যাগ করিয়া কি কারণে তোমরা এখানে আসিয়া রহিয়াছ? গৃহে চল।"

পদ্মা।—সে গৃহে আর আমি যাইব না; ইহাই এখন আমার গৃহ।

সয়া।—আমাকে তবে কি পরিত্যাগ করিবে?

পদ্মা।—তুমি যদি আমার হও, যে পথে আমি আসিয়াছি, যে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি, সেই পথে তুমি আইস, সেই ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।

সয়া।—তোমার পুত্র?

পদ্মা।—আমার পুত্র আমাকে যদি তুমি দিতে ইচ্ছা কর, দিতে পার; যদি ইচ্ছা না হয়, তুমি যদি নিজে এ পথে না আইস, পুত্র তুমি রাখিয়া দিও।

সয়া।—যাহাকে তুমি প্রসব করিয়াছ, এক কথায় তাহার মায়া কাটাইবে?

পদ্মা।—মায়া কি? সংসারের মায়া সমস্তই মিথ্যা। আমি আর মায়ার বশীভূত হইব না। পরিত্রাণের পথে মায়া বিষম কণ্টক; আমি এখন পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইব।

সয়া।—তোমরা চারিজনে আসিয়াছ, চারিজনেরই কি একরূপ অভিপ্রায়?

পদ্মা।—আমার কথা আমি বলিলাম, অপরের কথা আমি বলিতে পারিব না, তুমি জিজ্ঞাসা কর।

সয়া।—সে জিজ্ঞাসায় আমার পূর্ণ অধিকার নাই। পুনরায় আমি আসিব। এখন তোমার প্রতি আমার আর একটী প্রশ্ন।—তোমার শাশুড়ী গৃহে রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা-ভক্তির জন্য তোমার কি গৃহে যাওয়া উচিত কার্য্য নহে?

পদ্মা।—উচিত কার্য্য হইলেও হিঁদেন-পরিবারে আমি মিশিতে যাইব না। শাশুড়ী যদি আমার ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন, তুমি যদি আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, আমার পুত্রকে আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দাও, তাহা হইলে—

সয়া।—তোমার ধর্ম্ম? তুমি কি তবে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছ?

পদ্মা।—হই নাই, আগামী রবিবার আমার জল-সংস্কার হইবার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

সয়া।—(চিন্তা করিয়া) আগামী রবিবার?—না, আমার অনুরোধে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব কর। ইতিমধ্যে পুনরায় আমি আসিব।

পদ্মাবতী নিরুত্তর।

সাহেব-বিবিরা ঐ সব কথা শুনিতেছিলেন, পদ্মাবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের সকলেরই বদন প্রফুল্ল হইল। সয়ারাম এতক্ষণ পত্নীর সহিত কথা কহিতে কহিতে মনোমধ্যে আর একটী বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, পদ্মাবতীর মুখে শেষকথার কোন উত্তর না পাইয়া, মিস্ লভিঙের মুখের দিকে চাহিয়া, সন্দিগ্ধ-চিত্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে সেই যে ছোট বিবিটী আমাদের বাড়ীতে যাইতেন, যাঁহার নাম মিস্ ডার্লিং, তাঁহাকে এখানে উপস্থিত দেখিতেছি না কেন? তিনি কি এ বাড়ীতে থাকেন না?"

প্রশ্ন উচ্চারিত হইবামাত্র এককালে ছয়খানি মুখ অবনত হইল। সেই ছয় মুখের মধ্যে পঞ্চমুখের অধিকারিণী মিস্ লভিং, পদ্মাবতী, ক্ষীরোদকুমারী, নরেশনন্দিনী আর উমাকালী। একখানি মুখের অধিকারী নরেশনন্দিনীর পার্শ্ববর্ত্তী সেই পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্ক বালক। ছয়মুখেই মৃদু মৃদু হাস্য।

সয়ারাম সবিস্ময়ে সেই ভাব দর্শন করিলেন, হাস্যের কারণ উপলব্ধি হইল না, তথাপি তাঁহার মনে নূতন প্রকার তর্ক উঠিল। সেই অবকাশে বদন উত্তোলন করিয়া মিস্ লভিং বলিলেন, "মিস্ ডার্লিং নামে কেহই নাই।"— হাসিয়া এইটুকু বলিয়া উক্ত বালকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন, "ঐ বালক আর সেই মিস্ ডার্লিং অভিন্ন, উভয়েই এক। হিন্দু-সঙ্গীতে ঐ বালক সুনিপুণ বলিয়া আমি উহাকে নারী সাজাইয়া ভগ্নী-পরিচয়ে আপনাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম, কল্পিত মিস্ ডার্লিঙের প্রকৃত নাম জর্জ্জ রবিন্‌সন্।"

পুনরায় ছয়মুখে মৃদু মৃদু হাস্য। সয়ারামের বিস্মিত বদনে আরও অধিক বিস্ময়ের আবির্ভাব। সবিস্ময়ে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহাদের চাতুরীর নিকটে আমাকে পরাভূত হইতে হইল! এইটুকু চিন্তা করিয়াই আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "পদ্মা! তবে তুমি গৃহে যাইবে না? আচ্ছা, আমার শেষকথাটী রক্ষা কর। আগামী রবিবারের পর আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও। আজ আমি চলিলাম, সপ্তাহের মধ্যে আর একবার আসিয়া তোমাদের মনোভাব পরীক্ষা করিব।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "উত্তম।"

যাঁহাকে যাঁহাকে সেলাম করিতে হয়, বিমর্ষ-বদনে তাঁহাদিগকে সেলাম দিয়া সয়ারাম সেদিন বিদায় হইলেন, বাড়ীতে পৌঁছিয়া নরহরিকে আর রামদেবকে সকল কথা বলিলেন, জননীকে কিছু জানিতে দিলেন না। পিতৃ-বিয়োগে তথনও সয়ারামের কালাশৌচ অন্ত হয় নাই, সেই অবস্থায় তাঁহাকে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া তিনি কিছু উন্মনা হইলেন। তিন দিন পরে চতুর্থ দিবসে সেই মিশনরী-গৃহে গমন করিবার দিননির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিল। সয়ারামের পুত্রের নাম বিপিনকুমার, তাহার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, সেই

শিশুটীকেও সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইবে, ইহাও স্থির হইল। সয়ারাম যে দিন গিয়াছিলেন, সে দিন শুক্রবার, সেই দিন হইতে যে দিন চতুর্থ দিবস, সে দিন সোমবার।

রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন ডাক-হরকরা আসিয়া বামদেবের হস্তে একখানি চিঠি দিয়া গেল। সয়ারাম ও নরহরি তখন বাড়ীতে ছিলেন না, সয়ারামের নামে চিঠি, বামদেব সে চিঠি খুলিল না, বঙ্কিমবাবুপ্রণীত 'বিষবৃক্ষ' নামক উপন্যাস-পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিল।

রাত্রি আটটার পর সয়ারাম বাটীতে আসিলে, বামদেব সেই পুস্তকখানি হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, পুস্তকের মধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। ডাকের মোহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সয়ারাম যেন একটু শিহরিলেন, কি যে তাঁহার মনে হইল, প্রকাশ পাইল না, কম্পিত-হস্তে খাম খুলিয়া চিঠির অক্ষরগুলির প্রতি তিনি একবারমাত্র নেত্রপাত করিয়াই কম্পিতস্বরে বামদেবকে কহিলেন, "দেখি দেখি, কি পুস্তক তোমার হস্তে?" বামদেব তাঁহার হস্তস্থিত পুস্তকখানি জ্যেষ্ঠের হস্তে প্রদান করিলেন।

দুঃখের সময় অবস্থাবিশেষে অনেক লোকের মুখে এক প্রকার হাসি আইসে, সে হাসিতে কিছুমাত্র রস থাকে না, সম্মুখের লোকে সে হাসি দেখিলে অন্তরে অন্তরে ভয় পায়। বিষণ্ণবদনে সেইরূপ হাস্য করিয়া, মস্তক-সঞ্চালন পূর্ব্বক সয়ারাম আপন মনে বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে! এরূপ পত্র এইরূপ পুস্তকের মধ্যেই স্থান পাওয়া উচিত বটে!"

বামদেব কিছুই বুঝিতে পারিল না, পত্রের অক্ষরের প্রতিও দৃষ্টি দেয় নাই, জ্যেষ্ঠের বিস্ময়সূচক আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া বামদেব চমকিয়া উঠিল, চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা! পত্র কোথাকার? পত্রে কি সংবাদ লেখা আছে?"

অন্যমনস্কভাবে হস্তবিস্তার করিয়া সয়ারাম সেই পত্রখানি বামদেবের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "দেখ, পড়।"

বামদেব পত্র পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল :—

"আজ্ঞাকারী অবশ্যপত্র শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দেবশর্ম্মন্ নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে আমি মহাশয়কে একটা কুরুটনার খবর লিখিতেছি। আমার খুড়া মহাশয়ের মধ্যম পুত্র সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক প্রকম কুকার্য্য করিতেছিল, প্রায় একমাস বাড়ীতে

আসে নাই, আমাদের গাঁয়ের নেপাল পুরকুতের ছেলের সঙ্গে একদিন জামতাড়া ষ্টেসনের চাতালের উপর বেড়াইতেছিল। রেলগাড়ী আসিয়াছিল। মানুষেরা যখন হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছিল, হতভাগা সন্ন্যাসীচরণ সেই সময় একজন মানুষের পাকেট হইতে একখানা রুমাল-বাঁধা পয়সা কিম্বা টাকা তুলিয়া লয়। তাহার কপালক্রমে সেই রুমালখানা চাতালের নীচে রেলরাস্তার রেলের উপর পড়িয়া যায়। হতভাগা সেই সময় চাতালের উপর হইতে হেঁট হইয়া রুমালখানা কুড়াইয়া লইবার জন্ত হাত নামাইয়া দিয়াছিল, সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া রেলের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। তখন গাড়ী ছাড়িয়াছিল, গাড়ীর চাকায় সেই হতভাগা একেবারে চূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গিয়াছে। নেপাল পুরকুতের ছেলের মুখে আজ তিন দিন হইল, আমরা এই খবর পাইয়াছি, মহাশয়দিগকে এই শোকের খবর জানাইবার জন্ম আমি এই পত্রখানা লিখিলাম, ইতি সন ১৩০৯ সাল তারিখ ১১ই চৈত্র।"

পত্রখানা ভূতলে ফেলিয়া দিয়া বামদেব দুই হস্তে নয়ন আবরণ করিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সয়ারাম বলিলেন, "একরকম ভালই হইয়াছে। পত্রে কি আছে, তাহা না জানিয়াও তুমি ঐ পত্রখানা 'বিষবৃক্ষ' পুস্তকের ভিতর রাখিয়াছিলে, বিষফল বাহির হইয়াছে। পত্রখানা আমাকে দাও, ও পত্র আমি কাহাকেও দেখাইব না, মাকেও তুমি এ সংবাদ দিও না, কাহাকেও কিছু বলিও না। সংসারে আমাদের যে ঘটনা হইতেছে, তাহাতে যে কি ফল ফলিবে, কল্য তাহা আমরা জানিতে পারিব।"

পত্রখানা তুলিয়া বামদেব চক্ষু মুছিতে মুছিতে সয়ারামের হস্তে প্রদান করিল, সয়ারাম সেখানা আপন পকেটে রাখিয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন, কত কি ভাবিতে ভাবিতে বামদেব আর একখানি গৃহে গিয়া বসিল। পত্রপাঠ করিয়া বামদেব কাঁদিল কেন, বিষফল বাহির হইল, সয়ারাম এ কথাই বা বলিলেন কেন, এই স্থলে তাহা বুঝাইতে হইতেছে। পত্রখানা কোথাকার? কেই বা সেই সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়? সন্ন্যাসীচরণের অপমৃত্যুর সহিত এ সংসারের কি সম্পর্ক?—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, পত্রখানা রামপুরের, সন্ন্যাসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা, উমাকালীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল; উমাকালী বিধবা হইল।

রাজা বল্লালসেন তাঁহার রাজত্বসময়ে বঙ্গের ব্রাহ্মণ-কায়স্থের থাক্ বদ্ধ করিয়াছিলেন, গুণবান্ পুরুষগণকে তিনি কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন; অতঃপর সেই বিশুদ্ধ বল্লালী নিয়ম বঙ্গদেশে সুরক্ষিত হয় নাই। গুণবানেরা কুলীন হইবে, আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি প্রধান প্রধান নবগুণ কুলীনের ভূষণ হইবে, ইহাই ছিল বল্লাল সেনের ব্যবস্থা; কুলীনের পুত্র হইলেই কুলীন হইবে, কুলীনপুত্রেরা পুরুষানুক্রমে কুলীন হইবে, বল্লালী কৌলীন্যের সে অর্থ নহে; কিন্তু বঙ্গের দুর্ভাগ্যক্রমে কাল সহকারে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুলীনের পুত্র সর্ব্বগুণবর্জ্জিত, সর্ব্বদোষাকর হইলেও তাঁহারা আপনা আপনি কুলীনের সম্ভ্রম লইয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, গ্রামে গ্রামে বুক ফুলাইয়া বেড়াইত, কেহই প্রায় সরস্বতীদেবীর কোন ধার ধারিত না, বিবাহ করা তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, বিবাহের দ্বারা তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত, গুণবিশিষ্ট কুলীনের মুর্খ বংশধরেরা কুলধ্বজ হইয়া বহুনারীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক জীবনান্তে একদিনে বহু নারীকে বিধবা করিত; শিক্ষা-প্রভাবে আজকাল সে দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে, তথাপি স্থানে স্থানে যাহা কিছু কিছু আছে, তাহাতেও সামান্য অনর্থ সংঘটিত হইতেছে না। কুলীনের মূর্খপুত্রেরা দুরাচার হয়, তাহাদের অকর্ত্তব্য কোন দুষ্কার্য্যই প্রায় থাকে না; যাঁহারা বঙ্গীয় কুল-সংসারের সমাচার রাখেন, তাঁহারাই এই বাক্যের সাক্ষী। এক দৃষ্টান্ত উপরিভাগে বর্ণিত হইল। সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের মূর্খ জামাতা গাঁটকাটা হইয়াছিল, কুলীনের পুত্র বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না, বাষ্পীয় শকটচক্রও তাহাকে ক্ষমা করিল না,—শকটচক্রেই তাহার প্রাণান্ত হইল।

কৌলীন্যের বিচারের অবসর এখন নহে, বিধবা হইয়া উমাকালীর কি হইল, তাহাই জানিতে হইবে। রবিবারের রজনী প্রভাত হইয়া গেল, সোমবারের সূর্য্য পূর্ব্বাচলে দর্শন দিলেন। মিহিরকুমারকে সঙ্গে লইয়া দয়ারাম, নরহরি ও বাসুদেব সেই মিশনরী বিবির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শুক্রবার যে কয়েকটী সাহেব-বিবিকে দয়ারামবাবু একটী গৃহে সমবেত দেখিয়াছিলেন, সোমবারে আর সেগুলি একত্র ছিলেন না, মিস্ লভিং আর জর্জ্জ রবিন্‌সন্ একটী কক্ষে বসিয়া চারিটী নব শীকারের সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাক্যালাপ করিতেছিলেন, পুত্র ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সেই গৃহেই দয়ারাম উপস্থিত।

মিস্ লভিং বিশেষ শিষ্টাচারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বসিবার অগ্রে লভিংকে সম্বোধন করিয়া দয়ারাম বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া রবিন্‌সনের সহিত ক্ষণেকের জন্য যদি অন্য গৃহে সরিয়া যান, তাহা হইলে আমরা আপনাদের কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ করিয়া লইতে পারি।" মিস্ লভিং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। মিহিরকুমার পদ্মাবতীকে দেখিয়া মা মা বলিয়া তাঁহার কোলের কাছে ছুটিয়া গেল, পদ্মাবতী তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া, তাহার মুখপানে না চাহিয়াই অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনটী ভ্রাতা মহা বিস্ময়াপন্ন। অনন্তর দয়ারাম পদ্মাবতীকে, নরহরি ক্ষীরদাকে এবং বামদেব নরেশনন্দিনীকে তাঁহাদের মনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বধূরা সংসারত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তদনুরূপ উত্তর দিলেন। উমাকালীকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, তথাপি উমাকালী বলিল, "কেন আর তোমরা বৃথা কষ্ট পাও, আমরা আর ঘরে যাইব না। ঘরের নাম শুনিয়া আমার দক্ষিণচক্ষু নৃত্য করিতেছে, আমি যেন বুঝিতেছি, ঘরে গেলেই আমার অমঙ্গল ঘটিবে।"

ডাকের চিঠিখানি দয়ারামের পকেটেই ছিল, সাশ্রু-নয়নে উমাকালীর সিন্দুরশূন্য সীমন্ত দর্শন করিয়া মনে মনে তিনি বলিলেন, "অভাগিনী! তোমার ঘরের আশা ফুরাইয়া গিয়াছে! কেন তোমার দক্ষিণচক্ষু নাচিতেছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না। কেহ তোমার সীমন্তের সিন্দুরবিন্দু মুছিয়া দেয় নাই, নিয়তিবশে তোমার অজ্ঞাতেই সেই সিন্দুরবিন্দু বিলীন হইয়া গিয়াছে! তোমাকে গৃহে না লইয়া গেলেই এক প্রকার মঙ্গল হয়। তোমারও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল।"

মনে মনে দয়ারামের এই কথা। উমাকালীর বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া, পদ্মাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া, স্তম্ভিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "পদ্মা! সত্যই কি নূতন প্রকার জল-সংস্কারে তোমাদের একান্ত অভিলাষ? গঙ্গাস্নানে তোমাদের কি জল-সংস্কার সিদ্ধ হয় নাই?"

মৃদু হাস্য করিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, "তোমরা যাহাকে গঙ্গা বল, তাহার নাম গঙ্গা নহে। বিবির মুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, সেই নদীর নাম হুগলী। বিবি বলেন, হুগলীর জল পবিত্র হয় না। পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র নদ জর্দ্দান্, সেই জর্দ্দনের জল মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা বিশুদ্ধ

দীক্ষিত হইব। সেদিন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি কাহারও উকীল হইয়াছি কি না। আজ তোমরা তিন ভাই এখানে উপস্থিত আছ, আজ আমি ওকালতী করিব। আমার, ক্ষীরদার, নন্দিনীর, আমাদের তিন জনেরই এক কথা। তোমরা যদি আমাদের চাও, তোমরাও প্রভুমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ছেলেটীকেও দীক্ষা দিবার জন্য আমার ক্রোড়ে অর্পণ কর। ইচ্ছা যদি না হয়, ঘরে ফিরিয়া যাও। আমাদের ঘর নাই, প্রভুর প্রতি যাহারা বিশ্বাস করে, ঘর-সংসারে তাহাদের প্রয়োজন থাকে না। তোমরা যদি ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রভুপদে শরণ লইতে চাও, সেই নামে বিশ্বাস কর, পরিত্রাণ পাইবে,—পরিত্রাণ পাইবে। বিবি বলেন, মানব-জাতির প্রতি স্বর্গীয় পিতার এত কৃপা, এত ভালবাসা যে, মানব-জাতির পরিত্রাণের নিমিত্ত তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম ঔরস পুত্রকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই একমাত্র প্রিয়তম ঔরস পুত্র আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশু। তোমরা যদি আমাদের চাও, পরকালে যদি মুক্তিবাঞ্ছা কর, তবে সেই স্বর্গস্থ প্রভু যশুর নামে অন্তরের বিশ্বাসস্থাপন কর।"

পদ্মাবতীর বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে তিনটী ভ্রাতার তিনটী শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয় পদ্মা-প্রসঙ্গে সেই ক্ষেত্রে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক চলিল। তর্কমুখে পদ্মাবতী জিতিলেন, সয়ারাম হারিলেন; তাঁহার ছুটী ভ্রাতাও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনটী বধূর প্রতি তিনটী ভ্রাতার যথার্থ ভালবাসা ছিল, সংসারধর্ম্মের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সেই ভালবাসা হারাইতে হয়, এই চিন্তা করিয়া মনে মনে তাঁহারা পদ্মাবতীর উপদেশেই অনুমোদন করিলেন; সম্মতি প্রকাশ করিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব রহিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সয়ারাম গদগদস্বরে পদ্মাবতীকে কহিলেন, "আজ সোমবার, তোমাদের দীক্ষা-গ্রহণের দিন পড়িতেছে আগামী রবিবার, সেই রবিবারের পূর্ব্বদিন আমাদের মনের কথা তোমরা জানিতে পারিবে।"

মিহিরকে লইয়া ভ্রাতৃগণ গৃহগমনের উপক্রম করিতেছিলেন, সহসা বামদেবের একটী কথা স্মরণ হইল, পদ্মাবতীর দিকে চাহিয়া বামদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমাকালীর কি হইবে?"—পদ্মাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই বামদেব সতৃষ্ণ-নয়নে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মুখের দিকে চাহিলেন।

বামদেবের দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়াও পূর্ব্ব-প্রশ্নের উত্তরে পদ্মাবতী কহিলেন, "উমাকালী কুলীনের বধূ, উমাকালীর স্বামী মূর্খ, মূর্খেরা সর্ব্বত্র সচ্চরিত্র থাকিতে পারে না,—উমাকালীর স্বামী দুশ্চরিত্র,—দুশ্চরিত্র মূর্খ স্বামীকে পরিত্যাগ করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। সত্যকথা গোপন রাখিতে নাই, গোপন রাখিব না, আমার মুখে সেই সত্যকথাটী তোমরা শুনিয়া রাখ। মিস্ ডার্লিং নাম লইয়া যে বালকটী নারীবেশে আমাদের বাড়ীতে যাইত, যাহার নাম জর্জ্জ রবিন্‌সন্, উমাকালী সেই রবিন্‌সনের প্রতি অনুরাগিণী।"

তিনটী ভ্রাতা সমভাবে চমকিত। নিয়তি সর্ব্বত্র বলবতী। ক্ষণকাল চমকিতভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া; দয়ারাম আপন পকেট হইতে বাহির করিয়া নফরচন্দ্রের লিখিত সেই পত্রখানি পদ্মাবতীর হস্তে দিলেন। পদ্মাবতী পাঠ করিয়া ক্ষীরদাকে, ক্ষীরদা নরেশনন্দিনীকে সেইখানি দেখাইলেন। পত্র যখন নরেশনন্দিনীর হস্তে, উমাকালী সেই সময় সেই দিকে একটু ঝুঁকিয়া অক্ষরগুলি পাঠ করিল;—কি তখন তাহার মনে হইল, ঠিক বুঝিতে পারা গেল না, কিন্তু উমাকালী জোরে জোরে তিন বার করতালি দিল।

দয়ারাম আর সেখানে বিলম্ব করিলেন না, যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিলেন, পুত্রটীর হস্তধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন; বধূরা কোথায়, উমাকালী কোথায়, জননীকে সে কথা কিছুই কহিলেন না। চারি দিন গত হইল, প্রতিশ্রুত শনিবার আসিল। তিন ভ্রাতার মন্ত্রণা স্থির হইল। কপ্নীকাবাস্তে সন্ন্যাসীরা যেমন সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল, পত্নীকাবাস্তে ঐ তিনটী সহোদরও সেইরূপে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসীর গল্পটী এইখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল।

নদীতীরে এক বৃক্ষতলে দুইজন সন্ন্যাসী থাকিত; প্রতিদিন নদীর জলে কৌপীন ধৌত করিয়া সেই বৃক্ষশাখায় শুকাইতে দিত; প্রতি রজনীতেই সেই কৌপীনগুলি ইঁদুরে কাটিত। নিত্য নিত্য ঐরূপ; নিত্য নিত্য নূতন কৌপীন প্রয়োজন হইত। ঐ উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া একজন সন্ন্যাসী তথা হইতে পলায়ন করিল, একজন রহিল। গ্রামের যে সকল স্ত্রী-পুরুষ সেই নদীতে স্নান করিতে আসিত, নিত্য নিত্য তাহারা দুইজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যাইত;

কেহ কেহ তাহাদের ভক্তও হইয়াছিল। প্রধান ভক্ত একটী বাবু;—তাঁহার নাম রামসুন্দর। যে দিন তিনি দেখিলেন, দুইজনের স্থলে একজনমাত্র সন্ন্যাসী, নিকটবর্ত্তী হইয়া সেইদিন তিনি সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আর একজন কোথায় গেলেন?"—সন্ন্যাসী সেই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিলেন। রামসুন্দর বলিলেন, "আপনাকেও ত তবে প্রস্থান করিতে হইবে, এইরূপ বুঝিতেছি; কিন্তু আপনি যাইবেন না; সাধুর প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তি, আপনাকে আমি রাখিব। আপনি এক কাজ করুন,—একটা বেরাল পুষিয়া রাখুন, ইঁদুর-বংশ নির্ব্বংশ হইবে। আমি আপনাকে একটী বেরাল দিব, দিনের বেলা আপনি সেটীকে বাঁধিয়া রাখিবেন, রাত্রিকালে গাছের উপর ছাড়িয়া দিবেন।"

সন্ন্যাসী বিড়াল পুষিল। বিড়াল প্রতি রজনীতে ইন্দুর ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল, বিড়ালের মেও মেও রব শুনিয়া কতক ইন্দুর পলাইল, কৌপীন কাটা বন্ধ হইল। এক উৎপাত বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে আর এক উৎপাত। বিড়ালের জন্য প্রতিদিন তাঁহাকে পাড়ায় পাড়ায় দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে যাইতে হইত। রামসুন্দর প্রতিদিন আসিয়া সংবাদ লন। সন্ন্যাসী একদিন তাঁহাকে বলিল, "ইন্দুর কমিয়াছে বটে, কিন্তু বিড়ালের দুগ্ধের জন্য আমার অনেকটা সময় নষ্ট হয়, আসল কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে।"—রামসুন্দর বলিলেন, "উপায় আছে। আপনি একটী গাভী রাখুন। আমি আপনাকে একটা দুগ্ধবতী গাভী দিব, বৎস দিব, দুগ্ধের জন্য আর আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

তাহাই হইল, রামসুন্দর একটী সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী দিলেন, প্রচুর দুগ্ধ হইতে লাগিল, বিড়ালও খায়, সন্ন্যাসীও খায়, বিলক্ষণ সুবিধা। একপক্ষে সুবিধা হইল বটে, অন্যপক্ষে নূতন অসুবিধা। গাভীর জন্য ঘাস কাটিতে হয়, বিচালী সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাতেও সন্ন্যাসীর অনেক সময় যায়। বিশেষতঃ গাভীটী থাকে কোথায়? রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে, শীত আছে, খোলা জায়গায় বড় কষ্ট, তাহাতেও পাপ আছে। সন্ন্যাসী সেই কথা রামসুন্দরকে জানাইল। রামসুন্দর সেই গাভীর জন্য একখানা চালা করিয়া দিলেন, একজন রাখাল রাখিলেন, বিচালী কিনিবার জন্য কিছু কিছু পয়সা দিতে লাগিলেন, যে অভাব ছিল, সে অভাব দূর হইল। গাভীর

চালাখানি একটু বড় করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এক ধারে গাভী থাকিত, এক ধারে রাখাল থাকিত, রাত্রিকালে একধারে সন্ন্যাসী শয়ন করিত।

বিড়াল হইল, গাভী হইল, রাখাল হইল, ঘর হইল, তথাপি সন্ন্যাসী তুষ্ট হইল না। রামসুন্দর আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, সন্ন্যাসী নিজের মুখের কথা চলেন, রামসুন্দর সন্তুষ্ট হন। এইরূপে দিন যায়। সন্ন্যাসী আর একদিন রামসুন্দরকে বলিল, "বাপু হে! সকলই তুমি দিয়াছ, কিন্তু গাভীর খোরাকীর জন্য নিত্য নিত্য তুমি নগদ পয়সা দাও, সেটা গ্রহণ করা আমার উচিত হয় না। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার জন্য তোমার ঐরূপ দণ্ড হয় কেন? যাহাতে না হয়, তাহার কি কোন উপায় হইতে পারে না?" রামসুন্দর বলিলেন, "অবশ্য হইতে পারে। আমি আপনাকে পাঁচ বিঘা চাষের জমী দিব, তাহাতে ধান্য হইবে, খড় হইবে, ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত হইবে, ধান্য-চাউল বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থাগমও হইবে, কোন অভাব থাকিবে না। গো-সেবাও চলিবে, আত্ম-সেবাও চলিবে।"

পাঁচ বিঘা জমীতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, রামসুন্দরের আদেশে গ্রামের দুঃখিনী স্ত্রীলোকেরা চাউল প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল, সন্ন্যাসী ভাত খাইতে আরম্ভ করিল; রাখালও আর ঘরে ভাত খাইতে যায় না, সন্ন্যাসীর প্রসাদ পায়। দুই জনের জন্য কত চাউল আবশ্যক? অনেক চাউল উৎপন্ন হয়, রাখাল তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া সন্ন্যাসীকে মূল্য আনিয়া দেয়, ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর হস্তে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল; গো-সেবার উদ্বৃত্ত বিচালী বিক্রয় করিয়াও কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। গাভীটী প্রচুর দুগ্ধ দান করে, সন্ন্যাসী যত পারে খায়, রাখাল খায়, বিড়ালে খায়, বেশী যাহা থাকে, রাখাল তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে; দুগ্ধের মূল্যও সন্ন্যাসীর তহবিলে জমা হয়। সন্ন্যাসী দেখিল, ধান্য-চাষে বিলক্ষণ লাভ, হাতেও টাকা জমিয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে আরও পাঁচ বিঘা জমী কিনিল। দশ বিঘা জমীতে অধিক ধান্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীর আয়ও বাড়িল। তদবধি বৎসর বৎসর চাষের জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে লাভও অধিক হয়। সাত বৎসরে সন্ন্যাসীর অনেক জমী হইল, গাভী-বৎসের সংখ্যা বাড়িল, অনেক টাকা জমিল, তখন আর চালা ঘরে বাস করিতে মন সরিল না; গ্রামের মধ্যে একখানা একতালা কোটা-বাড়ী বানাইল; বিড়াল, গাভী, বৎস, রাখাল সমস্তই সেই বাড়ীতে লইয়া যাওয়া

হইল, ক্রমশঃই সন্ন্যাসীর সম্পদ্‌বৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি। তখন আর কৌপীন রহিল না, জটা রহিল না ভস্ম রহিল না, জপ, তপ, যাগ, যজ্ঞ কিছুই রহিল না, রহিল কেবল সন্ন্যাসাশ্রমের অঙ্গ অঙ্গ গাঁজা। সন্ন্যাসী তখন উত্তম উত্তম বসন পরিধান করিতে লাগিল, উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিতে লাগিল, বিলক্ষণ মোটা-সোটা হইল, বাড়ীতে দাস-দাসী, পাচিকা নিযুক্ত করিল, ক্রমে ক্রমে বাড়ীখানিও দোতালা হইল, সদরদরজায় একজন দরোয়ান বসিল।

বৃক্ষতলে যখন আশ্রম ছিল, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া ঐ সন্ন্যাসীর সেবা করিত; অধিক রাত্রে—বিশেষতঃ ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দুর্যোগ হইলে সেই স্ত্রীলোক তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া রাখিত। সন্ন্যাসীর সম্পদের সময় সেই স্ত্রীলোক ঐ নূতন বাড়ীতে আসিয়া রাত্রি-কালে সেবা করিতে ভুলিত না। সেই স্ত্রীলোকের নাম ত্রিপুরা। ত্রিপুরাকে দাসী-চাকরেরা দেখিয়া মনে করিত, প্রভুর সেবাদাসী।

রামসুন্দরবাবু ভক্তিমান্ ছিলেন, সেটা কেবল তিনি মুখেই বলিতেন, তাঁহার অন্তরের ভাব ছিল অন্যপ্রকার। সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্যই বিড়াল পোষা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ী করা পর্য্যন্ত তিনি ঐ সব খেলা খেলিয়া-ছিলেন। সন্ন্যাসীর সম্পদের সময় মধ্যে মধ্যে আসিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন। রামসুন্দরবাবুর চেষ্টায় সন্ন্যাসীর বিবাহ হইল। সন্ন্যাসীর রূপ-লাবণ্য সন্ন্যাসী নিজেই দর্শন করিয়া—দর্পণে মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া আনন্দে ও অহঙ্কারে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। জপ; তপ সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে আত্মকলেবর নিরীক্ষণ করিয়া কেবল জপ করা হইত "কপিকাবাস্তে! কপিকাবাস্তে!"

সন্ন্যাসীর নাম হইল রূপচাঁদ গোস্বামী। দাসী-চাকরেরা তাহাকে বাবু বলিত। গ্রামের লোকেরা কেহ বলিত রূপচাঁদবাবু, কেহ বলিত গোঁসাইবাবু, কেহ কেহ বলিত সন্ন্যাসীবাবু। দরোয়ান বলিত, মহারাজ।

রূপচাঁদের বিবাহের দুই বৎসর পরে একদিন বেলা এক প্রহরের সময় তাহার সদরদরজার সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী আসিল, ভিক্ষার্থী হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল, দরোয়ান নিষেধ করিল। দরোয়ানের সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথা-কাটা-কাটি চলিতেছিল, এমন সময় রামসুন্দরবাবু সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন। তিনি তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন, সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেইখানে চমকিয়া দাঁড়াইলেন, অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর শ্মশ্রুশোভিত বদন নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ!"

সন্ন্যাসীকে লইয়া রামসুন্দরবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দ্বারপাল তখন আর নিষেধ করিতে পারিল না। উপরের যে ঘরে রূপচাঁদ বসিয়া আরাম করে, সেই ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামসুন্দরবাবু উৎফুল্লকণ্ঠে রূপচাঁদকে কহিলেন, "দেখুন দেখি, এই সাধুটীকে আপনি চিনিতে পারেন কি না?"

রামসুন্দরবাবুর গায়ে তৈলমাখা, ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিছানায় উঠিলেন না, সন্ন্যাসীর অঙ্গে ভস্ম-মাখা, চরণে ধূলা-মাখা, সন্ন্যাসীও বিছানায় উঠিতে সাহস করিল না। রূপচাঁদের ঘরে ঢালা বিছানা, জাজিমের উপর কার্পেট পাতা, সারি সারি অনেকগুলি উপাধান; দুটী উপাধান অবলম্বনে রূপচাঁদ উপবিষ্ট। তৃতীয় উপাধানে একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থ। গৃহমধ্যে বিছানার উপর রূপচাঁদ, চৌকাঠের বাহিরে শ্যামসুন্দরবাবুর পার্শ্বে নবাগত সন্ন্যাসী। রূপচাঁদের চক্ষের সহিত সন্ন্যাসীর চক্ষের মিলন হইল। অল্পক্ষণ মিলনেই সন্ন্যাসী যেন রূপচাঁদকে চিনিতে পারিল; নাম জানিতে পারিল না, হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভায়া হে! তোমার এ অবস্থা কত দিন?"

আকার-দর্শনে যতটা না হউক, কণ্ঠস্বর-শ্রবণে আর 'ভায়া' সম্বোধনে রূপচাঁদ সেই সন্ন্যাসীকে চিনিয়া লইল, উত্তর করিল, "যত দিন তোমাকে দেখি নাই, প্রায় তত দিন।"

সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে?"

রূপচাঁদ বলিল, "কপ্নিকাবাস্তে।"

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিল। কৌপানের কথা তখন তাহার মনে পড়িল। পাঠকমহাশয়েরও হয় ত মনে পড়িতে পারিবে, ইঁদুর কৌপীন কাটিত, সেই উৎপাতে যুগল সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন সন্ন্যাসী স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসরের কথা; দ্বাদশ বৎসর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়াছে। কপ্নিকাবাস্তে এক জনের দেশত্যাগ, কপ্নিকাবাস্তে দ্বিতীয় জনের সম্পদপ্রাপ্তি, ইহা বড় আশ্চর্য্য।

রূপচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিল, হস্তধারণ পূর্ব্বক গালিচার উপর লইয়া বসাইল। রামসুন্দরবাবু বহুদিনের পর যুগলমিলন দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া স্নান করিতে গেলেন; তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য-রেখা দেখা দিল। কি তাঁহার মনে উঠিল, হাস্য-দর্শনে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।

"কপ্লিকাবাস্তে"—রূপচাঁদের মুখে এই কথার ব্যাখ্যা হইতেছিল, পার্শ্বে হঠাৎ ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। সন্ন্যাসী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?" ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় উপাধানে যে একটী বস্ত্রাবৃত পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, আবরণ-মোচন করিয়া রূপচাঁদ সেই পদার্থটীকে আপন ক্রোড়ের নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর প্রশ্নে উত্তর দিল, "কপ্লিকাবাস্তে এই পদার্থ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এটী আমার পুত্র। ছয় মাসের শিশু।"

সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব-বিস্ময় অধিক গাঢ়তর হইয়া উঠিল, সবিস্ময়ে রূপচাঁদ গোস্বামীকে কহিল, "ভায়া হে! কপ্লিকাবাস্তে তুমি সম্পদ পাইয়াছ, কপ্লিকাবাস্তে তুমি বিবাহ করিয়াছ, কপ্লিকাবাস্তে তুমি পুত্র পাইয়াছ; কপ্লিকাবাস্তে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া বৃথা আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়াছি। এখন তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হইতেছে।"

একবার ছেলের দিকে, একবার সন্ন্যাসীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া রূপচাঁদ বলিল, "ভালই হইয়াছে, হিংসা আসিলে সন্ন্যাসধর্ম্ম থাকে না। আমার মনে হিংসা আইসে নাই, ক্রমে ক্রমে ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা আসিয়াছিল, তাহাতেই আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম হারাইয়া ফেলিয়াছি। তোমার মনে হিংসা আসিয়াছে, তুমিও সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখিতে পারিবে না।"

কপ্লিকাবাস্তে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এই তর্কের পূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে সঙ্ক্ষেপে রূপচাঁদ সে সকল কথা ঐ সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। গোড়ার কথা মনে করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তোমার মনে হিংসা আইসে নাই, এমন কথা তুমি বলিতে পার না। তোমার অবস্থা দর্শনে আমার হিংসা হইতেছে, এ হিংসা এক প্রকার, তোমার হিংসা ছিল অন্য প্রকার। ইন্দুর মারিবার জন্য তুমি বিড়াল পুষিয়াছিলে, তোমার মনে জীব-হিংসার প্রবৃত্তি আসিয়াছিল। ভাব দেখি ভাই, কাহার হিংসায় বেশী দোষ?"

মাথা হেঁট করিয়া রূপচাঁদ তখন ছেলেটীকে শান্ত করিতে লাগিল, পূর্ব্ব-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া, একজন দাসীকে ডাকাইয়া সন্ন্যাসীর আহারের আয়োজন করিয়া দিতে বলিল।

সেই দিন অপরাহ্নে রামসুন্দরবাবু পুনর্ব্বার আসিয়া উভয়ের সকল কথা শুনিলেন। স্নান করিতে যাইবার সময় তাঁহার মুখে যে হাসি আসিয়াছিল, তাহার ফল ফলিল। পরদিন প্রভাতে ক্ষৌরকার ডাকিয়া, গোঁপ-দাড়ী ও জটা মুড়াইয়া সেই সন্ন্যাসীকে স্নান করাইয়া নববস্ত্রাদি পরিধান করান হইল; তাহার নাম হইল খড়্গারাম গোস্বামী। রূপচাঁদ ও খড়্গারাম একসঙ্গে এক বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল। কি জাতি, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানা ছিল না, রূপচাঁদের পূর্ব্ব-সেবাদাসী ত্রিপুরাসুন্দরী ঘটকালী করিয়া রূপচাঁদের বিবাহ দিয়াছিল, সেই ত্রিপুরাসুন্দরীই আবার একজন বৈষ্ণবীর কন্যার সহিত খড়্গারামের বিবাহ দিয়া দিল। বৎসরান্তে খড়্গারামেরও একটী পুত্র জন্মিল, সন্ন্যাস ভুলিয়া খড়্গারাম দিব্য সুখস্বচ্ছন্দে রূপচাঁদের বাড়ীতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কলিকাবাস্তে দুইজন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া ঐরূপে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল, পল্লীকাবাস্তে সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় আপন ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈশব ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। যেমন মন্ত্রণা স্থির, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ। মিহিরকুমারকে লইয়া তাঁহারা তিন সহোদরে সেই শনিবার রাত্রেই বিবির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন, রবিবার প্রাতে উপযুক্ত গির্জ্জামন্দিরে তাঁহারা আটজনেই যিশুমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন। উমাকালী বিধবা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে তাহার কোন বাধা ছিল না, স্বয়ম্বরা হইয়া সে তখন তাহার পূর্ব্ব-অনুরাগপাত্র জর্জ্জ রবিন্‌সনকে বিবাহ করিল। নরেশনন্দিনীর উপর বালক রবিন্‌সনের লোভ পড়িয়াছিল, কিন্তু নরেশ-নন্দিনীর স্বামী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে প্রকাশ্যরূপে তাহার সেই লোভবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পাইল না।

অন্তঃপুরে নারীশিক্ষায় সর্ব্বত্রই এইরূপ ফল, এমন কথা বলা হইতেছে না; তবে কি না, যেস্থলে স্বধর্ম্মের বিপরীত উপদেশ, স্বধর্ম্মের নিন্দা এবং আনুষঙ্গিক প্রলোভন থাকে, সে স্থলে ক্রমে ক্রমে বিষময় ফল উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র কথা নহে। আমাদের রমণীগণের যেরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক, যেরূপ শিক্ষা প্রার্থনীয়, বর্ত্তমান

শিক্ষা-প্রণালীতে তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। স্রোতের বেগ দিন দিন যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে বাধা না পাইলে গতিরোধ করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। পদ্মা ও দামোদরের বন্যার স্রোত যেরূপ সময়ে সময়ে বহু গ্রাম বহু জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়, ঐরূপ শিক্ষা-স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইলে অনেক স্থলে আর্য্যসংসারে আর্য্যকুলাচার সেইরূপে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে সেইরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মহাজনেরা বলেন, নারী, পক্ষী এবং শিশু, এই তিন একরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন; তাহাদিগকে প্রথমাবধি যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে, সেইরূপেই তাহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। আমাদের অবরোধ-প্রণালী আমাদের রমণীগণের পক্ষে যথার্থই উপযুক্ত; অবরোধে ধর্ম্ম-বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বাহিরের কোন বিষয়ে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পায় না, বিশ্বাসও টলে না। নারীশিক্ষা প্রয়োজন হইলেও ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ এবং গৃহকার্য্য-শিক্ষাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। বিবির নিকটে শিক্ষা-প্রাপ্ত কয়জন হিন্দুরমণী অটল বিশ্বাসে স্বধর্ম্মপালন করিতেছে, কয়জন হিন্দুরমণী সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, গণনা করিয়া কেহই তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন না। ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের রমণীগণ প্রায়ই গৃহকার্য্যে অবহেলা করিতে, ভোগবিলাসে আসক্ত হইতে, স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস করিতে এবং গুরুজনের অবমাননা করিতে শিখিতেছে। ইহা কদাচ মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে পারে না। কর্ণাটবাসিনী ধর্ম্মশীলা সুশিক্ষিতা মাতাজী ঠাকুরাণী এই রাজধানীমধ্যে মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়া যে রীতিতে হিন্দুবালিকাগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই রীতিই আমাদের পক্ষে উপকারিণী। যদিও কেহ কেহ বালিকাগণের সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার বিরোধী হইতেছেন, কিন্তু মূলাংশে জাতীয় ধর্ম্মজ্ঞান ও গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য শিক্ষা দিবার নিয়মগুলি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

হিন্দু-অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক শিক্ষাদান করেন, তাঁহারা ভিন্নধর্ম্মের সেবিকা। যদিও তাঁহারা হিন্দুকামিনীগণকে আপনাদের ধর্ম্মে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রকাশ্যরূপে কোন কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশপ্রণালী এবং মনোগত ইচ্ছা অন্যপ্রকার। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, হিন্দুসংসারের সুশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক, যাঁহারা বুঝিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের গৌরব খর্ব্ব করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহা-

য়াই ইংরাজী প্রণালীতে হিন্দুস্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী। একদিন সমগ্র পৃথিবী খৃষ্টধর্ম্মের উপাসক হইবে, কতকগুলি খৃষ্টান অখণ্ড বিশ্বাসে সেই বাসনাকে হৃদয়মধ্যে পোষণ করেন। সমগ্র পৃথিবীর কথা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এই ভারত-ক্ষেত্রের নাম ধর্ম্মক্ষেত্র; হিন্দুকামিনীরা এই ক্ষেত্রের গৌরবরক্ষা করিতেছেন, হিন্দুকামিনী-গণকে ভিন্নধর্ম্মে লইয়া যাওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না, পূর্ণ বিশ্বাসে অবশ্যই এ কথা বলা যাইতে পারে। পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকেরা তরলমতি; পুনঃ পুনঃ বিরুদ্ধবাদ শ্রবণ করিলে উন্মার্গগামিনী হইবার সাধ তাহাদের মনে উদিত হইতে পারে। যাহাতে না পারে, তাহার উপায় করা পুরুষগণের কর্ত্তব্য। দিনকাল যেরূপ পড়িয়া আসিসেছে, তাহাতে দেখা যায়, পুরুষেরাই বিবিয়ানা শিক্ষায় প্রশ্রয় দিতেছেন। পরিণাম-চিন্তা তাঁহা-দের মনে উদিত হইতেছে না। তরল শোণিতের উত্তাপে মস্তিষ্ক বিকারপ্রাপ্ত হয়। শীতল-বুদ্ধির পরামর্শ না লইয়া যাঁহারা আপনাদের পদে কুঠারাঘাত করিতে ব্যগ্র, আঘাতের যন্ত্রণায় পরিণামে তাঁহাদিগকে পরিতপ্ত হইয়া অনুতাপ করিতে হইবে; একখানি প্রহসনের নাম স্মরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহারা দর্শন করিবেন, তাজ্জব ব্যাপার! তাজ্জব ব্যাপার!

হিন্দুদায়ভাগের বিধানে স্বধর্ম্মত্যাগী পুত্রেরা পৈতৃক বিভবের উত্তরাধি-কারী হইতে পারে না; দায়ভাগ পরিবর্ত্তন না করিয়াও বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দুসন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইবে, সে ব্যবস্থানুরূপ নজীরও হইয়াছে। সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় "পত্নীকাবাস্তে" যুগল সহোদরের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির অংশ-গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। ঐরূপ নজীর যখন ছিল না, পৈতৃকসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ধনবানের সন্তানেরা তখন অন্য কোন প্রকার প্রলোভনে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে সম্মত হইতে পারিতেন না। চাকরী পাইবার, অন্ন পাইবার কিম্বা বিবি পাইবার লোভে যে সকল গরীবের ছেলে খৃষ্টান হইত, লেখা-পড়া জানা না থাকিলে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। পাদরী সাহেবেরা বলিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্মে ঐহিক সুখ নাই; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত, অশিক্ষিত গরীবের ছেলেরা ঐহিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একপ্রকার অনাহারে ঊর্দ্ধদৃষ্টে

মুক্তিপথ চাহিয়া থাকিত। এখনকার নূতন নিয়মে সে ভয়টা দূর হইয়া গিয়াছে। সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় জমীদারের পুত্র; তাঁহারা পাঁচ সহোদর, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা পাঁচজনেই পূর্ণ বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনজন ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিলেন। পিতৃসম্পত্তির ত্রিপঞ্চমাংশ তাঁহাদের প্রাপ্য, সহজে সে তিন অংশ তাঁহারা বাহির করিয়া লইতে পারিলেন না, মকদ্দমা করিতে হইল। মকদ্দমা অবশ্যই ডিক্রী হইল; জমীদারীর তিন অংশ, ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ এবং নগদ টাকার তিন অংশ তাঁহারা প্রাপ্ত হইবার অধিকার পাইলেন। কিরূপে ভাগ করা হয়? এজমালী সম্পত্তি বিভাগ করিয়া তিন অংশ বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব না হইলেও এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। বাঁটোয়ারা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেও সে অবস্থায় এক বাড়ীতে পাঁচ জনের বাস করা সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য; দুই জন হিন্দু, তিন জন খৃষ্টান; কিছুতেই সামঞ্জস্য হইয়া উঠিল না; খরিদ্দার স্থির করিয়া সয়ারাম তাঁহাদের ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; জমীদারীর তিন অংশও কাজে কাজে বিক্রয় করিতে হইল। মূল্যের টাকাগুলি তাঁহারা তিন জনে বিভাগ করিয়া লইলেন। পিতার সঞ্চিত অর্থ অতি সহজেই সমাংশে বিভাগ করিয়া লওয়া হইল।

সুধারাম চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী তখন জীবিতা ছিলেন, ভদ্রাসনবাটীর তিন অংশ অপরের হস্তে গেল, দুটী পুত্রের অংশ অবশিষ্ট থাকিল, সে বাটীতে বাস করা তিনি অকর্ত্তব্য ভাবিলেন। যে ব্যক্তি তিন অংশ ক্রয় করিয়াছিল, নিধিরাম ও মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বারা বাকী দুই অংশও তিনি তাহার নিকট বিক্রয় করাইলেন। জমীদারীর অংশ বিক্রয় করিতে হইল না, নম্বর খারিজ করাইয়া স্বতন্ত্র তৌজী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। পুত্র মরিলে জননীর শোক হয়, পুত্রেরা খৃষ্টান হইয়া গেল, শিশু পৌত্রটীও খৃষ্টান হইল, সুধারামের পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী সেজন্য শোকপ্রকাশ করিলেন না; অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

ভদ্রাসন গেল, সে গ্রামে বাস করা বড়ই কষ্টকর, অতএব গৃহিণী দুটী পুত্রকে লইয়া অপর এক গ্রামে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময়ে নিধিরামের, তাহার পর মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ হইল; পূর্ব্বের ন্যায় জনের সুখ না থাকিলেও তাঁহারা সংসারী হইয়া ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃ-

গণের মায়া ভুলিলেন, তাঁহাদের বিবাহের পূর্ব্বে খৃষ্টানের ভ্রাতা বলিয়া একটা গোল উঠিয় ছিল, খৃষ্টান হইবার পর ভ্রাতৃগণ আর ভদ্রাসনে ফিরিয়া আইসেন নাই, তাঁহাদের সহিত কোন সংস্রব ছিল না, বিশেষ প্রমাণে তাহা প্রকাশ পাওয়াতে, অতি অল্পেই সে গোলমালটা মিটিয়া গিয়াছিল।

পুরুষের স্বেচ্ছাচারে একটী সংসার ঐরূপে ভাঙ্গিয়া গেল, আর কখনও যায় নাই, আর কখনও যাইবে না কিম্বা আর কখনও যাইতে পারিবে না, এমন বিবেচনা করিয়া লওয়া অবশ্যই ভুল। দিন দিন যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, বিভ্রান্ত যুবকগণের যেরূপ স্বেচ্ছাচার বাড়িতেছে, পরিবারে পরিবারে যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস কমিতেছে, তাহাতে অশান্তি বাড়িবে, ইহা নিশ্চয়। যাঁহারা আপনাদিগকে উন্নতিশীল বলিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় ঐরূপ আত্মবিচ্ছেদ মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের হিন্দু-সমাজ যে ভাবে গঠিত, যে ভাবে পরিচালিত, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা মহা অমঙ্গলের নিদান বলিয়া গণনা করিতে হয়।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সমষ্টিকেই পরিবার বলা যায়। যদিও অভিধানে পাওয়া যায়, বিবাহিতা পত্নীর একটী অর্থ পরিবার, কিন্তু আজকাল ঐ শেষোক্ত অর্থই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পরিবার বলিলে এখন যেন কেবল স্ত্রীকেই বুঝায়। পরিবার লইয়া অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, অমুক ব্যক্তি সপরিবারে শৈলবিহারে গমন করিয়াছেন, এ কথা বলিলে কেবল স্ত্রীর সহিত বাস ও বিহার ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। অনেকেই এখন এক একটী স্ত্রী লইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে ভালবাসিতেছেন; পুত্রকন্যা জন্মিলে নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে হয়, পরিবার-ভক্ত পুরুষেরা তাহা করিয়াও থাকেন, কিন্তু পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাস করে, কন্যারা বিবাহিতা হইলে স্বামী-গৃহে চলিয়া যায়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। এগুলিও ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী অনুকরণের ফল। কেবল স্ত্রী ও স্বামী এক বাড়ীতে থাকিয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিলে স্বামীর উপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চলে, স্বামীকে স্ত্রীর আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হয়। স্ত্রীর গৌরব তখন এত অধিক হইয়া উঠে যে বাড়ীতে আর কেহ না থাকিলেও স্ত্রীর নাম বাড়ী; পরিবারের বদলে ইহাও কেহ কেহ বলিতে

আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ প্রকারের একটী বাবুর পরিবারের একদিন মাথা ধরিয়াছিল, বাড়ীতে কেবল তিনি আর তাঁহার পরিবার থাকিতেন, আর কেহই না। একটা ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া, সেই বাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এমন বিমর্ষ কেন?" বাবু উত্তর দিলেন, "বাড়ীর অসুখের জন্য আমার মনে একটুও সুখ নাই।"

"বাড়ীর অসুখ।"—এ কথার অর্থ সকলে কি বুঝিবেন? বুঝিতে হইবে, যিনি ঐরূপ উত্তর দিলেন, তাঁহার পরিবারের মাথা-ধরা। পরিবারের মাথাধরার নাম "বাড়ীর অসুখ!" এখনকার সমাজে অনেকেরই পরিবার সর্ব্বস্ব। পরিবারকে "বাড়ী" বলিয়াও সকলে সন্তুষ্ট হইতে চান না, তাঁহারা ভাবেন, জগতের যথা-সর্ব্বস্বই তাঁহাদের পরিবার।

পরিবার লইয়া পৃথক্ থাকাই পরম সুখ। পরিবারভক্তগণের সেই সুখসাধনের উপদ্রবেই বঙ্গের নারী-সংসার ভঙ্গ হইতেছে। দৃষ্টান্ত এখনও অধিক হয় নাই বলিয়া সকলে সেটী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ঔদাস্য-সাগরে ডুবিয়া থাকিলে পূর্ণতা-দর্শন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

সয়ারাম চট্টোপাধ্যায় মাতৃসংসার পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, পরিবার লইয়া পৃথক্ হইলেন। তিন ভ্রাতা একসঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনজনে একত্র রহিলেন না; পরিবার লইয়া নরহরিও পৃথক্, পরিবার লইয়া বামদেবও পৃথক্। হিন্দু-সংসারে উচ্চজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজে কিছু উপার্জ্জন করেন না, হিন্দুসংসার পরিত্যাগ করিলে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপার্জ্জনের সুবিধা হয়। জমীদারী ও ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়া, পিতৃসঞ্চিত নগদ টাকা বিভাগ করিয়া লইয়া, তিন ভ্রাতার হস্তে অনেকগুলি টাকা হইয়াছিল; আলস্যের দাস হইয়া ক্রমাগত বসিয়া খাইলে অনেক টাকাও অল্পদিনে ফুরায়; নবধর্ম্ম-বিশ্বাসে, নব নব অনুরাগে, নব নব উৎসাহে ঐ তিন ভ্রাতর লব্ধ অর্থ অল্পদিনে ফুরাইয়া আসিল; সেই অবস্থায় তাঁহারা চাকরী অন্বেষণে সাহেবের দ্বারে দ্বারে উমেদারী করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনজনেরই কিছু কিছু ইংরাজীভাষা জানা ছিল, মিশনরীগণের সুপারিসে তাঁহারা তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন আফিসে তিনটী কেরাণী-গিরী চাকরী পাইলেন। ব্যবহারে তাঁহারা সাহেব; সাহেবী পোষাকে, সাহেবী-খানায়, সাহেবী বিলাসে অনেক টাকা খরচ; কেরাণীগিরীর মজুরীতে তত টাকা

উৎপন্ন হয় না, কাজে কাজে মাসে মাসে অকুলান পড়িতে লাগিল। যতগুলি সাহেব অধুনা পরিবার লইয়া আমাদের দেশে আসিতেছেন, স্বদেশে তাঁহারা কি ভাবে কি অবস্থায় ছিলেন, যাঁহারা বিলাত দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন না। ভারতবর্ষ রত্নগর্ভা, ভারতবর্ষকে দরিদ্র বলিয়া সেই প্রকারের অনেক সাহেব ভারতবর্ষের টাকায় ভারতে ঘোরতর বিলাসী হইয়া উঠিতেছেন, দরিদ্র ভারতবাসীকে, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীকে বহুব্যয়সাধ্য উচ্চ ভোগবিলাস শিক্ষা দিতেছেন; সেই শিক্ষার প্রসাদে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে হাহাকার বাড়িতেছে। সয়ারামেরা তিন সহোদরে সপরিবার খৃষ্টান হইয়া সাহেবের চাল-চলন বজায় রাখিবার জন্য অন্তরে অন্তরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্যবহারে তাঁহারা সাহেব; তাঁহাদের পরিবারেরা তখন আর বঙ্গসংসারের বৌমা নহেন, ব্যবহারে তাঁহারাও অবশ্য বিবি;—বিবিরা উপার্জ্জন করিতে পারেন;—ঐ তিনটী বৌবিবি অবশ্যই উপার্জ্জন করিতে বাধ্য। কি প্রকারে উপার্জ্জন হয়?—কার্পেট বুনিয়া অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামা সেলাই করিয়া অধিক উপার্জ্জন হওয়া অসম্ভব;—উপায় কি?—বিবি পদ্মাবতী একটী বালিকা-বিদ্যালয়ে এবং বিবি নরেশনন্দিনী একটী হিন্দুপরিবারে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন, ক্ষীরোদকুমারীর পক্ষে সেরূপ সৌভাগ্যের সংযোগ ঘটিয়া উঠিল না। তিনি তবে কি করেন?—সহরে আজকাল বারাঙ্গনা-সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে;—তাহাদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট নাই; সদররাস্তার পার্শ্বে, গৃহস্থভবনের পার্শ্বে, এমন কি, হরিসভা ও ব্রহ্মসভার পার্শ্বেও বারাঙ্গনাবাস, বারাঙ্গনারা আজকাল নায়ক-রঞ্জনের নিমিত্ত লেখা-পড়া শিখিতে, গীতবাদ্য শিখিতে অধিক যত্নবতী; বিবি ক্ষীরোদকুমারী সেই প্রকারের একটী বারাঙ্গনা প্রাপ্ত হইলেন;—সেই বারাঙ্গনাকে মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, দাশরথি রায়ের পাঁচালী এবং নিধুবাবুর টপ্পা শিক্ষা দেওয়া তাঁহার কার্য্য হইল;—কেবল পাঠশিক্ষা দেওয়াই পর্য্যাপ্ত নহে, যন্ত্রাদি-যোগে সঙ্গীত-শিক্ষা দেওয়াও ক্ষীরোদকুমারীর কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইল। সেই বারাঙ্গনার নাম ভানুমতী; মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের একজন হিন্দুগৃহস্থের আবাস-নিকেতনের গাত্রেই ভানুমতী বিলাসগৃহ। ভানুমতীর সহিত ক্ষীরোদকুমারীর সখীসম্বন্ধ হইল।

নারীগণ স্বাধীন হইলে তাহাদের আর কোন কার্য্যেই বাধা থাকে না। তাহারা পুরুষের অধীনতা-স্বীকার করে না, পুরুষের উপর তাহারা প্রভুত্ব করে।

নরেশনন্দিনী মেয়ে পড়াইয়া যখন অবসর প্রাপ্ত হন, তখন কতিপয় বন্ধুর সহিত প্রেমালাপ করেন, পদ্মাবতী ও ক্ষীরোদকুমারী তাহা করেন না, এমনও বুঝিতে হইবে না; করেন সকলেই, কিন্তু নরেশনন্দিনী অধিক রূপবতী, সেই কারণে তাঁহার গৃহেই অধিক বন্ধুর আমদানী। কুলকামিনীরা কুলের বাহির হইলে বাহিরে তাহাদের অনেক প্রকার বন্ধু জুটিয়া থাকে। যাহারা স্বামী লইয়া বাহির হয় কিম্বা স্বামীরা যাহাদিগকে বাহির করে, স্বামীগণের ঔদার্য্য-প্রসাদে তাহারাও অনেক বন্ধু পায়। পদ্মাবতী, ক্ষীরোদকুমারী ও নরেশনন্দিনী কুলের বাহির হইয়া, স্বধর্ম্মত্যাগিনী হইয়া, অনেকগুলি বন্ধু পাইয়াছিলেন। সে সকল বন্ধু কখন্ কি করিত, স্বামীরা তাহা জানিতে পারিতেন না।

সাহেবের সংসারে একটা আদব আছে, ইংরাজীতে যাহাকে এটিকেট্ বলে, বাঙ্গলাতে যাহাকে বাঁধাবাঁধি রীতি বলা যায়, সেই আদবটী বড় অদ্ভুত। সাহেব যখন বাহিরে যান, বিবি যখন একাকিনী ঘরে থাকেন, সেই সময় বিবির ঘরে কোন বন্ধু আসিলে সাহেব ফিরিয়া আসিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কতকগুলি হিন্দুসন্তান সস্ত্রীক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঐ আদবটী পালন করিতে শিক্ষা করেন। নরেশনন্দিনীর স্বামী বামদেব;—বামদেব কেরাণীগিরী চাক্‌রী করেন, বাসায় ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, ছাত্রী পড়াইয়া নরেশ-নন্দিনী অনেক বেলা থাকিতে ঘরে আইসেন;—সেই সময় সমাগত বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার মিলন হয়। একদিন সন্ধ্যার পর বামদেব আফিস হইতে আসিয়া আয়ার মুখে শুনিলেন, ঘরে একজন সাহেব আছে। সাহেবী আদব-পালনে বাধ্য হইয়া বামদেব তখন আর ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; শীতকাল, ভাড়া-করা বাড়ীতে ঘরও বেশী ছিল না, কাজে কাজেই উঠানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা পরে নরেশনন্দিনীর গৃহ হইতে একজন সাহেব বাহির হইয়া আসিল;—প্রাঙ্গণেই বামদেবের সহিত সেই সাহেবের সাক্ষাৎ হইল; সহাস্য-বদনে মাথা নাড়িয়া বামদেবের পাণিমর্দ্দন পূর্ব্বক সাহেবটী বাহির হইয়া গেল, বামদেব গৃহপ্রবেশ করিলেন।

সাহেবটী কে?—জর্জ্জ রবিন্‌সন্। পূর্ব্বে বলা আছে, পাঠশিক্ষার সময় নরেশ-নন্দিনীর প্রতি রবিন্‌সনের এবং রবিন্‌সনের প্রতি নরেশনন্দিনীর প্রণয়ানুরাগ জন্মিয়াছিল; গৃহ হইতে বাহির হইয়াও নরেশনন্দিনী সে অনুরাগ ভুলিতে

পারেন নাই, রবিন্‌সন্‌ও পারে নাই। বামদের গৃহে না থাকিলে প্রায় প্রতিদিন নাগর-নাগরীর ঐরূপ সাক্ষাৎ আলাপ হইত।

সাহেব-সংসারে বাল্যবিবাহ চলে না। রবিন্‌সনের বয়ঃক্রম ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষ, সেই বয়সে রবিন্‌সন্ পূর্ব্বানুরাগপাত্রী তরুণী উমাকালীকে বিবাহ করিয়াছিল, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অবস্থা স্মরণ করিয়া পাঠকমহাশয় হয় তো বলিতে পারিবেন, রবিন্‌সনের দোষ নাই, রবিন্‌সন্ স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদের সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে নাই; রবিন্‌সন্ স্বেচ্ছাক্রমে বাল্যবিবাহের বদ্ধ হয় নাই, যুবতী উমাকালীই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। রবিন্‌সনের অনুকূলে এইরূপ সাফাই সত্য সত্য বলবৎ হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

নরেশনন্দিনী উমাকালীর ভ্রাতৃজায়া;—স্বধর্ম্মে থাকিলে এক বাড়ীতে একত্র বাস করা সম্ভব হইত, নূতনধর্ম্ম-গ্রহণে উমাকালী এখন নরেশনন্দিনীর পর হইয়া গিয়াছে। রবিন্‌সন্ যে বাড়ীতে থাকে, উমাকালী এখন সেই বাড়ীতেই বাস করে। সে বাড়ীখানা নরেশনন্দিনীর বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর। রবিন্‌সনে আর নরেশনন্দিনীতে কিরূপ লীলা-খেলা হয়, উমাকালী তাহা জানিতে পারে না। নরেশনন্দিনীর সহিত নূতন স্বামীর গুপ্তপ্রেম, উমাকালী যদি ইহা জানিতে পারিত, সাক্ষী-সাবুদ রাখিয়া উমাকালী তাহা হইলে ডাইভোর্স আইনের আশ্রয় লইতে পেছু-পা হইত না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে রবিন্‌সনের বদলে অন্য কোন ডিয়ারসন্ কিম্বা পিয়ারসন্ স্বচ্ছন্দে উমাকালীর উচ্ছিষ্ট প্রণয়কমলে নূতন মধুকর হইয়া বসিত।

সর্ব্বদা সেরূপ হইতে পায় না। সাহেবের সমাজ যে প্রকার উপাদানে গঠিত, তাহাতে সে সমাজের বন্ধন যেমন শক্ত, তেমনি শিথিল। নারীবন্ধু পুরুষবন্ধু সমান কথা;—নারীতে নারীতে নির্জ্জনে দেখা-সাক্ষাতে যেমন কোন দোষ ঘটে না, নারী-পুরুষে গুপ্তসাক্ষাৎ-আলাপেও সেইরূপ দোষ নাই, ইহাই ঐ সমাজের পদ্ধতি। সাহেবের সমাজে যে ভাব চলে, সাহেবের ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারাও সেই ভাব চালায়,—চালাইতে বাধা, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। নরেশনন্দিনীর গৃহে স্বামীর অসাক্ষাতে বন্ধুলোকের প্রবেশ, ইহা কোন প্রকার দোষের হেতু হইতে পারে না। উমাকালীর গৃহেও ঐরূপ হইতে পারে,

প্রম্নাবতীর গৃহেও হইতে পারে, ক্ষীরোদকুমারীর গৃহেও হইতে পারে; আরও যাহারা যাহারা ঐ ভাবে ঐ পথে আইসে, তাহাদের গৃহেও হইতে পারে। আদর্শানুরূপ প্রতিলিপি হয়, তাহার অন্যথা হইতে পারে না; যেখানে অন্যথা হয়, প্রতিলিপি সেখানে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

বঙ্গের নারী-সংসার—হিন্দুর নারী-সংসার অনেক প্রকারেই ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। সংসার হইতে পৃথক্ থাকিবার ইচ্ছা, স্বাধীনতালাভ করিবার ইচ্ছা, পতির উপর কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা, গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, নিত্য নূতন নূতন ভোগবিলাসের ইচ্ছা, নারীগণের এই সকল ইচ্ছাতেই হিন্দু-পরিবারের সুশৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতেছে। স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ভিন্নধর্ম্ম-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া পুরুষেরা স্ব স্ব রমণীগণকে সেই পথে লইয়া গিয়া স্বতন্ত্র থাকিতেছেন, ইহাতেও হিন্দুর নারী-সংসার বিলক্ষণ আঘাত পাইতেছে। বৈদেশিক ব্যবহারের অনুকরণ-প্রবৃত্তি আর একটী প্রধান কারণ। সাহেবলোকেরা সর্ব্বপ্রকারে বিবিলোকের বাধ্য। কি করিলে কি হয়, তাহা বিবেচনা করিবার অগ্রে স্ত্রীলোকের কথায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেক স্থলে অনর্থ ঘটে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও গল্পে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে; নববঙ্গযুবকেরা সে সকল না দেখিয়াই—না বুঝিয়াই—ফলাফল চিন্তা না করিয়াই, কেবল সাহেবের অনুকরণে স্ত্রীবাধ্য হইতে অনুরাগী হইতেছেন, লোকে স্ত্রৈণ বলে, সে কথায় বধির হইতেছেন, দিন দিন এই রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীর কথা একবারেই শুনিতে হইবে না কিম্বা সকল কথাই শুনিতে হইবে, আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রের কোন স্থানেই এরূপ উপদেশ নাই; শাস্ত্রের প্রতি অনাদর হওয়াতেই নানা প্রকার অনর্থকর ব্যাপারের সূত্রপাত হইতেছে।

স্ত্রীলোকর স্বাধীনপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজের উপযোগিনী হইতে পারে না অথচ এখনকার স্ত্রীলোকেরা তাহাই ভালবাসে। সে ভালবাসা দুই পক্ষেই সমান। পুরুষেরা মনে করেন, নারীগণকে স্বাধীন করিতে পারিলে বাহাদুরী-লাভ হইবে, আমোদেরও জমাট বাঁধিবে। নারীগণ স্বাধীনতা ভালবাসেন কেন, তাহার অনেকগুলি কারণ। সংসারের অনেকগুলি বন্ধন ঘুচিয়া যায়। লজ্জা রাখিতে হয় না, ঘোমটা রাখিতে হয় না, কাহারও অধীন হইয়া থাকিতে হয় না, খোলা বাতাসে বিহার করা হয়, বন্ধুগণের সহিত উদ্যান-

বিহারে, তরণীবিহারে, নির্জ্জনবিহারে আনন্দলাভ করা যায়. কোন দিকে কোন বাধাই থাকে না। উভয় পক্ষের মনোগত ভাবের সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিয়া লইলে এই ফল পাওয়া যায় যে, শীঘ্র শীঘ্র হিন্দুসমাজের অধঃপতন।

খৃষ্টাশ্রয় গ্রহণ করিলে হিন্দু নারী হিন্দু-সংসার পরিত্যাগ করে, আর কোন কারণে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, এ কথাও ঠিক নহে। বর্ত্তমান যুগের অপর এক আখ্যা উপধর্ম্মের যুগ। হিন্দু-নারী যে কোন উপধর্ম্মের দাসী হয়, সেই উপ-ধর্ম্মই তাহাদিগকে মাতৃসমাজ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়; তখন আর তাহারা পিত্রালয়ের সহিত—শ্বশুরালয়ের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে পারে না। সমাজ তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু তাহারা তাহাতে আনন্দ পায়। আনন্দলাভের নিগূঢ় কারণ ধর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে, বিশ্বাস নহে, প্রধান কারণ স্বাধীনতালাভ। হিন্দু-নারীকে লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে দলাদলি হইয়াছে; সেই দলাদলির ফলে এ পর্য্যন্ত কতকগুলি হিন্দু-নারী স্বাধীন হইয়া পিত্রালয় হইতে, শ্বশুরালয় হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা তালিকা রাখিতে জানেন, তালিকা রাখা যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারাই তদ্বিষয়ের সাক্ষী হইবেন।

সংসারে যাঁহাদের মাতা-পিতা বর্ত্তমান নাই, তাদৃশ পুরুষেরা উপধর্ম্মের সেবক হইলে নিজে নিজেই সংসারের কর্ত্তা হন, তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় না; তাঁহাদের রমণীরাও ঘরে বসিয়া স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতে পায়। ইহা এক প্রকার মন্দের ভাল, ফল কিন্তু এক। স্বামী উপধর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্ত্রী যদি তাহার অনুগামিনী হইতে না চায়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য স্বতঃ পরত নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়। স্ত্রীর যদি লেখাপড়া জানা থাকে, পুনঃ পুনঃ ডাকযোগে পত্র লিখিয়া স্বামী তাহাকে অনেক প্রকার উপদেশ দেয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। হুগলী জেলার এক ব্রাহ্মণ-কন্যা যৌবনের অঙ্কুরে পিত্রালয়ে বাস করিত, বাঁকুড়া জেলায় তাহার শ্বশুরালয়; তাহার স্বামী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, যত দিন সেই কথা তাহার শ্বশুর-পরিবারের কর্ণগোচর হয় নাই, তত দিন সেই স্বামী মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে গোপন-ভাবে শ্বশুরালয়ে যাইয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিত; শ্বশুরালয়ে আহারাদি করিত না, তাহার স্পৃষ্ট অথবা উচ্ছিষ্ট পাছে কেহ খায়, কিঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞানপ্রভাবে সে জন্য সাবধান থাকিত। দুই তিন মাসের মধ্যে পাঁচ সাতবার সেই ব্যক্তি

ঐরূপে শ্বশুরালয়ে গিয়া বালিকা স্ত্রীকে ফুসলাইয়া, আপন মতে লওয়াইয়া সঙ্গে আসিতে রাজী করে। একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রীকে জামা-জোড়া পরাইয়া, মাথায় পাগ্ড়ী বাঁধিয়া দিয়া, পুরুষ সাজাইয়া, মাঠের পথ দিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। পুরুষেরাই নারীসংসার নষ্ট করিবার মূল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ধর্ম্মান্তরগ্রহণ উপলক্ষে ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আর একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে যে সকল হিন্দু-সন্তান আজকাল কালাপানি পার হইয়া বিলাত-যাত্রা করেন, দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সাহসী পুরুষ এককালে বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া সহরের ইংরাজটোলা আশ্রয় করিয়া থাকেন; মাতাপিতা ভুলিয়া যান, মাতৃভাষা ভুলিয়া যান, হিন্দু-সংস্রবে ঘৃণা করেন, হিন্দু খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদন তিক্তবোধ হয়, সর্ব্বপ্রকারেই সমাজ হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া যান। বিলাতে গিয়া সকলে কিছু ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন না, তথাপি দেশে আসিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও অধিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হন। যাঁহাদের স্ত্রী থাকে, তাঁহারা সেই স্ত্রীগণকে বিবি সাজাইয়া নিকটে লইয়া রাখেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যায়। দাসীর উপাধি হয় আয়া, চাকরের উপাধি হয় খানসামা, পাচকের উপাধি হয় বাবুর্চ্চী। তাহারাও যে হিন্দু-জাতি হইতে গৃহীত হয়, ইহাও তাঁহারা ইচ্ছা করেন না। হিন্দুর প্রতি তাঁহাদের কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা জন্মিয়া থাকে। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দেন, "সমাজ আমাদিগকে গ্রহণ করে না, কাজেই আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে হয়।" তাঁহাদের রমণীগণও লজ্জাসম্ভ্রমাদি বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। বিসর্জ্জন দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস, সহজে অল্পদিনে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে। একটী ঘটনা আমাদের মনে হইতেছে। কালীঘাটের একটী বাবু একবার হাইকোর্টের একটী মকদ্দমায় জড়িত হন, তাঁহার একজন বারিষ্টার প্রয়োজন হয়; সাহেব বারিষ্টার অপেক্ষা বাঙ্গালী বারিষ্টারে খরচ অল্প হইবে, এই বিশ্বাসে সেই বাবুটী একজন বাঙ্গালী বারিষ্টারের নূতন নিকেতনে উপস্থিত হন। বেলা আটটা। বাড়ীখানি চৌরঙ্গীতে ছিল, এ কথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। বাবু যখন উপস্থিত হইলেন, বারিষ্টার তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

একমহল, বারিষ্টারের বাড়ীতে সদর অন্দর থাকে না, একজন খানসামা সেই বাবুটীকে দরদালানে বসিতে বলিল। দরদালানে একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল, বাবু সেই বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া বারিষ্টারের গাত্রোত্থান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দক্ষিণদিকে একটা দরজা; সে দরজায় কপাট ছিল না, চৌকাঠের মাথার উপর একটা ক্যাম্বিসের পর্দ্দা গুটান ছিল, ঐ দরজার দক্ষিণাংশে বারিষ্টারের শয়নকক্ষের বারান্দা; সেই বারান্দার রেলের ধারে ছোট একখানা চৌকী পাতা, পার্শ্বে একটা জলের টব। কক্ষমধ্য হইতে একটী বিবি বাহির হইলেন। বিলাতী বিবি নহে, বাঙ্গালী বিবি,—বারিষ্টারের পূর্ব্ব-বিবাহিতা হিন্দু পত্নী। বিবিটী বারান্দায় সেই চৌকীর উপর বসিয়া মুখে চক্ষে জল দিতেছিলেন, হঠাৎ উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব-কথিত সেই বাবুটী দরদালানে বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট। বিবির লজ্জা আসিল;—নূতন পুরুষ দেখিলে পূর্ব্বে ঘোমটা দেওয়া অভ্যাস ছিল, হস্তভঙ্গী করিয়া ঘোমটা টানিবার চেষ্টা করিলেন;—নাইট-গাউন পরা, ঘোমটা উঠিল না। বিবি তখন কি করেন, মাথা হেঁট করিয়া, দুই হস্তে মুখ-চক্ষু ঢাকিয়া, খুব মিহি-স্বরে ডাকিলেন, "আয়া—আয়া—আয়া!"

একজন আয়া ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি দরজায় সেই পর্দ্দাটা ফেলিয়া দিল, বিবির লজ্জারক্ষা হইল। যায় যায়, যায় না। অনেক দিনের অভ্যাস ঘোমটা দেওয়া; সে অভ্যাস যায় যায় যায় না। ঐ প্রকারের বিবিরা মনে করেন, লজ্জায় জল গুলি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু লজ্জা তাঁহাদিগকে শীঘ্র ছাড়িয়া যায় না,—জোর করিয়া ছাড়াইতে হয়।

বঙ্গের নারী-সংসার কি প্রকারে বিপর্য্যস্ত হইতেছে, বঙ্গের বন্ধুগণ তাহা যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না। সংসার হইতে বাহির করিয়া রমণীর লজ্জা-রক্ষকেরা যতই রমণীগণকে নির্লজ্জ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ততই তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি বাড়িতেছে। লজ্জা স্ত্রীজাতির অলঙ্কার; সকল দেশে সকল সমাজে ঘোমটার গৌরব নাই বটে, কিন্তু রমণীর স্বভাবসুলভ যে একটী লজ্জা, বিনা ঘোমটাতেও তাহার শক্তি প্রকাশ পায়। বিদ্যা শিখিয়া, বিলাত হইতে আসিয়া, বিদ্বান্ পুরুষেরা স্ত্রীজাতির লজ্জা নষ্ট করিতেছেন, ইহাতে যে তাঁহাদের কি গৌরববৃদ্ধি হইতেছে, নারীগণকে লজ্জাশীলা রাখিলে তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের যে কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহারা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

তাঁহাদের কেবল এক কথা,—"সমাজ আমাদিগকে গ্রহণ করে না, সমাজে আমরা থাকিতে পারি না, বিবাহিতা পত্নীকেও ত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং পত্নীকে নিকটে আনিয়া স্বাধীনতা দিতে হয়।"

মিথ্যা আপত্তি। সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন না, তাঁহারা সমাজকে চাহেন, ইহা কি তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন? সমুদ্রযাত্রায় জাতি যায়, সমুদ্রপারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গেলে জাতি যায়, এ সংস্কার দিন দিন ঘুচিয়া যাইতেছে; স্বধর্ম্মে অটল থাকিয়া সদাচারে দৃঢ়তা রাখিলে সমাজ কেনই বা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? যাঁহারা বিলাত হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত?—কথনই না। স্বদেশে আসিয়া যাঁহারা স্বধর্ম্মপালন করিতেছেন, সদাচারে রত থাকিতেছেন, সমাজমধ্যে তাঁহারা সগৌরবে আদৃত হইতেছেন, তাদৃশ দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নহে। ইহা জানিয়াও, স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াও যাঁহারা সমাজের সহিত মিশিতে চাহেন না, সমাজ হইতে দূরে থাকেন, তাঁহাদের প্রকৃতি কিরূপ, বিজ্ঞলোকে তাহা বুঝিতে অক্ষম।

ঐ দলের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া আক্ষেপ উপস্থিত হয়। সাহেব সাজিয়া সাহেব হইতেই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ। সাহেবেরা এ দেশে যেরূপ ব্যবহার করেন, যে ভাবে চলেন, যে ভাবে কথা কন, যে ভাবে এ দেশের লোককে অবজ্ঞা করেন, বাঙ্গালী হইয়াও ঐ দলের নকল সাহেবেরা ঠিক সেইরূপ, বরং কোন কোন অংশে অধিক রৌদ্রভাব প্রদর্শন করেন। শরীর অসুস্থ হইলে তাঁহারা "হোমে" যান, "হোম" তাঁহাদিগের বিলাত। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন বিলাতে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃতই হোম বানাইয়াছেন। এ দেশের ফিরিঙ্গীরা পুঁইখাড়া চিংড়ী খাইয়া যেমন গর্ব্ব করিয়া বলে, "মোদের বেলাত," ঐ দলের বাঙ্গালী পাছে সেইরূপে "মোদের বেলাত" বলিয়া বাঁকা কথায় লোকের কাছে পরিচয় দেন, এক একবার আমাদের সেই ভয় হয়। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া কাহারও কাহারও ইচ্ছা; কেন না, স্ত্রী বিলাতে সন্তান প্রসব করিলে, সেই সন্তান ব্রিটিস্ বরণ (Britiss born) অর্থাৎ ব্রিটন-জাত আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ব্রিটন্-জাত, ভারত জাত লোকের সহিত তাহাদের কতদূর প্রভেদ, এ দেশে তাহাদের কতদূর উচ্চ অধিকার, সর্ব্বসাধারণে তাহা

অনুভব করিতেছে। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন, "ব্রিটন্-জাত পুরুষেরা কলিযুগের দেবতা।" ব্যবহার মিলাইয়া লইলে যথার্থই তাহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস বেদবিভাগকর্ত্তা বলিয়া দেব-গৌরব লাভ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণদ্বীপে তাঁহার জন্ম, এই কারণে তাঁহার একটী নাম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন;—ব্রিটনকে শ্বেতদ্বীপ বলিতে যাঁহারা সন্দেহ রাখেন না, তাঁহারা ব্রিটন-জাত পুরুষগণকে "শ্বেতদ্বৈপায়ন" আখ্যা প্রদান করিতে পারেন। শ্বেতদ্বৈপায়নেরা এ দেশে দেবতুল্য পূজা প্রাপ্ত হন, মনে মনে তাঁহাদের এইরূপ বাসনা। কৃষ্ণবর্ণ বঙ্গবাসীর পুত্র শ্বেতদ্বীপে প্রস্তুত হইলে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের সমানাধিকার লাভ করিবে, এরূপ আশা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা বঙ্গবাসিগণকে ঘৃণা করিবেন, ইহা বড় বিচিত্র কথা নহে। তাঁহারা যাহাই করুন, তাঁহারা যাহাই ভাবুন, তাঁহারা যাহাই হউন, তাহাতে বঙ্গের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই; তাঁহারা যে বঙ্গের নারী-সংসারকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, সেই কথাই বড় শক্ত কথা।

যে সকল গৃহলক্ষ্মী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে-ছেন, তাঁহারা আর আমাদের নহেন, এই মনে করিয়া কতকটা নির্ব্বেদ সহ্য করা যায়, কিন্তু যাঁহারা গৃহে থাকিয়া সনাতন গৃহধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুসংসারের কোন মঙ্গলের আশা নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় আচার-ব্যবহার যে সকল পুস্তকে লেখা থাকে, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গকামিনীর এক প্রকার শিক্ষালাভ হয়; নারীগণ স্বাধীন হইলে কত সুখ, সেই বিষয় যে সকল পুস্তকে লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া বঙ্গকামিনীর এক প্রকার লোভ জন্মে; স্বাধীনা অঙ্গনাগণের সৌভাগ্যের কথা যে সকল উপন্যাসপুস্তকে লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষিতা বঙ্গকামিনীরা চমৎকার কুহকে আকৃষ্ট হয়। এই তো গেল পুস্তকপাঠের ফল; তাহা ছাড়া নূতন নূতন প্রলোভনের আরও সামগ্রী আছে। বড়মানুষের বাড়ীর পার্শ্বে গরীবের বাস, বড়মানুষের বধূরা মহামূল্য অলঙ্কার-বস্ত্র পরিধান করিয়া যে প্রকার বিলাসে লালিতা হয়, গরীবের বধূরা অহরহ তাহা দর্শন করে, সেইরূপ ভোগবিলাসে তাহাদের ইচ্ছা জন্মে, স্বামীগণের সামর্থ্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার অবসর লয় না। যাহার স্বামীর মাসিক আয় দ্বাদশ মুদ্রামাত্র, সে স্বচ্ছন্দে অম্লান-বদনে স্বামীকে অনুরোধ করে, "পাচিকা নিযুক্ত করিয়া দাও, রন্ধনের ধূমে মাথা

ধরে, উত্তাপে সহ্য হয় না, অমুকের স্ত্রীর যেমন কণ্ঠহার আছে, আমাকে সেই রকম একছড়া হার গড়াইয়া দাও, তরুবালার যেমন সবুজ সাটিনের পোষাক আছে, আমাকে সেই রকম একটা পোষাক কিনিয়া দাও," ইত্যাকার নানাপ্রকার বাহনায় স্বামীকে নিত্য নিত্য জ্বালাতন করিয়া তুলে। একটী পূর্ণগর্ভা দরিদ্ররমণী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল, "পাশের বাড়ীতে বিবি ধাত্রী আসিয়া ছল, আমার প্রসবের সময় সেইরূপ ধাত্রী না আসিলে আমি প্রসব করিব না।" এই গেল ঐশ্বর্য্যদর্শনের ফল। তৃতীয় প্রলোভন আরও কিছু বেশী ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কলিকাতায় দিন দিন বেশ্যা-নিবাসের অসম্ভব আধিক্য; সেই সকল নিবাসের নির্দ্দিষ্ট পল্লী নাই; যেখানে যাহাদের ইচ্ছা, বেশ্যারা সেইখানেই বাসস্থান মনোনীত করে। গৃহস্থালয়ের গাত্রে গাত্রে বেশ্যার বাস;—গৃহস্থকন্যারা নিত্য নিত্য সেই সকল কুলটার বিচিত্র বসনভূষণ, বিচিত্র কেশবিন্যাস, বিচিত্র হাবভাব লীলা-বিলাস দর্শন করিয়া চঞ্চলা হইয়া থাকে, ভিতরের যন্ত্রণা বিবেচনা করিতে পারে না; যাহাদের বুদ্ধি অল্প, বিলাসেচ্ছা প্রবলা, তাহারা সেইরূপ সুখবিলাসে মনে মনে অভি-লাষিণী হয়; কাহারও কাহারও কপাল ভাঙ্গিয়া যায়, পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া মরে, ঐ প্রকারের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনারা কেহ কেহ ঐরূপ বিষম দৃষ্টান্ত দর্শনে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পিশাচী গণিকাদলের পুষ্টিসাধন করে; পলায়নের ইচ্ছায় বাধা পাইলে কেহ কেহ উদ্বন্ধনে অথবা বিষপানে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনা যাইত, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় বঙ্গের কুলবধূরা বহুযন্ত্রণা সহ্য করিত, কেহ কেহ সেই যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে কুলের বাহির হইয়া যাইত, কেহ কেহ জীবনবিসর্জ্জন দিয়া সংসার-যন্ত্রণা এড়াইত, এখন অনেক স্থলে তাহার বিপরীত ঘটিতেছে।

এখনকার বধূরা প্রায়ই শাশুড়ী-ননদকে গ্রাহ্য করেন না, বধূর গঞ্জনায়—বধুর তাড়নায় শাশুড়ী-ননদেরা সর্ব্বদাই অস্থির;—মর্ম্মান্তিক যাতনায় প্রতিদিন তাহা-দিগকে অশ্রুপাত করিতে হয়। বধূগণের প্রতিকূলাচরণে পুত্রগণও জননার প্রতি ভক্তিশূন্য হইতেছে। বধূরা বাবু হইয়া বসিয়া থাকে, বৃদ্ধা শাশুড়ীরা দাসীর ন্যায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। হিন্দু সংসারে একটী ব্যবহার আছে, বর যখন বিবাহযাত্রা করে, জননী তখন জিজ্ঞাসা করেন, "বাছা! কোথায় যাও?" বর উত্তর দেয়, "মা! তোমার দাসী আনিতে যাই।" আজিও সেই ব্যবহারানুসারে

চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঐ কথা বলিতে হয় কিন্তু, বরের মনে মনে থাকে, "তুমি যাহার দাসী হইবে, তাহাকে আনিতে যাই।"

কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবিক তাহাই দাঁড়াইতেছে। এবংবিধ অনেকগুলি কারণে বঙ্গের হিন্দু-সংসার অশান্তিময় হইতেছে। বাবু হইবার সাধটা মেয়ে-মহলেও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মাসীবাবু, পিসীবাবু, দিদিবাবু, বৌবাবু এইপ্রকার খ্যাতি-লাভ করিয়া নূতন ধরণের স্ত্রীলোকেরা নূতন প্রকারে আমোদিনী হইতেছেন। স্বাধীনা বঙ্গাঙ্গনার আধিপত্য যেথানে, সেথানে শাশুড়ী-ননদের স্থান হয় না, স্বামীও মান পান না, স্বামীকে যেন নারীর গোলাম হইয়া থাকিতে হয়। একটী বাবুর স্ত্রী ছিলেন স্বাধীনা, তাঁহাদের বাটীর হিন্দুস্থানী বেহারা একদিন বৌমার আদেশে বাবুকে ডাকিতে গিয়া বলিয়াছিল, "বহুমহারাজ বোলাওতে হেঁ।"—কতকগুলি বাড়ীতে বহু-মহারাজের আবির্ভাব হইয়াছে, এ রঙ্গ নূতন হইলেও নিতান্ত নূতন নহে; দিনে দিনে বহু-মহারাজের সঙ্খ্যাবৃদ্ধি হইবে, তাহারও লক্ষণ দেখা দিতেছে।

স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারপ্রিয় হয়, বঙ্গদেশের সকলেই ইহা জানেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাহারা বিলাতী ধরণে বিবি সাজিয়া আছে, তাহারা অধিক অলঙ্কার ভালবাসে না;—লকেট, হার, ইয়ারিং, বালা, এই পর্য্যন্ত হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়; তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু যাহারা সংসারবাসিনী, অথচ যাহাদের পতির প্রতি কমলার কৃপা আছে, তাহারা অলঙ্কারের ভারে চলৎশক্তি-বিহীনা হইলেও আরও অধিক অলঙ্কার প্রাপ্ত হইবার আবদার ধরিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার ছিল না;—সাধারণ গৃহস্থের বাটীর সধবারা শঙ্খ ব্যবহার করিয়াই সংসার উজ্জ্বল করিতেন, কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাটীর পরিবারের গাত্রে দুই একখানি রজতালঙ্কার উঠিত; আজকাল স্বর্ণালঙ্কারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে যে, বৎসরে দুই তিনবার অলঙ্কারের নাম বদল হয়, নূতন নূতন গঠনের বিবিধ অলঙ্কারের সৃষ্টি হইতেছে, এত নূতন সৃষ্টি যে, প্রাচীনা গৃহিণীরা সে সকল অলঙ্কারের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন। সুবর্ণালঙ্কারের আদরও অনেক বিলাসিনা কামিনীর নিকটে কমিয়া আসিতেছে;—হীরা-মতি, মণি-রত্ন না হইলে তাঁহারা আর তুষ্ট থাকিতে পারেন না,—নারীসমাজে তাঁহাদের গৌরবও থাকে না। কিছুদিন পূর্ব্বে জনকত বক্তা একটা সুর ধরিয়াছিলেন,

"অলঙ্কারে স্ত্রীলোকের অহঙ্কার বৃদ্ধি করে, অতএব অলঙ্কার পরাইবার প্রথাটা উঠাইয়া দেওয়া ভাল।" কলিকাতার বক্তৃতার স্রোত ধারাবাহিকরূপে দশবৎসর সমভাবে চলে না, শীঘ্র শীঘ্র ভাঁটা পড়ে;—অলঙ্কার উঠাইয়া দিবার বক্তৃতা এখন আর শ্রুতিগোচর হয় না, সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের মহিমা-বৃদ্ধি হইতেছে। ছুটী দলে সে মহিমা কিছু অল্প। বিবিয়ানা ধরণে অষ্টপ্রহর যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকে, তাঁহারা অধিক অলঙ্কার-পরিধানের স্থান পান না, সেই একদল, আর যাহাদের সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি কম, সেই একদল। যাঁহারা বিবি সাজেন না, অথচ জামাজুতা মোজা ব্যবহার করেন, তাঁহারা লোক দেখাইবার জন্য জামার উপর নানাপ্রকার অলঙ্কার ধারণ করেন। চরণাভরণের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। নূতন বিবাহিতা বালিকারা কিছুদিন গুজ্‌রীপঞ্চম, চরণচাঁদ ইত্যাদি পরিধান করে, একটু বয়স হইলেই তাহা ফেলিয়া দেয়। কোন কোন বিলাসিনীর পায়ের মোজার উপর ছয়গাছা আটগাছা মল শোভা পায়, তাদৃশি বিলাসিনীর সংখ্যা অধিক নয়।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের দেশের ভাগ্যবতী রমণীরা চরণে নূপুর পরিধান করিতেন। কবিবর্ণনায় আছে :—

"কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, চরণে নূপুর বাজে,
গলে দোলে গজমতি-হার।"

ভারতচন্দ্রের সময়েও সম্ভ্রান্ত-রমণীর চরণে নূপুর শোভা পাইত। বিদ্যার গর্ভ-সমাচার বিজ্ঞাপন করিবার জন্য বীরসিংহ-রাজমহিষী যৎকালে রাজার শয়নকক্ষে গমন করেন, তদুপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন :—

"রাণী ধায় ক্রোধ-মনে, নূপুরের ঝনঝনে,
উঠে বৈসে বীরসিংহ রায়॥"

অধুনা গৃহস্থ-স্থানে নূপুর নাই, পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকীরাই এখন নূপুরের মান রাখিতেছে। চণ্ডীর মশান, মনসার ভাসান, ধর্ম্মের গান, রামায়ণগান, মাণিকপীরের গান, ওলাবিবির গান ইত্যাদির আসরে যাহারা অবতীর্ণ হয়, সেই সকল গায়নের কাছেও নূপুরের বেশী আদর; গাজনের সন্ন্যাসী এবং বহুরূপীরাও নূপুর পায়ে দেয়। রাঢ়দেশের এবং উড়িষ্যার কোন কোন স্ত্রীলোক এখনও নূপুরাকারের এক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করে; তাহার নাম বাঁকমল।

যেদিক্ দিয়াই হউক, অলঙ্কারের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। অলঙ্কারে অহঙ্কার হয়, সে কথা এখন ডুবিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের অহঙ্কার কেবল অলঙ্কারের সঙ্গে গাঁথা, এমন কথাও বলা যায় না। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে অহঙ্কার আইসে, এ কথা স্বীকার্য্য, তথাপি স্ত্রীজাতির অহঙ্কারের আরও অনেক প্রকার হেতু আছে। যাঁহারা আমাদের সামাজিক অবস্থা জানেন, তাঁহাদের নিকটে নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অহঙ্কারে উন্মত্তা হইয়া কতকগুলি বঙ্গকামিনী এক এক প্রকার স্বেচ্ছাচারে বঙ্গের নারী-সংসার উৎসন্ন দিবার পন্থা পরিষ্কার করিতেছে।

তর্ক উঠিতে পারিবে, যতগুলি কথা বলা হইল, তৎসমস্তই কলিকাতার কথা। কলিকাতার সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে সমগ্র বঙ্গসমাজ বিপ্লুত হইয়া যাইবে, ইহা অগ্রাহ্য। যাঁহারা ভাবেন অগ্রাহ্য, তাঁহাদের তর্কও অগ্রাহ্য। কত স্থানে কত প্রকারে কত দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইতেছে, রাজধানীর হাওয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রদেশে প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। নারীরাই নারী-সংসার ভঙ্গ করিতেছে, এ কথা ঠিক নহে, পুরুষের যোগ না থাকিলে এই হতভাগ্য দেশের এমন দুর্দ্দশা হইত না। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বঙ্গের প্রদেশগুলি দর্শন করিয়াছেন, সূক্ষ্ম-দর্শনে যাঁহারা মফস্বলের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, প্রত্যেক বিংশতি বৎসরে, প্রত্যেক দশম বৎসরে, প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে, এমন কি, প্রত্যেক সম্বৎসরে কতদূর পরিবর্ত্তন। সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন ঘটে। পরিবর্ত্তনে ভাল মন্দ দুইই থাকে। আমাদের দেশের পরিবর্ত্তনগুলি ভালপথে ধাবিত হইতেছে না, মন্দের দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে, ইহাই অমঙ্গলের কারণ;—অমঙ্গলের কারণ বলিয়াই আক্ষেপের কারণ। মফস্বলের লোক কলিকাতায় আসিতেছে, কলিকাতার জল-হাওয়ায় তাহাদিগের হৃদয় জুড়াইতেছে, কলিকাতার দুর্দ্দশাকে তাহারা সৌভাগ্য মনে করিতেছে, সেই সৌভাগ্যবৃক্ষে কলম বাঁধিয়া কলমের চারাগুলি স্ব স্ব গ্রামে লইয়া গিয়া রোপণ করিতেছে; অতি অল্পদিনেই কলমের গাছে ফল ধরে; শীঘ্র শীঘ্রই মফস্বলের উদ্যানে উদ্যানে নূতন নূতন ফল ফলিতেছে। ফল দুই প্রকার;—অমৃতফল ও বিষফল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথমোক্ত ফল অতি বিরল।

রাজধানীর নাম পাপের উদ্যান। পৃথিবীর সমস্ত রাজধানীই পাপের উদ্যান ও পাপের ক্ষেত্র। দুইচারি কথায় তাহা কি বুঝাইব? কলিকাতার পাপ

মফস্বলে যাইতেছে, কলিকাতার পুণ্য যদি কিছু থাকে, তাহা মফস্বলে যাইতেছে না; মফস্বলের পুণ্য কলিকাতায় আসিতে পারে, কিন্তু পাপের সহিত মিশ্রিত হইয়া রসায়ন-শাস্ত্রের মর্য্যাদানুসারে তাহা বিকৃতভাব ধারণ করিতেছে।

নারী-সংসার নষ্ট হইবার আর একটা নূতন কারণ। বঙ্গে হিন্দু-নারীর সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। হিন্দুবিধবার বিবাহের হুজুগ সেই প্রশংসাকে ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। বিধবা বিবাহ চলে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রধূমিত হইতেছে। যে সকল রমণী স্বাধীনা হইতেছে, তাহাদের মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পতির মৃত্যু হইলে তাহারা বিধবা হইবে না; পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন পতিগ্রহণ করিতে পারিবে। এই বিশ্বাস মহা অনর্থের মূল। এই মূল হইতেই অঙ্কুর বাহির হইয়া বঙ্গের সতী-সংসার কণ্টকীলতায় জড়াইয়া ফেলিবে, "পতি মোলে হাতের বালা খুলবো না লো খুলবো না," নাট-মন্দিরের রঙ্গমঞ্চের এই গীত তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

পতিব্রতা নারী বঙ্গ-সংসারের ভূষণ। পতিভক্তি কুরূপা নারীর অতুল্য রূপ। পতিই স্ত্রীলোকের গুরু, পতিই দেবতা; পতিভক্তি ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য কোন ব্রত নাই; পতিসেবাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম। শাস্ত্রপ্রমাণে এই বিশ্বাস থাকাতে বঙ্গের হিন্দু-সংসারের স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করেন। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের জীবন শূন্যময় বোধ হয়, সংসারের সকল সুখ ফুরাইয়া যায়; এই কারণেই পতিব্রতা রমণীগণ পতি-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এক পতি মরিলে নূতন পতি প্রাপ্ত হইবে, এমন ধারণা যদি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা পতি-সেবায় যত্নবতী হইবে না, পতির মঙ্গলামঙ্গলে ভ্রূক্ষেপ রাখিবে না, অন্য জাতির দৃষ্টান্ত দর্শনে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। হিন্দু-রমণীর বৈধব্যযন্ত্রণা দর্শন করিলে সকলের শোক উপস্থিত হয়, হিন্দু-বিধবার ম্লানবদন নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়বান্ লোকের হৃদয়ে বেদনা লাগে, কিন্তু পুত্র-পৌত্রবতী বিধবাকে দেখিলে তাদৃশ শোক হয় না। মহাজনবাক্য আছে, "অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্র-পৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা।"—এখন বিবেচনা করা হউক, তাদৃশী অশোচ্যা বিধবা যদি দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণে অভিলাষিণী হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সংসারের কি অবস্থা দাঁড়াইবে। স্বাধীন-প্রবৃত্তি উত্তেজিতা হইলে কোন কোন স্থলে তাহা যে ঘটিবে না, এরূপ অনুমান করাও ভ্রান্তিমূলক।

কেন না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ" পুস্তক যখন বাজারে বাহির হয়, বিধবা-বিবাহের কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে যখন মহা আন্দোলন হয়, সেই সময় বাজারে একটা গীত উঠিয়াছিল, "সাত ছেলের মা পতি পাবে, আহ্লাদেতে আটখানা।"

পতিবিয়োগে সতী যদি কাতরা না হইয়া নূতন পতি পাইবার লোভে আহ্লাদে আটখানা হয়, তাহা হইলে বঙ্গে আর সতীত্ব-গৌরব থাকিবে না। সতীত্ব-গৌরব আছে বলিয়াই নিজ সংসারে নারীগণের এতাধিক যত্ন দৃষ্ট হয়। বিধবা হইবার ভয় না থাকিলে নারীগণ কদাচ পতিসেবায় অনুরাগিণী হইবে না। পর্য্যায়ক্রমে যতগুলি পতি হইবে, একনারী ততগুলি পতির প্রতি সমান ভক্তি রাখিতে পারিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। বিধবার সন্তানেরা নূতন পিতা প্রাপ্ত হইলে যদি তুষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের জননী নূতন পতি পাইয়া তুষ্ট হইতে পারিবে, এরূপ অনুমান করা প্রকৃতিসঙ্গত হইতে পারে না। একজনের প্রতি ভক্তি জন্মিলে, এক সংসারের উপর মায়া বসিলে, নারী যেমন মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সংসারপালন করিয়া, সেই মায়া-ভক্তি অটল রাখিতে পারে, সেই সংসারে সে যেমন সুখী হয়, বার বার নূতন সংসারে যাইতে হইবে, নূতন লোকের সেবা করিতে হইবে, নূতনের মন যোগাইতে হইবে, এটা জানা থাকিলে কোন সংসারের প্রতিই নারীগণের তেমন যত্ন থাকিবে না। সতীত্বে অনাদর জন্মিলেই সংসার নষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চয়।

নারীজাতির সতীত্ব-মহিমা ভারতবাসী যেমন জানেন, জগতের অন্যান্য জাতি তেমন জানেন না; অধিক কথা কি, সতী কাহাকে বলে, সেই সূক্ষ্ম কথাটী বুঝিতেই অনেক জাতি অক্ষম। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের আমলে এতদ্দেশীয় সাধবা রমণীগণের সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ সাহেবেরা সেই সহমরণপ্রথার প্রকৃত অর্থ আজিও অবগত হইতে পারেন নাই। কেবল সাধারণ সাহেব কেন, পুলিশের সাহেব এবং বিচারালয়ের সিবিলিয়ান্ সাহেব পর্য্যন্ত নারীর সহমরণকে একটা অপরাধ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সেই অপরাধের নাম "সতী হওয়া।"—সেই অপরাধে কারাবাসদণ্ডের বিধান আছে। বিচারকেরা সিদ্ধান্ত করেন, স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণের নাম সতী হওয়া। যে সকল পুরুষ সেই অপরাধে অনুমৃতা স্ত্রীর সহায়তা করে,

তাঁহাদেরও কারাবাসদণ্ডাজ্ঞা হয়। মনে করুন, একটী স্ত্রীলোক অনুমৃতা হইল, আইন-পালকেরা ইংরাজীতে লিখিলেন "Committed Suttee"—ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ইংরাজী আইনমতে সতী হওয়া ফৌজদারী অপরাধ।

সতী হওয়া ফৌজদারী অপরাধ, এরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা সতীমহিমা কতদূর বুঝিয়াছেন, সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। বিদেশীলোকের কথা লইয়া আন্দোলন করা নিষ্ফল, যাঁহারা এতদ্দেশের সতীমাহাত্ম্য অবগত আছেন, পাকে প্রকারে তাঁহারা পরম্পরা-সম্বন্ধে আমাদের সতীস্ত্রীগণকে সতীত্বধর্ম্মপালনে নিরুৎসাহ করেন, ইহার তুল্য সমাজধ্বংসের সাঙ্ঘাতিক হেতু আর কি হইতে পারে? পতিব্রতার প্রধানধর্ম্মে আঘাত করিলে হিন্দুসংসার খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি। যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার, তাঁহাদিগের মতিভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া কতদূর অমঙ্গলের নিদান, উন্মত্ত উন্নতিকামুকেরা এখনও তাহা বুঝিতেছেন না। বঙ্গের নারীসংসার নষ্ট হইলে কি লইয়া বঙ্গসংসার চলিবে, এ সংসারে কি সুখ থাকিবে, সময় থাকিতে থাকিতে এখনও তাহা চিন্তা করা উচিত;—চিন্তা করিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত বঙ্গসুন্দরী কাব্যের একস্থানে নারী-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

"প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুতলি,
করুণা-সাগর, দয়ার নদী।
হতো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি॥"

স্ত্রীজাতি জগতে না থাকিলে চরাচর সংসার মরুময় হইয়া যাইত, ইহাই কবির কথা। এখন সেই স্ত্রীজাতি বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে পুরুষেরা যদি তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হয়, বঙ্গসংসারের সুখের নিদর্শন আর কি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? বর্ত্তমান লক্ষণ দর্শন করিয়া, ভবিষ্যৎ অবধারণ করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, বঙ্গনারী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে সমস্ত বঙ্গসংসার মরুময় হইয়া যাইবে।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

বিষয়-সংসার।

বঙ্গের বিষয়-সংসার একপ্রকার বিষম-সংসার হইয়াছে। একদিকে কর্ণপাত কর, নিরন্তর বিজয়-কোলাহলে আমোদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে, অন্যদিকে কর্ণ-পাত কর, সকরুণ আর্ত্তনাদমিশ্রিত বিষাদধ্বনি শ্রুত হইতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে দুইদিকেই কিন্তু একরূপ পরিস্ফুট মিশ্রধ্বনি—হা অন্ন, হা অন্ন!

শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন পরস্পর-বিরোধী উভয়ধ্বনি শ্রবণ করে, দর্শনেন্দ্রিয়ও তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধী উভয়প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়া তৃপ্ত ও অতৃপ্ত হয়। জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকেই বলেন, 'ক্রমোন্নতিই জগতের ধর্ম্ম। ক্রমোন্নতি অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই, কিন্তু এককালে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমভাবে উন্নতির পতাকা উড়িতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

আমাদের দেশে কতকগুলি পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাজভক্ত। ভারতে রাজভক্ত কে নহে, সে প্রশ্ন উত্থিত হইতেই পারে না; কেন না, ভারতবাসীমাত্রেই চিরদিন অবিচ্ছেদে রাজভক্ত। বঙ্গে এখন একটু ইতরবিশেষ এই হইয়াছে যে, যাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হইল, তাঁহাদের রাজভক্তি অনেক উচ্চসীমা অথবা উচ্চশিখর স্পর্শ করে। রাজপুরুষেরা যাহা কিছু করেন, সর্ব্ববিধায়ে সেই সকল বিষয়ের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা সেই পণ্ডিতগণের কার্য্য। ইংরাজ চরিত্ত সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি।

ইংরাজ বলেন, ভারতের মঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে ভারতক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যাঁহারা অকপট রাজভক্ত, রাজবর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রের প্রতি যাঁহাদের অকপট ভক্তি, তাঁহারাও ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করেন। কেহ কেহ

না করে ?॰ দেড়শত বৎসর হইতে চলিল, পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজেরা এ দেশের অধিপতি হইয়াছেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারা এ দেশে কত প্রকার মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি, জগদীশ্বরও তাহা দেখিতে পাইতেছেন।

পৌষ মাঘ মাসে অধিক বেলায় সূর্য্য প্রকাশ পাইলে অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা যেমন দূর হইয়া যায়, ইংরাজের অনুগ্রহে এ দেশের কুসংস্কার সেইরূপ দূর হইয়া যাইতেছে। ইংরাজের অনুগ্রহে এ দেশের লোকেরা আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান-মঞ্চে আরোহণ করিতেছে, দেশের স্থানে স্থানে ব্রহ্মসভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রজালোকের যাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইংরাজরাজপুরুষেরা সদয় হইয়া তদর্থ নানাস্থানে বহু বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে প্রজালোকের সত্বশান্তি সুরক্ষিত হয়, তদর্থ স্থানে স্থানে বহু বিচারালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে প্রজালোকের সাংসারিক অভাব দূর হয়, ইংরাজরাজার উৎসাহে ইংরাজ বণিকেরা তদর্থ তাঁহাদের দেশ হইতে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী এ দেশে আমদানী করিতেছেন, ইংরাজ-রাজপুরুষেরা নিরপেক্ষভাবে এ দেশের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার খাস আমলের উদার ঘোষণাপত্রের মর্ম্মানুসারে ইংরাজরাজপুরুষেরা এ দেশের সমস্ত প্রজাকে সমনেত্রে দর্শন করিতেছেন ; এতৎসমস্তই ভারত-মঙ্গলের উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাজপুরুষেরা যাহা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়া এ দেশের লোকেরা নিজে নিজে কি করিতেছেন, তাহাও গণনা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজের প্রসাদে এ দেশের লোকেরা বিদ্বান্ হইতেছেন, বিশুদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হইতেছেন, ঐক্যহারা হইয়াও দশজনে মিলিয়া সভা করিতে শিখিয়াছেন, দেশের উপকারের জন্য সহানুভূতি জানাইয়া নানাভাবপূর্ণ বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইয়া, দেশোৎপন্ন তুলা, পাট, রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান্ বস্তুজাত বিদেশে প্রেরণ করিয়া, তদ্বিনিময়ে তদুৎপন্ন বস্ত্রাদি বহুমূল্য দিয়া এ দেশে আনাইতেছেন, উত্তম উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া বিলক্ষণ বিলাসী হইতেছেন, মানবের মহোপকারিণী যে সভ্যতা, ইংরাজের

প্রসাদে এ দেশের পণ্ডিতেরা তাহাও আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন। সমস্তই ভাল, সমস্তই মঙ্গলের নিদর্শন।

সমস্তই ভাল, মন্দ কি তবে কিছুই নাই? বুঝিবার দোষে আমরা যেগুলিকে মন্দ বলিয়া অবধারণ করি, বাস্তবিক সেগুলি সভ্যতার অঙ্গ; সভ্যতার রাজ্যে সেগুলি না থাকিলে সভ্যতার মান থাকে না। ছোট বড় গুটীকতক অঙ্গ আমাদের চক্ষে অপ্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তের আলোচনা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য, বড় বড় দুটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। মদিরা ও গণিকা। সকল সময়ে সকল দেশেই ঐ দুটীর বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, পুরাণবর্ণিত স্বর্গ যে সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় সুখস্থান, সে স্বর্গেও মদিরা-গণিকার অবিদ্যমানতা নাই। তবে আমরা ঐ দুটীকে মন্দের নিদর্শন কেন বলি, তাহার কারণ আছে।

ইংরাজ-আমলে এতদ্দেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ঐ দুটী বস্তুর অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এ দেশের ইতরলোকেরা কতক পরিমাণে দেশীয় মদ্য ব্যবহার করিত, ভদ্রলোকেরা মদ্যের নামে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, প্রকাশ্যরূপে মদিরা-বিক্রয়ের স্থানও নিতান্ত অল্প ছিল, পথে ঘাটে মাতালের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হইত না, এখন কিরূপ হইয়াছে, সকলেই তাহা দেখিতেছেন। দেশের অধিকাংশ লোক মাতাল; পূর্ণমাত্রায় মাতাল না হইলেও ভগ্নাংশবাদে এ বাজারে ইতর-ভদ্র অনেক লোক মদ্যপায়ী। রাজা এই বিষয়ে উৎসাহ দেন, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়। কে বলে রাজা উৎসাহ দেন? বে-এক্তার মাতাল রাস্তায় পাইলে পুলিশের লোকেরা ধরিয়া লইয়া যায়, একরাত্রি কয়েদ করিয়া রাখে, পুলিশকোর্টে জরিমানা হয়; বিনা অনুমতিতে কেহ মদ্য বিক্রয় করিতে পারে না, অনুমতি-প্রাপ্ত লোকেরাও নির্দ্ধারিত সময়ান্তে বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হয়; তবে আর রাজার উৎসাহ কোথায়?

মদ্যবিক্রয়ে ও মদ্যপানে রাজার উৎসাহদান নাই, ইহা স্বীকার করিলেও একটু একটু সন্দেহ আইসে। বর্ষে বর্ষে আবকারী বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হয়, কোন বৎসর যদি মদ্যবিক্রয়ের অল্পতা এবং মদ্যপায়ীর সংখ্যার অল্পতা সেই রিপোর্টে লেখা থাকে, কেন বিক্রয় অল্প হইল, কেন মাতাল কমিল, তদ্বিষয়ে উপর হইতে আবকারী-কর্ম্মচারিগণের কৈফিয়ৎ তলপ হইয়া থাকে। এক্রান্তপুঞ্জের মদ্য-

পানে রাজার উৎসাহ, এ কথা বলা অসঙ্গত হইলেও রাজস্ব-বিভাগের আয়-বৃদ্ধসম্বন্ধে রাজপুরুষগণের আনন্দ আছে, এরূপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়ত গণিকা।—প্রত্যেক দশম বৎসরে রাজ্যের প্রজাগণনা করা হয়। রাজধানীর গণনার ফলে প্রকাশ পায়, ক্রমশই নগরের গণিকা-সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী ইতর ভদ্র নায়কেরা সেই সকল গণিকার পরিপোষণ করিতেছে। এ পাপ দূর করিবার কোন উপায় অবধারণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; বরং এই দুর্দ্দমনীয় পাপস্রোত ক্রমশই বেগবান্ হইয়া উঠিবে। বড়লোকেরা বেশ্যা পোষণ করেন, তাহার একটী কারণ আছে। এখনকার বিষয় সংসার রূপভোগ করিয়া বুঝাইতে হইলে অবশ্যই বলিতে হয়, অর্দ্ধাংশের অধিকাংশ আমোদসংসাররূপে পরিণত হইয়াছে। যাহাতে অধিক আমোদ, তাহাতেই অধিকলোকের প্রবৃত্তি। আমোদ দুই প্রকার;—বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ আমোদে এখনকার লোকের আসক্তি অল্প, অশুদ্ধ আমোদের দিকেই অধিক আকর্ষণ। বিলাসিনীগণের বিলাসমন্দিরে যে প্রকার খোলা আমোদলাভ হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। এই জন্যই বিলাস-মন্দিরগুলি সর্ব্বদা গুল্‌জার। সুরাসেবন, বায়ুসেবন, কুৎসিত কুৎসিত নৃত্য-দর্শন, কুৎসিত কুৎসিত সঙ্গীতশ্রবণ এবং যোড়শোপচারে মকরকেতনের সমর্চ্চন ঐ সকল স্থলেই অবিরোধে হইয়া থাকে। বড় বড় লোকের গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি যেমন আসবাব, সখের বারাঙ্গনাগণও তদ্রূপ আসবাবের মধ্যে গণ্য। সমস্ত বড়লোকের এই আসবাব আছে, নিশ্চয় করিয়া সে কথা বলা না যাউক, শতকরা পাঁচজনের অধিক বাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাতেও সন্দেহ হয়। বারাঙ্গনারা ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ভাল আমোদ করে, ভাল হাসে, ভাল নাচে, ভাল গায়, অবিচ্ছেদে সুখভোগ করে, বাহিরের বিলাস দেখিয়া অদূরদর্শী লোকেরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে; গণিকারা যে পাপানলে, অন্তরে অন্তরে জলে, সেটা সকল লোকে হয়ত কল্পনাতেও আনিতে পারে না; ভ্রান্ত বিশ্বাসে ইহ-সংসারের অনেক কুলস্ত্রী সুখের লোভে বিপথগামিনী হয়; শেষকালে পাপের হ্রদে ডুবিয়া ডুবিয়া জীবন্ত শরীরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ইয়োরোপ-খণ্ডের এক জন পণ্ডিত নিত্য নিত্য গণিকাপল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া গণিকাবর্গের

বেশপারিপাট্য ও হাস্যবিলাসাদি দর্শন করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, অধর্ম্মের পথে এত প্রমোদ কি প্রকারে স্থান পায়? পণ্ডিতটী লৌকিক শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র সর্ব্বপ্রকারে নির্ম্মল ছিল; ঐ সকল রঙ্গভঙ্গ দর্শন করিয়া যুক্তযোগে মনে মনে তিনি স্থির করিলেন, অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। কি যে সেই কারণ, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রতি রজনীতে তিনি গণিকাগণের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে সামান্য সামান্য বেশ্যার ভবনে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশালিনী সুন্দরী সুন্দরী বিলাসিনীগণের ভবনে তাঁহার গতিবিধি আরম্ভ হয়। সেই প্রকার গতিবিধিতে তাঁহার অর্থব্যয় হইত না, এমন কথাও নহে, অর্থব্যয় করিয়া প্রত্যেকের মনের কথা জানিবার চেষ্টা করাই তাঁহার কার্য্য হইয়াছিল। প্রত্যেককেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "এ পথে কেন আসিয়াছ, গৃহত্যাগ কেন করিয়াছ, এ পথে কেমন সুখে আছ, এত হাস্য-কৌতুক কিরূপে শিক্ষা করিয়াছ?" পুনঃ পুনঃ এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছোট বড় সমস্ত বিলাসিনীকেই তিনি কাঁদাইয়াছিলেন। মনের কথা খুলিয়া বলিলে ঐ দলের সকলকেই কাঁদিতে হয়, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। আমাদের দেশে কোন চরিত্রবান্ পুরুষ যদি সেইরূপ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমস্ত কুলটাকেই তিনি চক্ষের জলে ভাসাইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের বাক্যে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া এক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ঐ সাহেব যেরূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন, অবশ্যই সেইরূপে ঐ সকল বাহ্যবিলাসের মর্ম্মভেদ করিতে পারিবেন; সে চেষ্টা, সে কষ্ট নিষ্ফল হইবে না। পরীক্ষার ফলগুলি মুদ্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারিলে বেশ্যাবিলাসে অনেক পুরুষের অরুচি জন্মিবে, মিথ্যালোভে অবলা কুলবালারাও আর ভবিষ্যতে কুলের বাহির হইতে ইচ্ছা করিবে না।

মদিরাবৃদ্ধির সহিত গণিকাবৃদ্ধি হইতেছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন নাই; রাজধানীতে ঐ দুই পাপের শ্রীবৃদ্ধি, আর কোথাও শ্রীবৃদ্ধি নাই, এ কথাও কেহ বলিতে পারিবেন না। মফস্বলের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাজারে, এমন কি, সামান্য সামান্য পল্লীতেও ঐ দুই পাপ বিলক্ষণ প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত করিয়াছে। আর একটা নূতন উপসর্গ। এ দেশে লৌহবর্ত্ম যোগে বাষ্পীয়

শকটের গতিবিধি আরম্ভ হওয়াতে দূরদেশে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সূত্রে মদিরা-গণিকার নূতন নূতন আশ্রয়স্থান বাড়িয়াছে। যেখানে রেলওয়ে ষ্টেসন, সেইখানেই দুই একখানা মদের দোকান, সেইখানেই ঘন ঘন বেশ্যা-নিবাস দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্মদর্শনে যাঁহারা ঐ সকল দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই বাক্যের সাক্ষ্য দিবেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাই কি বঙ্গের বিষয়-সংসার? আমরা উত্তর দিব, ইহা কিছুই নহে, মূলবিষয়ের ক্ষুদ্র ভূমিকামাত্র। ইংরাজাধিকারে আসল বিষয়-সংসারের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, এক এক করিয়া তাহা আমরা বুঝাইব। বীরভূমজেলার একজন বনিয়াদী জমীদার পুরন্দর বাবুলী। তাঁহার তিন সংসার। বাবুলীরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ নহেন, যে গৌরবে পুরন্দরের তিনটী বিবাহ, সে গৌরব অন্বেষণ করিতে হইবে।

তিনটী স্ত্রীই বর্ত্তমান। তিনটী স্ত্রীর গর্ভে চতুর্দ্দশটী পুত্র ও একাদশটী কন্যার জন্ম। প্রথমার গর্ভে চারি পুত্র, চারি কন্যা; দ্বিতীয়ার সাত পুত্র, কন্যা নাই; তৃতীয়ার তিনটী পুত্র, সাতটী কন্যা।

জ্যেষ্ঠা পত্নীর চারিপুত্রের মধ্যে যেটী জ্যেষ্ঠ, সেটীর নাম রামদয়াল; সেইটীই সর্ব্বাগ্রজ। পুরন্দরের বয়স অধিক হইয়াছিল, বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিবার অভিলাষে পুত্রগুলিকে তিনি দস্তুরমত লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলগুলি তাঁহার যত্ন সফল করিতে পারে নাই। যাহাদের পিতৃপিতামহের প্রচুর অর্থ থাকে, তাহারা প্রায়ই লেখাপড়ায় ঔদাস্য প্রদর্শন করে। পুরন্দর বাবুলীর পুত্রেরা সেই অভ্যাসের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ রামদয়ালটী সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

রামদয়ালের বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর। তাঁহার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাহারা একেবারেই মূর্খ হইয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এমন কথা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালার বিদ্যার অধিক বেশী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। জমীদারের পুত্র বলিয়া নাবালকগুলি ছাড়া সকলগুলিরই বিবাহ হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামে অল্পবিষয় থাকিলেও লোকে বড়মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়; পুরন্দর বাবুলীর জমীদারীর উপস্বত্ব সদরমালগুজারী বাদে প্রায় ষোলহাজার

টাকা। মফস্বলে যাঁহাদের ঐরূপ আয়, তাঁহারা অবশ্যই বড়মানুষ বলিয়া বিখ্যাত হন।

যে গ্রামে পুরন্দরের বাস, সেই গ্রামে আর একজন জমীদার ছিলেন, তাঁহার নাম দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী। গ্রামে দুটী দল; একদলের দলপতি পুরন্দর, দ্বিতীয় দলের দলপতি দর্পনারায়ণ। পুরন্দরে আর দর্পনারায়ণে মনের মিলন ছিল না, বস্তুতঃ উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিত; সাক্ষাৎসম্বন্ধে, পরম্পরা-সম্বন্ধে মকদ্দমা-মামলা চালাইতে তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করিতেন; উভয়েই উভয়ের আততায়ী, উভয়েই জিগীষাপরবশ। প্রকাশ থাকা উচিত, দর্পনারায়ণের বার্ষিক আয় পুরন্দরের আয় অপেক্ষা কিছু বেশী। দর্পনারায়ণ সৎকার্য্যে কৃপণ, কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় বিলক্ষণ দাতা।

পুরন্দরকে জব্দ করিবার জন্য দর্পনারায়ণের বিশেষ চেষ্টা। পুরন্দরের একটী দোষ ছিল, জমীদারীর প্রজাগণকে তিনি মৌরসীপাট্টা দিতে ভালবাসিতেন না, ঠিকা বন্দোবস্তেই তিনি বর্ষে বর্ষে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন; তাহা ছাড়া কোন কোন প্রজা পাঁচবিঘার অধিক নিষ্কর জমী ভোগ করিতে পায়, এমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, নিষ্করজমী বাজেয়াপ্ত করা তাঁহার একটা অভ্যাস হইয়াছিল। জমীদারীতে চাঁদা, মাথট, জরিমানা ইত্যাদি বাজে আদায়ের প্রতি তাঁহার অধিক লোভ ছিল। এই সকল কারণে প্রজারা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিল না।

বঙ্গের অনেক জমীদারের ঐরূপ অভ্যাস ছিল, কিন্তু আজকাল কমিয়া আসিতেছে। জমীদারেরা প্রজাপীড়ন করেন, অনেক সাহেবলোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। ধারণা অভ্রান্ত নহে, প্রজারঞ্জন সদাশয় ভূম্যধিকারী আমরা এখন অনেক দেখিতে পাই। তবে যে প্রজাপীড়নের কথাটা রটনা হয়, সে রটনার কারণ জমীদারেরা নহেন, মফস্বলের আমিলাবর্গের দোষে অনেক ভাল ভাল জমীদারের দুর্নাম রটে। উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ দেশে একজন আদর্শ ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরাও প্রজার উপকারে উদাসীন নহেন। জয়কৃষ্ণবাবুর আদর্শে বঙ্গের আরও কতকগুলি শিক্ষিত ভূম্যধিকারী কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে, প্রজা-লোকের অবস্থার সংশোধনকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। যে সকল সাহেব এ দেশের জমীদারগণের উপর হিংসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে

রাজদরবারে যাঁহাদের কিছু অধিক প্রতিপত্তি, তাঁহারা বুঝাইয়া দেন, কালেক্টারীতে অতি অল্পমাত্র রাজস্ব নিয়া জমীদারেরা বহুগুণে অধিক লাভ করিয়া থাকেন। কেবল ঐ কথা বুঝাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা প্রস্তাব করেন, জমীদারীর বিংশতি গুণ মূল্য দিয়া জমীদারীগুলি খাস করিয়া লইলে বঙ্গের ভূমির রাজস্ব অনেক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে পারে। হেতুবাদের সঙ্গে তাঁহারা আরও একটা বেশী কথা বলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর জমীদারগণের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যের ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন। সে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়, এই কারণে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না, এই কারণেই তাঁহারা ঐরূপ বিশগুণ পণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা সাহস করিয়া সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারেন না, তজ্জন্যই এখনও জমীদারীগুলি ঠিক রহিয়াছে। রহিয়াছে বটে, তথাপি শনৈঃ শনৈঃ কর-প্রসারণে কর-সংগ্রাহকেরা বড় একটা সঙ্কুচিত হইতেছেন না। রোডসেস্, পবলিক ওয়ার্কসেস, ডাকহরকরার বেতন ইত্যাদি নূতন বাব স্থাপন করা হইয়াছে, এডুকেশনসেস্ বসাইবার কল্পনাও হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহলসমূহে ঐরূপ অতিরিক্ত করস্থাপনে দশশালা-বন্দোবস্ত আঘাত পাইতেছে, বিধানকর্ত্তারা অবশ্যই তাহা বুঝিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে "সূর্য্যাস্ত আইনের" প্রসাদে রাজার রাজস্ব আদায়ের কত সুবিধা, বিপরীত-প্রস্তাবকর্ত্তারা একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। বিচক্ষণ রাজস্ববিদ্ পণ্ডিতমহাশয়েরা বঙ্গের আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী।

দর্পনারায়ণ প্রজাপীড়ন করিতেন না, এমনও নহে, তথাপি ঐ সূত্র ধরিয়া বৈরনির্যাতন করিবার সুবিধা অন্বেষণে তিনি সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন।

পুরন্দরের যেমন কতকগুলি দোষ ছিল, তেমনি কতকগুলি গুণেরও তিনি অধিকারী ছিলেন। স্বধর্ম্মে অনুরাগ থাকাতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত সদালাপ করিতে, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের উপকার করিতে, গুণানুরূপ মর্য্যাদারক্ষা করিতে তিনি কদাচ বিমুখ

হইতেন না, সেই কারণে দর্পনারায়ণের দল অপেক্ষা তাঁহার দলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংখ্যা অধিক ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, স্বজনপ্রিয়। মুখের কথায় লোকের সহিত অমায়িক ব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতির একটী উত্তম পরিচয়। তাঁহার ঐ সকল গুণে গ্রামের এবং ভিন্নগ্রামের অনেক লোক তাঁহার বাধ্য ছিল। কৃপণস্বভাব দর্পনারায়ণ সে সকল গুণে বঞ্চিত ছিলেন, তাহার উপর অত্যন্ত রূক্ষভাষী; লোকেরা তাঁহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত, তজ্জন্য পুরন্দরের উপর দর্পনারায়ণের অধিক হিংসা।

মামলা-মকদ্দমায় উভয়পক্ষের বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু কোন কৌশলে দর্পনারায়ণের নিগূঢ় অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইত না। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল, পুরন্দরকে বিপদে ফেলা। দেওয়ানী মকদ্দমায় সে অভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, কোন একটা গুরুতর ফৌজদারী মকদ্দমায় পুরন্দরকে জড়াইয়া ফেলা তাঁহার মনোগত ইচ্ছা, মনোগত চেষ্টা; কিন্তু সোজা-পথে সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তিনি বক্রপথ কল্পনা করিতেছিলেন।

পুলিশের এবং ফৌজদারী আদালতের প্রধান প্রধান আম্‌লাবর্গের সহিত দর্পনারায়ণ বিশেষ আলাপ রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতেন, পার্ব্বণে পার্ব্বণে পার্ব্বণী দিতেন, এক একটা পার্ব্বণে তাঁহাদের বাসায় বাসায় ভেট পাঠাইতেন; স্বভাবতঃ রূক্ষভাষী হইলেও, স্বভাব গোপন করিয়া সেই সকল লোকের সহিত বেশ মিষ্টালাপ করিতেন, কদাচ তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

দুই তিন বৎসর এইরূপে যায়। একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ জনকতক পুলি-শের লোক পুরন্দর বাবুজীর সদরবাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পুরন্দরের পুত্রগুলি সকলেই বাবু। কেবল দুই অক্ষরে বাবু নহে, সংযোগ আছে তৃতীয় অক্ষর, "জী"। অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে পুলিশের দল প্রবেশ করিল, কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, একসঙ্গে চতুর্দ্দশ বাবুজী সদরবাড়ীর প্রাঙ্গণে দর্শন দিলেন। অগ্রবর্ত্তী রামদয়ালবাবু। কর্ত্তা তখন পূজায় বসিয়াছিলেন, সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু পূজার আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিতে পারিলেন না।

পুলিশের লোক প্রায় দ্বাদশ জন। তাহাদের সঙ্গে আরও চারি পাঁচ জন অপর লোক। পুলিশের দলে যিনি প্রধান, তিনি নায়েব-দারোগা। সম্মুখবর্ত্তী রামদয়াল-বাবুকে নিকটে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পুরন্দরবাবুর কে হন ?" রামদয়াল উত্তর করিলেন, "তাঁহার পুত্র; আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র। হঠাৎ আপনাদের এখানে উপস্থিত হইবার হেতু কি, তাহাই আমরা জানিতে আসিয়াছি।"

থানার বাহালী দারোগা তখন ছুটী লইয়াছিলেন, বর্ত্তমান নায়েব-দারোগাটী তাঁহার প্রতিনিধি। ইনি নূতন আসিয়াছেন, এলাকার সকল ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার জানা-শুনা হয় নাই, পুরন্দরবাবুর পরিবারের পরিচয় তিনি জানিতেন না, সেই কারণেই রামদয়ালের প্রতি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। রামদয়ালের উত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা কোথায় ?"

রামদয়াল।—তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছেন।

দারোগা।—ডাকুন।

রাম।—সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত না হইলে তিনি উঠিতে পারিবেন না।

দারোগা।—(হাকিমী স্বরে) ডাকুন, এখন সন্ধ্যাবন্দনা করিবার সময় নয়; এখনই তাঁহাকে থানায় যাইতে হইবে।

রাম।—থানায় যাইতে হয়, এমন কোন কার্য্য তিনি করেন নাই। তিনি বৃদ্ধলোক, গৃহের বাহির হন না, কেন আপনি তাঁহাকে থানায় লইয়া যাইতে চান ? বিশেষতঃ তিনি এখন ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন, এখন আমি তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে পারিব না।

দারোগা।—সরকারী কার্য্যের জন্য প্রয়োজন, এখনই তাঁহাকে যাইতে হইবে। বৃদ্ধ কি অবৃদ্ধ, সে বিচার করিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। আপনি ডাকুন।

রাম।—ইহা আপনার অন্যায় হুকুম।

দারোগা।—ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার কর্ত্তা আপনি নহেন; ডাকুন।

রাম।—কি কারণে তাঁহাকে আপনার প্রয়োজন, আমাকে কি সে কথা আপনি বলিতে পারেন ?

দারোগা।—আপনি কি সকল কথার উত্তর দিতে পারিবেন ?

রাম।—উত্তর দিবার যোগ্য হইলে অবশ্য পারিব।

নায়েব-দারোগা বসিলেন; রামদয়ালকে বসিতে বলিলেন না। আপনা আপনি অস্পষ্টস্বরে কি কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করিয়া রামদয়ালকে তিনি বলিলেন, "একটা স্ত্রীলোক আপনাদের গোয়ালবাড়ীতে একরাত্রি কয়েদ ছিল, তাহার পর নিরুদ্দেশ; কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কোথায় গেল, তাহা কি আপনি জানেন?"

রাম।—আমাদের বাড়ীতে কেহ কখনও কয়েদ থাকে না। কেনই বা থাকিবে? ভদ্রলোকের বাড়ী জেলখানা নহে।

দারোগা।—ছিল, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আপনি অস্বীকার করিলে আপনাকেও আমি——

রাম।—(দারোগার অসমাপ্ত বাক্যের ভাব বুঝিয়া) সে স্ত্রীলোকের নাম কি?

দারোগা।—প্রসন্নমুখী নাগ।

রাম।—সে নামের কোন স্ত্রীলোককে আমরা চিনি না।

দারোগা।—এই জেলার মাণিকপুর মহল আপনাদের তালুক, তাহা আপনি জানেন?

রাম।—জানি।

দারোগা।—সেই মাণিকপুরের অন্তর্গত শিলাপুর গ্রাম; সেই গ্রামে প্রসন্নমুখী নাগের বিবাহ হইয়াছিল।

রাম।—ইহা শুনিয়া আমি কি বুঝিব?

যে কয়েকজন অপরলোক পুলিশের লোকের সঙ্গে ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া দারোগা বলিলেন, "ঐ লোকটীর নাম ভৃগুরাম সাঁফুই। প্রসন্নমুখী নাগ উহারই বিবাহিতা পত্নী। সেই পত্নী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে ঐ ব্যক্তি অনেক অন্বেষণ করিয়াছিল, শেষে জানিতে পারে, আপনাদের পেয়াদারা তাহাকে ধরিয়া এখানে আনিয়াছিল, গোয়ালবাড়ীতে আটক রাখিয়াছিল, তাহার পর কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। ভৃগুরামের সন্দেহ হয়, আপনাদের লোকেরা তাহাকে খুন করিয়াছে।"

রামদয়ালের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। দারোগার বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি কহিলেন, "স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া গুম্ করা

আমাদের সংসারের ধর্ম্ম নয়; স্ত্রীলোক দূরে থাকুক, কোন পুরুষকেও গুম করিয়া গোপন রাখা এ সংসারে কখনও হয় নাই।”

একটু তুষ্ট হাসি হাসিয়া দারোগা বলিলেন, “কখনও হয় নাই বলিয়া এখন কি হইতে পারে না? বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া ভৃগুরাম কি মিথ্যাকথা বলিতেছে? আপনাদের গোয়ালবাড়ীর তুইজন রাখাল এই ভৃগুরামকে ঐ সকল কথা জানাইয়াছে। খুনের কথা জানায় নাই সত্য, কিন্তু গুমের কথা প্রকাশ করিয়াছে; খুনের কথাটা ভৃগুরামেব সন্দেহ। বড় গুরুতর মকদ্দমা। আপনার মুখের কথায় এত বড় মকদ্দমা আমি লঘু বিবেচনা করিতে পারি না। আপনার পিতাকে আপনি সংবাদ দিন। আমি বরং আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র পূজা সাঙ্গ করিয়া তিনি এখানে আসুন।”

রামদয়াল নিস্তব্ধ হইলেন। দারোগা ঘূর্ণিত-নয়নে আপনার দলের লোকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবুটী সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেক মামলামকদ্দমার কথা শুনিয়াছেন, দেশের পুলিশ যে প্রকার শিষ্টশান্ত, তাহাও অবগত হইয়াছেন, পুলিশের লোকেরা সাধারণতঃ যে প্রকার ধর্ম্মপালন করেন, অনেক প্রমাণে তাহাও জানিতে শুনিতে তাঁহার বাকী ছিল না। নায়েব-দারোগার কথাগুলি শুনিয়া তিনি আপন মনে মনে সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রকার আলোচনা করিলেন। সিউড়ীর স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়া তিনি কলিকাতার এক কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। কলিকাতায় তাঁহাকে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল; কলিকাতার দাঁড়া-দস্তর তিনি অনেক দূর পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। দারোগার মুখের প্রথম কথাগুলি তাঁহার মনে জাগিতেছিল। প্রসন্নমুখী নাগ। স্ত্রীলোকের এ প্রকার নাম কলিকাতায় নূতন ফ্যাসান্। যে সকল শিক্ষিতা স্ত্রীলোক কলিকাতায় থাকে, তাহারাই ব্যাকরণের অপমান করিয়া ঐরূপ নাম লয়। ভৃগুরাম সাঁফুইয়ের স্ত্রী শিলাপুরের জঙ্গলে বাস করিয়া ঐরূপ নাম পাইয়াছিল, কিছুতেই ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কলিকাতার দস্তর মানিতে হইলেও মূলকথা বিবেচনা করিতে হয়। যে স্ত্রীলোকের স্বামীর উপাধি সাঁফুই, তাহার উপাধি হইল নাগ, গোড়াতেই গোলমাল। দ্বিতীয় কথা—একরাত্রি আমাদের গোয়ালবাড়ীতে আটক থাকিয়া হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, আমাদের

রাখালেরা শিলাপুরের ভৃগুরাম সাঁকুইকে সেই কথা বলিয়াছে, ইহাও ত কোন-মতে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। চক্রান্ত;—ইহার মধ্যে বিষম চক্রান্ত!—সমস্তই মিথ্যাকথা।—দেশের মামলাবাজ লোকেরা যে প্রকারে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইতে পারে, সেই প্রকারে এই ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

রামদয়াল মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, নায়েব-দারোগা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, হঠাৎ চাহিয়া দেখিয়া অশিষ্টাচারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ? আপনি আপনার পিতাকে সংবাদ দিতে যান নাই? আমার কথা কি গ্রাহ্য হইতেছে না? আপনাদের সকলকেই আমি একসঙ্গে চালান—"

"তারা! ব্রহ্মময়ী! কালী! কল্পতরু!" এইরূপ মহাশক্তির নামোচ্চারণ করিতে করিতে পুরন্দরবাবু অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার পরিধান পট্টবস্ত্র গাত্রে দশমহাবিদ্যা-নামাঙ্কিত নামাবলী, ললাটে রক্তচন্দনের দীর্ঘ-ফোঁটা, চরণে কাষ্ঠপাদুকা। তাঁহাকে দেখিয়াই রামদয়ালবাবু বিনীতস্বরে দারো-গাকে বলিলেন, "এই কর্ত্তা আসিয়াছেন, আপনার যাহা বলিবার আছে, বলিতে পারেন।"

নায়েব-দারোগা ইতিপূর্ব্বে পুরন্দরবাবুকে দেখেন নাই, চেহারা দর্শন করিয়া তাঁহার মনে কেমন একপ্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল, কর্ত্তব্যানুরোধে সে ভাব গোপন করিয়া, ইত্যগ্রে রামদয়ালবাবুকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, কর্ত্তাকেও সেই সকল কথা কহিলেন। পুরন্দরবাবু তিনবার দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া হস্তদ্বারা উভয় কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন। নায়েব-দারোগা বলিলেন, "কর্ণ আচ্ছাদন করিলে চলিবে না, আপনাকে থানায় যাইতে হইবে।"

পুরন্দরবাবু মামলা মকদ্দমা অনেক করিয়াছেন, কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামায় কখনও পড়িতে হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে অত বড় একটা ভয়ানক অভিযোগে পুলি-শের লোকের সহিত থানায় যাইতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি কাঁপিলেন। উপায় কি? পুলিশের লোকের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলে কোন উপকার হইবে না, বিপদ্‌ বরং অলঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, ইহা স্থির করিয়া দারোগাকে তিনি বলিলেন, "একান্তই যদি যাইতে হয়, তবে চলুন, যাইতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ দারুণ অভিযোগের

বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। আমার বোধ হয়, কোন বিপক্ষ পক্ষ আমাকে কষ্ট দিবার মতলবে এই মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়াছে।"

দারোগা কহিলেন, "সত্যমিথ্যা আদালতে অপ্রকাশ থাকিবে না, আপনি যদি নির্দ্দোষী হন, খালাস পাইয়া আসিবেন, অন্যপক্ষ শাস্তি পাইবে, আইনের মর্ম্মই এইরূপ।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া, সেই বেশেই পুলিশের লোকগুলির সঙ্গে পুরন্দর-বাবু পদব্রজে থানায় চলিলেন। পুলিশের সঙ্গে যে কয়েকজন অপরলোক ছিল, জনান্তিকে পরস্পর মুখচাগাচাহি করিয়া তাহারাও পশ্চাদ্গমন করিল। বৃদ্ধপিতা একটা মিথ্যা হাঙ্গামায় একাকী থানায় যাইতেছেন, উদ্বিগ্নচিত্তে রামদয়ালবাবুও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

যে কারণেই হউক, ভৃগুরাম সাঁফুই কেবল পুরন্দরবাবুর নামেই এজাহার করিয়াছিল, পুত্রগণের নাম করে নাই, সুতরাং কেবল পুরন্দরবাবুকেই ফৌজদারী আদালতে হাজির হইতে হইবে, দারোগা এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। ভৃগুরাম যেরূপ এজাহার দিয়াছিল, দারোগা স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়া পুরন্দরবাবুকে শুনাই-লেন, অভিযোগের উত্তরে পুরন্দরবাবু যাহা যাহা বলিলেন, থানার কাগজে তাহাও লিখিয়া লওয়া হইল, নিজের সম্ভ্রমে জামীনে বেলা প্রায় দুইপ্রহরের সময় পুরন্দরবাবু গৃহে আসিলেন। রামদয়ালবাবু পিতার সঙ্গে না আসিয়া আর কিয়ৎক্ষণ দারোগার নিকটে বসিয়া রহিলেন, নির্জ্জনে দারোগার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইল, প্রকাশ পাইল না, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দারোগার নিকট হইতে তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন। সেদিন রবিবার ছিল, পরদিন বেলা দশটার সময় পুরন্দববাবুকে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ অবধা-রিত থাকিল।

ভৃগুরাম সাঁফুই থানায় বলিয়াছে, বাবুর বাড়ীর দুইজন রাখাল তাহাকে ঐ গুমের বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল, থানার কাগজে সেই দুইজন রাখালের নাম আছে। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির পর পুরন্দরবাবু তাঁহার রাখালগণকে ডাকা-ইলেন। মফস্বলের ভূস্বামীরা নিজ চাষের জন্য অনেক জমী খাসে রাখেন। পুরন্দরবাবুর চাষের জমী একশত বিঘার অধিক। চাষের জন্য পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচযোড়া গরু আর দ্বাদশজন রাখাল ও কৃষাণ নিযুক্ত ছিল। বাবু যখন রাখাল-

গণকে ডাকাইলেন; তখন দশজনমাত্র হাজির হইল, দুইজন অনুপস্থিত। সে দুইজন কোথায় গিয়াছে, প্রশ্ন হইলে একজন রাখাল উত্তর দিল, "চারিদিন তাহারা কামাই করিতেছে।" সে দুইজনের নাম কি, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে থানার কাগজে লেখা যে দুই নাম, সেই দুই নাম ঠিক মিলিল।

রাখালগণকে বিদায় দিয়া পুরন্দরবাবু চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন, এ মকদ্দমায় বিষম চক্রান্ত আছে, চিন্তা করিয়া স্পষ্টই তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; চক্রান্তের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না।

রববারের রবিশশী অস্তাচলে চলিয়া গেলেন, ভাবনায় ভাবনায় পুরন্দরবাবুর সমস্ত রজনী নিদ্রা হইল না। মকদ্দমা তিনি অনেক করিয়াছেন, অস্থিতে অস্থিতে মকদ্দমার যন্ত্রণাশূল বিদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু এমন মকদ্দমায় তিনি কখনও জড়িত হন নাই।

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরবাবুর ভাবনা বাড়িল। উপযুক্ত সময়ে আপন জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি আদালতে উপস্থিত হইলেন। জেলার তিনজন প্রধান উকীলের নামে ওকালতনামা দেওয়া হইল।

প্রথমদিনের এজ্‌লাসে ফরিয়াদী এজাহার, সাক্ষীগণের জবানবন্দী, তাহার পর আসামীর জবাব। মকদ্দমা গুরুতর, নিশ্চয়ই দায়রায় যাইবে, ইহা স্থির জানিয়া উকীলেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সমীপে ফরিয়াদীর উপর এবং ফরিয়াদীর সাক্ষীগণের উপর জেরা করিলেন না, জজ-সাহেবের সম্মুখে জেরা করা হইবে, হাকিমেক এই কথা বলিয়া সে দিন তাঁহারা জামীন হইয়া আসামীকে খালাস লইবার দরখাস্ত করিলেন। তাদৃশ মকদ্দমায় জামীন মঞ্জুর হইতে পারে না, এই আপত্তি তুলিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর জামীন মঞ্জুর করিতে প্রথমে অসম্মত হইলেন। পুরন্দরবাবু একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার, তিনি পলায়ন করিবেন না, আইন অমান্য করিবেন না, আদালতের হুকুম অমান্য করিবেন না, এই সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে শেষকালে জামীন মঞ্জুর হইল।

সাক্ষী পাঁচ জন। প্রথমদিন কেবল দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিবসে বাকী তিন জনের জবানবন্দী লওয়া হইবে, এইরূপ স্থির ছিল; কিন্তু সেদিন আসামী পক্ষের প্রধান উকীলের জজ-আদালতে একটা

মকদ্দমা ছিল, সুতরাং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করিয়া সেসিনের জন্য ঐ মকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে তিনি বাধ্য হইলেন।

যে দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের একজনের নাম আনন্দ সর্দ্দার, দ্বিতীয়ের নাম ভরত মণ্ডল। তাহারা উভয়েই পুরন্দরবাবুর বাড়ীর রাখাল; তাহারাই প্রধান সাক্ষী। ফরিয়াদী ভৃগুরাম তাহাদের মুখেই গুহ্য বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ। রাখালেরা গুম্‌করার কথাটা বলিয়াছিল, খুনের বিষয় সত্য কি না, তাহা তাহারা জানে না। ভৃগুরামকে যখন তাহারা গুমের কথা বলে, তখন সেইখানে যে তিনজন লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকেও সাক্ষী মান্য করা হয়, তাহাদের নাম ঠাকুরদাস মাইতি, জহর থানাদার ও তিনকড়ি নাইয়া।

তৃতীয় দিবসে সেই তিনজনের সাক্ষ্য লওয়া হয়। সেইদিনেই মকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ হয়।

একমাস পরে দায়রায় বিচার। দায়রার আদালতে একজন বারিষ্টার নিযুক্ত করা পুরন্দরবাবুর ইচ্ছা, উকীলগণের নিকটে সেই ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেন। প্রধান উকীল বলেন, এ মকদ্দমা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে, ইহার জন্য অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া বারিষ্টার দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পুরন্দরবাবু মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, বিপক্ষপক্ষের পশ্চাতে প্রবল শত্রু আছে, সুতরাং একজন বারিষ্টার না রাখিলে নিষ্কৃতি লাভ করা কঠিন হইবে, অতএব উকীলের কথা না শুনিয়া বারিষ্টার বায়না করিবার জন্য গ্রামের দুইজন ভদ্রলোকের সহিত তিনি স্বয়ং কালিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় এখন বারিষ্টার অনেক, কথায় কথায় বারিষ্টার নিযুক্ত করা অনেক লোকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, সামান্য সামান্য মকদ্দমাতেও উভয়পক্ষ বারিষ্টার দিতে চায়। কলিকাতায় যখন সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তখন দুইজন মাত্র বারিষ্টার ছিলেন;—রীচি এবং পিটার্সন্। রীচি দীর্ঘাকার, পিটার্সন্ খর্ব্বাকার। তাঁহাদিগের চেহারা দেখিলে ভয় হইত, তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিলে হৃদয় নাচিত, সেসন্-আদালতে বড় বড় অপরাধীগণকে খালাস করিবার জন্য তাঁহারা যখন বক্তৃতা করিতেন, তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর যখন সেসন্-কোর্টের কড়ি-কাঠ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিত, জলদগম্ভীরনিনাদে তাঁহাদের হুঙ্কার যখন গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইত, অপরের কথা দূরে থাকুক, বীরমূর্ত্তিধারী

সেকন্‌জজও তখন ক্ষণে ক্ষণে ভয় পাইয়া চমকিত হইতেন। তাদৃশ প্রতাপশালী বারিষ্টার কলিকাতায় এখন একজন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময় মফস্বল-আদালতে বারিষ্টার আনিবার জন্য কেহই প্রয়াস পাইতেন না, জেলার উকীলেরাই বিশেষ যোগ্যতার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এখন অল্প টাকায় বারিষ্টার পাওয়া যায়, উকীলের নিষেধ সত্ত্বেও পুরন্দরবাবু কলিকাতায় আসিয়া বারিষ্টার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই কার্য্যে দশদিন তাঁহাকে কলিকায় থাকিতে হইল, এই অবকাশে তাঁহার বাসগ্রামে আর এক কাণ্ড উপস্থিত।

বাবু পুরন্দর বাবুলীর একটী জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম সিদ্ধেশ্বর বাবুলী। তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল, পুত্রের নাম গোপেশ্বর বাবুলী। বিবাহের পর পিতা বর্ত্তমানে গোপেশ্বরের মৃত্যু হয়, পুত্রবধূ বিধবা হইয়া গৃহে থাকে। পুত্রের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে সিদ্ধেশ্বরও পরলোকযাত্রা করেন; তাঁহার পত্নীও (গোপেশ্বরের জননী) বিধবা হইয়া দেবরের সংসারে গৃহিণী হইয়া ছিলেন। বারিষ্টার অন্বেষণে পুরন্দর যখন কলিকাতায়, সেই সময় ঐ শাশুড়ী বধূ উভয়েই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান জেলার তারাপুর গ্রামে আশ্রয় লন। গোপেশ্বরের জননীর নাম শুভঙ্করী দেবী, পত্নীর নাম বিশ্বময়ী দেবী। তারাপুর গ্রামে শুভঙ্করী দেবীর পিত্রালয়। পিতা ভ্রাতা কেহই বর্ত্তমান নাই, কেবল একটী নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, আর চারি পাঁচটী বিধবা। পুত্রবধূকে লইয়া শুভঙ্করী দেবী সেই বাড়ীতে আসিয়া থাকেন, অর্দ্ধেক বিষয় বাহির করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে দেবরের নামে মকদ্দমা উপস্থিত করা শুভঙ্করী দেবীর সঙ্কল্প। হঠাৎ এ সঙ্কল্প তাঁহার মনে কেন স্থান পাইল, সে সঙ্কল্পের উত্তেজনাকর্ত্তা কে, পাঠকমহাশয় তাহা অনুভব করিয়া লইবেন।

বারিষ্টার নির্ব্বাচন করিয়া বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইল, কোন্ দিন মকদ্দমা হইবে, বারিষ্টার তাহা আপন স্মারক পুস্তকে লিখিয়া লইলেন। পুরন্দরবাবু বীরভূমে ফিরিয়া গেলেন।

বাজারে বিচারের দিন সমাগত হইল। আদালত লোকারণ্য। ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, উকীল, সকলেই উপস্থিত। প্রথমেই খুনী মকদ্দমা। উভয়পক্ষেই এক একজন বারিষ্টার। পুরন্দরবাবুর উকীল উপস্থিত মকদ্দমার

অবস্থা এবং কোন্ কোন্ কথার জেরা করিতে হইবে, বারিষ্টারকে তাহা সমঝাইয়া দিয়াছিলেন। দস্তুরমত কার্য্য হইবার পর জেরা আরম্ভ হইল।

ফরিয়াদীর প্রতি আসামীর পক্ষে বারিষ্টারের জেরা।

প্রশ্ন।—তোমার নাম কি?

উত্তর।—ভৃগুরাম নাগ।

প্রশ্ন।—পুলশের কাগজপত্রে—আদালতের কাগজপত্রে লেখা আছে, ভৃগুরাম সাঁফুই, তাহার অর্থ কি?

উত্তর।—আমার উপাধি নাগ; আমার কার্য্য বুঝাইবার জন্য লোকে আমাকে সাঁফুই বলে।

প্রশ্ন।—কি তোমার কার্য্য?

উত্তর।—পুকুরকাটা এবং জমীতে ভেড়ীবন্দীর চৌকাকাটা কোড়ায়া আমার অধীনে থাকে, আমি তাহাদের সর্দ্দার, কোড়াদলের সর্দ্দারকে সাঁফুই বলে।

প্রশ্ন।—আচ্ছা, বাবু পুরন্দর বাবুরা তোমার স্ত্রী প্রসন্নমুখী নাগকে নিজ বাড়ীতে গুম্ করিয়া রাখিয়া খুন করিয়াছেন, তাহা তুমি ঠিক জান?

উত্তর।—নিশ্চিত খুনের এজাহার আমি দেই নাই, গুম করিয়া রাখা আমি শুনিয়াছি, স্ত্রীকে না পাওয়াতে অনুমান হয়, খুন।

প্রশ্ন।—গুম্ করার খবর কাহার মুখে শুনিয়াছ?

উত্তর।—আনন্দ সর্দ্দার ও ভরত মণ্ডল।

প্রশ্ন।—কোন্ তারিখে তোমার স্ত্রীকে পুরন্দরবাবুর লোকেরা তোমার বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহা তুমি স্মরণ করিয়া বলিতে পার?

উত্তর।—সে দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম না, বাড়ী হইতে তিন ক্রোশ দূরে পুকুর কাটাইতে গিয়াছিলাম, রাত্রিকালে বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম, আমার স্ত্রী বাড়ীতে নাই, সে দিন ১১ই শ্রাবণ।

প্রশ্ন।—তোমার বাড়ীর লোকেরা পুরন্দরবাবুর লোকদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল?

উত্তর।—দেখিয়াছিল, কিন্তু চিনিতে পারে নাই।

প্রশ্ন।—তোমার স্ত্রীকে তাহারা ধরিয়া লইয়া আসিল, তোমার বাড়ীর লোকেরা তাহা জানে?

উত্তর।—বাড়ীর নিকটে জনকতক পাইক বেড়াইয়াছিল, বাড়ীর লোকেরা তাহাই দেখিয়াছে, আমার স্ত্রীকে ধরিয়া আনিতে দেখে নাই।

প্রশ্ন।—কি কারণে পুরন্দরবাবুর পাইকেরা তোমার বাড়ীর ধারে গিয়াছিল, তাহা তুমি বলিতে পার?

উত্তর।—আমি পুরন্দরবাবুর প্রজা, এক-শ বিঘা জমী রাখি, দুই বৎসরের খাজনা দিতে পারি নাই, তাগাদা করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে দুই এক জন পাইক যায়, তাহা জানি, কিন্তু সেদিন অনেক পাইক কি করিতে গিয়াছিল, তাহা জানি না, আমি বাড়ীতে ছিলাম না।

প্রশ্ন।—আনন্দ সর্দ্দার ও ভরত মণ্ডল তোমার বাড়ীতে গিয়া তোমাকে ঐ সংবাদ দিয়াছিল কিম্বা আর কোথাও তাহাদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে?

উত্তর।—তাহারা আমার বাড়ীতে যায় নাই, আমাদের গ্রামের নিকটস্থ শীতলপুর গ্রামে ঠাকুরদাস মাইতির বাড়ী, সেই বাড়ীতে আমাদের একটা নিমন্ত্রণ ছিল, আমি সেই নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেইখানে উহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, উহারা আমাকে গোপনে ডাকিয়া ঐ কথা বলে।

প্রশ্ন।—গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিল, আর কেহ তাহা শুনিতে পায় নাই?

উত্তর।—যখন তাহারা আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়, তখন আর কেহ আমাদের সঙ্গে যায় নাই, যখন তাহারা বলে, তখন তিনজন লোক সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন।—তাহাদের নাম কি?

উত্তর।—যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, সেই বাড়ীর কর্ত্তা ঠাকুরদাস মাইতি, প্রতিবাসী জহর খানাদার ও তিনকড়ি নাইয়া।

ভৃগুরামকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ব্যারিষ্টার তখন আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না, ভৃগুরাম বিদায় পাইল, প্রথম সাক্ষীর তলব। প্রথম সাক্ষী আনন্দ সর্দ্দার। ব্যারিষ্টার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

প্রশ্ন।—তোমার নাম কি?

উত্তর।—আনন্দিরাম সর্দ্দার।

প্রশ্ন। তুমি কি কার্য্য কর?

উত্তর।—পুরন্দরবাবুর বাড়ীর রাখাল।

প্রশ্ন।—এই মকদ্দমার ফরিয়াদী ভৃগুরাম নাগের স্ত্রী প্রসন্নমুখী নাগকে পুরন্দরবাবু আপন বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান?

উত্তর।—জানি।

প্রশ্ন।—কিরূপে জানিয়াছিলে?

উত্তর।—পুরন্দরবাবুর গোয়ালবাড়ীতে আমরা থাকি, একদিন সন্ধ্যাকালে আমি আর ভরত মণ্ডল গরুর জাব দিবার জন্ত বিচালী আনিতে যাই। যে ঘরে বিচালী থাকে, সে ঘরে কোন মানুষ থাকে না, ঘরে সর্ব্বদা চাবী দেওয়া থাকে; চাবী খুলিয়া আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের এক কোণে একজন মেয়েমানুষ।

প্রশ্ন।—সন্ধ্যাকালে অন্ধকারে কেমন করিয়া দেখিয়াছিলে?

উত্তর।—আমার হস্তে একটা হাতলণ্ঠন ছিল।

প্রশ্ন।—লণ্ঠনের আলোতে দেখিতে পাইলে একজন মেয়েমানুষ; সেই মেয়েমানুষ যে ভৃগুরাম নাগের স্ত্রী প্রসন্নমুখী, তাহা তোমরা কিরূপে চিনিলে?

উত্তর।—যে গ্রামে ভৃগুরামের বাস, আমরাও সেই গ্রামের লোক, ভৃগুরামের বাড়ীর সকল স্ত্রীলোককেই আমরা চিনি।

প্রশ্ন।—যখন দেখিলে, তখন সেই স্ত্রীলোককে তোমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

উত্তর।—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি এখানে কেন? প্রসন্নমুখী উত্তর দিয়াছিল, বাবুর লোকেরা আমায় ধরিয়া আনিয়া এইখানে আটক রাখিয়াছে।

প্রশ্ন।—কোন্ মাসের কোন্ দিন সন্ধ্যাকালে তোমরা প্রসন্নমুখীকে সেই ঘরে দেখিয়াছিলে, তাহা তোমার স্মরণ আছে?

উত্তর।—তারিখ স্মরণ হয় না, বর্ষাকাল, শ্রাবণমাস, সে কথা আমার মনে আছে।

প্রশ্ন।—সেই স্ত্রীলোক কত দিন সেই ঘরে কয়েদ ছিল, তাহা তুমি জান?

উত্তর।—সন্ধ্যাকালে আমরা দেখিয়াছিলাম, ভোরে উঠিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

প্রশ্ন।—বিচালী লইয়া তোমরা আবার সেই ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে ?

উত্তর।—না ;—ভুল হইয়াছিল।

প্রশ্ন।—পুরন্দরবাবু প্রসন্নমুখীকে খুন করিয়াছেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছ ?

উত্তর।—না।

প্রশ্ন।—প্রসন্নমুখী কোথায় গিয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ ?

উত্তর।—না। সে রাত্রে প্রসন্নমুখী কতক্ষণ সে ঘরে ছিল, কখন্ বাহির হইয়া গিয়াছিল, কেহ তাহাকে লইয়া গিয়াছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। যে ঘরে বিচালী থাকে, সে ঘরের অনেক তফাতে অন্যঘরে আমরা শয়ন করি।

প্রশ্ন।—বাবুর গোয়ালবাড়ীতে তোমরা ক-জন থাক ?

উত্তর।—বারো জন।

প্রশ্ন।—কেবল তোমরা দুই জনেই প্রসন্নমুখীকে দেখিয়াছিলে, আর দশজন দেখে নাই, তাহারা কোথায় ছিল ?

উত্তর।—তাহারা অন্য ঘরে ছিল, তাহারা বিচালীর ঘরে যায় না। আমি আর ভরত মণ্ডল এই দুইজনে গরু-সেবা করি, বাকী লোকেরা চাষের কাজ করে। আমরা দুজনেই বিচালী আনিতে গিয়াছিলাম।

প্রশ্ন।—বিচালীর ঘরে তোমরা মেয়েমানুষ দেখিয়াছিলে, যাহারা চাষের কাজ করে, তাহাদের কাছে সে কথা বল নাই ? বাড়ীর আর কাহাকেও কিছু বল নাই ?

উত্তর।—না, ভয় হইয়াছিল।

প্রশ্ন।—শীতলপুর গ্রামে, ঠাকুরদাস মাইতির বাড়ীতে ভৃগুরামের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ভৃগুরামকে তোমরা ঐ কথা বলিয়াছিলে, সেখানে আর কে কে ছিল ?

উত্তর।—ঠাকুরদাস মাইতি, জহর থানাদার, তিনকড়ি নাইয়া।

প্রশ্ন।—গোপনে বল নাই ?

উত্তর।—গোপনে বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিবার সময় ঐ তিন জন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

আনন্দ সর্দ্দার বিদায় পাইল। ভরত মণ্ডল সাক্ষী হইল। ভরত মণ্ডলের সকল কথাই আনন্দ সর্দ্দারের কথার ন্যায়, কেবল একটী কথার গরমিল হইল। ভরত মণ্ডল বলিল, শ্রাবণমাসের শেষে কি ভাদ্রমাসের প্রথমে তাহারা প্রসন্নমুখীকে সেখানে দেখিয়াছিল।

যাহারা লোকের মুখে শুনিয়া কোন মকদ্দমায় সাক্ষ্য দান করে, তাহাদের সাক্ষ্যবাক্য আদালতে গ্রাহ্য হয় না, ইহাই ইংরাজী আইনের মর্ম্ম; তথাপি আসামীর বারিষ্টার সেই প্রকারের তিন জন সাক্ষীর উপর জেরা করিতে চাহিলেন। সেদিন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, এজলাস ভঙ্গ হইল, কার্য্য বাকী থাকিল। পরদিন বাকী তিন জন সাক্ষীর উপর জেরা করা হইবে, স্থির হইয়া রহিল। বারিষ্টারেরা একদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মক্কেলেরা দ্বিতীয় দিবসের ফী অতিরিক্ত প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় হইতে দিলেন না।

আদালত বন্ধ হইবার পর পুরন্দরবাবু আপন পক্ষের বারিষ্টারের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আবশ্যকমত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আপন আলয়ে প্রতি-গমন করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর। দর্পনারায়ণবাবুর বাড়ীতে আট দশ জন লোক একত্র হইয়াছেন। বৈঠকখানার মজলীস। দর্পনারায়ণবাবুর বদন প্রফুল্ল, কথায় কথায় মহোৎসাহ প্রকাশ। একজন বলিলেন, "বাবুর সঙ্গে কাহার তুলনা? এত বড় একটা কাণ্ড বাধাইয়াছেন, কেহই কিছু জানিতে পারে নাই। ভৃগুরাম তো ভৃগুরাম, কোথাকার ভৃগুরাম, বাবু যেন কিছুই জানেন না, ঠিক সেই ভাবে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র হইতেছে।" আর একজন বলিলেন, "জানিতে পারিলে তবে আর বাহাদুরী কি? বাবুর বুদ্ধির কাছে কি হাবুলী বাবুলীর বুদ্ধি খাটে? এইবার বাবুলীর গো অক্কা পাবেন। সাফ্ সাফ্ প্রমাণ। দেশের পুলিশ যাঁহার পক্ষে সহায়, নিশ্চয়ই তাঁহার জয়লাভ।" কাণে কলম গুঁজা একজন বৃদ্ধ লোক একটু তফাতে বসিয়া অল্প উচ্চস্বরে বলিল, "বাবুলী পক্ষের কোন কোন লোক একটা তর্ক তুলিয়াছে। এই মকদ্দমার ভিতর আমাদের বাবু আছেন, এই কথাটা তাহারা প্রমাণ করাইবার চেষ্টা পাইবে।

একটু হাস্য করিয়া বাবু বলিলেন, "কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের জাতি। কায়স্থের বুদ্ধি কেবল মারপ্যাঁচের দিকেই বেশী খেলে। কি বুদ্ধি তুমি বাহির করিয়াছ, কিরূপ তর্ক তাহারা তুলিয়াছে, কিসে আমাকে ফাঁসাইবে? বালী সুগ্রীবে যখন যুদ্ধ হয়, রামচন্দ্র পশ্চাতে লুকাইয়া আছেন, বানররাজ বালী কি তাহা জানিতে পারিয়াছিল?"

যে লোকটীর কাণে কলম গোঁজা, সে লোকটী ঐ বাড়ীর পুরাতন সরকার। বাবু যখন ছোট, তখন অবধি তিনি ঐ বাড়ীতে কাজ করিতেছেন। বাবু একজনের পোষ্যপুত্র। সরকার তাঁহাকে ছোটবেলা হইতে আদর করিয়া থাকেন। রামায়ণের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়া বাবুকে তিনি বলিলেন, "সে কথা বটে, সে কথা বটে। আপনি আমাদের দ্বিতীয় রামচন্দ্র, সকলেই সে কথা বলেন, কিন্তু তাহারা যে তর্ক তুলিয়াছে, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা নয়। তাহারা পরামর্শ করিতেছে, এই মকদ্দমার সঙ্গে আপনাকে জড়াইবে।"

একটু বিরক্ত হইয়া বাবু বলিলেন, "কিসে? কিসের মধ্যে আমি আছি? শিলাপুরের ভূতরাম নাগ পুরন্দর বাবুদের প্রজা; শিলাপুর আমি কখনও দেখিও নাই, ভূতরামকেও কখন চিনি না। ভূতরামের মকদ্দমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ, কিসে তাহারা এ কথা প্রমাণ করাইবে? আমি যদি—"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় বাড়ীর একজন চাকর আসিয়া একধারে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, তিন দিন আমার খোরাকী নাই। দুই বৎসরের মাহিনা বাকী, সাতদিন অন্তর কিছু কিছু খোরাকী পাই, এইবার দশ দিন হইয়া গেল। আমি খাই কি?"

মনে মনে বিরক্ত হইলেও বাহিরে ঈষৎ হাস্য করিয়া, সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া উপহাসের স্বরে বাবু বলিলেন, "দাও হে, উহাকে দুই আনা পয়সা দাও। সত্যই ত, কাজ করিবে আবার, খাইতে যাইবে কোথায়? ধর্ম্মের দিকে চাহিতে হয়, ধর্ম্ম আমার বড় ভয়, লোকের কষ্টে আমার বড় দুঃখ হয়। ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আশ্রিত লোকের উপকার করা আমার নিত্য ধর্ম্ম; দাও, দাও—আগে দাও। সব যদি দিতে না পার, তহবিলে যদি বেশী না থাকে, দুই চারি পয়সা যদি কম হয়, তাই দাও। না দিলে বেচারা খাবে কি?—হাঁ, কি বলিতেছিলাম,—হাঁ,—কিসে আমাকে জড়াইবে? আমি যদি ভূতরামের পক্ষ হইয়া দাঁড়াইতাম,

তাহা হইলে আর কি আর ও মকদ্দমা মুলতুবী থাকিতে পায়? প্রমাণের আর বাকী কি? সাতটী বৎসর! সাতটী বৎসর!”

সরকার বলিলেন, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহারা বলিতেছে, ভৃগুরাম একজন সামান্য লোক, বিঘাকতক ঠিকা জমী চাষ করে, কোড়াদারী করিয়া দিন গুজরাণ করে, কলিকাতা সহর হইতে বারিষ্টার আনিল কিসের জোরে? কাহার জোরে?”

হাস্য করিয়া বাবু বলিলেন, “ওঃ! ঐ কথা! দুরন্ত লোককে জব্দ করিতে হইলে লোকে ভিটামাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও মকদ্দমা করিতে পারে। যেমন তেমন মকদ্দমা নয়, খুন্ করা। এ মকদ্দমায় একটা বারিষ্টার কেন, দশটা বারিষ্টার আনিতেও লোকে কাতর হয় না। ও কথা ছাড়িয়া দাও। কল্য এত-ক্ষণে তোমরা সকলেই শুনিতে পাইবে, পুরন্দরের দফা রফা। এখানকার সকল লোকেই জানে, আমার একজন প্রজা আমার শত্রু হইয়াছিল, এক রাত্রের মধ্যে আমি তাহার ভিটা-মাটী চাটি করিয়া কচুগাছ বসাইয়াছিলাম।”

বাবুকে বেষ্টন করিয়া যাঁহারা বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া বাবুর জয়গান করিতে লাগিলেন, কত শত মকদ্দমার নজীরের কথা তুলিয়া বাবুকে স্তবকে স্তবকে ফুলাইয়া দিলেন। অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া বাবু তখন ভুঁড়ী নাচাইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর মজ্‌লীস ভঙ্গ হইল।

গৃহিণী তখনও জাগিয়া ছিলেন। দর্পনারায়ণ অন্দরে প্রবেশ করিলে গৃহিণী কহিলেন, “এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে আর গাঁয়ের লোকের মাথাব্যথা।—বাবুনীদের মকদ্দমা, তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত সেই কথা নিয়ে কিসের ঘোঁট্ কোচ্ছিলে?”

দর্পনারায়ণ কহিলেন, “পরম শত্রু! পরম শত্রু! শত্রুনিপাত হওয়াই মঙ্গল। কল্য পুরন্দরকে জেলখানায় পাঠাইয়া আমি সত্যনারায়ণের সিন্নী চড়াইব। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিল, ইহা অপেক্ষা মঙ্গল আর কি আছে?”

পুরন্দর বাবুনীকে দর্পনারায়ণের স্ত্রী শত্রু বলিয়া জানিতেন না। স্বামীর শেষ-কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “ষাঁড়ও জানি, বাঘও জানি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জেলে পাঠাইয়া তোমার যে কি মঙ্গল হইবে, তাহা আমি জানি না।”

স্ত্রী-পুরুষে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, সে সকল কথার সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। আহ্লাদে দর্পনারায়ণের নিদ্রা হয় নাই, সমস্ত রাত্রি

জাগিয়া জাগিয়া তিনি পরদিনের নূতন নূতন যোগাড়যন্ত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। গর্ভবতী রজনী পরদিন প্রভাতে কি প্রসব করিবে, মানুষেরা তাহা জানিতে পারিল না। রজনী অবসান হইয়া গেল।

মঙ্গলবার। বেলা দশটার সময় আদালত বসিল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় আদালত লোকারণ্য হইল, গুমী মকদ্দমা উঠিল। যে তিনজন সাক্ষীর জেরা বাকী ছিল, আসামীর বারিষ্টার সেই তিনজনকে সামান্য সামান্য গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ফরিয়াদীর এজাহারের সহিত সাক্ষীগণের বাক্যের যেখানে যেখানে অনৈক্য, সেই সকল স্থলের উল্লেখ করিয়া বারিষ্টার মহাশয় জজসাহেবকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন, বেলা প্রায় একটা বাজিয়াছিল, এমন সময় আদালতের বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। কিসের গোলমাল, জজসাহেব তাহা জানিবার জন্য একজন চাপরাসীকে হুকুম দিতেছিলেন, ইত্যবসরে একজন উকীলের সঙ্গে একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক এজলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কে এই স্ত্রীলোক ?—প্রসন্নমুখী নাগ। যে উকীল তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, জজ সাহেবকে তিনি বলিলেন, "যে স্ত্রীলোককে গুম্ করা হইয়াছে বলিয়া এই মকদ্দমা হইতেছে, এই সেই স্ত্রীলোক।"

আদালতস্থ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন। একপক্ষের বদন বিবর্ণ, অন্যপক্ষ প্রফুল্ল। জজসাহেবের আদেশে আসামীপক্ষের প্রধান উকীল সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? পুরন্দরবাবু তোমাকে গুম করিয়াছিলেন, একরাত্রি তাঁহার গোয়ালবাড়ীতে আটক থাকিয়া তাহার পর তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

হাকিমের সম্মুখে লজ্জা করিয়া ঘোম্‌টা দিয়া থাকিলে চলিবে না, হাকিমের আদেশে অগত্যা প্রসন্নমুখীকে ঘোম্‌টা খুলিতে হইল। হাকিম তখন ভৃগুরামকে ডাকাইয়া, প্রসন্নমুখীকে দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ-দেখি, এই স্ত্রীলোক তোমার স্ত্রী কি না ?" একটু কম্পিত হইয়া ভৃগুরাম উত্তর করিল, "আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, এই আমার স্ত্রী, ইহারই নাম প্রসন্নমুখী।"

মন্ত্রমত হলপ পাঠ করিয়া উকীলের প্রশ্নে প্রসন্নমুখী বলিল, "পুরন্দরবাবু আমাদের জমীদার, তাঁহার গোয়ালবাড়ীতে আমি যাই নাই, তাঁহার লোকেরাও

আমায় ধরিয়া আনে নাই। আমি একদিন আমাদের খিড়কীর ঘাটে বাসন মাজিতেছিলাম, নিকটে কেহ ছিল না, হঠাৎ জনকতক লোক আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া একখানা পাল্‌কীতে তুলিয়া লইয়া আইসে, একটা বাড়ীতে আনিয়া রাখে। কাহার বাড়ী, আগে আমি তাহা জানিতে পারি নাই, শেষে জানিয়াছিলাম, দর্পনারায়ণবাবুর এক্‌জন গোমস্তা রামকুমার ভট্টাচার্য্য; তাঁহারই সেই বাড়ী। রামকুমারকে আমি দেখি নাই, তাঁহার এক ভাই বীরভদ্র ভট্টাচার্য্য, তিনিই আমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, বাহির হইতে দিতেন না, স্নানাদি নিত্যকর্ম্মের জন্য যখন বাহির হইতাম, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তখন পাহারা থাকিতেন, ঘোমটা দিয়া থাকিতাম, বাহিরের কোন লোক আমার মুখ দেখিতে পাইত না। বীরভদ্রের স্ত্রী নিত্য নিত্য আমাকে বলিতেন, দর্পনারায়ণবাবু বড়লোক, তিনি আমার জন্য ভিন্নস্থানে স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া দিবেন, অনেক টাকার গহনা দিবেন, খুব সুখে রাখিবেন, আমার কোন কষ্ট থাকিবে না। কথাগুলা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিতাম, তাহার পর শুনিলাম, আমার জন্য মকদ্দমা হইতেছে, পুরন্দরবাবু আমার জন্য বিপদে পড়িয়াছেন, যাহারা আমার কাছে মকদ্দমার গল্প করিত, গত কল্য তাহাদের একজনের মুখে শুনিলাম, আমার জন্য পুরন্দরবাবু দায়মালে যাইবেন, আজ নাকি সেই বিচারের শেষদিন। আমার জন্য আজ একজন বৃদ্ধব্রাহ্মণ বিনা দোষে দায়মালে যান, বড়ই পাপের কার্য্য, ইহা ভাবিয়া বাড়ীর লোকেরা কেহ জাগিবার অগ্রে ভোরবেলা চুপি চুপি খিড়কীর দরজা খুলিয়া আমি পলাইয়া আসিয়াছি। যে বাড়ীতে ছিলাম, এই শিউড়ীর নিকটেই সেই বাড়ী, গ্রামের নাম আমি জানি না। প্রায় চারিমাস সেই বাড়ীতে আমি ছিলাম।”

উকীলের প্রশ্নে ও জেরা-প্রশ্নে থামিয়া থামিয়া প্রসন্নমুখী একে একে ঐ কথাগুলি বলিল। সমস্ত লোক চমৎকৃত।

বাবু পুরন্দর বাবুজী বে-কসুর খালাস পাইলেন। মকদ্দমার শ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর সাক্ষীগণ ফৌজদারীতে অর্পিত হইল। দর্পনারায়ণ এবং বীরভদ্র এই নূতন ফৌজদারী মকদ্দমার সহিত জড়িত হইবেন কি না, মকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া তাহা স্থির করা হইবে।

যাহারা ভিতরের খবর জানিত, তাহারা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল,

"এত পাপ সহ্য হইবে কেন? দর্পনারায়ণের টাকার জোরেই ঐ মিথ্যা মকদ্দমা উঠিয়াছিল। আগাগোড়া মিথ্যা। ভৃগুরাম টাকা পাইয়াছিল, সাক্ষীরা টাকা পাইয়াছিল, উকীলেরা টাকা পাইয়াছিলেন, বারিষ্টার টাকা পাইয়াছিলেন, সমস্তই দর্পনারায়ণের টাকা। পুলিশের লোকেরা কিছু কিছু সেলামী পাইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ পায় নাই। পুরন্দরবাবুর বাড়ীর রাখাল আনন্দ সর্দ্দার ও ভরত মণ্ডল উভয়েই দর্পনারায়ণের টাকা খাইয়া চাকরী ছাড়িয়াছিল, তাহাও প্রকাশ পাইল।

বাবু পুরন্দর বাবুলী প্রায় খুনদায়ে পড়িতেছিলেন, প্রসন্নমুখী তাঁহাকে রক্ষা করিল। মকদ্দমায় সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুরন্দরবাবু প্রসন্নমুখীকে কিছুদিন আপন বাড়ীতে আনিয়া স্থান দিলেন, সহস্রমুদ্রা পুরস্কার দিলেন, আপন কন্যার ন্যায় যত্নে রাখিলেন। প্রসন্নমুখীকে দেখিলেই তিনি মনে করিতেন, এই প্রসন্নমুখী প্রকৃতই অমৃতমুখী। নাগের পত্নী নাগিনী হয়, ভৃগুরাম নাগের পত্নী প্রসন্নমুখী নাগিনী। নাগিনীদের মুখে হলাহল থাকে, এই নাগিনীর মুখে অমৃত বর্ষে। কিছুদিন আপন বাড়ীতে যত্নে রাখিয়া প্রসন্নমুখীকে তিনি তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। প্রসন্নমুখী স্বামীগৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল না।

ওদিকে ফৌজদারী আদালতে নূতন মকদ্দমা;—মূল মকদ্দমার পাল্টা মকদ্দমা। একে একে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল, গোড়া পর্য্যন্ত টান পড়িল। বাবু দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী আর বীরভদ্র ভট্টাচার্য্য আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। পাছে আবার রামকুমার ভট্টাচার্য্যকে তলব হয়, সেই ভয়ে রামকুমার দেশ ছাড়িয়া পলাইল। পুরন্দরবাবুকে জেলে অথবা দায়মালে পাঠাইয়া দর্পনারায়ণ সত্যনারায়ণের সিন্নী দিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সত্যনারায়ণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার সিন্নী গ্রহণ করিলেন না। ধর্ম্মের কর্ম্ম ধর্ম্মই সম্পাদন করেন, ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজিয়া উঠে। প্রসন্নমুখীকে কেহ আদালতে হাজির করে নাই, ধর্ম্মের উপদেশে প্রসন্নমুখী নিজেই হাজির হইয়াছিল।

দায়রার মকদ্দমার প্রথমদিন রজনীযোগে দর্পনারায়ণবাবু আপন বাড়ীতে মজলীস করিয়া দশজনের নিকটে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল, উপকার পাইত বলিয়া তাহারা তাঁহার খোসামোদ করিত; অন্তরে অন্তরে তাহারা কেহই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। সেই

সকল লোকের মধ্যেই একজন দর্পনারায়ণের ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় এক বেনামী চিঠিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল ; সেই লোকের মুখেই সকলে শুনিল, এইবার দর্পনারায়ণের দর্প চূর্ণ।

ইংরাজী আদালতে সুবিচার হয়, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। সুবিচার হয় বলিয়াই যে একেবারে অবিচার হয় না, এমন প্রমাণ কিছুই জানা নাই। সাক্ষীর মুখে মকদ্দমা ; টাকার জোরে সাক্ষী সাজাইতে পারিলে অনেক মিথ্যা মকদ্দমায় নির্দ্দোষ লোকের দণ্ড হয়, টাকার জোরে সত্য মকদ্দমায় অনেক বড় বড় অপরাধী খালাস পাইয়া যায়। মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প, তাহাও বলা যায় না ; সমস্ত মিথ্যা মকদ্দমায় মিথ্যা ধরা পড়ে, এ কথাও ঠিক নহে। হাকিমেরা মিথ্যা বুঝিলেও সাক্ষীগণের দক্ষতার নিকটে তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ব্যর্থ হইয়া থাকে। মিথ্যা মকদ্দমায় নির্দ্দোষ আসামীর দণ্ড হয়, তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাওড়ার ঈশ্বর নাপিতের কন্যা-হত্যার মকদ্দমা। পুলিশের চক্রে ঈশ্বর নাপিতের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল। ঈশ্বর নাপিত আপন কন্যাকে খুন করিয়াছে, পুলিশের যোগাড়ে এইরূপ মকদ্দমা উপস্থিত হয়, বেশ প্রমাণও হয়। যে দিন ফাঁসী হইবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন সেই কন্যা দূরদেশ হইতে আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সমস্ত সত্যকথা ব্যক্ত করে। তাহাতেই তাহার পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। পুলিশের লোকেরা সাজা পাইয়াছিল।

আমাদের বিষয়-সংসার কতপ্রকারে বিকৃত হইতেছে, তাহা গণনা করা অনেক সময়-সাপেক্ষ। প্রকৃতিপুঞ্জের স্বত্বশান্তি-রক্ষার উদ্দেশে আদালত-সংস্থাপন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজদ্বারে আবেদন করিতে হইলে কাহারও কোন প্রকার অর্থ-ব্যয় হইত না, এখনকার নিয়মে মকদ্দমা করিতে পদে পদে অর্থ-ব্যয়। একজন বিষয়ীলোক একবার বলিয়াছিলেন, "ইংরাজের রাজ্যে সমস্তই সুখ, সমস্তই সুবিচার, কিন্তু রিক্তহস্তে বিচার পাওয়া যায় না, বিচার কিনিয়া লইতে হয়।" এ কথার অর্থ সকলেই বুঝিবেন। অর্থ ব্যতিরেকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপায় নাই, দুঃখ জানাইবার উপায় নাই। মকদ্দমা করা কেবল টাকার খেলা। রাজপ্রণীত ব্যবস্থানুসারে রাজার যাহা প্রাপ্য, তাহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার উপসর্গ। আদালতে যাহারা চাকরী করে, কি আমলা, কি পেয়াদা, কি পোদ্দার, কি দপ্তরী, কি চাপরাসী, কি আরদালী, কি শিক্ষানবীশ,

আসামী ফরিয়াদী দেখিলে সকলেই অগ্রে দক্ষিণহস্ত বিস্তার করিয়া থাকে, সকলেই কিছু কিছু পূজা চায়; পূজা না দিলে সহজে কাজ পাওয়া যায় না। এই কারণে বে-আইনী হইলেও সকলেই তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা দিতে বাধ্য। এ দেশের লোক এই আমলে অতিশয় মকদ্দমাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজে কাজে দিন দিন আদালতের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, স্থানে স্থানে নূতন নূতন মহকুমা বসিতেছে, মকদ্দমা বাড়িতেছে। মকদ্দমা করা একটা কৌতুক। নিকটে মহকুমা পাইলে গ্রাম্যলোকেরা ঘন ঘন মকদ্দমা উপস্থিত করে। কে জানে সত্য, কে জানে মিথ্যা, মকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিলেই বীরত্ব প্রকাশ পায়, ইহাই অনেক লোকের ধারণা হইয়াছে। প্রতিবাসী লোকের সহিত সামান্য কলহ হইলেও, কেহ কাহাকে একটী চপেটাঘাত করিলেও কিম্বা না করিলেও গাছের আটা লাগাইয়া অঙ্গে ঘা করিয়া কিম্বা জ্বলন্ত অঙ্গারে আপন অঙ্গ দগ্ধ করিয়া কেহ কেহ আদালতে গিয়া দাঁড়ায়। মহকুমার মোক্তারেরাও বিলক্ষণ ধড়ীবাজ, দরখাস্তের বয়ান তাহাদের কণ্ঠস্থ, ইচ্ছামত দক্ষিণা লইয়া এক এক খণ্ড মূল্যবান্ কাগজে খর্ খর্ করিয়া লিখিয়া দেয়, "ধর্ম্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু। অধীনের নিবেদন এই যে, অমুক অমুক আসামীগণ কিল, চড়, লাথি ইত্যাদি দ্বারা আমাকে মারপিট করিয়া জখম করিয়াছে, নীচের লিখিত সাক্ষীগণ আগুয়ান হইয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, অতএব দরখাস্ত করিয়া প্রার্থিত যে, আসামী সাক্ষী তলব করিয়া বিচার আজ্ঞা হয়, হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।"

ঐরূপ দরখাস্ত এত অধিক হয় যে, একজন বিচারক একদিনে সকল দরখাস্ত শুনিয়া উঠিতে পারেন না। মফস্বলের চাষা লোকেরা পূর্ব্বে আদালত জানিত না, সাহেব দেখিলে, পেয়াদা দেখিলে ভয় পাইত, এখন তাহারাও ঘোরতর আইনবাজ হইয়া উঠিয়াছে; কথায় কথায় মকদ্দমা রুজু করে। দেওয়ানী ফৌজদারী দুই দিকেই গুলজার। আইনকর্ত্তারা নিত্য নিত্য নূতন নূতন আইন করিয়া মকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। জমীদারেরা খাজনার জন্য প্রজার বাড়ীতে পাইক-পেয়াদা পাঠাইতে পারিবেন না, খাজনা বাকী পড়িলে আদালতে নালিশ করিয়া আদায় করিতে হইবে। এই আইনের গুণে মুনসেফ ও ডেপুটী কালেক্টরদিগের কাছারীতে কত মকদ্দমা বাড়িয়াছে, যাঁহারা আদালতের

রিপোর্ট পাঠ করেন, তাঁহারাই তাহা জানেন। মকদ্দমার জোরে আদালত চলে, চলিয়াও সরকারের লাভ হয়, এদিকে কিন্তু মামলাবাজ লোকেরা নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছে; অনেক লোকের ঘরে অন্ন নাই, অথচ মকদ্দমা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। মকদ্দমাতে যে কত খরচ, যাহারা মকদ্দমা করে, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারে। অনেক ধনবান্ লোক ক্রমাগত মকদ্দমা করিয়া দেউলে হইয়া যাইতেছেন। যে সকল মকদ্দমায় উভয়পক্ষে জিদাজিদি থাকে, সে সকল মকদ্দমার খরচ কেহ গণনা করিতে পারেন না। যে দেশের অধিক লোক মামলাবাজ, যে দেশে মকদ্দমার খরচ অপরিমিত, সে দেশের মঙ্গল অবশ্যই সুদূর-পরাহত।

জনপদের শান্তিরক্ষার উদ্দেশে পুলিশের সৃষ্টি। পুলিশের লোকেরা বদ্‌মাস্-দমনে যতদূর দক্ষ, নির্দ্দোষ ভদ্রলোকগণকে পীড়ন করিতে তদপেক্ষা বহুগুণে নিপুণ। পুলিশ দেখিলে সাহস হওয়াই সম্ভব, কিন্তু পুলিশের ব্যবহার দেখিয়া পুলিশের নামে ভদ্রলোকের ভয় হয়; ইহা বড় ভয়ঙ্কর কথা। পেশাদার বদ্‌মাস্ লোকেরা পুলিশকে ভয় করে না, পুলিশকে পয়সাও দেয় না। নিরীহ ভদ্র-লোকেরা মানের ভয়ে পুলিশ-পূজা করেন। মফস্বলের পেন্‌সন্-প্রাপ্ত দুইজন পুরাতন দারোগা একস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, "পেন্‌শন্ লওয়া আমাদের দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে, চাকরীতে আমাদের বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল, একজন রাজ-পুত্রকেও 'খাড়া রও' বলিয়া দাঁড় করাইতে পারিতাম। বেতনের টাকা আমরা গ্রাহ্য করিতাম না। উপরিলাভেই আমাদের ঐশ্বর্য্য ছিল; চোরডাকাত ধরিলে কিম্বা খুনের তদারক করিলে আমাদের বড় একটা আমোদ হইত না। আমোদ হইত অপঘাত-মৃত্যুর তদারকে। সাপে কাটা, জলে ডোবা, গলায় দড়ী, বিষ খাওয়া ইত্যাদি তদারকে গৃহস্থের উপর জুলুম করিতে পারিলে বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হয়, সেই লাভে আমরা বড় খুসী থাকিতাম। ধরাবাঁধা পেন্‌সনের টাকায় আমাদের কিছুই সুখ হয় না।"

পুরাতন দারোগারা যে জন্য আক্ষেপ করেন, যে কথা তুলিয়া আমোদ করেন, এখনকার নূতন দারোগাদের মধ্যে তেমন লোক নাই, গর্ব্ব করিয়া এমন কথা আমরা বলিতে পারিব না। আথেজ প্রযুক্ত কেহ কোন ভদ্রলোকের নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইলে পুলিশ সেই ভদ্রলোকের উপর যেরূপ দৌরাত্ম্য করে,

চোরডাকাতের উপর ততদূর করিতে পারে না, করিলে কোন ফল নাই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে। যাঁহারা বেতন দিয়া পুলিশ পোষণ করেন, একটু কিছু সূত্র পাইলে তাহাদের উপরেই পুলিশের উপদ্রব বেশী হয়, বিনা সূত্রেও হইয়া থাকে। প্রবল প্রবল ধূর্ত্তলোকেরা পুলিশের পূজা দিয়া আপনাদের বিরাগভাজন নিরীহ ভদ্রলোকগণকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে পারে। পুলিশের নামে আমাদের বিষয় সংসার টল্ টল্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বাবু পুরন্দর বাবুলী বৃদ্ধাবস্থায় পুলিশের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া, গুরু অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া, ধর্ম্মের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিয়াছে। পাল্‌টা মকদ্দমায় আসামীদের কি হয়, তাহা দেখিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। লোকের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, কলিকাতার বিষয়-সংসার খুব ভাল। সেখানে হিংসা-দ্বেষ, রেষারিষি বেশী নাই, মামলা-মকদ্দমা বেশী নাই। পুলিশের উপদ্রব কম। নগরবাসিদের রোগের যন্ত্রণা অনেক অল্প। বিদ্যার চর্চ্চা অধিক, ধর্ম্মের আলোচনা অধিক, ভদ্রলোক অধিক, সাধুসঙ্গ সুলভ : এই সকল শুভকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিছুদিন কলকাতায় বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর বাটীর ও বিষয়কর্ম্মের ভার সমর্পিত রহিল।

কলিকাতায় আসিয়া পুরন্দরবাবুকে বাড়ীভাড়া করিতে হইল না, শাঁখারী-টোলা অঞ্চলে তাঁহার নিজের একখানি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে তিনি বাসা করিলেন। তিনি একাকী আসেন নাই, তাঁহার যে তিনটী পুত্র অল্পবয়স্ক, স্বদেশে তাহাদের রীতিমত লেখাপড়া-শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছিল, সেই তিনটীকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন; বাড়ীর একজন সরকারও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। রন্ধন করিবার নিমিত্ত স্বগ্রামের একটী দরিদ্র বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে আনয়ন করা হইয়াছে। দূরস্থ পল্লীগ্রামের শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নূতন কলিকাতায় আসিয়া বাসাবাড়ীর কাজকর্ম্ম করিতে শীঘ্র পটু হইতে পারে না, সেইজন্য তিনি বাড়ীর কোন দাসীকে কলিকাতায় আনেন নাই, কেবল একজন বিশ্বাসী চাকরকে আনিয়াছেন। বাসার কার্য্য করিবার জন্য নিকটস্থ পল্লীর দুইজন দাসীকে নিযুক্ত করা হইল, শৃঙ্খলামত কার্য্য চলিতে লাগিল, ছেলে তিনটীকে

তিনি বৌবাজারের বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হইয়া গেল।

একমাস থাকিতে থাকিতে পাড়ার অনেকগুলি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। তাঁহারা অবসরক্রমে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া নানাপ্রকার গল্প করেন, সহরের নূতন নূতন ঘটনার সংবাদ দেন, ধর্ম্মকথার আলোচনা হয়, খবরের কাগজ পাঠ হয়, এক একদিন সতরঞ্চখেলাও চলে। পুরন্দরবাবু বৃদ্ধলোক, যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহাদের সকলেরই বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক। যুবা বিম্বা বালক একজনও আইসে না, বালক তিনটীর শিক্ষার নিমিত্ত বাড়ীতে একজন পণ্ডিত রাখা হইয়াছে, পণ্ডিতের বয়সও পঞ্চাশ বৎসরের কম নহে।

মফস্বলের কোন রাজালোক কিম্বা বাবুলোক নূতন কলিকাতায় আসিলে শীঘ্র শীঘ্র সহরময় প্রচার হইয়া পড়ে। সেই সকল লোকের দানশক্তি অথবা সৎকার্য্যে আসক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইলে, নানা শ্রেণীর নানা প্রকার ব্যবসায়ী-লোক প্রায় নিত্য নিত্য নানা অভিপ্রায়ে তাঁহাদের নিকটে সমাগত হন। পুরন্দরবাবুর বাড়ীতেও সেই প্রকারের অনেক লোক সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া থাকেন; বাবু তাঁহাদিগকে বিশেষ শিষ্টাচারে যথাযোগ্য সমাদর করেন।

পুরন্দরবাবুর জমীদারীর বার্ষিক আয় ১৬ হাজার টাকা, কলিকাতায় তাদৃশ ধনবানেরা "বড়লোক" বলিয়া সকলের নিকটে গণ্য হন না; কলিকাতা সহরে তাদৃশ ধনবান্ অল্প নাই, কিন্তু মফস্বল হইতে যে সকল জমীদার কলিকাতায় আইসেন, তাঁহারা যদি দুই পাঁচটা সৎকার্য্য দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের নামপ্রচার হয়। তাঁহাদের কাহার কত টাকা আয়, প্রায় কেহই সে খবর লইতে চাহেন না। মনোগত আশা-পরিপূরণের অভিলাষে অনেকেই তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া থাকে; কেহ কেহ খোসামোদ করিতেও ত্রুটি করেন না। পুরন্দরবাবু সেই প্রকারের অনেক লোক দেখিলেন; অনেকেই তাঁহার বন্ধু হইলেন।

পাঁচ মাস কলিকাতায় বাস করা হইল। বৃদ্ধলোকের বড় একটা তামাসা দেখিবার সখ থাকে না। যাদুঘর, পশুশালা, কেল্লা, হোটেল, খেম্‌টানাচ ইত্যাদি

দর্শনে পুরন্দরবাবুর সাধ হইল না। তিনি শুনিয়াছিলেন, কলিকাতা সহরে থিয়েটার আছে; থিয়েটার কিরূপ, তাহা দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়াতে দুই একজন বন্ধুর সহিত গাড়ী করিয়া কয়েকদিন তিনি থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র, সাবিত্রী, দক্ষযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি ধর্ম্মভাবপূর্ণ নাটকের অভিনয় দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইয়াছিলেন, অপরাপর বাজে নাটক ও আরব্য প্রহসনের অভিনয় তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। বিশেষতঃ থিয়েটারে বেশ্যারা নৃত্য করে, বেশ্যারা ভগবতী সাজে, সীতা সাজে, সাবিত্রী সাজে, কৃষ্ণ সাজে, এই সকল দেখিয়া তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। অধিকবার তিনি থিয়েটারে যান নাই।

বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম হয়, কেবল তামাক খাইয়া আর গল্প করিয়া নিত্য নিত্য সকলে উঠিয়া যান, বেশীদিন সেটা ভাল দেখায় না, ইহা বিবেচনা করিয়া পুরন্দরবাবু একদিন গুটীকতক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিশাকালে ভোজের নিমন্ত্রণ করিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই, দুই একবার মাত্র দেখা হইয়াছে, অথচ যাঁহারা সমাজমধ্যে মান্যগণ্য, তাদৃশ গুটীকতক ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হইল। সকলেই সমাগত হইলেন।

বাড়ীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, বাবু যে-ঘরে বসিতেন, সে ঘরটীও দিব্য প্রশস্ত, বাঙ্গালী কেতায় উত্তমরূপে সজ্জিত, অনূ্যন ৫০।৬০ জন লোকের বসিবার স্থান হয়। ঘরটী ভদ্রলোকে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবুর নিজের বসিবার উচ্চগদী ছিল না, ঘরজোড়া ঢালা বিছানা; সারি সারি অনেকগুলি তাকিয়া, প্রত্যেক তাকিয়ার সম্মুখে ও পার্শ্বে এক একটী বাঁধা হুঁকা। আহারের আয়োজন হইবার প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব। অতগুলি ভদ্রলোক দুই ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, নানাপ্রকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। দেশের গল্প অতি কম, বিদেশের কথাই বেশী। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ, জর্ম্মন-ফরাসীযুদ্ধ, বুয়র-যুদ্ধ, তুর্কীর সুলতান, কাবুলের আমীর, হায়দ্রাবাদের নিজাম, রুষ-জাপানের যুদ্ধ, লাট-সাহেবের ভ্রমণ, এই সকল কথা লইয়াই তাঁহার আমোদ চলিতে লাগিল। কেহ কেহ মাঝে মাঝে পক্ষাপক্ষ-বিচারে একএক টীপ্পনী ঝাড়িতে লাগিলেন। একধারে একটী তাকিয়া লইয়া পুরন্দরবাবু চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, যে সকল গল্প তিনি কখন শ্রবণ করেন নাই, সেই সকল গল্পের টীকা-টীপ্পনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সন্তোষ

জন্মিতেছিল কিম্বা অসন্তোষের উদয় হইতেছিল, অন্যলোকে তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

গল্প চলিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একটী নূতন লোক আসিতেছেন, সহরের দস্তুরমত তাঁহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে, সেই অবসরে ক্ষণেকের জন্য গল্পে বিরাম পড়িতেছে, এইরূপ মজলীস্।

গল্প বন্ধ হইল। নিমন্ত্রিতজনগণের মধ্যে যাঁহাদের সহিত যাঁহাদের আলাপ, তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ চলিল। যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে নানাশ্রেণীর লোক ছিলেন। উকীল, ডাক্তার, কবিরাজ, দারোগা, সেরেস্তাদার, কেরাণী,কেশিয়ার, মাষ্টার, পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য, খবরের কাগজের সম্পাদক, গ্রন্থকার, জমীদার, উমেদার এই প্রকার নানাশ্রেণীর ভদ্রলোক। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরী করেন, অতি অল্পলোক স্বাধীন। তাঁহারা সকলেই পরস্পর আপন আপন বৃত্তির পরিচয় দিলেন, পরিচয় লইলেন। যে সকল বন্ধুর সহিত অনেক দিন দেখা-শুনা হয় নাই, তাঁহাদের বন্ধুরা তাঁহাদিগকে শারীরিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক মঙ্গলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ ভাল, কেহ মন্দ বিশেষ বিশেষ উত্তর দিলেন। পার্শ্বে একটী ভদ্রলোককে দেখিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া একটী বাবু প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "এই যে ডাক্তারবাবু! ভাল আছেন ত? কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে?" ডাক্তারবাবু উত্তর করিলেন, "শরীর এক রকম আছে ভাল, কিন্তু বাজার বড় মন্দা।" একজন ভট্টাচার্য্য আর একজনের দ্বারা ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন, "বাজার বড় মন্দা।" একজন উকীল তাঁহার এক বন্ধুর প্রশ্নে উত্তর দিলেন, "বাজার বড় মন্দা।" একজন কবিরাজ একজন বন্ধুর প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "বাজার বড় মন্দা।" একজন দারোগাও একটী বাবুর প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "বাজার বড় মন্দা।"

কতকগুলি ব্যবসায়ী-লোক বাজার মন্দা বাজার মন্দা বলিয়া এক এক নিশ্বাস ফেলিলেন, কেবল কেরাণীরা ঐ কথাটার প্রতিধ্বনি করিলেন না। তাঁহাদের নিদ্রা জাগরণ একই প্রকার। উমেদারেরা চাকুরী অভাবে বিমর্ষ। অনেকেরই বিমর্ষভাব।

মজ্‌লীসের একজন রসিক পুরুষ সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমোদ করিতে আসিয়াছেন, বাজার মন্দা বাজার মন্দা বলিয়া নিশ্বাস ফেলা কেন?

ক্ষণেকের জন্য ও কথাটা কি ভুলিয়া থাকা যায় না? আমোদের মজ্‌লীসে বিমর্ষ-ভাব বড় অলক্ষণ। এ মজ্‌লীসে এই সময় খানিকক্ষণ গীতবাদ্য চলিলে ভাল হয়।”

পুরন্দরবাবু চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি গীতবাদ্য ভালবাসেন, কিন্তু সে বাড়ীতে যন্ত্রাদির অভাব; দুঃখিত হইয়া সেই কথাটা তিনি প্রকাশ করিলেন। রসিক লোকটী বলিলেন, “সেজন্য ভাবনা কি? এখনি নানা যন্ত্র আসিতে পারে।”

সে বাড়ীর অতি নিকটে একটী সৌখীন বাবুর বাড়ী, তিনিও সেই মজ্‌লীসে উপস্থিত ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, দশ মিনিটের মধ্যেই একটী হারমোনিয়ম আর একটী পাখোয়াজ আসিয়া মজ্‌লীসের শোভা বর্দ্ধন করিল। মজ্‌লীসে গায়কবাদকের অভাব ছিল না, অবিলম্বেই গীতবাদ্য আরম্ভ হইল।

একঘণ্টা গীত হইল। সঙ্গীতাবসানে ভোজনের আয়োজন। ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রি প্রায় একটার সময় গৃহস্বামীকে অভিবাদন পূর্ব্বক সকলে হৃষ্টচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পুরন্দরবাবু শয়ন করিয়া নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বে উদ্বিগ্নচিত্তে একটী বিষয় চিন্তা করিলেন, কিছুতেই মীমাংসা আনয়ন করিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পর পুরন্দরবাবু আপন বৈঠকখানায় একদিনও একাকী থাকেন না, প্রতিদিন দুই পাঁচটী, অন্তত দুটী একটী বন্ধু উপস্থিত থাকেন। ভোজের পরদিন সন্ধ্যার পর তিনটী ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে ছিলেন; সেই তিনজনের মধ্যে একজনের নাম নীলাম্বর বসু মল্লিক। পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্টে চাকুরী করিতেন, বয়স অধিক হওয়াতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারজ্ঞানে এবং সমাজতত্ত্ব দর্শনে তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা, বয়সে প্রবীণ, কার্য্যেও বহুদর্শী। তাঁহার সহিত পুরন্দরবাবুর কিছু বেশী প্রণয়।

চারিজনে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় একজন ভট্টাচার্য্য সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ললাটে করপুট স্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেন, “ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।” ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে নমস্কার-বিনিময় হইল। পূর্ব্বকথিত তিনটী ভদ্রলোকের মধ্যেও একজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন। নূতন ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া সেই ভট্টাচার্য্য স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “এসো তর্কবাগীশ ভায়া! মঙ্গল

ত সব? অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, হচ্চে কেমন? বাহিরের কাজকর্ম্ম চল্‌বে কেমন?"

নস্য গ্রহণ করিয়া নূতন ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "চল্‌চে ত চল্‌চে, কিন্তু বাজারটা ভারী মন্দা।"

বাবু সেই নূতন ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্বে একবারও দেখেন নাই। ভট্টাচার্য্যের উপাধি তর্কবাগীশ, এইমাত্র পরিচয় পাইয়া, সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, তিনি তাঁহাকে বসাইলেন, নীলাম্বরবাবু তর্কবাগীশকে প্রণাম করিলেন, তর্কবাগীশ অভ্যাসমত আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিলেন না।

দুটী একটী অশুদ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় গৃহস্বামীর সন্তোষ জন্মাইলেন। কোন বড়লোকের নিকটে নূতন উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্যেরা যেরূপ সদালাপ করেন, এই ভট্টাচার্য্যটীও পুরন্দরবাবুর সহিত সেইরূপ সদালাপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তোষামোদবাক্য থাকে, ভট্টাচার্য্যের রসনা সেরূপ বাক্য-বর্ষণেও কৃপণ হইল না। কি অভিপ্রায়ে আগমন, বাবুর এই প্রশ্নে ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আপনি দাতা, ভোক্তা, ধার্ম্মিক, আপনার কাছে আমার একটী প্রার্থনা আছে। পুত্রের উপনয়ন, আমার তাদৃশ সম্বল নাই, বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।"

সরকারকে ডাকিয়া বাবু সেই ভট্টাচার্য্যকে একটী টাকা দান করিবার আদেশ দিলেন, টাকাটী লইয়া নমস্কার করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইলেন, প্রস্থানকালেও নীলাম্বরবাবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ পাইলেন।

ভট্টাচার্য্য বিদায় হইবার পর পুরন্দরবাবু মনে মনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া নীলাম্বরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। গত রজনীতে ভোজনের অগ্রে, সঙ্গীতালাপের অগ্রে কতিপয় বন্ধুর পরস্পর যখন বাক্যালাপ হয়, নীলাম্বরবাবু তখন পুরন্দরবাবুর পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন, বন্ধুগণের বাক্যগুলি তাঁহারও কর্ণগোচর হইয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়া বাবু তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা। নীলাম্বরবাবু সেই লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া সমদৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গতরাত্রের কথা কি আপনার স্মরণ আছে? কতকগুলি বাবু সমবাক্যে বলিয়াছিলেন, বাজার বড় মন্দা! বাজার বড় মন্দা! আজিও

ঐ ভট্টাচার্য্য ঠাকুরটী একনিশ্বাসে বলিয়া গেলেন, "বাজারটা ভারী মন্দা!" ঐ সকল কথার অর্থ কি? কলিকাতা সহরের এ কি রঙ্গ? এই রকমেই কি এখানকার আলাপ চলে?"

অল্পহাস্য করিয়া নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "রঙ্গই বটে। সকলের আলাপ একরূপ নহে, কিন্তু কতকগুলি ব্যবসায়ীলোক আজকাল ঐরূপ ধূয়া ধরিয়াছেন। কল্য যাঁহারা যাঁহারা বাজার মন্দা বলিয়াছেন, তাঁহারা কে কি কাজ করেন, তাহা আপনি শুনিয়াছেন। উকীল, ডাক্তার, কবিরাজ, দারোগা আর একজন ভট্টাচার্য্য। তাঁহাদের মনের কথা আমি আপনাকে বুঝাইব। উকীল বলিয়াছেন, বাজার মন্দা!—ইহার অর্থ এই যে, যত লোক এখন মকদ্দমা করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত রোজগার হইতেছে না, রাজ্যের সমস্ত লোক মকদ্দমায় মাতিয়া উঠিলে তাঁহার আনন্দ হয়। সকল লোকে মকদ্দমা করিতেছে না বলিয়াই উকীলের বাজার বড় মন্দা!

ডাক্তার বলিয়াছেন, বাজার মন্দা! ইহার অর্থ এই যে, রাজ্যের সমস্ত লোক রোগশয্যায় শয়ন করিতেছে না; রোগী বেশী না হইলেই ডাক্তারের বাজার মন্দা! কবিরাজের বাজার মন্দাও ডাক্তারের ইচ্ছার অনুরূপ।

দারোগার বাজার মন্দা, ইহার অর্থ এই যে, চুরি, ডাকাতী, খুন, জখম, দাঙ্গা, রাহাজানি, ঘরজ্বালানী আর অপঘাতমৃত্যু বেশী হইতেছে না, ঐ সকল অল্প হইলেই দারোগার বাজার মন্দা হয়।

ভট্টাচার্য্যের বাজার মন্দা, ইহার অর্থ এই যে, ইংরেজী পড়িয়া অনেকে এখন শ্রাদ্ধশান্তি,ব্রতপূজা উঠাইয়া দিতেছে। বড় বড় লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শ্রাদ্ধে ভট্টাচার্য্যেরা ফলার পান, বিদায় পান, বেশী আনন্দ হয়। যাহারা বড়লোক হইবে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র মরিবে, খুব ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইবে, ইহাই ভট্টাচার্য্য-দলের কামনা। সমস্ত বড়লোক শীঘ্র শীঘ্র মরিতেছে না, সেই দুঃখেই ভট্টাচার্য্যের বাজার মন্দা।"

বলা হইয়াছে,বাবুর নিকটে যাঁহারা ছিলেন,তাঁহাদের মধ্যে একজন ভট্টাচার্য্য। সেই ভট্টাচার্য্যের দিকে ফিরিয়া নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "দোষ লইবেন না, সত্য-কথাই আমি বলিতেছি। সকলের না হউক, অধিকাংশের ঐরূপ ইচ্ছা, তাহার উপর প্রতিবাদ চলিবে না। ঐ যে তর্কবাগীশ ঠাকুরটী আসিয়াছিলেন, তিনিও

বলিয়া গেলেন, বাজারটা ভারী মন্দা! কি হইলে বাজার মন্দা ঘুচিয়া যায়, আপনিও তাহা বুঝিতে পারেন।"

যাঁহারা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা হাস্য করিলেন, পুরন্দরবাবু হাস্য করিলেন না, শিহরিয়া শিহরিয়া ম্লানবদনে তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নীলাম্বরবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি কলিকাতা সহর এই রকম? আমি মনে করিতাম, পল্লীগ্রাম মন্দ, কলিকাতা ভাল। কলিকাতা সহরের কি এই দশা?"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, ক্রমে ক্রমে কলিকাতার এই দশা দাঁড়াইতেছে। যত কথাই বলা যায়, সকল কথাতেই কলিকাতার অধোগতি প্রতিপন্ন হয়। কলিযুগের ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে এখনকার সাহেবলোকেরা হাস্য করেন, মুসলমানেরা হাস্য করেন, হিন্দুসন্তানের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়া উন্নতিশীল হইয়াছেন, তাঁহারাও হাস্য করেন। সংসারের সারতত্ত্ব ধর্ম্ম; কলিকাতায় সেই ধর্ম্ম এখন বিপর্য্যস্ত। ধর্ম্মধ্বজীরা ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া একেশ্বরবাদী হইবার ইচ্ছা করেন, বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতেরা নাস্তিক হইবার অভিলাষ রাখেন। ব্রাহ্মণের ছেলেরা পৈতা ফেলিয়া দিতেছে, অন্নবিচার পরিত্যাগ করিতেছে, যবনান্নগ্রহণে মনুষ্যত্ব দেখাইতেছে, ব্রাহ্মণেতর অপরাপর জাতীয় লোকেরা পৈতা পরিবার হুজুগে মাতিয়াছে, তাহারা শাস্ত্রের নজীর দেখায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিরই পৈতা পরিবার অধিকার আছে, এই তাহাদের হেতুবাদ। আছে বটে নজীর, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্রধারণের অধিকার অপর কাহারও নাই। ক্ষত্রিয়ের কুশোপবীত, বৈশ্যের চর্ম্মোপবীত, পুরাতন পুথিতে এইরূপ লেখা আছে। এখন যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, এই বঙ্গদেশে তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণতের ন্যায় যজ্ঞসূত্রধারণে অধিকার আছে বলিয়া সভা করে, বক্তৃতা করে, শাস্ত্রের নজীর অন্বেষণ করে। এই হতভাগা দেশে অর্থলোভী তর্কবাগীশ, বিদ্যাবাগীশ, স্মৃতিবাগীশ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যেরাও সেই সেই দলের ব্যবস্থাপক হইয়া বড় বড় পত্রিকায় নাম দস্তখত করিতেছেন, কত লোকে কতবিধ ধর্ম্মের নূতন নূতন নামকরণ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। ধর্ম্মের ত এই দশা, ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া একে একে আরও গোটাকতক বড় বড় কথা আমি বলিতেছি।"

পুরন্দরবাবু করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। দেশের সর্ব্বনাশ হউক, জনকতক লোকের টাকা বাড়ুক, এমন স্বার্থপরতা এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীলাম্বরবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও কি বড় বড় কথা আপনার বলিবার ইচ্ছা আছে, বলুন, সমস্তই আমি শুনিব।"

নীলাম্বরবাবু বলিলেন, "ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশের মঙ্গল চান; এ দেশের মঙ্গলের জন্য অশেষবিশেষে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন; প্রজালোকের শরীর যাহাতে ভাল থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের একান্ত চেষ্টা। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহারা ভারতের স্বাস্থ্যবিধানের উপায় করিয়া দিতেছেন; মোটা মোটা বেতনে স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছেন, মেডিকেল কলেজ হইতে সুশিক্ষা দান করিয়া শত শত ডাক্তার বাহির করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না, তাঁহাদের দোষ নাই, সেটা কেবল আমাদের অদৃষ্টের দোষ।

স্বাস্থ্য-বিধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টেরও চেষ্টা আছে, দেশের লোকেরও চেষ্টা আছে; চেষ্টার ফল কিন্তু আর একপ্রকার হইতেছে; রোগের পরাক্রমের নিকটে চিকিৎসার পরাক্রম পরাজিত হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার অবস্থা আমি বেশী জানি, অতএব কলিকাতার কথা বলিয়াই এই বিষয়টী আমি আপনাকে বুঝাইব। এলোপাথ, হোমিওপাথ, কবিরাজ, হাকিম, অবধূত, হাইড্রোপাথ প্রভৃতি চিকিৎসকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কত বাড়িয়াছে, হিসাব করিয়া বলিতে হইলে গণনাসংখ্যা হারি মানিয়া যায়, তথাপি রোগের সংখ্যা কম হইতেছে না, যতই চিকিৎসক বাড়িতেছে, ততই নূতন নূতন রোগ বাড়িতেছে, শাস্ত্রীয় ঔষধ এবং অপরাপর বিধিসিদ্ধ ঔষধ পর্য্যাপ্ত হইতেছে না, দেখিয়া অনেকগুলি লোক ভিন্ন ভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য নূতন নূতন পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন, ঔষধ-বিক্রয় প্রচুর হইতেছে। যাঁহারা যে ঔষধ প্রস্তুত করেন, কলিকাতার বাজারে এবং প্রদেশে প্রদেশে তাহাই পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে বিক্রীত হয়। ঔষধওয়ালারা লাভবান্ হন, কিন্তু যাঁহাদের জন্য ঔষধ, তুল্যাংশে তাঁহারা লাভবান্ হন না। যে সকল রোগ এ দেশে পূর্ব্বাবধি

প্রচলিত ছিল, তাহার সংখ্যা ছাপাইয়া আজকাল আবার অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন নূতন রোগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। মালেরিয়াবিষযুক্ত জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ সর্ব্বপ্রথমে বারাসত, উলা, হালিসহর ও অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, বহুস্থান জনশূন্য করিয়া জঙ্গলময় করিয়াছিল, সেই ম্যালেরিয়া-বিষ এখন কলিকাতায় প্রবেশ করিয়াছে। আর একটা অদ্ভুত রোগ বোম্বাই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী হইতেছে, সেই সাংঘাতিক রোগটাও কলিকাতায় আসিয়াছে, বিচক্ষণ বিচক্ষণ ডাক্তার-কবিরাজ-মহাশয়েরা আজি পর্য্যন্ত সে রোগের নাম নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পাঁজি-পুঁথিতে সে রোগের নাম না পাইয়া ইংরাজ ডাক্তারেরা তাহার নাম দিয়াছেন 'প্লেগ'। গো-মনুষ্যাদির সাধারণ মড়কের ইংরাজী নাম ছিল 'প্লেগ,' এই নূতন রোগটাও সেই নামেই পরিচিত। পাঁজি পুঁথিতে যে রোগের নাম নাই, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সে রোগের চিকিৎসাও নাই; কার্য্যেও তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসক-মহাশয়েরা দুই একটা ঔষধের ব্যবস্থা করেন, প্রায়ই তাহা ভাসিয়া ভাসিয়া যায়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণান্ত। কাহারও কাহারও চব্বিশ ঘণ্টাও বিলম্ব সহে না!

ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, কবিরাজের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক মরিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকেরা তথাপি বলেন, "বাজার বড় মন্দা।" ইহাও একটা রোগ! রোগী মরুক আর বাঁচুক, তথাপি অন্যান্য রোগের এক এক প্রকার ঔষধ আছে, ঐ নিরাশ্বাস বাক্য-রোগের কোন ঔষধ নাই!

বাজার মন্দা হইলেও অগণ্য ডাক্তার-কবিরাজের স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হইতেছে। ডাক্তারগণের শিক্ষা আছে, পরীক্ষা আছে, যোগ্যতার নিদর্শন আছে, কিন্তু কবিরাজ-মহলে সে রীতি নাই। এখনকার কবিরাজগণের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, কবিরাজদলে এখন ভাল মন্দ বাছিয়া লওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল, 'বৈদ্য'। চিকিৎসা-জগতে বৈদ্য ভিন্ন অপর জাতি প্রবেশাধিকার পাইত না। আজকাল ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রের নবশাক, এমন কি, রাহুত, রাজবংশী, রজক, রন্ধক ও স্বর্ণকার ইত্যাদিজাতীয় নিরক্ষর লোকেরাও

কবিরাজ হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটীও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ছিল না। প্রাচীন কবিরাজ-মহাশয়েরা ঘরে ঘরে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগিগণের গৃহে গৃহে গিয়া ঔষধ প্রদান করিতেন। এখন কলিকাতার প্রায় গলীতে গলীতে এক একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। সহরের দেখা দেখি সহরের বাহিরেও আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের সাইনবোর্ড দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়সমূহের পরিচালক হইতেছে কাহারা? সত্য যাঁহারা পরিচালক হইবার অধিকারী, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়গুলির প্রতি অবশ্যই ভক্তি রাখিতে হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা জন্মাবধি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র দর্শন করে নাই, অন্য কোন কাজ না জুটিলে তাহারা এক একটা দোকানের চৌকাঠের মাথায় বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া মানুষকে দেখাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। সাইনবোর্ডে লেখা থাকে, 'কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মণ্ডল কাবশেখর, কবিরাজ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ কুণ্ড কবিকেশরী, কবিরাজ শ্রীজয়প্রকাশ দাস কাব্যরত্ন' ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিরাজ কাহাকে বলে, তাহা যাহাদের জানা নাই, দুঃসাহসের আশ্রয় লইয়া তাহারা আপনাদের নামের পূর্ব্বে কবিরাজ এবং নামের শেষে কাব্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতের উপাধি যোগ করে, ইহা কদাচ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। সাইনবোর্ড দিয়া যাহারা বস্ত্র বিক্রয় করে, জামা, জুতা, পুতুল অথবা অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহাদের কার্য্যের উপর কথা কহিবার কাহারও অধিকার নাই, কিন্তু যে কার্য্যে মানুষের জীবন মরণ সম্বন্ধ, সে কার্য্যে অনধিকারী ব্যক্তিগণকে প্রশ্রয় দেওয়া পাপের কার্য্য। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বাজারের খেলানা নহে, সে ঔষধ সেবন করিলে কি হয়, তাহা যাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারা মানুষকে ঔষধ প্রদান করিয়া চিকিৎসা করিতে সাহস করে, ইহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ডাক্তারের পরীক্ষা আছে, ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারগণের পরীক্ষা আছে, কবিরাজের পরীক্ষা নাই; কবিরাজ উপাধিধারী অপরীক্ষিত মূর্খলোকের হস্তে ঔষধ খাইয়া মানুষ যদি মরে, তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? বড় আক্ষেপের বিষয়, এত বড় রাজ্যে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই!

কলিকাতা সহরে আজ কাল প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরেই দুই একজন করিয়া এক এক প্রকার রোগে আক্রান্ত; রোগাধিক্য হেতু ডাক্তার-কবিরাজের দর্শনী

বাড়িয়াছে, ঔষধের মূল্য বাড়িয়াছে, এত বাড়িয়াছে যে, গৃহস্থের সংসারখরচ অপেক্ষা চিকিৎসার খরচ প্রায় দুই তিন গুণ অধিক। সামান্য আয়বান্ লোকের পক্ষে ইহা যে কতদূর কষ্টকর, চিকিৎসক-মহাশয়েরা তাহা বিবেচনা করিতে পারেন না। ব্যয়াভাবে অনেক দরিদ্রলোক বিনা চিকিৎসায় ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যায়, এরূপ অনুমান করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ডাক্তার মহলে আজকাল আর একটা নূতন অভ্যাস হইয়াছে, জ্বরাক্রান্ত রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া জ্বরের উত্তাপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা হইত, এখন তাহার বদলে তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার চলিতেছে; রোগীর কক্ষদেশে থার্ম্মোমিটার রাখিয়া দিয়া তাপ নিরূপণ করা হয়, তাপ কত ডিগ্রী উঠিয়াছে, যন্ত্রের পারদ দর্শনে সেইটুকু জানিতে পারিলেই ডাক্তারেরা যথেষ্ট মনে করেন। কেবল তাপনিরূপণেই জ্বরের প্রকৃতি বুঝা যায় না, ইহা ভাবিতে তাঁহারা ভুলিয়া যান; বায়ু, পিত্ত, কফ, নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া এই তিনটী স্থির করিতে না পারিলে, ঔষধপ্রয়োগ বৃথা হয়, কোন কোন স্থলে বিপরীত হয়, ডাক্তার-মহাশয়েরা কেন যে সেটী ভাবেন না, ইহাই আমরা আশ্চর্য্য মনে করি। ডাক্তারের দেখাদেখি কোন কোন কবিরাজও অধুনা থার্ম্মোমিটার বসাইয়া জ্বরের চিকিৎসা করিতেছেন। নাড়ীজ্ঞান নাই বলিয়া ঐরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, অনেকে এইরূপ মনে করেন, চিকিৎসকগণের পক্ষে ইহা সামান্য লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় নহে। নাড়ীজ্ঞান প্রয়োজন নাই, আনাড়ীরাই ঐরূপ ভাবিতে পারেন, বাস্তবিক আমাদের চিকিৎসা-সংসার অনেক স্থলে কেবল আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছে, চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্যে যেরূপ সুফলের আশা করা যায়, তাহা—"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় সরকার আসিয়া সংবাদ দিল, রঙ্গলাল-বাবু বাড়ী আইসেন নাই। পুরন্দরবাবু একটু চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল?"

সরকার ঠিক উত্তর দিতে পারিল না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেয়া-লের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বাবু বলিলেন, "সাড়ে আটটা, এখনও আসিল না, কারণ কি? যদুপতিকে ডাক দেখি।"—সরকার যদুপতিকে ডাকিতে গেল।

যে তিনটী পুত্রকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য পুরন্দরবাবু কলিকাতায় আনিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেটী বড়, সেইটার নাম রঙ্গলাল; বয়স ত্রয়োদশ

বর্ষ ; যেটী দ্বিতীয়, তাহার নাম যদুপতি ; বয়স দশ বৎসর ; যেটী সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাহার নাম হরিচরণ, বয়স আট বৎসর।

সরকারের সঙ্গে যদুপতি ও হরিচরণ উভয়েই পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুপতির দিকে চাহিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের দাদা কোথায় গেল ? এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাটী আসিল না কেন ?"

যদুপতি বলিল, "পাঠশালার তিনজন বালকের সঙ্গে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে।"

কোন্ থিয়েটার জানিয়া লইয়া বাবু তখন সরকারকে বলিলেন, "এখনি যাও, থিয়েটার হইতে ছেলেটাকে শীঘ্র ধরিয়া আন।"

সরকার ছেলে ধরিতে গেল, বিস্মিতনয়নে বাবুর মুখপানে চাহিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন, এই গো ! রোগে ধরিয়া আসিতেছে ! আপনি শাসন করিয়া দিবেন, সে ছেলে যেন আর কখনও থিয়েটারে না যায়। ছোট ছোট ছেলেরা থিয়েটারে গিয়া কুসঙ্গে মিশিয়া পড়ে, মন্দ মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে, অতি অল্পেই তাদের চরিত্র দূষিত হয়।"

নীরবে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "থিয়েটারটা কলিকাতায় কত দিন হইয়াছে ?"

নীলাম্বরবাবু উত্তর করিলেন, "পঞ্চাশবৎসরের অধিক হইবে। আগে আগে সখের থিয়েটার ছিল, থিয়েটার দেখিতে কাহারও পয়সা লাগিত না ; থিয়েটারে তখন মেয়েমানুষ ছিল না ; যাত্রার সখীদের ন্যায় বালকেরাই মেয়েমানুষ সাজিত। থিয়েটারের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল না ; এক একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতেই অভিনয় হইত। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, থিয়েটারের বাড়ী হইয়াছে, এক দুই করিয়া দলের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। থিয়েটারের কর্ত্তারা যখন টিকিটের নিয়ম করিলেন, টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া লোকে যখন থিয়েটার দেখিতে আরম্ভ করিলেন, দর্শকের সংখ্যা তখন অধিক হইত না। বুদ্ধিবলে কর্ত্তারা তখন স্থির করিলেন, থিয়েটারে মেয়েমানুষ আনিতে পারিলে দর্শক অধিক হইবে। সাধারণকে তাঁহারা বুঝাইলেন, মেয়েমানুষের কার্য্য মেয়েমানুষে করিলেই ভাল দেখায়, প্রকৃতির মর্য্যাদাও রক্ষা পায়। প্রকৃতির মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্তই মেয়েমানুষ সংগ্রহ করা হইল ; বেঙ্গল থিয়েটার নামক রঙ্গমঞ্চেই মেয়েমানুষের প্রথম প্রবেশ। এটী বিলাতী অনুকরণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে নীলাম্বরবাবু একটু থামিলেন, বালক দুটী তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "যাও বাবা, তোমরা বাড়ীর ভিতর যাও, পাঠ অভ্যাস কর গিয়া।"

বালকেরা বাড়ীর ভিতর গেল, নীলাম্বরবাবু পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "থিয়েটারে মেয়েমানুষ বাহির করা বিলাতী প্রথার অনুকরণ। বিলাতে গৃহস্থ-কামিনীরা প্রকাশ্য থিয়েটারে অভিনয় করেন, আমাদের দেশে সেরূপ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এখানকার থিয়েটারে যাহারা প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা বেশ্যা। মেয়েমানুষের কার্য্য মেয়েমানুষে করিলেই ভাল দেখায়, থিয়েটারের কর্ত্তারা প্রথমে এই কথা বলিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে কতকগুলি মেয়েমানুষকে পুরুষ সাজান হইতেছে। বেশ্যারা অল্পদিনের মধ্যে অভিনয়কার্য্যে বেশ পটু হইয়াছে। পুরুষবেশে অথবা নিজ নিজ বেশে বেশ্যারা যে সকল কার্য্যের অভিনয় করে, তাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রণয়-ঘটিত কোনরূপ ব্যবহার থাকিলে কেহ কোন দোষ বিবেচনা করেন না। বিলাতে অন্তঃপুর নাই, বিলাতী কামিনীরা স্বাধীনা, তথাপি সেখানে থিয়েটারের খেলায় মাঝে মাঝে এক একটা রহস্য শ্রুতিগোচর হয়। বিলাতের এক থিয়েটারে একবার একটী ভদ্রকামিনী নায়িকা সাজিয়াছিলেন, যে নাটকের অভিনয়, প্রণয়প্রসঙ্গে নায়ক পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চাশবার নায়িকাকে চুম্বন করিবেন, সেই নাটকে এইরূপ লেখা ছিল; অভিনয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। নায়িকার স্বামী উপস্থিত ছিলেন, আপনার নোট-বহিতে তিনি সেই চুম্বনগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন। অভিনয়ের পরদিন সেই নায়কের নামে তিনি আদালতে নালিস উপস্থিত করেন। প্রত্যেক চুম্বনের মূল্য দশ পাউণ্ড, পঞ্চাশটী চুম্বনের মূল্য পাঁচশ পাউণ্ড, এইরূপ হিসাব করিয়া আরজীতে দাবীর ঘর পূরণ করা হয়। বিচারের সময় বিচারপতি সেই ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, অগ্রে আপনি সে নাটক পাঠ করিয়াছিলেন কি না, আপনার পত্নী সে নাটকের অভিনয়ে নায়িকা সাজিবেন, তাহা আপনি জানিতেন কি না?' ফরিয়াদী সেই প্রশ্নে উত্তর দিয়াছিলেন, 'জানিতাম।' আইনানুসারে মকদ্দমা অবশ্য ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল, বিচারালয়ে সমস্ত লোক হাস্য করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সে প্রকার হাস্যকর মকদ্দমা উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বেশ্যারা অভিনয় করে, বেশ্যাগণের স্বামী নাই।"

থিয়েটারের কথা বলিতে বলিতে কি একটু চিন্তা করিয়া নীলাম্বরবাবু বলিলেন, "এইখানে আমার আর একটা কথা মনে পড়িল। যে সকল বঙ্গযুবক উন্নতিশীল নাম ধারণ করেন, সেই দলের প্রধান হইতেছেন, কৈশব সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায়ের একজন প্রবীণ বক্তা একদা এক সুললিত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমারদিগের বেশ্যাভগিনীগণ একবার কুপথে চলিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া আর যে তাঁহাদিগকে শোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে না, যুক্তিতে এমন আইসে না। বেশ্যাভগিনীগণের বিবাহ দিতে পারিলে অবশ্যই তাঁহাদের চরিত্র শোধিত হইতে পারে।' সেই বক্তৃতার গুণে বক্তার দুই একটী বেশ্যাভগিনী বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু সতীত্ব সেই সকল কলুষিত কলেবর স্পর্শ করে নাই, বক্তার বেশ্যা ভগিনীগণ সতী হইতে পারে নাই।"

রঙ্গলালকে লইয়া সরকার ফিরিয়া আসিল। রঙ্গলালের মুখ বিশুষ্ক। বাবু তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, নীলাম্বরবাবু প্রহার করিতে দিলেন না;—বারান্তরে প্রহার হইবে বলিয়া, থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। মাথা হেঁট করিয়া রঙ্গলাল বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

থিয়েটারের গল্প শুনিতে শুনিতে পুরন্দরবাবুর কৌতুক বাড়িতেছিল, নীলাম্বরবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতার থিয়েটারের আর কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আপনি কি অবগত আছেন?"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "অনেক আমি জানি। প্রথম প্রথম যখন থিয়েটার হয়, তখন অনেকগুলি প্রবীণ লোক তাহা দেখিতে যাইতেন, এখন আর থিয়েটারের আসনে প্রায়ই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এখন কেবল পূর্ব্ববঙ্গের সৌখীন লোকেরা আর আমাদের বিদ্যালয়ের বালকেরাই থিয়েটারের আসন পূর্ণ করিতেছে। বালকেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লেখাপড়ার কথা আলোচনা করিতে করিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত; এখন তৎপরিবর্ত্তে সকলের মুখেই থিয়েটারের কথা, অভিনয়ের কথা, নায়িকাদের বিশেষ বিশেষ নামের কথা; সকলের হস্তেই এক এক বড় বড় হ্যাণ্ডবিল্! এতদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে, অনেক বালকের চরিত্র নষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ যে সকল নবীন যুবক থিয়েটার-দর্পণে আপনাদের মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া আমোদের আকর্ষণে থিয়েটারের দলের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছেন, থিয়েটারের সাজঘরে গোপনে তাঁহারা যে সকল কার্য্য

করেন, তাহা অনির্ব্বচনীয় ; যে সকল রসিক পুরুষ মহাকৌতুকে গ্রীনরুমের মধ্যে নায়িকাগণকে পোষাক পরাইয়া দেন, তাঁহাদের আচরণের কথা মনে হইলে আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। এইখানে আর একটী কুপ্রথার কথা আমি বলিব।"

নারী-সংসার-তরঙ্গে আমরা যে একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম, নীলাম্বর-বাবু এইখানে সেই কথাটী তুলিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের অন্তঃপুরে কুলকামিনীরা প্রকাশ্য থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গহনা-বস্ত্র পরিয়া যুবতী কুলবধূরা পর্য্যন্ত থিয়েটার দেখিতে যান। তাঁহাদের স্বামীগণ আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে থিয়েটার দেখাইয়া আমোদিনী করেন! শনিবার, রবিবার, বুধবার এই তিন রজনীতেই কুলকামিনীদের জন্য গাড়ী গাড়ী পাশ! কেবল কলিকাতার অন্তঃপুরপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগুলি থিয়েটারে উড়িয়া যায়, তাহাও নহে, কালকাত্তার চারি পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, এমন কি, তদপেক্ষাও অধিকদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের কীর্ত্তিমান্ পুরুষেরা আপনাদের নব নব বিহঙ্গিনী-গণকে কলিকাতার থিয়েটারে উড়াইয়া আনিয়া বাহাদুরী দেখাইতেছেন। ইহার ফল যে কি হইবে, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না। কৃষ্ণ-নারদ-সংবাদে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, বহু পুরুষের সঙ্গে একত্র বাস, নিরন্তর পতির প্রবাস এবং যাত্রোৎ-সবে সঙ্গতি এই তিন কারণে স্ত্রীজাতির সতীত্ব কম্পিত হয়, অন্তরে অন্তরে চরিত্র দূষিত হইয়া আইসে। ভগবানের এই বাক্য এখনকার উন্মত্ত যুবকগণের মনেও আইসে না, হয় ত শ্রুতিগোচরও হয় না।"

পুরন্দরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কলিকাতায় থাকিতে আর তাঁহার ইচ্ছা থাকিল না। স্বদেশে গিয়া বিষয়-কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি কাশীধামে যাত্রা করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। সে রাত্রে আর কোন কথা উঠিল না, নীলাম্বরবাবু বিদায়গ্রহণ করিলেন, পুরন্দরবাবু মনে মনে নানা বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলেন।

পরদিন ডাকযোগে তাঁহার নিকট এক পত্র আসিল। রামদয়ালবাবুর পত্র। পাঠ করিয়া তিনি অবগত হইলেন, সেখানে যে মকদ্দমা হইতেছিল, সেই মকদ্দমার বিচার শেষ হইয়াছে। দর্পনারায়ণ গাঙ্গুলী সাত বৎসরের জন্য কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বীরভদ্র ভট্টাচার্য্যের পাঁচ বৎসর,

ভৃগুরাম নাগের পাঁচ বৎসর, আর তাহার পক্ষের সাক্ষীগণের তিন তিন বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। শুভঙ্করী দেবী ও বিশ্বময়ী দেবী ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেবরের অর্দ্ধেক বিষয় বাহির করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া দর্প-নারায়ণ গাঙ্গুলী শুভঙ্করী দেবীকে তাঁহার পুত্রবধূর সহিত স্থানান্তরে লইয়া রাখিয়াছিলেন, শুভঙ্করীদেবী নিজমুখে সেই কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরন্দরবাবু পুত্রতিনটীকে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, উইল করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কর্ত্তৃত্বভার দিয়া তিনি কাশীযাত্রা করিলেন। কাশীযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার আর একটী পুত্রের বিবাহ হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কন্যা ক্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে হইত, এখন ধন-গৌরবে কন্যা দানে পান, তিনি নিজেও ধনগৌরবে এক কুলীন ব্রাহ্মণের তিনটী কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহে আজকাল অনেক টাকা ব্যয়, কুলীন হইয়াও অর্থাভাবে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকেই একে একে তিনটী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। জামাতাকে এক পয়সাও দিতে হয় নাই।

ইহার নাম বঙ্গরহস্য। দেখা হইল, স্বেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম, দাম্ভিকতাই বিদ্যা, স্বার্থপরতাই পুণ্য, দরিদ্রতাই পাপ, প্রতারণাই মনুষ্যত্ব; এখনকার উন্নতির সর্ব্বাঙ্গই কেবল টাকা।—টাকাতেই পাণ্ডিত্য, টাকাতেই কৌলীন্য, টাকাতেই মর্য্যাদা। এই সকলের সমষ্টির নাম উন্নতি। বস্তুতঃ ইহাই যদি বঙ্গ সংসারের উন্নতি হয়, তবে এই সাতকোটি-জনপূর্ণ সুবিস্তৃত বঙ্গদেশ যত শীঘ্র বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

সমাপ্ত।